

A. V. Seyne & Bros.

সারনাথের অশোক-লিপি।

সারনাথের ভূগর্ভ খননে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মহারাজ অশোকের প্রস্তর স্তম্ভটি সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন এবং ঐতিহাসিকতায়ও সমধিক মূল্যবান্। ইহার শিল্প-সৌন্দর্য্য জগতের বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। এই স্তম্ভের আবিষ্কারক সারনাথ খননের প্রধান নায়ক এঞ্জিনিয়ার এফ, ও, ওরটেল মহোদয় সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার যত্নে স্তম্ভশীর্ষটি সুচারুরূপে উত্তোলিত হইয়া অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্তম্ভশীর্ষটি সারনাথের মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে; স্তম্ভের নিম্নাংশ এখনও "প্রধান বিহারের" (সুবিধার জন্য ইহাকে "Main Shrine" বলা হইয়াছে) পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে তৃণাচ্ছাদনের নিম্নে প্রোথিত অবস্থায় বর্ত্তমান। এই স্তম্ভগাত্রেই আমাদের আলোচ্য অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে অশোক-লিপি ব্যতীত আরও দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র লিপি পরিদৃষ্ট হয়। একটিতে রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সম্বৎসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দিবসের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই লিপিখানি লইয়া আজকাল বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে আলোচনা চলিতেছে। অপর লিপিখানি দানবিষয়ক লিপি। এই দুইখানি লিপি "কুষাণ" অক্ষরে লিখিত। অতঃপর এই দুইটির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। অশোক-লিপির প্রথম তিন পংক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার প্রধান অংশটি এখনও একরূপ অবিকৃত অবস্থায় আছে। বয়ার, সেণার, টোমাস ভোগেল ও ভিনিস প্রমুখ লিপিতত্ত্বজ্ঞগণ এই লিপির বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া যদিও ইহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় তথাপি মূলতঃ এই লিপির ব্যাখা এখন একরূপ সর্ব্বজন-পরিগৃহীত হইয়াছে।

অনুমান হয়, এই শাসনলিপিখানি তৎকালীন রাজধানী পাটলিপুত্রের ও প্রদেশসমূহের প্রধান কর্ম্মচারিগণের উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় প্রথম তিন পংক্তি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, প্রথম বাক্যটির মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের আর উপায়মাত্র নাই। বৌদ্ধ-সংঘে ধর্ম্ম লইয়া কলহ করিয়া সংঘের বিভাগ উৎপন্ন করিতে কেহই অধিকারী নহেন, ইহাই অনুশাসনের

আবাহন।

ইন্দিরা মা'র মন্দির-দ্বারে
উঠেছে শঙ্খ বাজি'।
সমাগত শুভ পূজার লগন,
কে থাকিবে আজি স্বপনে মগন!
অর্ঘ্য রচিতে আন গো ত্বরিতে
গন্ধ-কুসুমরাজি।
এস গো জননী বঙ্গলক্ষ্মি,
ধরিয়া দিব্য বেশ,
ধনে ও ধান্যে চির কল্যাণে
করিয়া পূর্ণ দেশ।

এস, করে লয়ে হেম-ঝাঁপি তব
রতনে মাণিকে ভরা।
যে দিকে ফিরা'বে করুণ নয়ন
ফুটিয়া উঠিবে শোভা অতুলন,
চরণ-পরশে হাসিবে হরষে
শস্যশালিনী ধরা।
এস গো জননী—ইত্যাদি।

বিশ্রুত ছিল একদা ভুবনে
বিভব-কাহিনী যা'র—
যে দেশের চারু শিল্প-নিচয়
প্রসাদের তব দিত পরিচয়,
ভুলি'সে সাধনা তব আরাধনা
আজি কি দীনতা তা'র!
এসগো জননী—ইত্যাদি।

শূন্য আসনে আসি' মা, কমলা
বারেক দাঁড়াও তুমি;
আসিবে ফিরিয়া নব গৌরব,
ছুটিবে আবার যশ-সৌরভ,
জগৎ-সভায় নবীন শোভায়
ভাতিবে বঙ্গভূমি।
এসগো জননী—ইত্যাদি।

শ্রী রমণীমোহন ঘোষ



সারনাথের লিপিযুক্ত অশোকস্তম্ভ।

Photo by R. Majumder.

Mohila Press, Calcutta.

প্রথম কথা। অনুশাসনের দ্বিতীয় কথা, এই সকল কলহকারী ব্যক্তির কি প্রকারে শাস্তি বিধান করিতে হইবে তাহার নির্দ্ধারণ। এই প্রকারের অননুমোদিত আচরণে অপরাধিগণকে সংঘচ্যুত করাইয়া বিহারবহির্ভূত স্থানে বিতাড়িত করিতে হইবে। ধর্ম্ম-কলহের জন্য এই প্রকারের দণ্ডবিধান বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক তাঁহার পাটলিপুত্রের অশোকাহুত ধর্ম্মসমিতির বৃত্তান্তেও উল্লিখিত হইয়াছে। সাঞ্চী ও প্রয়াগের স্তম্ভ-লিপিতেও ইহার অনুরূপ অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য অনুশাসনখানির অপর অংশে সম্রাটের আজ্ঞার প্রচার-সম্বন্ধে নিয়মাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সংঘসমূহে ও জনসাধারণের মিলনস্থানে এই আজ্ঞা প্রচার করিতে হইবে। ইহাতে রাজকর্ম্মচারিগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অনুশাসনের একখানি প্রতিলিপি তাঁহাদের প্রধান সমিতিতে ক্ষোদিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি এই আজ্ঞাও দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনুশাসনের বিশুদ্ধ প্রতিলিপি তাঁহাদের সীমাভুক্ত স্থানের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া দেন ও সেনানিবাসযুক্ত নানা জনপদের অধ্যক্ষগণকেও এই ভাবে বিদিত করাইয়া দেন।

আলোচ্য অনুশাসনখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুসন্ধানকারিগণের নিকট বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ইহা হইতে জানা গিয়াছে যে, রাজা "সদ্ধর্ম্মে"র(*) নেতৃরূপে বিশেষ ক্ষমতাসহকারে বিহারসমূহের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান করিতেন। আরও একটি সত্য ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অশোক ধর্ম্ম-কলহকারিগণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সত্যতা এখন আর প্রমাণের বহির্ভূত নহে। এই লিপিখানিতে কোনরূপ সময়ের উল্লেখ নাই। কোন কোন লেখকের মতে অশোক যখন বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করিতে করিতে সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন, ইহার রচনাকার্য্য তখনই সম্পাদিত হয়। এই অনুমান যদি ভ্রমশূন্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, অনুশাসনখানি "তরাই স্তম্ভলিপিগুলির" সমসাময়িক। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইহার অনুরূপ প্রয়াগের অশোকানুশাসনের সময় উক্ত স্তম্ভলিপিগুলির পরবর্ত্তী; অর্থাৎ অশোকের ২৭শ রাজ্যাব্দের অথবা খৃঃ পূঃ ২৪৩ সালের পরবর্ত্তী।

* বৌদ্ধগণ আপনাদিগের ধর্ম্মকে "সদ্ধর্ম্ম" বলিয়া আসিতেছেন। পালি সাহিত্যে কুত্রাপি বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ কথা ব্যবহৃত হয় নাই।

সুতরাং, সারনাথের লিপিও প্রয়াগের অনুশাসনের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।* পাটলিপুত্রের ধর্ম্ম-সমিতিতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহারই ফলে সম্রাটের এইরূপ আজ্ঞাপত্র এই অনুশাসনে ক্ষোদিত হইয়াছে। এক্ষণে পালি সাহিত্য হইতেও এ কথার প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যাইতেছে।

অক্ষরান্তর।

পঙ্ক্তি

১। দেবা ... ...

২। এল ... ...

৩। পাট .... যে কেনপি সংঘে ভেতবে এ চুংখো।

৪। [ভিখু-বা-ভিখুনি-বা] সংঘং ভা [খতি] সে ওদাতানি দুস [।] সংনং ধাপয়িয়া অনাবাসসি

৫। আবাসয়িয়ে॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিখু সংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপায়িতবিয়ে॥

৬। হেবং দেবানং পিয়ে আহা॥ হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা॥

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তি কং নিখিপাথ॥ তেপি চ উপাসকা অনুপোসথং যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে॥ অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতেপোসথায়ে

৯। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ॥ আবতকে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসয়াথ তুকে এতেন বিয়ংজনেন॥ হেমেবসবেসু কোট বিসবেসু এতেন

১১। বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা॥ ... ... (†)

লিপি-পরিচয়। অশোকের অন্যান্য স্তম্ভলিপির ন্যায় এই লিপিখানিও সুপ্রাচীন "মৌর্য্য" বা "ব্রাহ্মাক্ষরে" ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহাতে যতগুলি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে বিশেষ কোন অভিনবত্ব দেখিতে পাই না।

* সুপ্রসিদ্ধ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের এই মত।

† J & Proceedings of the A. S. B. Vol III, No. 1

ব্রাহ্মাক্ষরের বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসুগণ সুবিখ্যাত ডাঃ বাঁলার প্রণীত "On the Origin of the Indian Brahma Alphabet" নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

ভাষা। সারনাথলিপির ভাষার বিশেষত্বগুলি খাল্‌সি, ধৌলি, জৌগড়, রধিয়া, মথিয়া, রূপনাথ, বৈরাত, সাসারাম ও বরাবর গুহার লিপিগুলির মাগধী ভাষার বিশেষত্বের অনুরূপ। ইহার উদাহরণ যেমন:—পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনে 'এ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে; 'র' স্থানে 'ল', 'ণ' স্থানে 'ন'; একমাত্র 'স' কারের ব্যবহার, 'এবং' ও 'ঈদৃশ' স্থানে যথাক্রমে 'হেবং' ও 'হেদিসে প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্টান্তযোগ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কলঙ্ক-মুক্তি।

পূতসলিলা জাহ্নবীর তীরে ক্ষুদ্র আশ্রম; সুন্দর, পরিচ্ছন্ন।

লতাকুঞ্জের পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বেদিকাটি; আশ্রমবাসীর উপবেশনস্থল।

বেদিকার উপর বসিয়া বসিয়া চঞ্চলস্রোতা জাহ্নবীর ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ দেখা যায়; আর দেখা যায়, সুনীল গগনে রঞ্জিত মেঘের খেলা; জাহ্নবীজলে ছোট বড় নৌকার শ্রেণী; সে সব নৌকা কোন্ অচেনা দূরদেশের যাত্রী বুকে করিয়া চলিয়াছে কে জানে?

অদূরে বারাণসীধাম; হিন্দুর পুণ্যতীর্থ; প্রতি সন্ধ্যায় দেবালয়ে দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া ওঠে; আর তাহারই মৃদুমধুর ধ্বনি স্বপ্নসঙ্গীতের মত আশ্রমের চারিপার্শ্বে গুঞ্জরিয়া উঠে। সে যেন স্বর্গের বাদ্য, পুণ্য আশ্রমখানিকে অভিনন্দন করিবার জন্যই নিত্য ধূসর সন্ধ্যায় নামিয়া আইসে।

পুষ্পস্তবকনমিত প্রতি লতিকায় মধুপগুঞ্জন; আর শ্যামল ছায়াবৃত কুঞ্জবনপথে শান্ত মৃগশিশুর নিঃশঙ্ক বিচরণ, সে আশ্রমখানিকে সত্যই সেই কোন্ অতীত যুগের পুণ্য তপোবনের সকল সৌন্দর্য্যের ও গরিমার অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল।

আশ্রমখানি ক্ষুদ্র ; বাহিরের লোক জানে মাতৃতীর্থ ঃ—এক মাতৃরূপিণী রমণী সে তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সামান্যা সে রমণী—নাম গোত্র অপরি-ত।—তবু তাহার করুণাপ্লুত হৃদয়খানি সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসিয়াছে। মাতৃরূপে জগদ্ধাত্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে আর্ত্তের সেবিকা—বিপন্নের আশ্রয়রূপিণী।

আশ্রমখানিতে আর স্থান নাই—পীড়িতে আশ্রম ভরিয়া গিয়াছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণে জাহ্নবীর ক্ষুদ্র তরঙ্গশীর্ষগুলি জ্বলিতেছিল। প্রস্তরবেদিকায় বসিয়া রমণী দুর আকাশের দিকে চাহিয়া রঞ্জিত মেঘের খেলা দেখিতেছিল ; তাহার দৃষ্টি মুগ্ধ—শান্ত।

ঘাটে আসিয়া একখানি ছোট তরী লাগিয়াছে।

নৌকারোহী প্রশ্ন করিল, "এই মাতৃতীর্থ ?"

মৃদুকণ্ঠে রমণী কহিল, "সেবাশ্রম।"

"উঠাও"—আরোহী নৌকাবাহীদিগকে বলিল।

তখন তাহারা ধীরে ধীরে এক মূর্চ্ছাতুর দেহ আশ্রমে তুলিয়া আনিল।

রমণী কহিল,—'সঙ্গে আইস।"

রমণীর শয়নকক্ষ ভিন্ন আর কোথাও স্থান ছিল না। শুভ্র, পরিষ্কৃত শয্যাখানি। ধীরে ধীরে তাহার উপর রোগীর মূর্চ্ছিত দেহ রক্ষিত হইল।

বারাণসীর পথপ্রান্তে নৌকারোহী তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন—এইটুকু রোগীর পরিচয়।

রমণী চাহিয়া দেখিল,—রোগী কিশোরবয়স্ক বালক ; রুক্ষ কেশ আর মলিন বেশের মধ্য দিয়া তাহার রমণীয় কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

পলকহীননেত্রে রমণী পীড়িত বালকের মুখখানি দেখিতেছিল। ঠিক্ সেই মুহুর্ত্তে তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এতটুকু একটি লীলাচঞ্চল শিশু অলক্ষ্যে বাহির হইয়া আসিল। সে শিশু অনাবিল হাসিটির মত সুন্দর ; আর শয্যালুণ্ঠিত এই কিশোরমূর্ত্তি—এ যে সূর্য্যতাপক্লান্ত যুথিকাগুচ্ছের মত ম্লান, স্বপ্নময়।

রমণীর শঙ্কাশঙ্কিত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে রোগী ডাকিল, "মা!"

ক্ষুদ্র আহ্বান! কি তাহার শক্তি! রমণীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

রমণীর সেবা ও পরিচর্য্যা আগ্রহপরিপূর্ণ ;—তাহার ক্ষুদ্র ললাটদেশ মৃদু-

বিকুঞ্চিত; রুক্ষ চূর্ণকুন্তল ব্যজনীর বাতাসসংস্পর্শে একটু একটু উড়িতেছিল।

স্বপ্নের মোহ আবার তাহাকে ঘিরিতেছিল।

সে কি ভাবিতেছিল?

সে কত দিনের কথা! মুহূর্ত্তের এতটুকু ভুল; তাহার পর সে স্রোতে শৈবালের মত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আসিয়া পড়িল! মাথার উপরে আচ্ছাদন ছিল,—অনন্ত নীলাকাশ—আর পদতলে আশ্রয় ছিল,—শস্যশ্যামলা ধরিত্রী!

তাহার পর, গিরিপাদচুম্বী ঊর্ম্মির মত তাহার ব্যাকুল অন্তরের অনন্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারাশি তাহার পরিত্যক্ত গৃহখানি বেড়িয়া বেড়িয়া কত নীরব নিবেদন করিয়াছে,—কিন্তু সে গৃহ তাহার কাছে পাষাণপ্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের মত চিরদিনই অভেদ্য রহিয়া গিয়াছে! মুহূর্ত্তের ভুলে সে তাহার চিরদিনের অধিকারস্বর্গ হইতে বঞ্চিতা হইয়াছে।

তাহার চারি বৎসরের শিশুটি! সে যে এতটুকু ছিল! শিশুর লীলাচঞ্চল চলনভঙ্গি; শৈবালজড়িত শতদলের মত শ্লথকুন্তলরাজিপরিবেষ্টিত তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি—আজিও যে তাহার নয়নের কাছে ভাসিতেছে!

তাহার পাপ কতটুকু? অন্তঃপুরের পবিত্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তের ভুলে সে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর পর্ব্বতবক্ষচ্যুত স্রোতস্বিনীর মত সে আর অন্তঃপুরবক্ষে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। বাহিরে বিশ্বের কোলাহল যখন তাহার কাণের কাছে নিষ্ঠুরভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন সে বুঝিল, নারীর স্থান বাহিরে নহে, অন্তঃপুরে। সে দিন বাহিরের অসংযত দৃষ্টি তাহাকে পলে পলে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছিল।

পল্লবিনী লতিকার আশ্রয়ের জন্য দৃঢ় তরুশাখার প্রয়োজন, সেই দণ্ডেই মর্ম্মে মর্ম্মে সে তাহা অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু সে আশ্রয় ত সে স্বেচ্ছায় চরণে দলিয়া আসিয়াছিল!

পুরুষের সহস্র ভুল সংসার ক্ষমা করিয়া লয়; কিন্তু রমণীর এতটুকু ভ্রান্তি কি মার্জ্জনীয় নহে? কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবে?

তাহার পর পবিত্র তীর্থ বারাণসীধামে তাহার সেই ভ্রান্তিটুকুর প্রায়শ্চিত্ত, এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সে করিয়াছে। ভস্মাচ্ছাদিত হোমাগ্নির মত আজি সে কল্যাণময়ী।

তাহার পুণ্যোদ্ভাসিত শান্ত মাতৃমূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া কত মাতৃহীন শিশু ব্যথা ভুলিয়াছে,—কত শঙ্কিত মৃত্যুপথযাত্রী চিরশান্তি লাভ করিয়াছে!

কোন্ সুদূর অতীত লোকের পাষাণী অহল্যার মত সে শুধু অপেক্ষা করিতেছে; কবে সেই প্রেমসুন্দর বিশ্বের ঠাকুর, তাহার অন্তরবীণায় ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া যাইবেন যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে!

তাহার যুগব্যাপী সেবাব্রত, তাহার নিষ্ঠা ও সাধনা, তাহার অন্তর ক্ষতের উপর একটি অমৃতপ্রলেপ দিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তবু ত হৃদয়ের বেদনা, কোন্ অন্তরতম প্রদেশে যেন এতটুকু রহিয়া গিয়াছে। আজ তাহার অতীত জীবনের প্রত্যেক কাহিনী তাহার মানসচক্ষুর কাছে এমন সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে কেন?

সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রায়শ্চিত্তের পর আজি সে পুণ্য জাহ্নবীতটে বসিয়া কি মোক্ষফল কুড়াইয়া পাইল?

একবার সে কক্ষপ্রাচীরের দিকে চাহিল; ম্লানপুষ্পমালিকাবিমণ্ডিত আলেখ্যখানি কাহার? আলেখ্যচিত্রিত মূর্ত্তির দৃষ্টিটুকু কি কোমল—কি স্নেহময়!

ওই কক্ষপ্রাচীরবিলম্বিত আলেখ্য, আর এই রোগশয্যাশায়িত পরিম্লান তরুণ কিশোরমূর্ত্তি—ইহাদের মধ্যে কি সাদৃশ্য আছে?

তাহার হৃদয়ের অন্তরম প্রদেশের সযত্নরক্ষিত ধন, চারি বৎসরের এতটুকু লীলাচঞ্চল শিশুটি, পরিণত ষোড়শবর্ষে কি এমনই মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতে পারে না?

বাহিরে ও কাহার ত্রস্ত পদশব্দ শুনা যাইতেছে?

ওগো বিশ্বের ঠাকুর, ওগো হৃদয়ের চিরন্তন দেবতা, আজি তুমি কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া কাছে আসিবে?

প্রাণপণ আগ্রহে রমণী রুগ্ন বালকের মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল,—উচ্ছৃঙ্খল অলকরাজির মধ্যে কোথায় সেই ক্ষুদ্র রক্ত-তিলক ছিল? দ্বাদশ বৎসরপূর্ব্বে শিশুর কেশবিরল মস্তকের মধ্যে যে চিহ্নটি সে দেখিয়াছিল, আজি ঘনবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সরাইয়া সে আর কোন মতেই সেই চিহ্নটি খুঁজিয়া পাইতেছে না। শ্যামল পত্রান্তরিত ক্ষুদ্র পুষ্পকলিকাটির মত সে রক্ততিলক কোথায় লুকাইয়াছে?

ক্রন্দনের সুরে বাঁধা একটা অন্ধ আকুলতা তাহার অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠিতেছিল!

* * * *

ত্রস্ত পদশব্দ তাহারই দ্বারের কাছে আসিয়া থামিয়া গেল!

রমণী চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিল—কে!

মুহূর্ত্তমাত্র;—তাহারপর তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুততর তালে নাচিয়া উঠিল। আর একটা প্রবল উত্তেজনা—বিদ্যুতের স্রোতের মত তাহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার জীবনের উপর দিয়া একটা অন্ধ, বিধানশূন্য মৃত্যুতরঙ্গ খেলিয়া গেল।

সুন্দরলাল ছুটিয়া শয্যার কাছে আসিয়া দেখিলেন, শয্যায় শায়িত তাঁহারই কিশোর কুমার—আর তাহার পার্শ্বে শয্যাবিলুণ্ঠিতা রমণী!

সুন্দরলাল চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, উচ্ছৃঙ্খল কেশদামের অন্তরালে পুণ্য সম্ভ্রমময় একখানি মুখ;—সে মুখখানি কোন্ অতীত বিবাহবাসরে দৃষ্ট, তাঁহারই বালিকাবধূর মুখখানির মত কলঙ্কস্পর্শহীন, উজ্জ্বল, সুন্দর।

মরণের মঙ্গলময় স্পর্শ, জীবনের এতটুকু মলিনতাও আর সে মুখে রাখিয়া যায় নাই। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

দুঃখের প্রতি।

১

ওহে দুঃখ! হে মোর সুহৃৎ!
এ জগতে তুমি বরণীয়;
এস যবে, সঙ্গে আন তুমি
চিন্তা তাঁ'র চির-স্মরণীয়।

২

সুখ বাঁধে মায়ার বন্ধনে,
প্রবৃত্তির করে উদ্দীপন,
নিবৃত্তিরে হৃদয়মণ্ডপে
আনি তুমি করহ স্থাপন।

৩

জলভরা আঁখি দু'টি তব
করুণায় কিবা ঢল ঢল;
বক্ষে তব সান্ত্বনার সুধা
জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল।

৪

শ্রীকৃষ্ণের তুমি অগ্রদূত,
মর্ত্তে বহ গোলক-সংবাদ;
যা'রে তুমি কর অনুগ্রহ,
সেই পায় সে প্রেমআস্বাদ!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

কেহ কেহ বলেন যে, সাধুপুরুষের অথবা কর্ম্মবীরের জীবনকথার আলোচনায় উপকার আছে; কিন্তু কোনও সাহিত্যিকের সাধারণ বা অকিঞ্চিৎকর জীবনকথা জানিয়া লাভ কি? ইহার এক উত্তর, কৌতূহল-নিবৃত্তি। কৌতূহল অবহেলার বস্তু নহে; কৌতূহল হইতেই জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার। আর এ আলোচনায় যে কিছুই লাভ নাই এ কথাই বা কে বলিতে পারে? যে বাণীপুত্রের জীবনের "সামান্য" কথা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাঁহার একটি গীতে আছে—

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার
অমূল্য রতন।"

বিহারীলালের জীবনের ঘটনাবলী বলিবার পূর্ব্বে তিনি কি জন্য স্মরণীয় তাহা বলা আবশ্যক। বিহারীলাল একজন প্রকৃত কবি ছিলেন—প্রত্যুত তিনি একজন চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি লোক যাহাকে 'বড়লোক' বলে তাহা ছিলেন না। কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের ভাষায়—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ, জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।"

বিহারীলালের প্রধান কাব্য 'সারদামঙ্গল' বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ; তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য নারীপূজাত্মক কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। বর্ত্তমান যুগের গীতিকবিতার তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিতাকেই আদর্শ করিয়া কবিতা রচনা আরম্ভ করেন, এবং অক্ষয়কুমার বড়াল সাহিত্যিক গুরু বলিয়া বিহারীলালের স্মৃতিপূজা করেন।

বিহারীলাল কলিকাতার জোড়াবাগান নামক পল্লীতে ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কবির বংশের প্রকৃত উপাধি 'চট্টোপাধ্যায়' কিন্তু তাঁহারা 'চক্রবর্ত্তী' বলিয়া পরিচিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের আদি নিবাস ছিল ফরাসডাঙ্গায়। কবির প্রপিতামহ হালিসহরের একজন সুবর্ণবণিকের দান গ্রহণ করিয়া "পতিত" হয়েন এবং প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কবির পিতৃব্য ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ও মনস্বী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কবির পিতা ৺ দীননাথ চক্রবর্ত্তী সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পৌরহিত্য করিয়া জীবন যাপন করিতেন। দীননাথ ঠাকুরের প্রথম দুইটি পুত্রের শৈশবেই মৃত্যু হইবার পর বিহারীলাল ভূমিষ্ঠ হয়েন। সেই জন্য বংশের কুলপ্রদীপ বলিয়া বিহারীলাল জনকজননীর—বিশেষতঃ পিতামহীর, আদরে অত্যন্ত দুরন্ত হইয়া উঠেন। পিতামহী 'আহুরে' শিশুর দৌরাত্ম্য দমন করিবার আশায় জুজুর ভয় দেখাইলে শিশু সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুটিকে ধরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিত। চারি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহারীলাল মাতৃহীন হয়েন। নিজ দুরদৃষ্টের পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযোগী জ্ঞানবিকাশ তখনও বিহারীলালের হয় নাই। কিন্তু শৈশবের সেই কুহেলিকাচ্ছন্ন জননীস্মৃতি জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কবির হৃদয়াকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। 'সাধের আসন' কাব্যের "নিশীথে" কবিতায় বিহারীলাল জননীর স্মৃতিপূজা করিয়াছেন। বাল্যকালে বিহারীলালের পাঠাভ্যাসে আসক্তি ছিল না। তাঁহার পিতা ভাবিতেন, পুত্র সামান্যরূপ সংস্কৃত শিক্ষা করিলেই যজমান রক্ষা করিতে পারিবে, সুতরাং অধিক বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? বিহারীলাল বাল্যকালে নিয়মিতরূপে কোনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা গৃহেই হইয়াছিল। কৈশোরে বিহারীলাল কয়েক মাস জেনেরেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে এবং অনুমান তিন বর্ষকাল সংস্কৃত কলেজে পাঠ করেন।

বাল্যকাল হইতেই বিহারীলাল বলিষ্ঠ ছিলেন। আহিরীটোলার ঘাট হইতে তিনি অনায়াসে ২।৩ বার সাঁতরাইয়া গঙ্গা পার হইতেন সাহাধ্যায়ীদিগের সমরাঙ্গনে তিনি নেতা হইতেন। যথায় মারামারি তথায় বিহারীলাল। তাঁহার সংগ্রামপ্রবৃত্তি দমনে নিরুপায় হইয়া

দীননাথ ঠাকুর প্রিয় পুত্রের শরীর রক্ষার জন্য দুইজন হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌কে 'বডিগার্ড' নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন্। পুত্র কিন্তু সেই অযাচিত সম্মান হইতে আপনাকে অচিরেই মুক্ত করিয়াছিল।

বিহারীলালের বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিফল হইলেও অন্য উপায়ে তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল। বটতলা হইতে যত কিছু বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইত, বিহারীলাল সেগুলি একান্ত মনে পাঠ করিতেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। সে সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক সমস্তই প্রায় বটতলা হইতে বাহির হইত। যাত্রা, পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই বিহারীলাল আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আসরে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তখনকার গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ সুরজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। বিহারীলাল তাঁহাদের গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আণ্টনী "সাহেবের" কয়েকটি গীত তিনি সুরলয়ে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। দ্বারকা কুণ্ডুর পাঁচালীর কথা বা কোথাও হাফ্‌আকড়াই বা কবির লড়াই হইতেছে, শুনিলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। ভাবী কবি কেবল গীত শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না; বাটীতে আসিয়া সেই গীতগুলি গাহিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের বিস্মৃত কথাগুলি নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। এইরূপে অপরের রচিত গীতাংশ পূরণ করিতে করিতেই বিহারীলাল গীতরচনা আরম্ভ করেন। কৈশোরেই বিহারীলালের এই সঙ্গীতচর্চ্চার অবসান হয় নাই; তাহা চিরজীবন চলিয়াছিল। শেষ জীবনেও তিনি অহরহঃ গুণ গুণ স্বরে গান করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর ছিল না, কিন্তু তাঁহার সুরবোধ ছিল। বিহারীলাল সুরজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার কবিতা অত শ্রুতিমধুর—তিনি কবিতায় সঙ্গীতধারা ঢালিতে পারিয়াছেন। বিহারীলালের সঙ্গীতানুরাগপ্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিহারীলালের কবিতারচনা গীতে আরম্ভ এবং গীতেই শেষ হয়—তাঁহার আদি রচনা 'সঙ্গীত শতকের' কয়েকটি গান এবং শেষ রচনা 'বাউল বিংশতি'।

অনুমান পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময় বিহারীলাল পিতার ও পিতামহীর অজ্ঞাতসারে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। পথে সন্ধ্যার সময় তিনি এক দিন একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার নিকট উপস্থিত হয়েন। দীর্ঘিকাটি কুম্ভীরে

পরিপূর্ণ জানিয়াও তিনি সেই চন্দ্রোকরোজ্জল দীর্ঘিকার জলে সন্তরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পুরীতে অবস্থানকালে বিহারীলাল নিশীথকাল পর্য্যন্ত সাগরসৈকতে একাকী বসিয়া থাকিতেন। কখন বা তিনি সমুদ্রের জলকল্লোলের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেন, কখনও বা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারিধির তরঙ্গভঙ্গ দর্শনে অন্তরের সৌন্দর্য্যপিপাসা শান্ত করিতেন। সেই মহান ও গম্ভীর দৃশ্য দিনের পর দিন বিহারীলালের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতিতে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল।

উৎকলের তীর্থক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া বিহারীলাল বিদ্যার্জ্জনে যত্নবান হইলেন। তিনি কৈশোরে বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আন্তরিক উদ্যম ও পরিশ্রম সহকারে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা ৺ দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট তিনি সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি পাঠ করিলেন এবং সংস্কৃত কাব্য পাঠ আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অগ্রজ ৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কাব্যপাঠ করেন। কালিদাসের ও ভবভূতির কাব্যগুলিই তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল; কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ করিতেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন রামায়ণের মত কাব্য জগতে আর নাই।

সংস্কৃত কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য অভিনিবেশের সহিত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৺ রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকটে তিনি প্রথমে ইংরাজি শিক্ষা করেন; পরে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষার বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। বিহারীলাল সেক্সপীয়রের গ্রন্থরাজি এবং বায়রন ও গোল্ড্‌স্মিথের কাব্যসমূহ বিশেষ অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করেন। হ্যামলেটের অনেক স্থল বিহারীলালের কণ্ঠস্থ ছিল। বিহারীলাল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়া ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আছে বলিয়া বিহারীলাল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন না। কিন্তু যৌবনকালে সেক্সপীয়রের ও বায়রণের রচনার উপর তাঁহার এরূপ অনুরাগ

ছিল যে, তাঁহার তৎকালীন রচনা 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যে তিনি হ্যামলেট নাটকের দুইএকটি ছত্র, এবং 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যে বায়রনের Roll on thou deep and dark blue Ocean, roll পংক্তিটি অনূদিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষার আগ্রহে বিহারীলালের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ শিথিল হয় নাই। তিনি বাঙ্গালীর প্রাচীন কবিগণের ভক্ত ছিলেন। চণ্ডিদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের রচনা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীন সাহিত্য হিসাবে আদর করিতে যাঁহারা পথ প্রদর্শন করেন, বিহারীলাল তাঁহাদের একজন অগ্রণী। বিহারীলাল প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কবিকঙ্কণের ও আধুনিক কবিগণের মধ্যে মধুসূদনের রচনা পাঠ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রার্থনা।

আমারে অন্ধ করিয়া দাও হে
ফুটায়ে মনের আঁখি;
ফেল ধরণীর কলকোলাহল
বাঁশরীর তানে ঢাকি'।
মানবসজ্ঞ রবিশশী তারা
পশ্চাতে তব হ'য়ে যা'ক্ হারা,
তুমি এস বস' সম্মুখে মম
নয়নে নয়ন রাখি।

গুরু গুরু রব জলদমন্দ্রে
তুল মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে;
মথিত করিয়া আমার এ হিয়া,
পুলক উঠুক জাগি'।
হেরিয়া তোমারে, শুনিয়া বাঁশরী
তোমারেই বরি জগত পাশরি',
স্পর্শ তোমার পাইয়া বক্ষে
বিভোর হইয়া থাকি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

সমালোচনা।

ঢাকার ইতিহাস। *

শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ভারতীয় পুরাবস্তুর প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যেমন সন্দিহান ছিলেন, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহারা বঙ্গীয় পুরাবস্তুর প্রাচীনত্বসম্বন্ধে সেইরূপ সন্দিহান ছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক-দিগের রচনাই তখন আমাদিগের অবলম্বন ছিল; তাঁহাদের রচিত ইতিহাস পাঠে মনে হইত, যেন মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময় হইতে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার প্রামাণ্য ইতিহাসের আরম্ভ—তৎপূর্ব্বে সবই অন্ধকার। বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াই যৌবনের ভ্রম বুঝিয়া—ইংরাজী রচনায় বাঙ্গালীর পক্ষে অক্ষয় যশ অর্জ্জন বা জাতির উন্নতি সাধন অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গালীর ভাবসম্ভার বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারই তূর্য্যনিনাদে বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের আহ্বান ধ্বনিত হইল। তিনি বাঙ্গালীকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। পথ বিঘ্নবহুল—সঙ্কটসঙ্কুল; কিন্তু এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। কে যাইবে? চল। আমি প্রস্তুত।

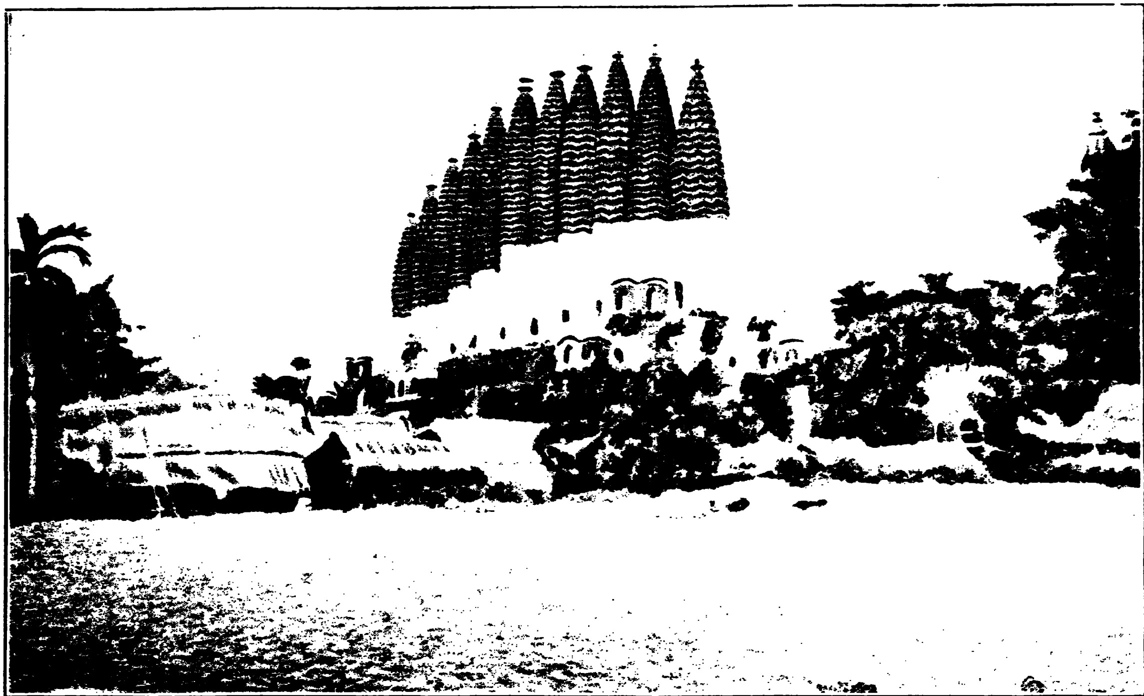
বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্বাশার তোরণে ঘনীভূত অন্ধকারে অরুণকিরণরেখা কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে। অল্পায়ু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তখন বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় মন দিয়াছেন। আর এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা অজ্ঞাতপূর্ব্ব উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। আর তাঁহারই চেষ্টার ফলে কানিংহামপ্রমুখ পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি বাঙ্গালার বক্ষে পড়িয়াছে বা পড়িতেছে। যিনি পরে বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু উপাদান উদ্ধার করিয়া অসাধারণ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন সেই মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন কেবল বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু তখনই প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অনুরাগ আত্মপ্রকাশ করি-য়াছে। তাহার পর বাঙ্গালী আজ বুঝিয়াছে, জাতীয় ভাবের অগ্রদূত বঙ্কিমচন্দ্র

* ঢাকার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—শ্রীযতীন্দ্রমোহনরায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৬নং সাগরধরের লেন হইতে শ্রীযামিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩।০ টাকা মাত্র।

যে বলিয়াছিলেন—যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতি বড় দুর্ভাগ্য—সে কথা যথার্থ। তাই কৈলাশচন্দ্র হইতে ত্রৈলোক্যনাথ পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী সমিধসমুচ্চয়ে যে বহ্নি দীপ্ত রাখিয়াছিলেন আজ তাহার সমুচ্ছ্রিত শিখা গগনে দৃষ্ট হইতেছে। আজ ধনী দরিদ্র সকলেই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়া ধন্য হইতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যে আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইয়াছে; কাহারও আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হয় না। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আপনার কার্য্যপ্রবাহ পরিবর্ত্তিত করিয়া পুরাবস্তুর দিকেই অধিক মনোযোগদান করিয়াছেন, আজ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বঙ্গে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে নূতন পথ দেখাইতেছেন, আর জিলায় জিলায় স্থানীয় ইতিহাস লিখিত হইতেছে। যতই অনুসন্ধান হইতেছে ততই বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট হইতেছে—ততই বাঙ্গালার লুপ্ত গৌরব সপ্রকাশ হইতেছে।

আমরা যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অনেক স্থলে অনাদৃত কিম্বদন্তী তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"তিমিরজলদাবৃত অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথহারা বিপন্ন পথিক যেমন তড়িত-রেখার ক্ষণিক আলোকে স্বীয় গন্তব্য (স্থান) নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রবাদের ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে, সন্তর্পণে আমাদিগকে অন্ধতমাচ্ছন্ন ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।" বাস্তবিক কিম্বদন্তীর ক্ষীণ আলোকের অনুসরণ করিলে আমরা অধিকাংশ স্থলেই ঐতিহাসিক সত্যের দীপশিখার সন্ধান পাইয়া থাকি। ঢাকার ইতিহাসেও এই কথার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়।

মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে যে ঢাকায় রাষ্ট্রীয়-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা এখন জানা যাইতেছে। বাস্তবিক বুড়ী গঙ্গার তীরে ইসলাম খাঁ'র আগমনের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় প্রাধান্যপ্রয়াসী ভূম্যধিকারিগণের উত্থানপতন ও প্রতিযোগী ধর্ম্মমতের আবির্ভাবতিরোভাব সংঘটিত হইয়াছে: "খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এতদঞ্চলে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার জের মিটে নাই। * * * তৎকালে শত শত বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও সংঘারাম হইতে ভগবান



একুশ রত্ন।

L.B.P.

অমিতাভের সাম্যসংস্থাপক নির্ব্বাণমুক্তির অমিয়বাণী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। আসরফপুরের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়, খড়্গবংশীয় রাজা খড়্গদেবের শাসনসময়ে আসরফপুরের অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে 'বুদ্ধ-মণ্ডপ' প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহারাই সন্নিকটস্থিত 'বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়' এক গণ্ডীভূক্ত করিয়া কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্য্য বন্দ্যকে দশ দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। অপর শাসনভূমি 'রত্নত্রয়োদ্দেশ্যে' শালিবর্দ্ধকস্থিত আচার্য্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। পরম সৌগত পুরোদাস কর্ত্তৃক তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে।" "বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার চিহ্ন অদ্যাপি এই জেলার নানা স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ধামরাই, নান্নার, রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বনদুর্গা পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। বনদুর্গা বুড়া ঠাকুরাণীরই নামান্তর মাত্র। বুড়া-ঠাকুরাণী বিক্রমপুর, পারজোয়ার, সোনারগাঁও অঞ্চলেও পূজোপচার পাইয়া থাকেন। * * * মাণিকগঞ্জের শিব যুগি জাতিদ্বারা পূজিত হইতেছে।" ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। "খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন পাল-রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। শৈলাট ও দীঘলিরছিট গ্রামে এবং ভাওয়ালের অন্যান্য স্থানে পালরাজগণের শাসনকালের বিক্ষিপ্ত চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাল-বংশীয় শিশুপালের রাজবাটীর বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশিপূর্ণ পরিখা, তন্মধ্যবর্ত্তী ভগ্ন ইষ্টকালয়সমূহ এবং পুষ্পবাটিকার শেষচিহ্ন আজিও অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজবাড়ী নামক স্থানে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের অত্যাচারে ভাওয়াল জনহীন হইয়া পড়ে। মুগ্‌ণী নাম্নী তাঁহাদের এক প্রতাপশালিনী সহোদরার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * * জয়দেবপুরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে ইঁহাদিগের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।" যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতত-সহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতির মত সমগ্র এসিয়ার মুক্তিকামী জনগণকে ছায়া ও আশ্রয় দান করিয়াছিল তাহার প্রচারকেন্দ্রের উপকণ্ঠে তাহার প্রভাব প্রকাশিত না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়। আবার শশাঙ্কের মত বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী নৃপতি ও শঙ্করের মত বৌদ্ধমতবিরোধী ধর্ম্মাচার্য্যেরও অভাব হয় নাই। ঢাকা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব-তিরোভাবের ইতিহাস উদ্ধার করিতে

পারিলে যে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায় পুনর্লিখিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আসরফপুরে প্রাপ্ত চৈত্য ও সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টকে ক্ষোদিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি যেমন এ অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচায়ক, তেমনই আবার কাপাসীয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বড়-চালা নামক স্থানে গভীর অরণ্য-মধ্যস্থিত মন্দিরের মৃত্তিকাতলে প্রাপ্ত প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের নিদর্শন। শেষোক্ত স্থানে একখানি প্রস্তরফলকও পাওয়া গিয়াছিল। উহার "এক পৃষ্ঠে বাসুদেবের মূর্ত্তি; অপর পৃষ্ঠে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্ত্তি ক্ষোদিত।" মৃজাপুর নামক স্থানেও মৃত্তিকার নিম্নে একটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে। "ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে একটি যজ্ঞকুণ্ড এবং তন্মধ্যে যজ্ঞীয় ভস্মের ন্যায় কতকগুলি ভস্ম পরিলক্ষিত হইয়াছিল।" ঐ কুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড কি স্তূপমধ্যস্থ গর্ভগৃহ তাহা কে বলিবে?

তাহার পর "খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই ঢাকার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দের শেষ ভাগে তথায় মোগল সম্রাটের সেনাসন্নিবেশ সংস্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানীতে পরিগণিত হয়। তৎকাল হইতে শতাধিকবর্ষ পর্য্যন্ত ঢাকার গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সহিত সোনারগাঁর সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত হইত। ঢাকার সুদৃঢ় দুর্গ হইতে রণদুর্ম্মদ মোগল অনিকিনী বহির্গত হইয়া আসাম বিহার চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া দিল্লীশ্বরের শাসনপ্রভাব বিস্তার করিত। দিল্লীর সম্রাটের বংশধর ও প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্য্যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ঢাকার সুবাদারী পদ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হইতেন। দিল্লীশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌত্রগণ ঢাকার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করা গৌরবজনক মনে করিতেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মুরশিদাবাদে রাজধানী নীত হওয়ার পর হইতেই ঢাকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে ঢাকায় নায়েব নাজিমগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন।"

মোগল বাদশাহগণ স্থাপত্যকীর্ত্তিসংস্থাপনে অসাধারণ আগ্রহ দেখাইতেন। বাদশাহগণের এই আদর্শ তাঁহাদিগের প্রতিনিধিদিগকেও

অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁহারাও বহু মসজেদে, প্রাসাদে, সমাধিতে, দুর্গে ঢাকার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে লালবাগ দুর্গ, সায়েস্তা খাঁ'র দুহিতা পরিবিবির মকবেরা, সায়েস্তা খাঁ'র আদেশে নির্ম্মিত চক-মসজেদ, সাহসুজার আদেশে নির্ম্মিত বড় কাটরা সরাইখানা, ফেরকসয়েরের কীর্ত্তি লালবাগ মসজেদ, আজিম উশ্বানের কীর্ত্তি পুস্তা প্রাসাদ, গিয়াস উদ্দীনের সমাধি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পথ সুগম করিবার জন্য তৎকালে অনেকগুলি পুলও নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবাদার মীরজুম্লার আদেশে নির্ম্মিত পাগলার পুল ও টঙ্গীর পুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বল্লালের বিরাট কীর্ত্তি আবদুল্লাপুরের ও তালতলার পুলেরও উল্লেখ করিতে হয়। প্রথমোক্ত পুলটিতে তিনটি মাত্র খিলান আছে। মধ্যস্থিত খিলানটি ৯৷৷০ হাত প্রশস্ত। খালের গর্ভ হইতে এই খিলানের উচ্চতা ১৯ হাত। ঢাকা অঞ্চলে এক দিকে যেমন মসজেদ মকবেরা প্রভৃতির বাহুল্য, অন্য দিকে তেমনই মন্দিরমঠাদিরও অভাব নাই। রাজবাড়ীর মঠের মত বৃহদায়তন মঠ ঢাকায় আর নাই। "প্রবাদ, কেদার রায় (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম) মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" ঢাকা নগরীর উত্তরাংশে মালীবান নামক স্থানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। "এই কালীমূর্ত্তি বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।" শুনা যায়, ঢাকেশ্বরীর মন্দির বল্লালের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "ঢাকেশ্বরীর মন্দির পুনঃপুনঃ সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইলেও উহার গঠনপ্রণালী এবং ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন ইষ্টকখণ্ডগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মন্দিরটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।" রাজনগর ঢাকা হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে "এই স্থানের পূর্ব্বনাম ছিল বিলদাওনীয়া। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এই স্থানে তদীয় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে রাজনগরে অভিহিত করিয়াছিলেন। রাজনগরের 'রঙ্গমহাল', 'নবরত্ন', 'পঞ্চরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', ও 'একুশরত্ন' প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি সৌন্দর্য্য ও স্থাপত্যকৌশলে বঙ্গদেশমধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। * * * রাজনগরের প্রাসাদাদির অনুকরণেই শিবনিবাসের হর্ম্ম্যরাজি ঢাকাই শিল্পিগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত

হইয়াছিল।" বঙ্গদেশের প্রাচীন স্থাপত্যকীর্ত্তির মধ্যে এক কান্তনগরের মন্দির ব্যতীত আর কোন কীর্ত্তিই শিবনিবাসের মন্দিরাদিকে পরাভূত করিতে পারে না।

মীরজুম্লাপ্রমুখ মুসলমান শাসনকর্ত্তারা মগ দস্যুদিগের অত্যাচারভয়ে ও অন্যান্য কারণে ঢাকায় বহু কেল্লাসংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হাজিপুরের দুর্গ, ইদ্রাকপুরের কেল্লা প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মুসলমানশাসনের শেষ সময় পর্য্যন্ত বঙ্গের জমীদারদিগকে আত্মরক্ষার ও প্রজারক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইত। জমীদারদল তখনও হৃতনখদংষ্ট্রায়ুধ পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরাজের দশাগ্রস্ত হয়েন নাই। শ্রীনগরের জমীদারবংশের স্থাপয়িতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিনারায়ণ "শ্রীনগর পত্তন করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন পূর্ব্বক সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিপৎকালে আত্মরক্ষার্থ স্বীয় আবাসভূমির চতুর্দ্দিকে যে চারিটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটীমাত্র ধ্বংসচিহ্ন লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান আছে। * * এই বুরুজটী গোলাকার; উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফিট হইবে।"

ঢাকা অঞ্চল এক সময় অস্ত্রঝনৎকারে মুখরিত ছিল। সুতরাং এ অঞ্চলে যে যুদ্ধসজ্জা নির্ম্মিত হইত তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। নদীবহুল নিম্নবঙ্গে জলদস্যুদিগের উচ্ছেদসাধনজন্য ও সফরের জন্য নৌবহরের প্রয়োজন হইত। আমরা মুতক্ষরীণে দেখিতে পাই যে, শেষে ঢাকায় এমন সুদৃঢ় ও সুন্দর নৌকা নির্ম্মিত হইত যে, দিল্লীর রাজস্ব কতকাংশ নৌকায় প্রদত্ত হইত। এই অঞ্চলের কামানও প্রসিদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ 'জাহানকোষা' তোপ ঢাকার "দারোগা শের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরিবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দনদ্বারা" ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ওজন ২১২ মণ। ঢাকার বড় তোপও এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানবাগে ৭টি পিত্তলনির্ম্মিত কামান পাওয়া গিয়াছিল। "তন্মধ্যে ৪টী কামান হুমায়ুনবিজয়ী সেরসাহ কর্ত্তৃক ও ২টী ঈশাখাঁ মসনদআলি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

শিল্পসম্বন্ধে ঢাকার প্রসিদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত। "এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর ধাতব ও প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি প্রাচীনকালের উন্নত



ভাস্কর শিল্পের জলন্ত নিদর্শন।" "হিন্দুশাসনসময়ে বিক্রমপুরের শিল্পাচার্য্যগণ একত্র বিমিশ্র বিভিন্নধাতব পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটি ধাতু পৃথক করিয়া লইবার প্রণালী অবগত ছিলেন। মোগলশাসনসময়ে এই শিল্প বিক্রম-পুর হইতে ঢাকার অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।"

ঢাকার সুবর্ণ ও রৌপ্যের বিচিত্র কারুকার্য্য দেশবিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ঢাকার বাদ্যযন্ত্রও বিশেষ বিখ্যাত।

ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসের আলোচনা করিলে অশ্রুসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; মনে হয়, হায় "কি ছিলে? কি হ'লে? কি হ'তে চলিলে?" গ্রন্থকার ৫০ পৃষ্ঠায় এই দুর্দ্দশার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বাইবেলে ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ আছে। প্লীনিপ্রমুখ প্রাচীন লেখকগণের রচনায় বিদেশে এই মসলিনের আদরের কথা অবগত হওয়া যায়। টেভারনিয়ার লিখিয়াছিলেন, পারস্যের রাজদূত ভারত হইতে প্রত্যাগমন-কালে পারস্যের সাহকে উপহার দিবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি মস্‌-লিন অতি ক্ষুদ্র একটি নারিকেলের মালার মধ্যে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 'সবনম', 'আবরোয়ান' 'মলমল খাস' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মসলিন ঢাকায় প্রস্তুত হইত। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় ২৮,৫০,০০০৲ টাকার বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। তখন টাকার ক্রয়কারী শক্তি যে অধিক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেও ঢাকার উৎকৃষ্ট মলমল প্রস্তুত হইত। তখনও ১৭৫ হাত লম্বা একখানি মলমলের ওজন ৪ তোলা হইত। ১৮৮৬খৃষ্টাব্দে ২৭০০ মাত্র টাকার মসলিন বিক্রীত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মিষ্টার কলিন্স লিখিয়াছিলেন, "দুই একটি পরিবারে এখনও ঢাকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে।" এত দিনে বোধ হয় ভারতের এই গৌরবের সামগ্রী উৎপাদনের শেষ সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়াছে।

'ঢাকার ইতিহাস' লিখিয়া যতীন্দ্রবাবু কেবল ঢাকার নহে, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গ্রন্থে যে সকল ত্রুটী লক্ষিত হয়;—লেখকের আরব্ধ কার্য্যের তুলনায় সে সকল নগণ্য। এই গ্রন্থ চার খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আলোচ্য খণ্ডে "কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর জমি ও জমা, প্রাচীন কীর্ত্তি, তীর্থস্থান ও পুণ্যস্থান, দেবালয় ও ঐতিহাসিক স্থান", প্রভৃতির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহা কতকটা Gazetteer শ্রেণীর গ্রন্থ। দ্বিতীয় খণ্ড হইতে "প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য" লিখিত হইবে।

আমরা সেই সকল খণ্ডের জন্ম উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। যতীন্দ্রবাবু আলোচ্য খণ্ডে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন।

এখন গ্রন্থকারকে কয়টি বিষয়ে অনুরোধ করিয়া আমরা আলোচনা শেষ করিব। কয় বৎসরেরর মধ্যে আমরা অনেকগুলি জিলার উপাদেয় ইতিহাস গ্রন্থ পাইয়াছি। তাহার অনেকগুলিতেই সমসাময়িক ব্যক্তির ও ঘটনার বিবরণ আছে। এ প্রথা অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। জীবিতকালে যাঁহার 'যশ প্রভাকরতুল্য বিবেচিত হয়—মৃত্যুর পর হয়ত তাঁহারই যশ খদ্যোতের ক্ষাণ আলোক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালের বিচার ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব নির্দ্ধারিত করে। আমাদের ইতিহাসের অভাব। যাহা বিস্মৃতিগর্ভগত হইয়াছে তাহার উদ্ধার ও যাহা বিলুপ্ত হইতেছে তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা হউক—তাহার পর history of our own times (সমসাময়িক ইতিহাস) রচনার সময় পাওয়া যাইবে। 'ঢাকার ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড Gazetteer ধরণের পুস্তক বলিয়া ইহাতেও এ দোষ লক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভে ঢাকেশ্বরীর মন্দিরের চিত্র বা ঢাকার মানচিত্র না দিয়া গ্রন্থের সহিত সর্ব্ববিধ ঘনিষ্ঠসম্পর্কশূন্য আসান মঞ্জিলের চিত্র সন্নিবেশই তাহার প্রমাণ। ঢাকার ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার অধিকার আসানমঞ্জিলের নাই। গ্রন্থকার এ সকল বিষয়ে অবহিত হইলে অনেক স্থলে তাঁহাকে গ্রন্থখানি অনাবশ্যক বিবরণে ভারাক্রান্ত করিতে হইবে না। আর আমাদের অনুরোধ তিনি যেন গ্রন্থের ভাষা ও মুদ্রণ সম্বন্ধে এবং পাদটীকার যথাস্থানে সন্নিবেশবিষয়ে অধিক সতর্ক হয়েন। গ্রন্থকারের ও আমাদিগের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের মত সকল বাঙ্গালীই বলিবেন, যতীন্দ্রবাবু যে বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ হইবার সময় পর্য্যন্ত হয় ত আমরা অনেকে জীবিত থাকিব না; কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য দেখিয়া আমরা সকলেই পরম পুলকিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, তিনি অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতার ফলে শীঘ্রই তাঁহার উপহৃত উপাদান সাহায্যে এই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

বেদাদি গ্রন্থে সূর্য্য।

চুঁচুড়া সাহিত্য-আলোচনা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন যখন চুঁচুড়ার প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, তখনই বেদাদি গ্রন্থে সূর্য্যসম্বন্ধীয় অনেক মালমাসলা আমার সংগৃহীত ছিল; আমার প্রবন্ধের একাংশ 'চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি' নাম দিয়া পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' ইতঃপূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ও সূর্য্যপূজা-সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৎকর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ এক্ষণে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতেছি। *

সূর্য্য † ও সবিতা বলিলে আমরা সূর্য্যকেই বুঝিয়া থাকি। বৈদিক সূক্তেই সাধারণতঃ সূর্য্যের এই দুইটি নাম পাওয়া যায়। সূর্য্যের আর একটি নাম আদিত্য; কিন্তু বেদে বৈদিক উপাসনায় আদিত্যের বড় একটা প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি দেবসম্ভূত এবং ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, মিত্র ও বরুণ ইঁহার জনয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বৈদিক হিসাবে ইনি দেবতাদিগের নায়ক অথবা তাঁহাদের পুরোহিত। অগ্নি ও ইন্দ্র যেমন আলোকের বিধান, সূর্য্যও সেইরূপ আলোক উৎপাদন করিয়া যাবতীয় লোকের ঐহিক সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বদ্রষ্টা—নর জীবগণ যাহা কিছু সৎ বা অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ইনি তৎসমুদায়ের সাক্ষীস্বরূপ। ইনি চিকিৎসকের কার্য্যও করিয়া থাকেন। কুষ্ঠব্যাধির ইনিই আরোগ্যবিধাতা। ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাকে তিনটি সূক্তে সূর্য্যের যে অপরিসীম শক্তি ও প্রভাব আছে তাহাই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। যদিও বৈদিকযুগে সূর্য্যোপাসনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না; তথাপি আলোক ও উত্তাপ প্রাচীন আর্য্যগণের বিশেষ আদৃত

---

* এই প্রবন্ধে যে যে স্থানে আমাকে টিপ্পনী, বৈদিক বচন, টীকা প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তৎসমুদয় স্থলেই আমি শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাহায্য লইয়াছি।

† সূর্য্য সবিতার অনুবর্ত্তী—ঋগ্বেদ ১০—১৪৯

সবিতাকে সূর্য্যের নায়করূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে যথা :—

"হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষ নিরুভে দ্যাজ পৃথিবী অংতরীয়তে।

অলামীজং বাধতে বেতি সূর্য্যমভি কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃনোতি।"১।৩৫, ৯

(হিরণ্যপাণি বিবিধদর্শনযুক্ত সবিতা উভয়লোকের মধ্যোগমন করিতেছেন * * সূর্য্যের নিকট যাইতেছেন।)

থাকায় সূর্য্য তাঁহাদের অত্যন্তই প্রিয় হইয়াছিলেন। বেদের অন্যান্য সূক্তেও সূর্য্যকে 'পাপহন্তা', 'হৃদয়সন্তাপহারী', 'শারীরিক ক্লেদবিনাশী' ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সবিতা বলিলে পূর্ব্বে শারদীয় সূর্য্যকেই বুঝাইত। অনেক সময় এই সবিতাকে মিত্র ও বরুণ নামে অভিহিত করা হইত। ইঁহার মূর্ত্তিও কল্পিত হইয়াছে। সবিতৃদেবের বর্ণ সুবর্ণ; হস্ত সুবর্ণময়; জিহ্বাও সুবর্ণময় এবং ইঁহার কেশ পীতবর্ণের। ইনি সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে ইনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ইনি না কি দেবতাদিগকেও অমর করিয়াছেন। ইঁহার কার্য্য দ্বিবিধ। ইনি অতি প্রত্যূষে সমস্ত জীবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন এবং সায়ংকালে সমস্ত জীবকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া থাকেন। (১)

সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। সূর্য্য ও সবিতা একই দেবতা কি ভিন্ন ভিন্ন দেব, এ বিষয় লইয়া কিছু তর্ক আছে। যাস্ক বলেন, আকাশ হইতে যখন অন্ধকার দূরীভূত হইয়া কিরণ বিস্তৃত হয় তখনই সবিতার কাল; সায়ণ বলেন, সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সূর্য্য। অতএব আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিতা একই দেব; য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও এই মতের পোষকতা করেন।

আদিত্যদেব মনুষ্যের সমস্ত কার্য্য অবলোকন করিয়া থাকেন এবং মনুষ্যদিগের সমস্ত দোষ, অপরাধ প্রভৃতি মিত্র ও বরুণের নিকট বিজ্ঞাপিত করেন। (২)

সূর্য্য যে স্থানে উপাস্যদেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই স্থানেই সূর্য্যের অন্যান্য নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'সূর্য্য' শব্দ বিরল। ইনি অথর্ব্ববেদে (১৩-১) রোহিত=লোহিত নামে পূজিত হইয়া থাকেন। পরে ইনিই সূর্য্য ও আদিত্য নাম পাইয়াছেন। সুপ্রাচীন বৈদিককালে ত্রিমূর্ত্তির পূজা হইত। ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ইঁহারাই প্রাচীন বৈদিকযুগের ত্রিমূর্ত্তি। (৩)

(১) ঋগ্বেদ—২।৩৮ ইত্যাদি

(২) ঋগ্বেদ—১।৫০; ১১৫; ৭'৬২; ২—ইত্যাদি

(৩) তৈত্তিরীয় সংহিতা—৬—৬,৮,২ শতপথব্রাহ্মণ ৪।৫, ৪; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২১, ১ Brihaddevata in Indische Studien, ১।১১৩ For other references to the শতপথ-ব্রাহ্মণ see Weber, Ewei Vedische Texte, p. 386.

সূর্য্যসম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন গল্প আছে (৪) ইহাঁর মৃত্যুবিষয়েও একটি প্রবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) অন্যান্য স্থলেও ইঙ্গিতে সূর্য্যের মৃত্যুর বিষয় দ্যোতিত হইয়াছে। (৬) যম যিনি মৃত হইয়াছিলেন, তিনিও একজন সূর্য্য ছিলেন।

ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও বরুণের উল্লেখ যত অধিক বেদে সূর্য্যের উল্লেখ তত অধিক নহে। (৭)

আমরা বেদের যে যে স্থানে সূর্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ—

সূর্য্যস্তুতিবাচক বা সূর্য্যসম্বন্ধীয় বেদের প্রধান প্রধান স্তোত্র বা স্তোত্রাংশ',

১।৫০, ১-১৩; ১।১১৫, ১-৬; ৪।১৩, ১-৩; ৫।৪০, ৫, ৬, ৮, ৯; ৫।৪৫, ৯ ১০; ৫।৫৯, ৫; ৭।৬০, ১-৪; ১০।৩৭, ; ১০।১৭০ সূর্য্য সম্বন্ধে নিরুক্ত ১২।১৪-১৬ দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যের উৎপত্তি, অন্যান্য দেবতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, সংজ্ঞা ও কার্য্য।

ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত কয়েকটি সূক্তে সূর্য্যকে আদিত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ—

"উদগাদয়মাদিত্যোন বিশ্বেন মহসা সহ" ইত্যাদি ১।৫০।১৩ (এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উদিত হইতেছেন ইত্যাদি)

"উদপপ্তদসৌ সূর্য্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্ব্বন্।
আদিত্যঃ পর্ব্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা॥" ১।১৯১।৯

(সূর্য্য প্রচুর পরিমাণে বিষ নাশ করিয়া উদয় হইতেছেন। সর্ব্বদশা, অদৃশ্যদিগের বিনাশক, আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্য উদিত হইতেছেন।)

সূর্য্য—অদিতি-পুত্র (৮)

---

(৪) শতপথব্রাহ্মণ—১।২, ৫, ১ হইতে ৭।

(৫) Muir's Sanskrit Texts—vol. IV—p. 122

(৬) তৈত্তিরীয় সংহিতা—১।৫, ৯, ৪; ১।৫, ৪, ৪

(৭) Even these three (the Moon, the Sun and mother Earth) though noticed in the Veda are put far into back-ground compare with Indra, Agni, Soma and Varuna

Buddhist India—Rhys Davids

(৮) অথর্ব্ববেদ—১৩।২, ৯, ৩৭ সূক্তে সূর্য্যকে অদিতির পুত্র, অদিতেপুত্র ও অদিত্যা পুত্রম্ বলা হইয়াছে।

"যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ং।" (যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এই অগ্নিকে আর অদিতিপুত্র সূর্য্যকে আকাশে স্থাপিত করিলেন) *

সূর্য্য আকাশের পুত্রস্বরূপ (দ্যৌস্)

"দূরদৃশদেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শংসত।" ১০।৩৭।১

সূর্য্য—মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃস্বরূপ :—

১।১১৫, ১; ৬।৫১, ১; ৭৬১.১; ৭।৬৩, ও ১০।৩৭, ১

সূর্য্য স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মাস্বরূপ :—

"মিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।

আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" ১।১১৫।১

সূর্য্য মনুষ্যগণের প্রসবিতা।—

"উদেতি প্রসবিতা জনানাং"

সূর্য্য দূরদর্শী, সর্ব্বদর্শী এবং নরজীবগণ যাহা সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার দ্রষ্টা † :—

১৫০।২, ৭; ৬।৫১, ২; ৭।৩৫, ৮; ৭।৬০।২; ৭।৬১১; ৭৬৩।১, ৪; ১০।৩৭।১

সূর্য্যের স্ত্রী—উষা—

"সূর্য্যস্য যোষা চিত্রামঘা" ॥৩।৭৫।৫ কিন্তু আবার একস্থলে উষাই সূর্য্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করিলেন বলা হইয়াছেঃ—

"অজীজনস্ত সূর্য্যং যজ্ঞমগ্নিম্ × × ।৭।৭৮।৩

---

* নিরুক্ত—২।১৩ ; ৭।২৯

† আমরা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় কাব্যগ্রন্থেও সূর্য্যসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই। নিম্নে ঐ কাব্যগ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিলাম—অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলে দেখিয়া লইতে পারিবেন :—

(ক) Iliad—Homer

(খ) Odyssey

(গ) Aeschylus in the Prometheus Vinctus.

(ঘ) Plutarch

(ঙ) Ovid, Metamorph.

সূর্য্য রথে বিচরণ করিতেছেন এবং ঐ রথ হরিদ্বর্ণ অশ্ব (কখনও বা সপ্তাশ্ব) বহন করিতেছে:—*

১।১১৫।৩,৪
৭।৬০।৩
৭।৬৩।২
৯।৬৩।৪
} দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যকে বেদের কোন কোন স্থলে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। † সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সূর্য্য আকাশে ধাবমান হয়েন, এইজন্য ঋগ্বেদের প্রথম কবিগণ সূর্য্যকে অশ্ব বা অশ্বযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তাহা হইতেই অশ্বের আখ্যান সৃষ্ট হয়। ‡

১০।৫৬।৬ ঋকে সূর্য্যকে 'অসুর' বলা হইয়াছে।

সূর্য্য গন্ধর্ব্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছেন। যথা:—

"গংধর্ব্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ।" ৯।৮৩।৪

এই স্থানে গন্ধর্ব্ব অর্থে সায়ন সূর্য্য বা বিবস্বান্ করিয়াছেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরীক্ষই গন্ধর্ব্বের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করিলেন। এই সকল ও অন্যান্য ঋক্ হইতে অনুমান হয়, যে, সায়ণের ব্যাখ্যা প্রকৃত; গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ সূর্য্য বা সূর্য্যরশ্মি। ৯।৮৫।১১ ঋকেও গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্য। সোমকে সূর্য্যরূপে স্তুতি করা হইতেছে।

১০।১০।৪ ঋকে গন্ধর্ব্ব সূর্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ¶

সূর্য্য অন্যান্য দেবতার অধীন

---

* Compare Ovid's description of Phaethon's horses.

† ১।১৬৩; ১০।১৭৭

‡ ইরাণীয়দিগের কবিগণও এইরূপ কল্পনাশক্তির দ্বারা সূর্য্যকে অশ্বযুক্ত বলিয়া উপাসনা করিতেন, যথা:—

"অমর দীপ্তিমান শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি * * *

"অন্ধকার ও অন্ধকারজাত দেবগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, দস্যু ও ডাকাইতদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, যাতু এবং পৈরিকদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, অদৃষ্টভাবে আগন্তুক মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, যে মনুষ্য অমর দীপ্তিমান্ শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে যজ্ঞ প্রদান করে, সে অহুরো মজদকে যজ্ঞ প্রদান করে।" জেন্দে,

¶ এই সম্বন্ধে মোক্ষমূলর বলেন:—

"I take Gandharva for Vivasvat * * * though differing from Prof Kuhn." Scince of Language—(1882), Vol. II

১।১০১।৩

২।১২, ৭; ৩।৩১, ১৫; ৩,৩২, ৮; ৩।৪৪, ২;

৩।৪৯, ৪; ৬।১৭, ৫; ৬।৩০, ৫; ৮।৮৭, ২;

১০।১৭১, ৪; ৬।৭২, ২; ১০।৩, ২; ১০।১৫৬, ৪; দ্রষ্টব্য।

বেদে সূর্য্যের উল্লেখমাত্র আছে, পুরাণাদিতে তাঁহার ধ্যান ও পূজা-বিধি পাওয়া যায়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে, ১০৬ সর্গে শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধ-জয়ের জন্য সূর্য্যপূজার বিধিবিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে দেখা যায়। যথা,—

"রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং শর্ব্বশত্রুবিনাশনম্।
জয়াবহং রূপং নিত্যমক্ষরং পরমং শিবং॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্।" *

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যানে দুর্ব্বাসার পারণে এবং শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্বের পিতৃশাপমুক্তির জন্য চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্যারাধনায় সূর্য্য-পূজার উল্লেখ আছে।

পুরাণাদিতেও সূর্য্যপূজার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা, কূর্ম্মপুরাণে—

"ক্ষয়াপস্মারকুষ্ঠাদৈর্ব্যাধিভিঃ পীড়িতোঽপি সন্।
জপ্ত্বা শতগুণং স্তোত্রং স শ্লাঘ্যো ভবতি দ্রুতম্।"

স্কন্দপুরাণে—

"প্রতি মন্ত্রং নমস্কুর্য্যাদদয়াস্তময়ে রবিম্।
অনয়া নামসপ্তত্যা মহামন্ত্ররহস্যয়া॥
এবং কুর্ব্বন্নরো জাতু ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্।
ব্যাধিভির্ম্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥" †

নরসিংহপুরাণে—

"হস্তযুক্তে অর্কদিনে পৌরণক্তং সমাচরেৎ।
স্নাত্বা অর্কং সমভ্যর্চ্চ্য নীরোগী চিরজীবতি।" *

* বোম্বাই সংস্করণে ইহার উল্লেখ আছে; কিন্তু Gorresioর সংস্করণে ইহার উল্লেখ নাই।

† স্কন্দপুরাণে—কাশীখণ্ডে ৯ অধ্যায়।

‡ নরসিংহপুরাণের ৬৪ অধ্যায়ে।

মার্কণ্ডেয় ও গরুড়পুরাণে—

"ত্বাং স্মরিষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা মুচ্যন্তে তে মহাপদঃ।
ক্ষেমং বৃদ্ধিং সুখং রাজ্যং আরোগ্যং কীর্ত্তিমুন্নতিম্ ॥"

এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিতে পাই যে, কপিল-সংহিতা, গ্রহযাগ-সংস্কারতত্ত্ব, অগ্নিপুরাণ, শাম্বপুরাণ, এবং স্কন্দপুরাণে সূর্য্যের মূর্ত্তি ও সপ্তাশ্বব্যাপার ঋষিগণ-কল্পিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিয়াছে। কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করিলেও আমরা সূর্য্যপূজার অস্তিত্ব মধ্যযুগে দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে 'হর্ষচরিতে' দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভাকরবর্দ্ধন সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ৬৪০ খৃঃ অব্দে যখন চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাং মূলতানে আগমন করেন, তখন তিনি একটি সুন্দর সূর্য্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণময় সূর্য্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। হুয়েন সাং কাণ্যকুব্জ ভ্রমণকালেও একটি বৃহৎ সূর্য্যমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর আনন্দগিরি-রচিত 'শঙ্কর-বিজয়ে' আমরা সূর্য্যোপাসকদিগের পূজাপদ্ধতির প্রকরণবিবরণ প্রভৃতি বহু বিষয় দেখিতে পাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এক্ষণে জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে ১॰ ক্রোশ দূরে যে বিরাট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বেলাভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে সূর্য্যদেবের এক বিখ্যাত মন্দির ছিল। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে সূর্য্যমন্দির অবস্থিত ছিল। (ক) 'তারিখ-ই-বদাউনি' * পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীরবল আকবরের নিকট সূর্য্যপূজার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কথাতেই সম্রাট্ রাজ্যাভিষেক-উৎসবের সময় সূর্য্যপূজা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা সূর্য্যপূজার কথা দেখিতে পাই। উৎকল প্রদেশ যখন মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়, তখন তাহারা কণার্ক মন্দিরের সম্মুখের বিরাট অরুণস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে স্থাপন করিয়াছিল। আজিও সেই স্তম্ভ তথায় সমভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজপুতগণের মধ্যে সূর্য্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, যুদ্ধে যদি মৃত্যু

(ক) Ain-I-Akbari,—Gladwin

* Elliot's History of India. Vol. v. p. 531.

হয়, তাহা হইলে লোক ভানুস্থানে গমন করে। উদয়পুরের রাজসিংহাসনের সম্মুখে একটি সুন্দর সূর্য্যমূর্ত্তি চিত্রিত আছে। এখন আমরা যে প্রদেশকে ইন্দোর বলিয়া থাকি, পূর্ব্বে সে প্রদেশের নাম ইন্দ্রপুর ছিল। সেই ইন্দ্রপুরে খৃষ্টীয় ৪৬৫ অব্দে একটি প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান থাকার কথা জানিতে পারা যায়। বুদ্ধগয়ায় অতি প্রাচীনকালে একটি প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির ছিল। সেই সূর্য্যমন্দিরের মধ্যেই শিলাফলকে বুদ্ধদেবের পরি নির্ব্বাণের বৎসর পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরে সুন্দর সূর্য্যমূর্ত্তি অবস্থিত আছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ভারতবর্ষের প্রচলিত সূর্য্যপূজার কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সূর্য্যপূজার সহস্র নিদর্শন অঙ্কিত রহিয়াছে। যিনি গবেষণাসহকারে আসমুদ্র-হিমাচলপ্রবর্ত্তিত প্রাচীন পূজাপদ্ধতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তিনিই দেখিবেন, সূর্য্যপূজার ব্যাপ্তি কত দূর পর্য্যন্ত ছিল। এই সূর্য্যপূজা সুপ্রাচীনকালে যে শুধু ভারতের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহা নহে - চীন, ব্যাবিলন, মিশর, আমেরিকা, মার্কিন, আফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল স্থানেই সৌর-প্রভাব সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। আর হইবারই ত কথা—চক্ষু মেলিয়াই মানব সূর্য্যদেবের কিরণ-চ্ছটা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। পরে জ্ঞানের উন্মেষের সহিত যখন সে জানিতে পারে যে, সূর্য্যকিরণ না হইলে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না, তখন মানবপ্রাণ স্বতঃই সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকে। আদিম মানব প্রকৃতিতে যাহা কিছু শক্তিমান্ দেখে, তাহারই নিকট প্রথমে মস্তক নত করিয়া থাকে ও ভক্তির সহিত তাহার পূজা করিয়া থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত যখন সে জানিতে পারে, শক্তিমান্ কোথা হইতে শক্তি পাইল, তখন প্রকৃতি-পূজায় সে মনে আর শান্তি পায় না। তখন শক্তিমানের পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন, মানব সেই মহাশক্তির —বিশ্বস্রষ্টার চরণতলে পড়িয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে। কিন্তু বৈদিক যুগের আর্য্যসন্তানগণকে আমরা প্রকৃতিপূজায় রত থাকিতে দেখি না —তাঁহাদিগের পূজা প্রকৃতি-পূজা নহে—জড়ের উপাসনা নহে—উহা অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্যকরী যে চেতনা-শক্তি, যাহা জড়ের ভিতর দিয়া প্রকাশমান, তাহারই পূজার সূচনা করিয়া দেয়—বুঝাইয়া দেয়, বৈদিক দেবতাগণ ব্রহ্মের নামান্তর। তৎকালীন আর্য্যরা যখন যে দেবতার পূজা

করিতেছেন, তখনই তাঁহাদিগকে এক অদ্বিতীয় নিত্য সত্য ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই—তখন তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—সচ্চিদানন্দ এক অদ্বিতীয় নিত্য সত্য, সকল সৃষ্ট পদার্থে প্রকাশমান। শুধু তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝেন নাই—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এই মহাসত্য বিঘোষিত করিয়াছিলেন। অবশ্য ভারতে যে প্রকৃতি-পূজার প্রচলন ছিল না, তাহা বলিতে পারি না—অনার্য্যদিগকে আজিও প্রকৃতি-পূজায় নিরত দেখিতে পাই; কিন্তু বৈদিক সময়ে আর্য্যরা প্রকৃতিপূজা করিতেন না, তাহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি। বৈদিকযুগের পূর্ব্বতন যুগে প্রকৃতি-পূজার প্রচলন ছিল বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি ও আমি।

জীবনের মম স্নিগ্ধ প্রভাতে
প্রীতিময় ছিল এ হৃদয়।
নিখিল বিশ্ব পুলকপূর্ণ
হেরিত আমায় আঁখিদ্বয়।
নিতি নব নব সুষমা মাধুরী
হেরিতাম মোর চারি ভিতে;
বিষাদ বেদনা চিত্ত আমার
পারে নি তখন পরশিতে।
তখন দেবতা, নবরূপে তুমি;
হয়েছিলে সখা প্রিয়তম,
তখন তোমায় জানিতাম আমি
শুধু নর্ম্মের সাথীসম।
হাসিয়া খেলিয়া কাটানু তখন
তব প্রীতিময়ী সখীরূপে।

তারপর হায়, কত কাল প্রিয়,
কাঁদিনু কাতরে চুপে চুপে।
আজি তুমি শুধু নহ মোর সখা,
সখী শুধু তব নহি আমি,
আজি তুমি মম দেব ভগবান্,
আজি তুমি প্রাণময় স্বামী।
আজি তুমি মম গুরু জ্ঞানময়
করিছ আমারে জ্ঞান দান!
দিতেছ শিক্ষা করিতে আমার
সংযত, প্রভো, মনঃপ্রাণ।
আজিকে হয় না তৃপ্ত পরাণ
শুধুই তোমায় ভালবাসি,
দিতে হয় সাধ চরণ-পদ্মে
শ্রদ্ধা-ভকতি-ফুলরাশি।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্ত।

অদৃষ্ট-চক্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন জীবন।

সদানন্দ পুরুষরা বলিয়া থাকেন, আনন্দময়ের রাজ্যে কেহই নিরানন্দ নহে—কেহই নিরানন্দ থাকিতে পারে না। যে মরুবক্ষের বালুবিস্তারে জীব বাস করিতে পারে না, সে মরুবক্ষেও মরীচিকা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন দেখায়। জীবগণ যে কণ্টকগুল্ম স্পর্শ করিতেও পারে না, বসন্তের বাতাসে তাহারও শাখায় ফুল ফুটিয়া উঠে। কেহ নিরানন্দ নহে। যতীশ চন্দ্রের নূতন জীবনও নিরানন্দ হইল না। তাহার প্রধান কারণ—কল্যাণী। সে বাল্যকাল হইতে যশের, অর্থের প্রাচুর্য্যের যে আদর্শ কল্পনা করিয়াছিল, যখন তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে সে কল্পনা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন সে যে ব্যথা পায় নাই, তাহা নহে। তখন তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই—তাহার হৃদয়ে সুখের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী হইতে পায় নাই। কল্যাণীর প্রেমে—ততোঽধিক তাহার সহানুভূতিপ্রণোদিত সাহচর্য্যে প্রথমে সে বেদনার উপশম হইয়াছিল। তাই সে নূতন আশায়—নূতন উদ্যমে, নূতন জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

দানাপুরে আসিয়া সে সত্য সত্যই নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন তাহার আদর্শ স্বতন্ত্র—উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র—আশা স্বতন্ত্র। এই সকল লইয়াই আমাদের জীবনের বিশেষত্ব। এখন আয় সীমাবদ্ধ,—সঙ্কীর্ণ; কিন্তু কল্যাণী তাহারই মধ্যে ব্যয় বদ্ধ রাখিয়া অভাবকে গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেয় নাই; সুতরাং সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট; এই কাযই অবলম্বন বুঝিয়া সে তাহা সুসম্পন্ন করিত; সুতরাং কাযে তাহার সুনাম ছিল। অবসর বিনোদনের জন্য সে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিত। সাহিত্যের নেশা সে কাটাইতে পারে নাই। কিন্তু এখন সে পড়িত; লিখিত না। এখন পিতার সেই কথা তাহার মনে পড়িত,—শিক্ষা সম্পূর্ণ কর, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর—মতামত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। এখন তাহার পূর্ব্বলিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সে লজ্জিত হইত। কি অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া

সে কত বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছে! সে তখন কি ভাবিত? বাস্তবিক সে যে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিল, তাহা অনেকের পক্ষেই লাভ করা দুষ্কর। দুর্দ্দশার দারুণ আঘাতে তাহার উদ্ধত অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার বিনয়নম্র ব্যবহারের গুণে সে সকলেরই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে পারিত। তাই বাঙ্গালীবিরল দানাপুরের বাঙ্গালীসমাজে সকলে তাহাকে ভালবাসিতেন।

উপরে যে বাঙ্গালীসমাজের কথা বলিয়াছি, সে সমাজ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। এক সময়ে দানাপুর সমৃদ্ধ সহর ও বৃহৎ গোরাবারিক ছিল। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাহার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। তখন বারিকে সৈনিকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সহরের সমৃদ্ধি-নাশহেতু লোকও কমিয়াছে। পূর্ব্বে সহরে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন। ব্যবসায়ীরা অনেকেই স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, বিহারের আদালতে ক্রমে বাঙ্গালী ব্যবহারাজীবের অন্ন উঠিয়াছে, বিহারে বাঙ্গালীর চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বাসন্দা অথবা যাঁহারা ব্যবসায়ের জাল গুটাইতে পারেন নাই বা চাকরী পাইয়াছেন, তাঁহারাই দানাপুরে আছেন; কাজেই তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে; আর বোধ হয়, সেই কারণেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। যাঁহারা জাল গুটাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে বসু মহাশয়রাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কারবার বৃহৎ ও বিবিধ বিভাগে বিভক্ত ছিল; সহজে গুটান যায় না। তাই কারবারসংস্থাপকের দুই পুত্র অন্য ব্যবসা জড়াইয়া লইয়া ক্রমে জাল গুটাইতেছিলেন। তাঁহাদের একজন ডাক্তার আর একজন উকীল। এই "ডাক্তার সাহেবের" ও "উকীল সাহেবের" বারান্দায় প্রতি অপরাহ্নে বাঙ্গালীসমাজের বৈঠক বসিত। তথায় সংবাদপত্রপাঠ, চা-পান ও গল্পগুজব হইত। সে বৈঠকে গৃহস্বামীরা ব্যতীত বসিতেন—বাঙ্গালী পোষ্টমাষ্টার, যতীশচন্দ্র, স্থানীয় বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষক। এই শিক্ষকদ্বয়ের মধ্যে একজন নীরজার ভাশুরপুত্র। শরৎবাবু স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হইয়া পিতামহী শাসিত সংসারের পুরুষ অবলম্বনরূপে দানাপুরেই নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। পিতামহীর নিকটে প্রাপ্ত অজীর্ণরোগ ও নবপরিণীতা পত্নীর প্রেম এই দুই লইয়াই তাঁহার সময় কাটিত। তাঁহার সহকর্ম্মীটি অত্যন্ত কর্ম্মঠ। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ নাটকরচনায় আত্মপ্রকাশ করিত।

তাঁহার গল্প বলিবার প্রণালী বড় চিত্তাকর্ষক। তাঁহার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা—শ্বাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া তাঁহার প্রথম পক্ষের পত্নীর আত্ম-হত্যা, ছাত্রাবস্থায় তাঁহার আশ্রয়দাতা নিয়োগী মহাশয়ের রূপসী কন্যা ‘পান্নু দিদির’ তাঁহার প্রতি প্রেমপ্রকাশ, তাঁহার বিদেশে চাকরী-প্রাপ্তি—এ সব তিনি এমন ভাবে বিবৃত করিতে পারিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিত, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া বাছিয়া লইতে পারিত না। যতীশ প্রত্যহ এই বৈঠকে আসিত।

পত্নীর সাহচর্য্যে—আফিসের কাজে—বৈঠকে গল্পগুজবে যতীশের নূতন জীবন শান্ত ভাবে কাটিতেছিল। তাহাতে উত্তেজনা ছিল না; কিন্তু শান্তি ছিল। তাহার পর দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যভাগে যখন সেই জীবনে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়া কল্যাণীর পুত্র জননীর অঙ্ক ও পিতার হৃদয় উজ্জ্বল করিল, তখন যতীশ নূতন কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আনন্দ অনুভব করিল।

দিনে দিনে কল্যাণী যেমন সুস্থ ও দৌর্ব্বল্যমুক্ত হইতে লাগিল, আর শিশু যেমন বড় হইতে লাগিল—যতীশচন্দ্র তেমনই নূতন সুখের আস্বাদ পাইতে লাগিল। সে যে জীবনে কখন এমন সুখ পাইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। যে দিন সে রিক্তহস্তে পত্নীকে লইয়া এই বিদেশে জীবিকা অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল, সে দিন সে যে মনে ভাবিতেও পারে নাই, এক দিন নূতন আশায়—নূতন আনন্দে—তাহার হৃদয় পূর্ণ হইবে—জীবন সুখময় হইবে! তাহার অতীত জীবন ক্রমে তাহার নিকট বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। সে মনে করিতে লাগিল, মানুষের অদৃষ্টে যাহা ঘটে—ভালর জন্যই ঘটে।

পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী যেন নবজীবনে প্রবেশ করিল। এত দিন পতিই তাহার সর্ব্বস্ব ছিল—পতির প্রীতিসাধন ব্যতীত তাহার জীবনে যেন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না—পতির মঙ্গল-কামনা ব্যতীত তাহার আর কোন কামনা ছিল না। এখন পুত্রস্নেহে যেন তাহার পতিপ্রেম নূতন হইয়া উঠিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহার কেবল পতিকে মনে পড়িত। এখন তাহার কর্ত্তব্য বাড়িল, সে কর্ত্তব্যপালনে যেন তাহার পরম আনন্দ; তাহার কাজ বাড়িল—সে কায করিয়া কত সুখ! আর এত দিন তাহার যাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ ঘটে নাই—এবার সে তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল;—তাহার জন্য স্বামীর সস্নেহ ব্যাকুলতা;

তাহাকে স্বামীর অসীম যত্ন, তাহার আরামবিধানে স্বামীর ঐকান্তিক চেষ্টা—এ সব লক্ষ্য সে করিল; লক্ষ্য করিয়া সে যে আনন্দ উপভোগ করিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখনও উপভোগ করে নাই। সে যখন পুত্রের মুখচুম্বন করিত, তখন মাতৃগর্ব্বে গর্ব্বিণী হইয়া সে মনে করিত, জগতে তাহার মত সুখী কে? মাতৃত্ব তাহার রমণীহৃদয়ে পূর্ণতা দান করিয়া যেন তাহাকে আরও উদার—আরও মধুর আরও স্বার্থত্যাগী করিল।

কল্যাণীর প্রসবের পূর্ব্বে তাহার জননী তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের কষ্ট হইবে বলিয়া সে যায় নাই। সে স্বামীর জন্য আপনার জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিল—স্বামীর সামান্য সুখের জন্য সে আপনার প্রাণপাত করিতে পারিত। তাহার পর তাহার জননী আসিতেও চাহিয়াছিলেন। পিতৃগৃহে সকলের অসুবিধা হইবে বলিয়া সে তাহাতেও সম্মতা হয় নাই। সে সকলকে ভালবাসিত—তাই সকলে তাহাকে ভালবাসিত। সে আসন্নপ্রসবা শুনিয়া দানাপুরের সকল বাঙ্গালী পরিবারের মহিলারাই আসিয়াছিলেন। এমন কি নীরজার শাশুড়ীও আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অত্যন্ত 'সেকেলে' ব্যবস্থার অনুসরণের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য-গৃহে গমন এমনই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার যে, ইহা লইয়া কয়দিন ধরিয়া মহিলা-মহলে আন্দোলন চলিয়াছিল। "ডাক্তার সাহেবের" পত্নী স্বভাবতঃ শুচিবাইগ্রস্তা; বিশেষ তাঁহার কোলে সর্ব্বদাই কচি ছেলে থাকে। তথাপি তিনি সূতিকাগৃহে যাইয়া আবার স্নান করিতেও ভয় পায়েন নাই। আর "উকীল সাহেবের" পত্নী বিপুল দেহভার লইয়াও প্রসূতির শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি তখনও সন্তানলাভসৌভাগ্যশালিনী হইতে পারেন নাই। কিন্তু রমণীহৃদয়ে অপত্যস্নেহ উছলিয়া উঠে। তাই তিনি কল্যাণীর এই সৌভাগ্যে আনন্দিতা হইয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে; প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গৃহকর্ম্ম সারিয়া তিনি কল্যাণীর গৃহে আসিতেন—তাহার নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইতেন। নীরজা তাহার সংবাদ লইত; কিন্তু শাশুড়ীর অনুমতির অভাবে তাহাকে দেখিতে আসিতে পারিত না।

নীরজা যে সরোজার ভগিনী কল্যাণী তাহা জানিত; কিন্তু নীরজা তাহার পরিচয় জানিত না। কল্যাণী নীরজাকে দেখিয়া ভাবিত, সরোজা কেমন? অমনই কি ভগিনীর মত গৌরবর্ণা—রূপবতী? অমনই কি শান্তস্বভাব? সে এক দিন যতীশকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কি দেখিতে তাঁহার ভগিনীর

মত?" যতীশ তাহার এ প্রশ্নে বিস্মিত হইল; বলিল, "আমি যখন নীরজাকে দেখিয়াছিলাম, তখন সে বালিকা। কিন্তু তখনও দুই ভগিনীতে যেন অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইত।" কল্যাণী বলিল, "দিদিকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।" তাহার কথা শুনিয়া যতীশ ভাবিল, সংসারের স্বার্থপর কুটিলতা কি কখনও এই সরলাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না? বাস্তবিকই কল্যাণীর সপত্নীকে দেখিতে ইচ্ছা হইত। সে সকলকে ভালবাসিত; ভাবিত, সকলে তাহাকে ভালবাসে—সংসারে ভালবাসাই স্বাভাবিক। তাই সে মনে করিত, সরোজা কেন পতিপ্রেমে বঞ্চিতা রহিবে, কেন সে স্বামীর কাছে থাকিতে পাইবে না? ইহা লইয়া সে যতীশের সহিত ঝগড়া করিত। সপত্নীর আগমনে তাহার সংসারে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে—শান্তির স্থানে অশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে তাহা ভাবিতেও পারিত না।

যতীশ যখন কল্যাণীর কথা শুনিত, তখন সে মনে করিত—কোন্ জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে বিধাতা আমার দুরদৃষ্টদাবানলদগ্ধ জীবনে এই শান্তির স্নিগ্ধ স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন? আমি কল্যাণীর উপযুক্ত নহি—তবে আমি তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিব। আমার দীনতা—হীনতা তাহার পুণ্যপ্রভাবে দূর হইয়া যাইবে; আমার অসম্পূর্ণতা সে সম্পূর্ণ করিয়া দিবে।

কল্যাণী যে দুঃখসময়ে তাহার সমস্ত অলঙ্কার আনন্দে—স্বেচ্ছায় তাহাকে দিয়াছিল, যতীশ সে কথা ভুলে নাই। কিন্তু সে, সে কথা উত্থাপিত করিলেই কল্যাণী অন্য কথা পড়িয়া সে কথা চাপা দিত। যতীশ কল্যাণীকে না বলিয়া কোন কায করিত না; কিন্তু তাহাকে না বলিয়া তাহার জন্য একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিয়াছিল। সুতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া স্নানান্তে কল্যাণী যখন পুত্রকে অঙ্কে লইয়া বসিয়া ছিল, যতীশ তখন সেই অলঙ্কার লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ, একটা কথা তোমাকে জানিতে দিই নাই।" কল্যাণী বলিল, "তুমি কেন অত পয়সা খরচ করিলে? এখন অনেক খরচ বাড়িল। আমাদের সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।" তবুও যখন যতীশ তাহাকে সেই অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তখন সে হৃদয়ে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিল—সে অলঙ্কার পরিলে যতীশ যখন সুখী হয়, তখন অলঙ্কার পরিয়া সে সুখী হইবে না কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভাঙ্গা-গড়া।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ রাধাচরণকে দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্দ্ধাংশ তাঁহার তিন পুত্রের; তাহার মধ্যে গৃহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পুত্রীদিগের বাসের অধিকার ছিল। এ সব ব্যবস্থা বামাচরণের মনঃপূত হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল, এখন রাধাচরণকে হস্তগত করাই আবশ্যক—একে সে অর্দ্ধাংশের মালিক—তাহাতে তাহার নগদ টাকাও রহিয়াছে। সুতরাং সে রাধাচরণকে বুঝাইয়া টাকাটা ব্যবসায়ে ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল; রাধাচরণকে বলিল, "বসিয়া থাকিলে ত আর চলিবে না। কলিকাতায় চল। কায ত করিতে হইবে।" কিন্তু রাধাচরণের প্রতি তাহার অতিরিক্ত স্নেহ শৈলজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। শৈলজার সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইল।

শৈলজা রাধাচরণকে ডাকিয়া বলিল, "জ্যেঠা মহাশয় না কি তোমাকে কয় হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন?"

রাধাচরণ বলিল, "হাঁ।"

"তুমি টাকা লইলে কেন?"

রাধাচরণ জ্যেঠতাতের সহিত তাহার কথোপকথন বিবৃত করিল।

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "সে টাকা কোথায়?"

রাধাচরণ চলিল, "বড় দাদার কাছে।"

"কেন?"

"ব্যবসায়ে দেওয়া হইবে।"

"তোমার ব্যবসা করিয়া কায নাই।"

"কি করিব?"

"চাকরী করিয়া দেখিয়াছ; রাখিতে পার নাই। ব্যবসা তোমার কায নহে। কেবল হইবার মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনোমালিন্য হইবে। ঐ টাকা দিয়া একটু সম্পত্তি কিন। দেবী চাকরী করিতেছে করুক, তুমি সংসার দেখ—সম্পত্তি দেখ। তিল কুড়াইয়া তাল হয়—কয় জনে যাহা আনিবে, তাহাতে সংসারে কষ্ট হইবে না।"

রাধাচরণ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া বামাচরণের পরামর্শ লইতে গেল।

বামাচরণ সব শুনিয়া শঙ্কা গণিল—বুঝি জাল ছিঁড়িয়া মাছ পলায়। যাহা হউক, সে ভাবিল, সে শৈলজাকে বুঝাইয়া রাধাচরণকে লইয়া যাইতে পারিবে। আপনার বুদ্ধিতে তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল। আর শৈলজার সহজ বুদ্ধি যে তাহার ক্রূর বুদ্ধিকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা সে ভাবিতেও পারিল না।

অপরাহ্নে অন্তঃপুরের দালানে শৈলজা, বিরজা, পিসীমা ও বড় বধূ বসিয়া ছিলেন। বামাচরণ রাধাচরণকে লইয়া তথায় আসিল। বড় বধূ মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। বামাচরণ বলিল, "শৈল, তুই কি রাধাচরণকে বাটী থাকিতে বলিয়াছিস্?"

শৈল কোলের ছেলেকে দুধ পান করাইতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ।" তাহার পর ছেলেকে আবার দুধ দিতে লাগিল।

বামাচরণ বলিল, "পার্ব্বতী আর দেবী ত বাড়ীতেই থাকিল।"

শৈল মুখ না তুলিয়াই বলিল, "মেজদাদা যজমান দেখিবেন, দেবীর চাকরী আছে।"

"কিন্তু বসিয়া থাকিলে কয় দিন চলিবে?"

"চলিবার ব্যবস্থা জ্যেঠা মহাশয় একরূপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে টাকা রাধুকে দিয়া গিয়াছেন, সে টাকায় একটু সম্পত্তি কিন। রাধু সংসার দেখুক—সম্পত্তি দেখুক। টাকা রাধুর নহে—তোমাদের চারি ভ্রাতার।"

"আমি বলি, রাধাচরণ আমার সঙ্গে ব্যবসায় থাকুক। আমি একা সব পারিয়া উঠি না।"

"রাধুর কি ব্যবসা বুঝিবার যোগ্যতা আছে? আর ঐটুকু ব্যবসাতেই বা কি হইবে?"

"না—এই টাকাটা ফেলিলে ব্যবসাটাও বড় করা যায়।"

শৈল হাসিয়া বলিল, "তুমি এত বড় বুদ্ধিমান্ তুমি ব্যবসায়ে বড় লাভ করিতে পারিলে, তা রাধু লাভ করিবে! আমি ত জানি, কলিকাতার বাসার খরচ পাই পয়সা হিসাব করিয়া জ্যেঠা মহাশয় পাঠাইতেন।"

কথা কাটাকাটিতে বামাচরণ একটু রাগ করিতেছিল—বিশেষ সে শৈলজাকে যুক্তিতে পরাস্ত করিতে পারিতেছিল না, ইহাতে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া যাইতেছিল। সে বলিল "লাভ করি কি না করি, এই বার বুঝিবে।"

শৈলজা বলিল, "এত দিন যদি বুঝি নাই, এইবারই বা বুঝিব কেন?"

"এত দিন সংসারে অভাব হয় নাই—তাই কিছু দিই নাই এখন বোধ হয়, আমাকেও দিতে হইবে, তোমাদেরও লইতে হইবে।"

শৈলজা ঝনাৎ করিয়া ঝিনুকখানা দুগ্ধের বাটিতে ফেলিয়া দিল; বিস্ফারিত নয়নের তীব্র দৃষ্টি বামাচরণের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "দাদা, আমি চার ছেলের মা—কচী খুকী নহি। বাবা যে জ্যেঠা মহাশয়কে টাকা পাঠাইতেন—সে কি সংসারের অভাব বুঝিয়া? দেখিতেই ত পাইলে, সে টাকা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। রাধু ব্যবসা করিলে টাকা কি সংসারে আসিবে?"

বামাচরণ বলিল, "আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি—বলিয়াছি। আমার কায আমি করিয়াছি। এখন তোমরা যাহা ভাল বুঝ কর।"

"আমাদের বুঝাবুঝিতে আর কি আইসে যায়? তোমাদের ভাল হইলেই ভাল। যাঁহার জোরে—যাঁহার যত্নে বাপের বাড়ীতে জোর ছিল, তিনি গিয়াছেন। বাপের বাড়ীতে আর যত্ন করিয়া কেহ আনিবে না। বাপের বাড়ী আসিবার পাট উঠিল। তবে তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনিতে না হয়।"

"কেন, তোমরা আসিবে না কেন? বাটীতে তোমাদের ত আমাদের সঙ্গে সমানই অধিকার।"

বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিযোগ হইল। শৈল বলিল, "বাপের বাড়ী থাকিলেই মেয়েরা আসিয়া থাকে। জ্যেঠা মহাশয় যে সে জন্য আবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে কি তোমাদের গুণে নহে? আমি সবই জানি। আমার পত্র পাইতে একদিন বিলম্ব হইলে জ্যেঠা মহাশয় পত্রের জন্য ঘর আর বাহির করিতেন। তুমি কি কোন দিন একখানা পত্র লিখিয়া সংবাদ লইয়াছ? তুমি ত বড় ভ্রাতা—সে কায ত তোমারই।"

ক্রোধে ও অভিমানে শৈলজার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বামাচরণ পরাজিত হইয়া স্থানত্যাগ করিল।

শৈলজা বিরজার কোলে ছেলে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বধূ গজ-রাইতেছিলেন। তাঁহার একটি মেয়ে আসিয়া বিরজার কাছে খাবার চাহিল। "কেবল লোককে বিরক্ত করা"—বলিয়াই বড় বধূ তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন। সে কাঁদিতে না কাঁদিতে শৈলজা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া

বড়বধূকে বলিল, "বড়-বৌ, পিসী মাসী ত কুটুম্ব নহে যে, খাবার চাহিলে তাহাদের বিরক্ত করা হয়। ছেলেদের অমন শিক্ষা দিও না।"

বড়বধূ বলিলেন, "জানি গো, জানি। সময়গুণে সবই হয়।"

"আমিও তাহা জানি। যখন জ্যেঠা মহাশয় গিয়াছেন, তখন তোমরা সেই সময়ই আনিবে। তবে যে কয় দিন সে সময় না আইসে—সে কয় দিন তোমারও মঙ্গল—আমারও মঙ্গল। সে কয় দিন ছেলেমেয়েরা পিসীদের আপনার বলিয়া জানুক।"

শৈলজা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বক্ষে লইয়া কক্ষান্তরে গেল।

পরদিন প্রভাতেই বামাচরণ সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, "আমার খরচ আমি চালাইব। সে জন্য আর কাহারও কথা শুনিব না।" সে পিসীমা'কেও লইয়া গেল না।

শৈলজা বিরজাকে বলিল, "এবার কি এমন পোড়া কপাল লইয়াও আসিয়াছিলাম! কাঁদিয়া চলিলাম। আর বুঝি, সংসারও ভাঙ্গাইয়া গেলাম।"

বিরজা বলিল, "এ ভাঙ্গাত আগেই ভাঙ্গিয়াছিল। বাবা এ ভাঙ্গা জুড়িতে পারেন নাই। তুমি বরং রাধুকে আনিতে পারিলে গড়িয়া যাইতে পারিবে।"

সেই দিন শৈলজা সেজ বধূকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইল। সে বলিল, "রাধুর বুদ্ধি প্রকৃতি আমার জানিতে বাকি নাই। একে কোন দিনই উহার মতি স্থির নহে; তাহার উপর জ্যেঠা মহাশয়ের আদরে ও একেবারে কাযের বাহির হইয়াছে। জ্যেঠা মহাশয় তাহা বুঝিয়াই উহার ভাগেই অধিক দিয়া গিয়াছেন। দাদার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে, উহার এমন সাধ্য নাই। দাদা উহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবে—আবশ্যকমত অর্থ যোগাইবে; ও সেই টাকা আপনার আতর-সাবানে আর তোমার সেমিজ-জ্যাকেটে ফুটকড়াই করিয়া ফেলিবে। সে আমি ভাল জানি। কিন্তু খরচ এখন বাড়িতেই চলিল। টাকা লইয়া আর ছিনিমিনি খেলা চলিবে না। আমি বলিয়াছি, যে টাকা আছে, তাহা দিয়া সম্পত্তি কিন। সম্পত্তি এক দিনে নষ্ট করা যায় না। ঘরে বসিয়া সম্পত্তি দেখ—সংসার দেখ। তুমি শক্ত না হইলে হইবে না। বুঝিলে?"

সেজ বধূ ঘাড় নাড়িল।

শৈলজা আবার বলিল, "আর দেখ—মা পাগল। মা'কে ছাড়িয়া যদি

কলিকাতায় যাও—তবে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকিবে না। আমার সংসারে আর স্ত্রীলোক নাই। তাই আমাকে যাইতে হইতেছে, নহিলে আমি আরও কিছুদিন থাকিতাম; তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইতাম না। বিরজাও ছেলে মানুষ—আর সে সূতিকাগারের ব্যবস্থা কিছুই জানে না। পিসিমা'র বয়স হইয়াছে। সেই জন্যই তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইতেছি। তুমি সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়াই চলিয়া আসিও; বিলম্ব করিও না। বিরজা থাকিতে মা'র কোনরূপ অযত্ন হইবে না। ভগবান কেন যে তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন!" শৈলজার নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তাহার পর বিদায়ের পালা পড়িল। নীরজার শ্বাশুড়ীর কড়া হুকুম, তাহাকে ফিরিতে হইবে। পার্ব্বতীচরণ বলিল, এ হুকুম না মানিলে চলিবে না। শৈলজারও না যাইলে নহে। বৈশাখের প্রথমেই সেজ বধূকে ও নীরজাকে পাঠাইয়া শৈলজা যাত্রার আয়োজন করিল। এ বার যাইবার সময় সে অনেক কান্দিল—জ্যেঠা মহাশয়ের জন্য কান্দিল—বিরজার জন্য কান্দিল—সরোজার জন্য কান্দিল -সংসারের জন্য কান্দিল—দাদার জন্য কান্দিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরাজও কান্দিল—সরোজাও কান্দিল।

যাইবার সময়ে শৈলজা বিরজাকে বলিল, "বাপের বাড়ী হইতে যাইবার সময় পূর্ব্বে কখন তোমাদের কি হইবে ভাবি নাই। এবার হইতে সে ভাবনার আরম্ভ হইল।"

বিরজা বলিল, "দিদি, মধ্যে মধ্যে আসিও। আমি কাশী যাইতাম; কিন্তু সরোজাকে কোথায় রাখিয়া যাইব?"

শৈলজা বলিল, "না, তোমার যাওয়া হইবে না। এখন উহার সকল ভার তোমার। ভগবান যদি উহার অদৃষ্ট ফিরান, তখন তোমার ছুটী হইবে। আমি আসিব বৈ কি? যতদিন মা আছেন—পীসিমা আছেন—তোমরা আছ, ততদিন কি না আসিয়া থাকিতে পারিব?"

সংগ্রহ।

প্রত্নতত্ত্ব।

পাটনার পুরাবস্তু।

লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যফলে এক্ষণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুরাবস্তুর সন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। সংপ্রতি মিষ্টার রতন টাটার বদান্যতায় পাটনায় অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। পাটনা প্রাচীন পাটলিপুত্র। এই স্থানে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল এবং এই স্থান হইতে রাজানুকূল্যে শত শত শ্রমণ ভারতের চারিদিকে ও ভারতের বাহিরে শাক্য রাজকুমারপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে রাজাদেশে ভারতের নানাস্থানে যে সকল স্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকলকে ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের অক্ষয় উপাদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চীন হইতে যে সকল পরিব্রাজক সুগতের জন্মভূমি দেখিয়া পুণ্য ও তথায় বৌদ্ধমতের আলোচনা করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ভ্রমণ-বিবরণ ভারতের ঐতিহাসিকের অবলম্বন। সে সকল বিবরণে পাটলিপুত্রের সম্পৎসম্ভারের সম্যক্ পরিচয় পরিকীর্ত্তিত আছে। কানিংহাম পাটনায় পুরাবস্তুর সন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার পর যাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ডাক্তার ওয়াডেলের ও পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে পাটনায় ও পাটনার উপকণ্ঠে যে অনুসন্ধান চলিতেছে তাহা হইতে আমরা বিবিধ বিষয় জানিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে। সংপ্রতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার রচনার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কুমড়ারে খনন।

সুখের বিষয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মনোযোগ মৌর্য্যবংশের পুরাতন রাজধানী পাটলিপুত্রনগরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ডাক্তার স্পুনার বর্ত্তমান সহর হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুমড়ারে খনন ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত এবং পালিতে সুপণ্ডিত এবং ইতঃপূর্ব্বে পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী সাহ-কি-ডেরিয়া নামক স্থানে কণিষ্কের স্তূপ হইতে বুদ্ধদন্ত বাহির করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি মজাফরপুর জিলার বৈশালীতে অনেকগুলি মুদ্রা, ছাপ ও মৃণ্ময় পুত্তল বাহির করিয়াছেন। ইহার বিবরণ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিবরণীতে বাহির হইতেছে।

পূর্ব্বতন খনন এবং তাহার ফলাফল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম গ্রীকবর্ণিত পুরাতন পালিবোথ্রা নগর এবং হ্রানোবাসের অবলম্বিত পথ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত মিঃ বেগ্লারকে সহযোগী করিয়াছিলেন। কানিংহাম পাটনায় গমন করতঃ মিগাস্থিনিসবর্ণিত পুরাতন পালিবোথরাসম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, ঐ নগরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরবর্ত্তী খননের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সমান্তর রেখায় ঐ নগরের প্রাচীরাবলী হইতে প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ, এমন কি, কোন কোন স্থানে তদপেক্ষাও অধিক স্থান বর্ত্তমান আছে। কানিংহাম পাহাড়িগ্রামে চীন পরিব্রাজকগণবর্ণিত বুদ্ধ-মন্দিরগুলির যে সূত্র বাহির করিয়াছেন, তাহা কিন্তু অনেক পরিমাণে সত্য।

পাটলিপুত্র নগরে পুরাতন মন্দিরগুলির আবিষ্কারের কথা ডাক্তার ওয়াডেল পুনরুত্থাপিত করেন। অশোকের প্রাচীন রাজধানীসম্বন্ধে তিনি একখানি পুস্তিকা বাহির করেন। তিনি বলেন যে, পাটলিপুত্র নগরের চিহ্ন গঙ্গাগর্ভে ত যায়ই নাই; পরন্তু অশোকের প্রাসাদ, মঠ ও মন্দিরগুলি এত পরিচীয়মান রহিয়াছে যে, য়ুয়ান-চোয়াংএর ইতিবৃত্তের অনুগমন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহাদিগের স্থাননির্দ্দেশ করা যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ পুরাবস্তুসংগ্রহশালার ডাঃ ফুরার পাহাড়িয়ার স্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করেন। উহার জন্য সহস্র টাকা ব্যয় মঞ্জুর হয়, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ডাঃ ওয়াডেলের অনুমোদনে ঐ কার্য্যে পুনরায় ২০০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হয়। মিঃ মিল কুমড়ারে, বুলানদিবাগে ও রামপুরে খনন আরম্ভ করেন। শেষোক্ত স্থানে প্রায় ২০০ ফিট দীর্ঘ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নর্দ্দামা বাহির হয়। কুমড়ারে অনেকগুলি অপূর্ব্ব পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউজিয়ম হইতে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ কার্য্যের জন্য প্রেরিত হয়েন। কিছু দিনের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বুলানদিবাগ ও লসকরী বিবি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন। তৎপরে তিনি কুমড়ার, নাওরতনপুর, বাহাদুরপুর, রামপুর, বিক্না পাহাড়ি ও লোহানিপুরে খনন আরম্ভ করেন। ইহার ফলে নানা প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কুমড়ারে ও লোহানিপুরে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের দুইটি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, পাটনার কালুখাঁর বাগে, মৌলবী মহম্মদ কবীর এবং আমীরের জেনানার প্রাঙ্গণনিম্নে একটি অশোক-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিপুল বপুবিশিষ্ট।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবরণী মুদ্রিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু প্রচারিত হয় নাই; ডাঃ ওয়াডেলের বিবরণী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ পাটনার অনুশাসনসম্বলিত অশোক-স্তম্ভগুলির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনওরূপ উপযুক্ত গবেষণা করা হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা স্বতঃই স্বীকার্য্য যে, ফাহিয়ান এবং য়ুয়ান-চোয়াং যথাক্রমে ৪১৪ ও ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় দুইটি স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন।

ডাঃ ওয়াডেল এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয় উভয়েই কানিংহামের বিরুদ্ধমতাবলম্বী। তাঁহারা চীন পরিব্রাজকগণবর্ণিত মন্দিরসমূহের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অশোকের প্রাসাদ এবং কুমড়ার গ্রাম একই বলিয়া গিয়াছেন। কুমড়ার গ্রাম বর্ত্তমান পাটনা সহরের বাহিরে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের দক্ষিণে। পাটনা সহর ঐ রেলপথের ভিতরে।

কুমড়ারে অপূর্ব্ব খনন।

অশোকের রাজপ্রাসাদ যে কুমড়ারে নহে, তাহার প্রমাণ আছে।—বিভিন্ন খননক্রিয়ার ফল পর্য্যালোচনা করিলে এবং হুয়েন সাং-লিখিত বিবরণী চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে সমালোচনা করিয়া দেখিলে কুমড়ার এবং অশোকের প্রাসাদকে এক বলা যাইতে পারে না। ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং উভয়েই পাটলিপুত্র নগরের বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার ফাহিয়ানপ্রদত্ত বিবরণ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ; কারণ, তিনি হুয়েন সাং অপেক্ষা অধিক দিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

ফাহিয়ান মুদ্রা-রাক্ষস নামক সংস্কৃত নাটকবর্ণিত সাংগঙ্গপ্রাসাদই নানারূপ কারুকার্য্য-শোভিত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। পাটলিগ্রামে থাকিয়া শাক্যমুনি, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে অশোক তাঁহার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে তিন মাইলেরও অধিক উত্তরে পাটলিপুত্রনগর অবস্থিত বলিয়া ফাহিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াডেল বলেন যে, ফাহিয়ানবর্ণিত স্তূপ এবং পাটনার পঞ্চ্ পাহাড়ি একই এবং এই স্থানে থাকিয়াই আকবর পাটনা অবরোধ করিবার সময় এই নগরের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পাটনা সহর পঞ্চ্পাহাড়ি স্তূপের ঠিক অর্দ্ধ মাইল উত্তরে। সুতরাং অশোকের রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান পাটনা নগরের যে স্থানেই হউক, হইবে; কিন্তু কুমড়ারে নহে; কারণ, কুমড়ার বর্ত্তমান সহরের বাহিরে। অশোকের রাজপ্রাসাদ যে কুমড়ারে নহে, ইহার আরও প্রমাণ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০১ অব্দে মেগাস্থিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, গঙ্গা ও শোণনদীর সঙ্গমস্থলে পালিবোথ্রা নগর অবস্থিত। এই স্থান আকারে সামন্তরিক ক্ষেত্রবৎ, দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল, বিস্তারে ১। মাইল। ইহার চারিদিকে কাষ্ঠের প্রাচীর; সম্মুখে বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রকাণ্ড পরিখা।

আমরা অবগত আছি যে, ফাহিয়ান অশোকের প্রাসাদ নগরমধ্যস্থ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। চাণক্য উহাকে আর একটু উত্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হুয়েন সাং ঐ নগর উচ্চ ভূমির উপরিভাগে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে উক্ত কাষ্ঠপ্রাচীরের অবস্থান আলোচনা করা যাউক। ডাক্তার ওয়াডেলের এবং মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের খননের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের সমসূত্রে লোহিনাপুর গ্রাম হইতে পাটনা সহর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ছয় মাইল বিস্তৃত কাষ্ঠপ্রাচীরের অবশেষ বাহির হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোহিনাপুরের পশ্চিমে অনেকগুলি এইরূপ প্রাচীরাবশেষ বাহির করিয়াছেন। মিষ্টার রাসেলও লোহিনাপুরের কিঞ্চিৎ উত্তর-দক্ষিণ-বিস্তারী অনেকগুলি কাষ্ঠপ্রাচীর বাহির করিয়াছেন। যদি বিভিন্ন খননক্রিয়াবিকৃত এই সকল প্রাচীরাবশেষ সংযুক্ত করিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায়, তাহা হইলে পালিবোথরার মূল প্রাচীরের সম্যক্ ধারণা হয়।

পুরাতন প্রাচীরের অবস্থান হইতে সহজেই প্রতীত হয় যে, আধুনিক পাটনা সহর প্রাচীন পালিবোথ্রা নগরের স্থান অধিকার করিয়াছে। অশোকের প্রাসাদ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান পাটনা সহরের মধ্যে এবং গঙ্গার অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। কেন না, "মুদ্রারাক্ষসে" মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রাসাদ সেইরূপ বর্ণিত আছে। হরারিমথ্নি, নজরকাটরা এবং

সাদিকপুর সংগ্রাম প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চ স্তূপ নগরমধ্যে আছে। সুতরাং উপরোক্ত স্থানেই অশোকের প্রাসাদের চিহ্ন বাহির করিতে হইবে। বিশেষতঃ স্মরণ করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান পাটনা সহর বাঁকিপুর অপেক্ষা উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত।

বৌদ্ধমন্দিরের আবিষ্ক্রিয়া।

কুমড়ার একটি প্রসিদ্ধ স্থান; এবং বোধ হয়, শুঙ্গ এবং গুপ্ত শাসনকাল হইতে এ স্থানে লোকের বাস। পাহাড়ি অথবা নিরীন্দ্রপুর গ্রামে অর্থাৎ যে স্থানকে কানিংহাম ফাহিয়ান-বর্ণিত নীলগ্রাম বলিয়া গিয়াছেন, তথায় বৌদ্ধ মন্দিরগুলির অন্বেষণ করিতে হইবে। ফাহিয়ান-বর্ণিত প্রকাণ্ড স্তূপ এবং বর্ত্তমান পঞ্চপাহাড়ি একই, ইহার নিকটে উত্তরে দুইটি দীর্ঘ এবং উচ্চ স্তূপ আছে। এগুলিকে ফাহিয়ান-বর্ণিত হীনযান এবং মহাযান মঠ এবং হুয়েন সাং-বর্ণিত উপগুপ্ত-আশ্রম বলা যাইতে পারে। ইহার কিছু উত্তরে আবার বিহার। এই স্থানে বুদ্ধের পদচিহ্ন পাওয়া যায়। অশোকারাম মঠ বোধ হয় সাদিকপুর সংগ্রাম নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

কুমড়ারে ডাক্তার স্পুনারের খনন।

ডাক্তার স্পুনার উত্তর-দক্ষিণবিস্তারী পরিখা খনন করিয়াছেন। উহা ১৮ হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর। তিনি এখন ইহা আরও বিস্তৃত করিতেছেন এবং ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতেছেন।

১০ হইতে ১৪ ফিট নিম্নে প্রায় ৫০টি শিলাস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। শিলাস্তম্ভের অংশগুলি ১৪ ফিট দূরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকারের শিলাখণ্ডগুলি রাশীকৃত ভাবে ছিল। সেগুলি দেখিলে কোন মানব কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই খণ্ডগুলির উপরিভাগে ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই খণ্ডগুলির উপরিভাগ মসৃণ।

একখানি শিলাখণ্ডে বৌদ্ধ ত্রিরত্নমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই প্রকার আর একখানি খণ্ডে অনেকগুলি বাক্যাংশ দেখা যায়, উহাদের মধ্যে দুইটি অক্ষর একেবারে নষ্ট হয় নাই। একটি ডা; অপরটি ক্রা; ইহার ঠিক উপরে আর একটি পংক্তি আছে। ইহার শেষ অংশটি এখনও সুস্পষ্ট। তিনটি মৃৎমোহরও বাহির হইয়াছে। প্রথম মোহরে একটি নাম পাওয়া যায়। মোহরের ঠিক মধ্যস্থলে শঙ্খের এবং চারি কোণে স্বস্তিক এবং ত্রিশূলের চিহ্ন পাওয়া যায়। অক্ষরগুলি শুঙ্গ রাজগণের সময়ের। দ্বিতীয় মোহরটিও বোধ হয় ঐ সময়ের। তৃতীয়টিতে লিখিত আছে—শবরস্য। ইহার অক্ষরগুলি গুপ্তবংশীয়-দিগের সময়ের।

এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি মুদ্রা বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটিকে ডাক্তার স্পুনার গুপ্ত রাজবংশীয়গণের সময়ে বলিয়াছেন। একটি পরিখায় ১৮ ফিট নিম্নে ৫।৬ খানি কড়ি-কাঠ বাহির হইয়াছে। পুনর্ব্বার খনন হইলে ঐ কড়িগুলির প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে।

আমরা অশোকদ্বারা উৎসর্গীকৃত কতকগুলি স্তম্ভ এই স্থানে পাইবার আশা করিতেছি। ডাক্তার স্পুনার বলেন, তিনি আগামী ১০ বৎসরে পাটনার অনেকগুলি স্থান খনন করিতে

চাহেন। মিষ্টার রতন টাটা এইরূপ খনন কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্টকে ২০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছেন। তিনি প্রথমে পাটনায় খনন করিতে বলেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলির প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া আবশ্যক—

১। সাদিকপুর সংগ্রাম। বর্ত্তমান সাদিকপুর মিউনিসিপাল গৃহের দক্ষিণে।

২। লোহানিপুর। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও রাসেলের খননে এই স্থানে অনেকগুলি দ্রব্য পাওয়া যায়।

৩। হরারি মণ্ডি এবং নজর কাটরায় অনেক জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে।

৪। পাটনা সহরে সদর গলিতে 'কালুর্খার বাগে' অশোকস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানও খননযোগ্য।

৫। পঞ্চ পাহাড়ি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

ভূস্বর্গে কয়েকটি দিন।*

ভেবেছিলাম, বল্‌ব না সে কথা, ফলেছিল রূপের যে স্বপন!
ভেবেছিলাম, প্রাণের জিনিসটুকু, প্রাণের মাঝেই রাখ্‌ব চিরগোপন।
ভাব্‌তাম, সুখ থাক্‌বে স্মৃতি হ'য়ে, নিজের লাভ খতিয়ে দেখ্‌ব নিজে,
বল্‌তে গেলে কণ্ঠ হ'বে রোধ, চোখ্‌টা শুধু উঠ্‌বে ভিজে ভিজে!
দেখেছিলাম, ছবির মত দেশ, কবি-জন্ম করেছিলাম সফল,
এ জীবনে বহু ঝুটা ঘেঁটে, পেয়েছিলাম একটি মাণিক আসল।
ধরার মাঝে ভারত যেমন সেরা, ভারত মাঝে এ দেশটিও তাই,
কবি কিম্বা শিল্পীর কল্পনায়, এমন ছবি নাই রে—বুঝি নাই!
যুগে যুগে এই স্বরগে এসে, অনেক ভাবুক হ'য়ে গেছে কবি,
অনেক রসিক ভাব-প্রেরণা পেয়ে, শিল্পী হ'য়ে আক্‌ল অমর ছবি।
প্রকৃতি এই রূপরাশির লাগি'; কঠোর তপ করেছিল কা'র,
স্বর্গ যেন টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, ধরার গায়ে ছোট্ট ফটো তা'র।
ওপরের সেই প্রীতি-উপহার পুণ্য সম জ্বল্‌ছে ধরার ধূলে,
দেশ-বিদেশের কত সাধক এসে, ছবির ছবি নিয়ে যাচ্ছে তুলে।
নাম শুনে' যা'র পাগল করে প্রাণ, চোখের দেখা দেখ্‌তে হবে তায়,
দিলাম এক দিন নিজকে পথে ছেড়ে, কল্পনার সে রূপরাশির পায়।
মা, স্ত্রী, (সোণার অজয় নাই তখনো!) আর দু'টি স্নেহের পুতুল সাথে,
—স্বর্গে যদি প্রিয়জন না থাকে, তেমন্ স্বর্গ থাকুক আমার মাথে!

---

* কাশ্মীরের 'ভূস্বর্গ' আখ্যা অতিবাদ নহে।

এ দিকে ত খাড়া উঁচু পাহাড়, অন্য দিকে গভীরতম খাত্,
তা'রই মাঝে অফুরন্ত পথ ; চল্‌ছি, নাই কিছুই দৃকপাত।
হনুর বংশ পাথর দিচ্ছে ডালি, নীচের দিকে চল্‌ছে সাথে পাতাল,
কখন্ মৃত্যু সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় ; বলে, নেশা ভাঙ্গ্‌রে এবার, মাতাল!
কিসের লোভে ছুট্‌ছি আকুল হ'য়ে, নিজের কাছেই যায় না তাহা বলা!
এমন শীতেও শিশু দুটির আহা, বারে বারে শুকিয়ে উঠ্‌ছে গলা।
মেয়েটি ত পড়্‌ল একদিন ঢলে', বড়ই কাতর হ'য়ে পথের শ্রমে,
সে রাত্রিতে ওদের আহারটুকও, জুটল না আর ভাগ্যে কোন ক্রমে!
যতই তা'রা চাপ্‌তো, কিছু নয়,—যতই তা'রা সইতো হাসি মুখে,
ততই নিজকে ভাব্‌তাম অপরাধী, কেমন করে' উঠ্‌তো যেন বুকে!
মনে হ'ত, কেউ কি এমন আসে, প্রাণের ধন সব পথে দিতে ডালি?
হৃদয়ের খাত্ ভর্‌তে গিয়ে এবার, দীর্ণ বুক বা হয় রে শেষটা খালি!
তখন মনে হয়নি, কেউ যে আছে ; আগুলি' সে চল্‌ছে সাথে সাথে ;
আজ্‌কে বড়ই পড়্‌ছে যেন মনে, বিপদ্‌ভঞ্জন অনাথের সেই নাথে।
দ্বিধা বল্‌তো,—চা'স যা', তাকি পাবি, ভুল যে হঠাৎ ভাঙ্গ্‌বে ক্ষ্যাপা ওরে?
আকাশকুসুম তুল্‌তে কোথা যাবি, কোন্ আলেয়ার আলোর পাছ ধরে'।
আবার ভাব্‌তাম, দেখে উর্দ্ধ নীলে ঢেউ-খেলানো গিরির দীর্ঘমালা,
নীচে ধূ ধূ শ্যামল উপত্যকা,—কাছে বা সে শোভার চিত্রশালা!
দেখা দিল বিতস্তার ক্ষীণ রেখা, ক্রমে রেখা বেণীর মত দেখায়,
পাষাণের বুক চিরে সুনীল ধারা, কল্লোলিয়া কোথায় বয়ে যায়?
'বার্চ্চ' সারির মাঝে যেথা শোভে ধব্‌ধবে এক ধরার ছায়াপথ,
চলে নেচে ধূ ধূ ভূ-স্বরগে প্রবেশিল সেথায় মোদের রথ।
এলাম, এলাম, আর ত দেরি নাই! ধুক্ ধুক্ ধুক্ শুন্‌ছি বুকের কাছে,
পথ যে আর ফুরা'তে না চায়, স্বর্গের সিড়ি কতই যেন আছে!
হঠাৎ কোথায় যাত্রা হ'ল শেষ, চিন্‌তে সে ঠাঁই রইল না আর বাকী,
প্রথম দেখায় নিজকে দিলাম ডালি, জুড়িয়ে গেল প্রাণের লক্ষ আঁখি।
চারি দিকে নীল পাহাড়ের ঢেউ, কুমুদ-কহ্লার-ছাওয়া হ্রদের বেণী,
পারে তাহার শালীধানের ক্ষেত, বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট গাছের শ্রেণী।
নেমে আস্‌ছে পাহাড়ের বুক ভেঙ্গে, সোঁ সোঁ শব্দে স্বচ্ছ জলের প্রপাত,
পাহাড়ের ঠিক পাছেই থম্‌কে মেঘ, মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ছে সে উৎপাত!

ফলে' আছে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর, ডালিম-বাগে জোয়ার লেগেই আছে,
পিচের শাখায় নূতন কুঁড়ির শোভা, রাঙ্গা রাঙ্গা আপেল ঝোলে গাছে।
পেয়ারা পিয়ার পাশাপাশি পেকে, উড়াচ্ছে কি মিঠে একটি সৌরভ,
ন্যাশপাতি, সেও ঝাঁকে ঝাঁকে ফলে', ছড়াচ্ছে কি মেওয়া-বাগের গৌরব!
এলাচ-মুকুল আধ আধ ফোটা, মধুর গন্ধে কুঞ্জ আমোদ করে,
কিস্‌মিস্‌ গুলি পাতার আড়াল থেকে, বঙ্গবাসী পথিকের মন হরে।
সবুজ ঘাসে ছাওয়া অধিত্যকা. থাকে থাকে ঢেউ খেলিয়ে তা'র,
'ডেলিয়া' ও 'ভায়লেটের' সারি ফাঁকে ফাঁকে 'ক্রোটন' ঝাড়ের বাহার।
ফুল-কুলের রাজা 'ম্যাগ্‌নোলিয়া' ফুটে আছে খোস্‌বো খুলে বাগে,
ফুলের শোভা, না, সেই গাছের শোভা, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখি আগে,
দু'দিক দিয়ে লতা-গুল্মের বেড়া, চলে' গেছে মাঝে সরু বীথি,
শ্যামলার শ্যাম যুগল বেণীর মাঝে, শোভা পাচ্ছে শুভ্র একটি সিঁথি।
দুর্ল্লভ সুখের মত কচিৎ কোথা, চোখে পড়ে পল্লী-পথে যেতে,
পাকা সোণার কেশর-শোভা বুকে, জাফ্‌রণকলি ফুট্‌ছে ক্ষেতে ক্ষেতে!
'লাদাক্‌' হ'তে চামর-পুচ্ছ ঘোড়ায় কস্তুরীভার আসে যেমন নেমে,
চিত্রল হ'তে দুধের মত ধারা তেমনি নেমে গেছে হেথায় থেমে।
এখানে সেই হিমালয়ের পালা চামর-পুচ্ছ চমরী গাই বেড়ায়,
সেই তিব্বতী অজ রাজের কুল উঁচু শৃঙ্গ লাফে লাফে ডেঙ্গায়।
বিখ্যাত সেই 'চেনার' তরুর কোটর, কুটীর বলে' হচ্ছে যেন ভ্রম,
প্রকৃতির সে ধর্ম্মশালায় এসে, কত শ্রান্ত পান্থ হরে শ্রম।
'চেনার' পাতার মাঝে বিদ্যমান মহাশিল্পীর শ্রেষ্ঠ কারিকরী,
আমরা ওস্তাদ্‌, ছবির ছবি গড়ে', তা'রি বড়াই বাইরে জাহির করি!
গোলাপকুঞ্জে ঢেউ খেলিয়ে যায়, ফুল-জনমের যেন রাঙ্গা হাসি,
পাহাড়ের কোল থেকে নামে হ্রদে, সাদা মেঘ, না, কলহংসরাশি?
পরীর মত নারীর মুখ-ছবি, আপেলের ন্যায় লাল টুক্‌টুকে গাল,
জাফ্‌রাণ তুল্‌তে যখন ক্ষেতে আসে, লালের সাথে মিশিয়ে যায় লাল।
কাঠের মত হামাল দিত্তায় ফেলে, ধান ভানে, আর গুন্‌ গুনিয়ে গায়,
বুকের কাছে 'কাংড়ী' নিয়ে ঘোরে, কাষের সাথে মিঠে আগুণ পোহায়।
ফুলের মতন তাজা জীবনগুলি বিকাশ পাচ্ছে মুক্ত আলোক পানে,
নাই ত তা'দের পর্দ্দার ঘেরা খাঁচা, হাওয়ার মত স্ফূর্ত্তি সতেজ প্রাণে।

কাশ্মিরিণীর কালো আঁখির মত বিতস্তার জল নেবার ছলে আসি',
কাশ্মীর-কুঞ্জের শ্রেষ্ঠ কুসুম যত, সাফ্ করে' যায় কৃষ্ণ কেশের রাশি।
স্বাস্থ্যদীপ্ত লাবণ্যে ঝল্‌মল্, রক্ত যেন ফেটে পড়ে গায়,
যৌবন যেন করে কোলাহল অঙ্গে অঙ্গে অটল মহিমায়!
লাল টুক্‌টুকে শিশুরা গাছ বেয়ে, আখ্‌রোট্ ভেঙ্গে খাচ্ছে শিস্ দিয়ে,
হৈ হৈ করে' জনার ক্ষেতে পড়ে' কট্‌কটিয়ে ভুট্টা চিবায় গিয়ে।
কুঁদে কাটা মর্ম্মরমূর্ত্তি যেন, কাশ্মিরী দ্বিজ, রং এ ফোটে গোলাপ,
জাফ্‌রাণের লাল তিলক জ্বলে ভালে, আর্য্যরূপের নিখুঁত ফটোগ্রাফ্!
কোথা এতই রকম শিল্পকলা, এমন সূক্ষ্ম, এমন মনোহর,
গড়্‌ছে বুঝি প্রকৃতি নিজ হাতে, কারুকাজের চারু কারিকর।
পশ্‌মী শালে 'চেনার' পাতার ছবি, আখ্‌রোট্ কাঠের চেয়ার টেবিল গায়
'ড্র্যাগন্' গুলি ক্ষোদা দেখ্‌লে, আজও মনটা যেন খারাপ হ'য়ে যায়!
বিতস্তার ধীর স্রোতে মোদের তরী কভু চলে, কভু ঘাটে লাগে,
শোভার মেলায় সুখের বিচরণ কোন্‌টি রেখে, কোনটি ধরি আগে?
এলাম যে সেই মানস-সরোবরে, কোথায় গেল কবিতার সেই কাল?
ফিরিয়ে দাও সে সাধের স্বর্ণ-যুগ, যাও সভ্যতা, নিয়ে তোমার মাকাল।
এই গন্ধর্ব্ব-সরোবর? কই সেই কলহাস্য জলকেলির সনে,
জীবন-যুদ্ধে হেরে রাজ্যপাট বেণু-বীণা কখন্ গেল বনে?
আবার নৌকা চল্‌ল রে কোন্ পথে, কোথায় এলাম? একি মায়া-স্থান?
একটি বিস্ময় না যেতেই যে দেখি, আর এক বিস্ময় আকুল করে প্রাণ!
খট্‌খটে দিন রৌদ্রে ঝল্‌মল্, রং বেরংএর বরফের তাজ শিরে!
'স্বর্ণ মার্গ' উঠ্‌ল অভ্র হ'তে, শিলার অঙ্গে ইন্দ্রধনু কি রে?
'অমরনাথ' অপূর্ব্ব ঠাঁই, সেথা তুষায় নাকি শিবের মূর্ত্তি গড়ে?
এ জীবনে হ'বে কি আর দেখা? কখন যেন যবনিকা পড়ে!
উঠ্‌লাম গিয়ে উচু পাহাড় ভেঙ্গে বিশ্বজয়ী শঙ্করের সেই মঠে,
ধর্ম্ম যুগের দীপ্ত জয়ধ্বজা দেখ্‌লাম সে দিন আঁকা পাষাণপটে।
'হরিপর্ব্বত' ওই যে।—পাণ্ডবের এই পথেই ত যাত্রা সে অসীমে,
এই তীর্থেই পাঞ্চালীর শেষ গতি পথের ক্লেশ আর দুর্ব্বিসহ হিমে।
অনেক প্রলয় গেছে উপর দিয়ে, অতীত যেন পেতে পাষাণ বুক
রক্ষা করে' আস্‌ছে প্রাণপণে মহাযাত্রার চরণ চিহ্নটুক্।

কুরু-পাণ্ডব স্বপ্ন সম আজ ; রাজা, রাজ্য কারু রক্ষা নাই !
কোথা দিয়ে উঠ্‌ল কবে জলে' ভারত-নভে মোগল বাদসাই।
স্বর্গ ভেবে দীন-দুনিয়ার মালেক, গড়্‌ল হেথায় সাধের গ্রীষ্মাবাস,
হয়ত মুগ্ধ পেল এ দেশটিতে নূরজাহানের মুখপদ্মের আভাস,
সিরাজীর সেই লালে লাল চোখে ক্ষেতে জাফ্‌রাণ দেখ্‌ল সৌখিন যখন,
ভাব্‌ল, ওর ঐ একটি কেশরতরে, দিতে পারি ভারত-সিংহাসন !
রংমহলে কতই কারিকরি ফলিয়েছিল স্থপতি বিদ্যার,
শিশ্‌মহলে, গুলাব ফোয়ারায় খুল্‌ত নিত্য রূপরাশির বাহার !
'নিসাৎ বাগ' পরিস্থানের মত, গড়িয়েছিল পরাণ ঢেলে হায়,
তরল-সুখের উৎস ছুট্‌ত সেথা, সকাল, সাঁঝে হাজার ফোয়ারায়।
কালো কালো পাতরের থাম দিয়ে মর্ম্মর-বেদী গড়্‌ল কি শোভন,
প্রিয়ার সাথে দ্রাক্ষাসুধা পিয়ে বসে' বসে' দেখ্‌ত রঙ্গিন স্বপন !
মোগল-পাঠান কোথায় গেল মুছে' মহাকালের সতরঞ্চ খেলায়,
কবে হ'ল বেচা-কেনার শেষ কল্লোলিত ঐশ্বর্য্যের সেই মেলায় ?
'পরীভবন' দাঁড়িয়ে সুধু আজ মোগল-বিভব করায় ধু ধু স্মরণ,
'সলিমার-বাগে' হাজার ফোয়ারায় উঠে বৃথা স্মৃতির নিবেদন।
কখন ভেঙ্গে গেল রূপের হাট, শূন্য কক্ষ স্বপ্নঘেরা বুঝি,
পায় আজও কিসের ইন্দ্রজালে মৃত-স্তূপে কাঁদের বেড়ায় খুজি !
রং মহলের পাষাণ প্রাচীর ভেদি, উঠ্‌ছে করুণ কাঁদের সে বিলাপ ?
জড়িয়ে আছে প্রতি অণুটিতে রূপের যেন বিদায় অভিশাপ !
আজ ত ঝুটা চাঁদির মুকুট পরে' উৎসকুলের রাজা চস্‌মাশাহী,
বক্ষ চিরে তোলে স্ফটীক-ধারা, রটায় বৃথা সাধের বাদশাহী !
পান করেছি 'চস্‌মাশাহীর' ধারা, পাইনি কোথাও জলের এমন স্বাদ,
রোগের বুঝি সঞ্জীবনী-সুধা, স্নেহের যেন তরল আশীর্ব্বাদ !
গন্ধর্ব্বলোক হ'তে ভিড়ল তরী, দেখ্‌লাম সে এক পটে আঁকা তীর,
তা'রই একটি বৃহৎ প্রান্ত জুড়ে' পড়ে গেছে মহারাজের শিবির।
কাশ্মীরাধিপ কই ?—একি দেখি হিন্দুরাজার ধ্বংশ-অবশেষ !
হরিষ-বিষাদ, সম্ভ্রম-বিস্ময় প্রাণে, ভেটিলাম সেই স্বাধীন দেশের নরেশ।
শিরে ধবল উষ্ণীষ, শোভে গলে শুভ্র উত্তরীয়, তিলক ভালে,
দেখ লাম যেন সে কালের এক রাজা, একাল যেন মিশেছে সে কালে।

ইনিই রাজা? এতই সাদা-সিধে, এমন মধুর, এমন আমায়িক,
ভারতের সেই পুরাণ ছাচে ঢালা, মহামনা রাজার মতই ঠিক!
মনে আঁকা সেই সহাস্যমুখ, আপ্যায়ন আর বিনয় আদর যত,
তাঁহার রাজ্যে রূপ-সাগরে স্নান, মর্ম্মে গাঁথা মধুর গানের মত।
দু'টি মাসের, সুধুই দু'টি মাসের, সুখের ক্ষুদ্র শারদ প্রবাস যাপন,
হারুণ-অল-রসীদের যুগে যেন, দেখেছিলাম বোগ্‌দাদি এক স্বপন!
ভিড়্‌ছে এম্‌নি ঘাটে ঘাটে তরী, বরফ পড়া সুরু কেবল তখন,
নীল পাহাড়ের উচু চূড়ায় চূড়ায় ধবল শোভার প্রথম সম্ভাষণ।
তুষার-কিরীট গিরির দু'টি বেড়া, মাঝে গেছে বিতস্তাটি বেঁকে,
তারই উপর ভাস্‌ছি তরী ল'য়ে জাফ্‌রাণের ঘ্রাণ আসে থেকে থেকে।
'ডল'—হ্রদে শিকারা-ডিঙ্গায় বাচ্‌ লাগিয়ে যেতাম দিনের মত,
পদ্ম-দলে কলহংস-কেলি, তীরে ফলফুল, ঘাসের শোভা কত!
তালে তালে পড়্‌ত বৈঠাগুলি, নায়ে নায়ে উঠ্‌ত সারি গান,
জীবনে কি দু'বার আসে কা'রও, সুখের স্রোতে, এমন সাধের ভাসান?
এত বরণ, এত গড়ন ফুলের, সকাল, সন্ধ্যায় বিকাশের কি ধুম!
চপল বায়ে উড়িয়ে জাতি-কুল, দোল খেল্‌ত কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম!
উচ্চ শিলাবেদীর উপর বসে', শুন্‌তাম একলা আবেশে থর্ থর্,
মিশ্‌ছে বাঁশের মর্ম্মর মূর্চ্ছনায় ঝরণার গান—অশ্রু ঝর্ ঝর্?
'চেনার'-শ্রেণী আমার মাথায় তখন থাকৃত তা'দের পাতার ছাতা ধরি';
যেন আমার ধ্যানের দ্বারে খাড়া, তা'রা ক'টি সজাগ প্রহরী!
পূবে বেগ্‌নী পাহাড়ের বুক চিরে, উঠ্‌ত ভোরে কাঁচা সোণার রবি,
আবার সাঁঝে গিরিবর্ত্ম বেয়ে পড়্‌ত ঢলে' পশ্চিমে সে ছবি।
সে দিন মনে আছে, পৌর্ণমাসী, ছাদে গিয়ে বস্‌লাম চুপটী করে',
পূব্‌, পশ্চিম, দুই আকাশের গোড়ায় ধীরে ধীরে আগুণ উঠ্‌ল ধরে'!
উদয়, অস্ত? না, দু'টি কবিতা? সুখ? না, এ সুখের মত ব্যথা?
বিশ্বারতির একি যুগল প্রদীপ? আত্মার এ যে অমর অভিজ্ঞতা!
সে দিন জ্যোছ্‌না নাম্‌ছে ঢলে' গলে', রজত শৃঙ্গের থাকে থাকে থেমে,
তুষারধারায় নেয়ে শীতল হয়ে' পাহাড় বেয়ে ধেয়ে আস্‌ছে নেমে!
প্রাণের সিন্ধু উঠ্‌ল উথলিয়া, বক্ষ-প্রাচীর ভেঙ্গে বুঝি যায়!
তা'র পরে?—সব চুপ!—এখান থেকে স্বর্গ-স্মৃতির কাছে চির-বিদায়!
কখন্ শুন্‌লাম কর্ম্মভূমির ডাক, শোভার শোভা ভঙ্গ জন্মের মতন,
কিছুই এখন পড়ে না ত মনে, স্বর্গ হ'তে কবে হ'ল পতন!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১৪)

১২ই চৈত্র, ১৩১৯।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"সম্প্রতি একটি লেখকের মুখে শুনিলাম যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমবাবুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ ধরণের রচনা কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল; এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকার মহাশয় ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তিনি কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন। বোধ হয়, সংবাদটি এক মুখ হইতে অন্য মুখে কিঞ্চিৎ অন্যথাভূত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, উহা রামকমলের। ঐ গ্রন্থ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। এক একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"'বিচারক' বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম। তুমি হয় ত শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া-টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবি-

তাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাতে' আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

"কিছু দিন পরে বিহারীলাল ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ ৭২ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম;—সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসীভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়ানের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহু বিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়রা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্তপর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। একটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছিলাম—তাহার নাম 'উজ্জ্বল'। চিঠিপত্রের প্রণালীতে লেখা। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ আমি ইহা মুদ্রিত হইতে দিই নাই। এমন কি, সমস্ত টাইপযোজনা হইয়াছিল; আমি নিজে বিহারীলালের অজ্ঞাতে সেই টাইপযোজনা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসি। ঐ রচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিহারীলাল উহা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যখন শুনিলেন যে, আমি গল্পটি চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তখন তিনি আমাকে কেবল মারিতে বাকী রাখিয়াছিলেন।

"ইহার পর 'ভারতী' পত্রিকায় আমি কয়েকটি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বায়রণের English Bards and Scotch Reviewers এর অনুকরণে যে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ তুমি পূর্ব্বেই একটি প্রসঙ্গে কতকটা লিপিবদ্ধ করিয়াছ। এই গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'বিচিত্রবীর্য্য' নামক একখানি গ্রন্থ ও একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলাম। 'বিচিত্রবীর্য্য' হস্তলিখিত অবস্থায় পাঠ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল বলিয়াছিলেন,—"It would do credit to a veteran writer",—বোধ হয়, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের অত্যুক্তি। পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ

সাত বৎসর ছাপান হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।

"কখনও গ্রন্থকার বা লেখক হইবার সাধ আমার বড় একটা তীব্র ছিল না। এক্ষণে কেহ কেহ আমার লেখার বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে আমি এই বিবরণটি সঙ্কলন করিলাম। লেখাগুলি একত্র মুদ্রিত করিলে বাঙ্গালা ভাষার, কি আমার নিজের কোনও উপকার হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে আমি এত প্রাচীন ও অপৰ্ব্ব হইয়াছি যে, নিজে তদ্বিষয়ে কোনও সাহায্য করিতে পারি বোধ হয় না; কিন্তু যদি সংগ্রহ হয় এবং ছাপাইবার আয়োজন হয়, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাময়িক সাহিত্যে লিখিবার অবসর বড় একটা ছিল না। বোধ হয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'সৰ্ব্বসুখকরী' পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে এবং বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতি কোনও পত্রিকায় কখনও লেখেন নাই।

"তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সৰ্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশীতে পাণিনি ব্যাকরণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণই তাঁহার specialty (বৈশিষ্ট) ছিল, এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্দেশে দুর্গাদাস, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি মুগ্ধবোধ-ব্যবসায়ীদিগকে তিনি বড়ই অবজ্ঞা করিতেন; কিন্তু মুগ্ধবোধ ও বোপদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মতে পাণিনি না জানিলে সংস্কৃত শিক্ষা হইতেই পারে না। ব্যাকরণসম্বন্ধে 'শব্দার্থরত্ন' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। বহুকাল পূৰ্ব্বে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল; পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে কি না এবং অদ্যাপি ঐ গ্রন্থের অনুশীলন হয় কি না, বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, উহাতে বাক্যপদীয় অথবা হরিকারিকা নামক অত্যুৎকৃষ্ট ভর্তৃহরি-প্রণীত গ্রন্থের সারাংশসকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাক্যপদীয় একখানি সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক। ইহাতে যে কি প্রকার কল্পনাচাতুর্য্য (speculative ingenuity)

প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থখানি আমি যে ভালরূপ জানি, এ অভিমান আমার নাই; অতি যৎসামান্য আভাস পাইয়াছি মাত্র। তাহাতেই আমার উহার প্রতি এতটা শ্রদ্ধার ও ভক্তির উদয় হইয়াছে। তারানাথ বোধ হয়, ঐ গ্রন্থখানি ভালরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় যে গোল্‌ড্‌ষ্টুকার পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিও বাক্যপদীয় ভালরূপ দেখেন নাই। বাক্যপদীয় পদ্যে লিখিত; উহার অনেকগুলি কারিকা এখনও আমার মুখস্থ আছে। একটিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মীমাংসা আছে;—যদি কোনও একটা জিনিষ হইতে আর পাঁচটা জিনিষ প্রস্তুত হয়, তবে সেই বিষয়ের সংস্কৃত বাক্য রচনা করিতে গেলে ক্রিয়াতে কোন্ বচন দিতে হইবে,—এক বচন, না বহুবচন? যেমন মনে কর, একটা বৃক্ষ হইতে পাঁচখানা নৌকা প্রস্তুত হইতেছে; এখন এখানে কিরূপ বাক্য রচনা করিবে? "একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি" বলিবে না "ভবন্তি" বলিবে? আমার যেন মনে আছে "ভবন্তি"। কিন্তু যে হরিকারিকাটি মুখস্থ আছে, সেটি তদ্বিপরীত। কারিকাটি এই—

"প্রকৃতের্বিকৃতের্বাপি যত্রোক্তত্বং দ্বয়োরপি।
বাচকঃ প্রকৃতেঃ সংখ্যাং গৃহ্লাতি বিকৃতের্ন তু।"

অর্থাৎ, যে জিনিষটা হইতে তৈয়ারি হয়, আর যেটা তৈয়ারি হয়, দুইটাই যে স্থলে উল্লিখিত হইতেছে, সে স্থলে ক্রিয়াতে প্রথমটার যে বচন, সেই বচনই দিতে হইবে, দ্বিতীয়টার বচন দিতে হইবে না। তদনুসারে—

একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি

এইরূপ বলিতে হয়। এ বিষয়ের মীমাংসা আমি ত এখন কিছুই দিতে পারি না; তর্কবাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিতেন। আর একটা প্রশ্ন আছে। পাণিনি অপাদান কারক define করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"ধ্রুবমপায়ে অপাদানং"

অর্থাৎ দুইটা বস্তু পরস্পর পৃথক্ হইবার স্থলে যেটা স্থির থাকে, সেইটা অপাদান। যেমন বৃক্ষাৎ পত্রং পততি; অর্থাৎ পাতাটাই সরিয়া গেল, বৃক্ষ স্থিরই আছে; সুতরাং বৃক্ষই অপাদান। কিন্তু পাণিনিকৃত এই definition এর উপর ফাঁকি উঠিল, ধাবতো অশ্বাৎ পততি, ঘোড়া দৌড়িতেছে, তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে সওয়ার পড়িয়া গেল; এ স্থলে অশ্ব ত স্থির

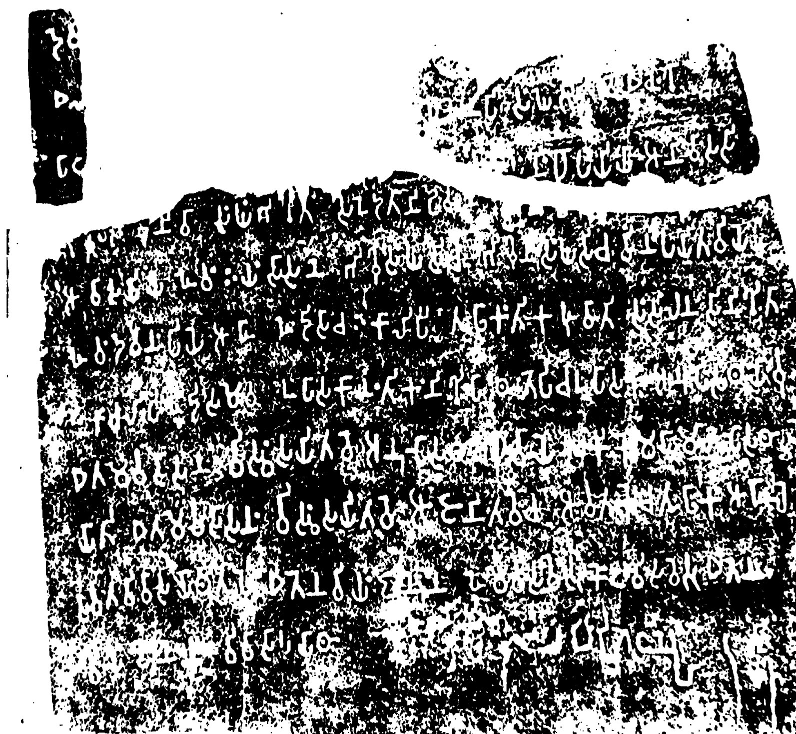
নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সওয়ারের পক্ষে অশ্ব কি অপাদান হইবে না? প্লেটো কোনও এক সময়ে মানুষকে define করিয়াছিলেন a biped without wings ডানাবিহীন দ্বিপদ; তাহাতে কোনও এই ব্যক্তি একটা মোরগের দুই ডানা কাটিয়া হাটের মাঝে টাঙ্গাইয়া দিয়া তলায় লিখিয়া রাখিল,—এই দেখ, প্লেটোর মানুষ! পাণিনির অপাদানবিষয়েও পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তির (difficulty) কি প্রকার মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় একপ্রকার সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না।

"এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হরিকারিকাতে কি প্রকার বিষয়ের আন্দোলন করা হইয়াছে। আর একটি কারিকা শুন; বোধ হয়, এটিও হরিকারিকা হইবে। কারিকাটি এই—

যান্যুজ্জার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোস্পদে॥

অর্থাৎ, মাহেশ নামে এক ব্যাকরণ আছে, সমুদ্রতুল্য; পাণিনি তাহার নিকট গোস্পদতুল্য; ব্যাসের প্রণীত পুরাণাদিতে যে সকল পদ আমরা আর্ষ বলিয়া থাকি, সেগুলি মাহেশ-ব্যাকরণ হইতে পাওয়া যায়, অতিক্ষুদ্র পাণিনিতে কোথায় পাইবে? মাহেশ ব্যাকরণ অদ্যাপি আছে, কি লুপ্ত হইয়াছে, জানি না; কিন্তু যদি থাকে, সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের অনুসন্ধান করা উচিত। তর্কবাচস্পতি মহাশয় জীবিত থাকিলে ইহার কোনও না কোনও সংবাদ পাওয়া যাইত।

"আমি তাঁহার নিকট সংস্কৃত কলেজে ভট্টি ও অভিধান পড়িয়াছি। তাঁহার শ্রেণী প্রথম শ্রেণী বলিয়া অভিহিত ছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোবিন্দ গোস্বামী ও প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করি; গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে এক বৎসর থাকিয়া ধাতুপ্রকরণ শেষ করি; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের অবশিষ্টাংশ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে পূজ্যপাদ তারানাথের ছাত্র হই। এই সময়ে মতিলাল নামে আমার এক সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি মুগ্ধবোধের কূট কথা লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিতেন। মুগ্ধবোধের বিষয়ে একটা প্রবাদ আছে যে, বোপদেব সূত্রগুলি যতদূর পারেন, অল্পাক্ষর করিয়া



সারনাথের অশোকানুশাসন।

Photo by R. Majumder.

Mohila Press, Calcutta.

গিয়াছেন; কাহারও সাধ্য নাই, কোনও একটি সূত্রের একটিও অক্ষর কমাইয়া গঠন করিতে পারেন। যদি কেহ ভাবেন, তিনি অক্ষর কমাইতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, কোথাও না কোথাও ঠেকিয়া যাইবেন। মতিলাল প্রত্যহ এক একটি ঐ প্রকারের ফাঁকি আনিয়া দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কখনও এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন চিন্তা করিয়া সমাধা করিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহাকে বিস্তর মাথা ঘামাইতে হইত। কিন্তু তিনি বোপদেবকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার মানরক্ষার জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

"সংস্কৃত syntax এর (শব্দযোজনারীতির) উপর 'বাক্যমঞ্জরী' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-বিদ্যার্থীদিগের উহা পাঠ করা উচিত।

"শুধু ব্যাকরণ নহে, তারানাথ স্মৃতি ও জ্যোতিষও ভালরূপ জানিতেন। বাচস্পত্য অভিধানে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত তিনি দুইখানি প্রয়োগগ্রন্থ (rituals) লিখিয়া গিয়াছেন,—'তুলাদানপদ্ধতি' ও 'গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি'। এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানির লোপ হওয়া উচিত নহে; ঐ ঐ বিষয়ের যাবৎ বিবরণ ঐ দুই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

"বাচস্পত্য অভিধান প্রথমে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও আমি, এই তিন জনে প্রস্তুত করিব বলিয়া কথা হয়, সে ১৮৬৫-৬৬ সালে; কিন্তু কার্য্যকালে ন্যায়রত্ন ও আমি সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয় সঙ্কল্পিত কার্য্য ত্যাগ করিবার লোক নহেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা সাহায্য পাইলেন। ইন্স্পেক্টর উড্রো 'সাহেব' আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, সে কথা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি; তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অর্থসাহায্য করেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে আমি বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলাম। মহামতি উড্রো 'সাহেব' তারানাথের অদ্বিতীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া উক্ত সাহায্য ঘটাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় একাকী ঐ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; দশ বৎসরের অধিককাল পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। আমার বিশ্বাস, এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারাই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করিলেন। জয়নারায়ণ

তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের তাঁহার ন্যায় কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

"আমাদের দেশের লোকের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের, যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, অর্থাৎ Versatility'র অভাব, তারানাথের তাহা ছিল না। এত শাস্ত্রচর্চ্চার মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করিতেন। কখনও বা শালের কারবার, কখনও বা নিজ গ্রাম অম্বিকাকালনায় সুরকি প্রস্তুত করিবার কারবারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে একটি হাসির কথা মনে পড়ে। এক দিন এক সভায় বিচার করিতে করিতে তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রৌঢ়িপূর্ব্বক (with haughty assurance) বলিয়া উঠিলেন—'এ কথা যদি না হয় ত আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।' প্রতিদ্বন্দ্বী তৎক্ষণাৎ পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কোন্ ব্যবসা মশাই? শালের ব্যবসা, না শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবসা?'

"পরিশেষে তিনি অর্থোপার্জ্জনের সংকল্প কতকটা সিদ্ধ করিয়াছিলেন; বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ নিজকৃত টীকা সহিত মুদ্রিত করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জীবানন্দও সেই কার্য্য চালাইয়া যে বিশেষরূপ সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহুবিবাহের অবৈধতার বিষয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন, সে সময়ে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রথমে তাঁহার মতের অনুমোদন করিতে উদ্যত ছিলেন। বহুবিবাহ যে অবৈধ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর একটি সুপরিচিত মনুবচনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা করেন। সে বচনটি এই—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং, প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রানাং সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রাহ্মণঃ স্মৃতাঃ॥"

পূর্ব্বে এই শ্লোকের মোটামুটি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষে প্রথমে স্বজাতীয় কন্যা বিবাহ করা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য; পরে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা হইলে স্বজাতীয় বা ভিন্ন ভিন্নজাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি

সূক্ষ্মবিবেচনা প্রয়োগ পূর্ব্বক মনুবচনদ্বয়ের এইরূপ অর্থ স্থির করিলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য স্বজাতীয় পত্নীর একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্বজাতীয় পত্নী হইতেই পারে না, ভিন্নজাতীয় পত্নী চাহি। কিন্তু মনু প্রতিলোম-বিবাহের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন; অতএব তিনি অনুলোমরীতি-তেই ভিন্নজাতীয় পত্নীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহু বিবাহসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি এই ছিল যে, যখন মনুর মতে কাম্যবিবাহ ভিন্নজাতীয় কন্যা ব্যতীত হইতেই পারে না, এবং যখন কলিতে জাত্যন্তরবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, তখন কলিতে বহুবিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় হইতেছে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা বিলক্ষণ সূক্ষ্মদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষ প্রণিধানের সহিত বচন দুইটির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমারও অনেক সময়ে বোধ হয় যে, মনুর অভিপ্রায় বা ইহাই ছিল। তবে একটা গোল এই থাকে যে, শূদ্রের পক্ষে কি কাম্যবিবাহ ঘটিবে না? কারণ শূদ্রের চেয়ে ছোট জাত আর নাই; এবং মনুর মতে কাম্যবিবাহ আপন অপেক্ষা ছোট জাতির কন্যার সহিতই শাস্ত্রানুমোদিত। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি, তারানাথ তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমাদের ঢিপ্‌লে না হোলে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বার কর্‌তে পারে?' বিদ্যাসাগরের গ্যাঁটা গোঁটা খর্ব্বাকৃতি দেহ ছিল; এই জন্য তারানাথ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আদর করিয়া তাঁহাকে 'ঢিপ্‌লে' বলিয়া ডাকিতেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে এই আদরের ডাকনাম আমি অনেকবার শুনিয়াছি।

"বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব মুদ্রিত হইল। কিছুদিন পরে দেখিলাম তারানাথ উহার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক লিখিলেন। অগত্যা বিদ্যাসাগর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তারানাথের যে প্রকার সর্ব্বসংগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞান ছিল তাহাতে কোনও একটি সিদ্ধান্তে স্থায়িভাবে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসাধ্য ছিল। তিনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিসকল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। দুই প্রকারের যুক্তিই তাঁহার চক্ষুর উপরে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত। সকল দেশের শাস্ত্রেই প্রায় প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিদ্যমান থাকে। কেবল Positive Science অর্থাৎ জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে

যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা আর উল্টাইবার জো নাই। পৃথিবী ঘুরিতেছে; পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ বত্রিশ ফুট; ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে; এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে পাগলামি করা হয় মাত্র। নতুবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না; কলিতে ভিন্নজাতীয় বিবাহ হইতে পারে কি না; ক্ষত্রিয় জাতি অদ্যাপি আছে, কি লোপ পাইয়াছে, এ সকল বিষয়ে মতামত চিরকালই আছে ও থাকিবে। তারানাথ যদিও প্রথমে বহুবিবাহের অবৈধতার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার বোধ হয়, কোনও ব্যক্তির অনুরোধে তদ্বিরুদ্ধমত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে, যদিও তিনি বিধবা বিবাহে মত দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেশ জানিতেন যে, সে মতের বিপরীতে বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে।

"বিদ্যাসাগরের প্রবল যুক্তিতে কাহারও মত আর্দ্র হইল না। যাঁহারা য়ুরোপীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া একাধিক বিবাহবিদ্বেষী হইতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বহুবিবাহবিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহে কোনও জবরদস্তি নাই, কেবল অনুমতি দেওয়া মাত্র (Permissive—not coercive)। আইন বিধবাকে বলিতেছে—'ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর, না হয়, না কর; কিন্তু যদি কর, তোমার সন্তান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয়; এই জবরদস্তি করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভরসা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুতরাং এরূপ আইন বিষয়ে ইংরাজের আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টা বিফল হইল।

"কিন্তু একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল; কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহুবিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস,' 'রত্ন-পরীক্ষা,' 'কস্যচিত ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা

করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে; এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রের কথা বড় একটা বুঝেন না; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায় আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এ দেশে এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তাছড়ান হইয়াছে; যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম একক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর এ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; কারণ, তিনি বাঙ্গালা ভাষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ পড়ুক আর না পড়ুক, আনন্দ করুক আর না করুক, বাঙ্গালা লিখিতে তাঁহার নিজের এত আমোদ বোধ হইত যে, সেই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

"বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন; যে কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় হাসি-তামাসার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে সকল রসিকতার কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে বোধ হয়, বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ শক্তি এখন কাহারও আছে কি না, বলিতে পারি না। আমার কিছু কিছু সময়ে সময়ে মনে পড়ে। বীটন কলেজ বরাবরই কোনও না কোনও কমিটীর শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। এক সময়ে বিদ্যাসাগর সেক্রেটরি ছিলেন, তখন অনেক উচ্চপদস্থ 'সাহেব' কমিটীর মেম্বর ছিলেন। একটি ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক প্রধান শিক্ষায়িত্রী ছিলেন। কি কারণে জানি না, একজন স্কুলের পণ্ডিতের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ জন্মিয়াছিল; তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটীকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারি; তদন্ত করিবার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইল। তিনি বিশেষ

অনুসন্ধানের পর বুঝিলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষই নাই। পরে এই বিষয়ের বিচারের জন্য একদিন কমিটীর বৈঠক হইল। সেই বৈঠকে বিদ্যাসাগর সকলকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পণ্ডিতটি নিরপরাধ কিন্তু কমিটীর মেম্বর অধিকাংশ য়ুরোপীয়; প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফিরিঙ্গী; কমিটী ভাবিল, পণ্ডিতকে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে শিক্ষয়িত্রীর অপমান করা হয়; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'তবে না হয়, হু' এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে Suspend করা যাক্; কেমন, বিদ্যাসাগর, তুমি কি বল?" বিদ্যাসাগর গত্যন্তর না দেখিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her," আচ্ছা, তবে তাই কর, যদি তোমরা ভাব যে, কিছু বলিদান না করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না। ইংরাজরা আর যাহাই হোক, প্রকৃত রসিকতা (Wit) পাইলে গুণগ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যাসাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন। একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্ণমেণ্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ওহে,আজকে political world এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম। এই Gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর একবার তাঁহার কোনও এক বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন; বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর আসাতে তিনি বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ এই প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া বিদ্যাসাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, 'যাও, আর উস্‌খুস্ কোরচ কেন? বাড়ীর ভেতরেই যাও।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসর পাইলেই শ্বশুরবাড়ী যাইতেন; এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতেন। বিদ্যাসাগর এক দিন একত্রে দু'জনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ'।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

সাহিত্য-সম্মিলন।

সম্মিলন হইতেই সভ্যতার উদ্ভব। আদিম মানব যখন তাহার বিক্ষিপ্ত ও বন্য অবস্থা পরিহার করিয়া সংহত হইতে থাকে,—তখনই সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়। সেই সংহতি আরও একটু ঘনীভূত হইলে সভ্যতার অঙ্কুর জন্মে। ক্রমে সেই সংহতির প্রসার যতই অধিক হয়, সভ্যতারও ততই বিকাশ ঘটে। ব্যষ্টিভাবাপন্ন বন্যস্বভাব আদিম মানবের ভাব থাকিতে পারে,—কিন্তু সে ভাব এতই সঙ্কীর্ণ যে, সেই সঙ্কীর্ণতার বজ্রবন্ধনে ভাষা গজাইয়া উঠিতে পারে না। সংহত মানব-সমাজে সভ্যতা যেমন বিকাশের পথে প্রধাবিত হয়, তেমনই সাহিত্য সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শোকে, বিস্ময়ে, ভয়ে, কোপে মানবের মনে যখন ভাবরাশি উদ্বেল হইয়া অপেক্ষাকৃত পুষ্ট ভাষার প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হয়, তখনই সাহিত্যের অঙ্কুর দেখা যায়। সভ্যতাই সাহিত্যের প্রসূতি সত্য, কিন্তু সম্মিলনই সাহিত্যের মূল। সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত মানবসংঘের মধ্যে যখন ভাবের আদান প্রদান আরব্ধ হয়, ঠিক সেই সময়ে সাহিত্য অলক্ষ্যে পুষ্টি লাভ করিতে থাকে। ভাবের আদান-প্রদানের সৌকর্য্যার্থই লিপিকৌশলের সৃষ্টি। লিপিকৌশল আবিষ্কারের পর হইতেই সাহিত্য মানব-সভ্যতার একটি বিশিষ্ট ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং বুঝা গেল, সম্মিলন ও ভাবের আদান প্রদানের উপরই সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সভ্যজাতি-মাত্রই সংহত বা সমাজবদ্ধ। সমাজবদ্ধ মানবজাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান অপরিহার্য্য। সুতরাং সভ্যপদবীতে আরূঢ় জাতি মাত্রেরই সাহিত্য আছে।

সমাজে সংহত মানবদিগের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয় সত্য,—কিন্তু কেবল সেই আদান প্রদানে সাহিত্যের পুষ্টি ও পবিত্রতা সাধিত হইতে বিলম্ব ঘটে। সাহিত্য যখন মানব-সভ্যতার একটা বিশেষ ব্যাপার হইয়া উঠে, তখন কতকগুলি লোকই উহার আলোচনা করিয়া থাকে,—সকলে উহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। সভ্যতাপ্রসূত অন্যান্য ব্যাপার লইয়াও অনেককে ব্যস্ত থাকিতে হয়। যাহারা সাহিত্য লইয়াই জীবন যাপন করে এবং সাহিত্যের আলোচনায় তৃপ্তিলাভ করে, তাহারাই সাহিত্যিক নামে অভিহিত হয়। যেমন অঙ্কুর যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহা নানা

শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হইতে থাকে,—সাহিত্যও তেমনই যতই উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে,—ততই তাহা নানা শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হয়। তখন সাহিত্যের এক একটি শাখা এক এক সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদিগের আলোচ্য হইয়া উঠে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকগণ যদি ব্যষ্টিভাবে কার্য্য না করিয়া মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিসাধনার্থ ভাবের আদান প্রদান করেন, তাহা হইলে অতি দ্রুতই সাহিত্য উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কলিকাতার সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যসভা সেইরূপ চেষ্টার ফল। সাহিত্যের পুষ্টি ও পবিত্রতা-সাধনে ঐ উভয় সভাই অল্পাধিক সহায়তা করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কলিকাতার সভা সকল অঞ্চলের সাহিত্যিকদিগের মিলন-কেন্দ্র নহে। সেই জন্য সমস্ত বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগের সম্মিলন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সাহিত্যিক সমাজ সেই আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন; তাহার ফলে আজ কয়েক বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিতেছে। ইহা অবশ্য আশার কথা। কিন্তু এখনও কায ঠিক সুপরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ সম্মিলনের সময় অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। কারণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সন্দর্ভ পাঠ ও অধিকাংশ সন্দর্ভ পঠিত বলিয়া গ্রহণ করাই যদি কেবল সাহিত্য সম্মিলনের কায হয়, তাহা হইলে তাহাতে সে উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপ সুসিদ্ধ হইবে না। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে সাধিত হইতে পারে। আমার মতে অন্ততঃ তিন চারি দিন ধরিয়া ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা লইয়া রীতিমত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সভাপতি অভিভাষণে বাঙ্গালা-সাহিতের বিকাশধারা সাধারণ ভাবেই বলিবেন। যাঁহারা সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের স্বল্পাবসরকালে সাহিত্যচর্চ্চার অবসর করিয়া লইয়াছেন,—সেইরূপ পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণই সম্মিলনের সভাপতি হইবেন, এরূপ ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। সভাপতির অভিভাষণগুলি যাহাতে সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তক হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা করিতে হইলে অন্ততঃ ছয় মাস কাল পূর্ব্বে সভাপতি সাব্যস্ত করা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় না বলিয়াই অনেক গোলযোগের উদ্ভব হয়।

এবার চট্টলে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি-নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হইয়াছিল। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ই এবার সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। যৌবনে সরকার মহাশয় অকপটচিত্তে বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বাণীর ঐকান্তিক সেবক বাঙ্গালায় দুর্ল্লভ। তাঁহার রচনা যে কেবল 'বঙ্গদর্শনের' গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা নহে,—পরন্তু তাঁহার 'সাধারণী' এক সময় বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছিল। তাঁহার 'নবজীবন' মাসিক সাহিত্যে নূতন জীবন ঢালিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সঞ্চারিত প্রভাব এখনও বঙ্গ-সাহিত্যের শিরায় শিরায় অনুভূত হইতেছে। বাঙ্গালী যদি সে প্রভাব বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের সে কলঙ্ক সপ্তসিন্ধুর জলেও বিধৌত হইবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার মহাশয় সাহিত্য-সংসারে কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইবেন, এরূপ আশাও আমাদের নাই। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে যে বিশেষ উচ্চ ভাব পোষণ করিবে না,—এই আশঙ্কাই আমাদের মনে সতত উদিত হইতেছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যে কোনও স্থায়ী স্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইলেন না, ইহাই আমাদের মনোবেদনার প্রধান কারণ।

আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, সরকার মহাশয় চট্টলের অভিভাষণে স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন; এই অভিভাষণ বিস্তৃত করিয়া তিনি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন। উহাই বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি হইবে। বিলাতে এক একজন মনীষী আজীবন সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া শেষ-কালে এক একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়া যায়েন। সেই পুস্তকই সাহিত্য-জগতে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। অক্ষয় বাবু যদি সেইরূপ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের এই ক্ষোভ হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি যে অভিভাষণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশা নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাঁহার অভিভাষণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত লিখিত হইয়াছে। উহার ভাব-সকল বিক্ষিপ্ত, অসংযত ও অসঙ্গতভাবে গ্রথিত। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অসম্বদ্ধ ভাবে গ্রথিত করিয়া তিনি যে অভিভাষণ লিখিবেন, তাহা আমরা

স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেই জন্য ক্ষুব্ধহৃদয়ে আমি তাঁহার অভিভাষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি জানেন ;—

"যে যাহারে ভালবাসে,
সে তাহারে তত দোষে।"

ইহার ফলেও যদি তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যের রীতি ও বিকাশ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যায়েন, তাহা হইলে এই দীন লেখক আপনার সমালোচনা সার্থক মনে করিয়া ধন্য হইবে।

সরকার মহাশয় সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা ঠিক হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"রস-রচনার নাম সাহিত্য। সৌন্দর্য্যের নাড়াচাড়া করিলে রস বাহির হয়। 'ধার্ম্মিক লোক সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব' বলিলে স্বরূপ উক্তি হয়, সত্য কথা বলা হয়, কিন্তু 'ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার' সেই একই কথা সুন্দর করিয়া বলা হয়, তাহাতে রস জন্মায়। প্রথমটি কেবল মাত্র ভাষা, দ্বিতীয়টি সাহিত্যের টুকরা নমুনা।" ইহা পড়িয়া মনে হয়, যে সরল ও সহজ ভাবে স্বরূপ উক্তি সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। আমরা এ মত সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। স্বরূপ উক্তি—সত্য কথা বলা,—সাহিত্যের একটি প্রধান গুণ। সরল ভাষায় সত্য কথা বলিতে কয় জন পারে? কাব্যে স্বভাবোক্তি নামে একটি অলঙ্কার আছে। 'স্বভাবোক্তিরসঃ চারু যথাবদ্বস্তু বর্ণনম্'—যথাবৎ বস্তু বর্ণন করিতে পারিলে, স্বরূপ উক্তি করিলে, ঠিক সত্য কথা বলিলে, সেই রসের আবির্ভাব হয়। তবে কবিরা কাব্যে সুন্দর বস্তুরই স্বরূপ উক্তি করিতে ব্যস্ত। কিন্তু সাহিত্যে তাহা নহে। সাহিত্য ও কাব্য যে স্বতন্ত্র, তাহা উভয়দের মৌলিক অর্থের দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়। "সহিত" শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দ উৎপন্ন। সহ শব্দের উত্তর ইতচ প্রত্যয় করিয়া সহিত শব্দ উৎপন্ন। উহার অর্থ সমভিব্যাহৃত বা সংযুক্ত। সহিতের বা সংযুক্তের ভাবই সাহিত্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শব্দসকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে স্থানে মানুষের মনের ভাব ব্যক্ত করে, তাহাই সাহিত্য। এই হিসাবে সাহিত্য ও ভাষা প্রায় একার্থবোধক। তবে শব্দ-যোজনার কতকগুলি নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারে সংযুক্ত ভাব-প্রকাশক শব্দাবলীই সাহিত্য। "দাদা! তুমি অগ্রগামিনী হও" এরূপ উক্তি যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার মনের ভাব বুঝা যায়, সুতরাং

তাহার ঐ উক্তিকে ভাষা বলা যায়, কিন্তু তাহাকে কখনই সাহিত্যের টুকরা বলা যায় না। কারণ ঐ ক্ষেত্রে শব্দ-সংযোগের নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। ঐ ভাষাকে আমরা মূর্খের ভাষা বলিয়া নিন্দা করিতে পারি,— কিন্তু তাহাকে ভাষা বলিতেই হইবে। "যদ্যপ্যাঠার সিকার খড় কিন্‌লাম তথাপ্যাক্ চালাখান্ ছাওয়া হলো না," এই উক্তি ভাষা বটে, কিন্তু সাহিত্য নহে। কারণ উহাতে বাঙ্গালা ভাষার সন্ধির নিষেধ লঙ্ঘিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় ঐরূপ ক্ষেত্রে সন্ধি হয় না। আমরা সাধারণতঃ কথোপকথন করিবার সময় ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রভৃতির বিধি নিষেধ মানি না, কিন্তু লিখিবার সময় উহা মানি; সেই জন্য লিখিত ভাষাই সাহিত্য নামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্থলে সাহিত্য ও কাব্য একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সব স্থলে তাহার অর্থসংকোচ করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় সেই সঙ্কীর্ণ অর্থ গৃহীত হয় নাই। এ দেশে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগের পাঠগুলি, কথামালা ও চরিতাবলি প্রভৃতিও সাহিত্য। ভাবপ্রকাশার্থ সংযুক্ত শব্দাবলী রচনামাত্রই সাহিত্য। সরকার মহাশয়ও তাঁহার রচনায় সাহিত্য শব্দের ঐরূপ অর্থ একেবারেই পরিহার করিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনিও তাঁহার অভিভাষণে 'সুকুমার সাহিত্য' একাধিকবার লিখিয়াছেন। যাহা সরস তাহাই সুকুমার। রস না থাকিলে কিছুই কোমল বা মোলায়েম হয় না। যদি 'রস রচনাই সাহিত্য' হইত, তাহা হইলে তাহার স্কন্ধে সৌকুমার্য্যের বোঝা অনর্থক চাপিতে পারিত না। সুকুমার সাহিত্য বলিলে অসুকুমার সাহিত্যের অস্তিত্বও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয়। সুতরাং তাঁহার সাহিত্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ যে ভ্রান্ত, তাহা তিনিই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

সকল দেশের ভাষার একটা ধারা বা প্রণালী আছে। অবশ্য এখানে ভাষা বলিতে আমরা সাহিত্যের ভাষাই বুঝিব। সেই ধারা বা প্রণালী কি, সরকার মহাশয় আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ভাষা একটি জীবন্ত প্রবাহ। তাহার গতি আছে বেগ আছে।" আবার তাহার পরই তিনি লিখিয়াছেন,—"সামাজিক কোনও ব্যাপারই গড়া পেটা জিনিষ নহে। সকল ব্যাপাই ক্রমে ক্রমে গজাইয়া উঠে।" ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, সরকার মহাশয় ভাষা সম্বন্ধে বিবর্ত্তনবাদী। বিবর্ত্তনবাদ এখন মানবের

চিন্তারাজ্যের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। সুতরাং বর্ষীয়ান সাহিত্যসেবী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মনের উপর উহা যে বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তিনি পরে বলিয়াছেন, "আসল কথা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, আমাদের ভাষার ঠাট, কায়দা, ভঙ্গী, রীতি বহুদিন হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। পদ্য বহুদিন হইতে গদ্য অন্ততঃ ভারত-চন্দ্রের সময় হইতে। এই ঠাট একটা বাঁধি ঠাট। আমাদের সমাজের যদি কিছু বাঁধন থাকে, তাহা হইলে ভাষারও আছে। * * * * যাঁহারা মনে করেন, সমাজের ঠাট বজায় রাখিয়া সমাজের উন্নতি আবশ্যক, তাঁহাদিগকে আমরা বলি ভাষাতে সেইরূপ ঠাট বজায় রাখিয়া উন্নতি আবশ্যক।" সরকার মহাশয়ের অভিভাষণের এই অংশ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। উহাতে একাংশের সহিত অন্য অংশের সামঞ্জস্যহীনতা যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যে জিনিসের প্রবাহ আছে তাহা নদীর সহিতই তুলনীয়। তাহার খাত থাকে, 'ঠাট' থাকিতে পারে না। সরকার মহাশয় 'ঠাট' অর্থে কি বুঝেন, তাহা আমরা জানি না ; আমরা ঠাট অর্থে কাঠামোই বুঝি। উহা একটা অপরিবর্ত্তনীয় বাঁধি আধার। যে জিনিষের প্রবাহ নাই, গতি নাই, বৃদ্ধি নাই, যাহা গজায় না তাহারই ঠাট বা বাঁধি ঠাট থাকে। প্রতিমার ঠাট আছে। কারণ প্রতিমা প্রবাহহীন, গতিহীন, বৃদ্ধিহীন। উহা গজায় না, ঠিক থাকে। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"কুঁড়ে ঠাটা ডুবিল, তাম্বুতে এল বাণ।" কুঁড়ে প্রবাহহীন, গতিহীন, বৃদ্ধিহীন ; উহা গজায় না, সেই জন্য আমরা কুঁড়ে ঠাট বুঝি। কিন্তু যে ভাষায় প্রবাহ আছে, বেগ আছে, আবর্ত্ত আছে, প্রপাত আছে, "যাহা কখনও কুলুকুলু রবে কখনও গভীর গর্জ্জনে" নিয়তই প্রবহমান, তাহার 'বাঁধি ঠাট' কি, তাহা অনেকেরই ধারণার অতীত। যদি ভাষার স্থির, ধীর ও অতি-শয় সীমাবদ্ধ স্বল্পকাল স্থায়ী গতি বা বৃদ্ধি থাকিত, তাহা হইলেও মানব-দেহের কাঠাম বলিলে যেমন উহার বৃদ্ধিটুকু গণ্য না করিয়া গঠন বা আকৃতিমাত্র বুঝি, ভাষার সেইরূপ একটা কিছু বুঝিয়া লইতাম। কিন্তু যাহা গঙ্গার ন্যায় নিয়তই প্রবাহমান, তাহার 'বাঁধি ঠাট' থাকিতেই পারে না বলিয়া আমাদের ধারণা। উহার ভঙ্গীও অপরিবর্ত্তনীয় নহে। নদী যেমন বারিসম্পদে স্ফীতা হইলে তাহার লহরীলীলার পরিবর্ত্তন হয়, ভাষাও

ভাবসম্পদে পুষ্টা হইলে তাহার ভঙ্গী তেমনই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গঙ্গোত্তরীতে ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গী যেরূপ, সাগরসঙ্গমে সেরূপ নহে। বিবিধ উপনদী যেমন বিভিন্ন দিক হইতে নদীর সহিত মিলিয়া উহাকে পরিপুষ্টা করে, ভাষাকেও তেমনই নানাদিক হইতে ভাব ও শব্দরাশি আসিয়া পরিপুষ্টা করিয়া তুলে। উপনদীগুলি যেমন মূলনদীর ভঙ্গীকে প্রভাবিত করে, সেইরূপ বিভিন্ন উৎস হইতে উৎসারিত ভাবরাশি আসিয়া ভাষা ও সাহিত্যের ভঙ্গীকে প্রভাবিত করিয়া তুলে। সকল দেশের ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। সংস্কৃত ভাষাই ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষায় মাতামহী। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে পালি, বাঙ্গলা, উড়িয়া, হিন্দী, গুজরাটী, উর্দ্দু, মারহাট্টি, প্রভৃতি ভাষা জন্মিয়াছে। এই সকল ভাষার ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। তবে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাহির হইতে ভাব ও শব্দরাশি আসিয়া প্রত্যেক ভাষাকে স্বতন্ত্র ভঙ্গী দিয়াছে। তাই মহারাষ্ট্রীয় ভাষার ভঙ্গীর সহিত বাঙ্গালা ভাষার ভঙ্গীর সাদৃশ্যের মধ্যেও বৈসদৃশ্য বর্ত্তমান।

অতঃপর ভাষার প্রাণের কথা। সাহিত্যাচার্য্য সরকার মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—"ভাষাশরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণ পদার্থ আছে, সেইটি বাঙ্গালীর মত হইলে তবে বাঙ্গালীর উপযোগী ভাষা হয়।" আমরা সরকার মহাশয়ের এই উক্তি মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত। সত্য সত্যই "ভাষা প্রাণের জিনিষ।" কিন্তু সেই প্রাণের অনুসন্ধানে সরকার মহাশয় আমাদিগকে এক জটিল গোলক ধাঁধাঁয় লইয়া গিয়াছেন, ইহাতেই আমরা দুঃখিত। তাঁহার তিনটি প্রাণের কথা আমরা আলোচনা করিব না। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তনাম যুগে ব্রাহ্মণের প্রাণ নাই,—ক্ষত্রিয়ের প্রাণ নাই—বৈশ্যের প্রাণ নাই,—"ভারতের প্রাণ, বাঙ্গালীর ক্ষীণ প্রাণ, এখন কেবল শস্যোৎপাদক কৃষকের হস্তে।" সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, যাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদের সেই প্রাণ হইতে প্রবাহিত ভাষা লইয়া সাহিত্য গঠিত করিতে হইবে। এই চাষার ভাষা লইয়া আমাদের সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। নতুবা সাহিত্যে প্রাণ থাকিবে না। অর্থাৎ সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে—

ওরে রামশশী যদি কঁ্যাটাল খাবি,
বিচিগুনো রাগ্‌গে ঝা তুলে—

এই ভাষায় আমাদের ভবিষ্যৎ কবিদিগকে কাব্য লিখিতে হইবে! বিরহ গাথা লিখিতে হইলে আরম্ভ করিতে হইবে,—

রম্‌জ্রানের চাঁদ উঠ্‌বে কবে, খসম আস্‌বে দ্যাশেতে।

ইহাই কি সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের মত? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে—"ভারতবাসীর কোনও দিকে যদি কিছু উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা থাকে ত সে কেবল চাষে। চাষেই আমাদের প্রাণ বাঁচে, চাষেই আমাদের প্রাণ আছে।"—সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে এ সকল কথা বলিবার সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা কি?

"কুটীরবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি" এ কথা সত্য। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশ বা জাতির অংশ। কেবল বড় লোককে, বিনোদভাববিহ্বল বিলাসীকে লইয়া জাতি হয় না। কোনও জাতির কথা, দেশের কথা, বুঝিতে হইলে, তাহাদের স্বার্থাস্বার্থের বিচার করিতে হইলে, সেই জাতির ধনীর কথা, ক্ষমতাশালীর কথা, সহরবাসীর কথা ভাবিলে চলে না। সকলের কথাই ভাবিতে হয়। দরিদ্রের স্বার্থাস্বার্থ বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের কথা তাহা নহে। সাহিত্য সাহিত্যিকেরই বিশেষ সম্পত্তি। কোনও দেশের দেশশুদ্ধ লোক সাহিত্যিক হয় না। সাহিত্যের ভাষা সকলে বুঝে না। তাহা যদি বুঝিত, তাহা হইলে ভাষাশিক্ষার জন্য লোককে পরিশ্রম করিতে হইত না। সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের নিম্নস্তরের ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না।" আমাদের সমাজের নিম্নস্তরে ডোম, দোসাদ, চামার, মুদ্দাফরাস প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি অবস্থিত। এমন জিজ্ঞাস্য, ইহাদের ভাষা লইয়া কি বঙ্গসাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে? আমাদের অন্ত্যজ জাতি অশিক্ষিত, তাহাদের হৃদয়ের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবাহিত হয়। তাহাদের ভাষা সেই সঙ্কীর্ণ ভাব কোন মতে প্রকাশ করিতে পারে। আবার জিজ্ঞাস্য, তবে কি সাহিত্যকে অন্ত্যজ জাতি-সুলভ ভাবরাশিতে পূর্ণ করিতে হইবে?

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, "ভাষার চলন্ত প্রাণ চাই"। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাষায় চলন্ত প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে যে ক্ষেত্র-পাল বা ডোম ডোক্‌লার দারস্থ হইতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। ভাবই ভাষার প্রাণ। যে ভাষা প্রাণ হইতে ফাটিয়া আপনিই বাহির হয়

সে ভাষা প্রাণবন্ত হইবেই হইবে। প্রাণময়ী ভাষা আপনার শব্দসম্পদ আপনিই খুঁজিয়া লয়। যাহাতে ভাবটি অবিকল ও সরলভাবে প্রকাশ পায়, ভাবপ্রকাশে কোনওরূপ বাধা না জন্মে, সাহিত্যিকের তাহারই জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভাষাকে আড়ষ্ট করিলেই সর্ব্বনাশ।—

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র তীরে
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে।

এ স্থলে "নড়বোড়ে" শব্দটি চলিত ভাষা হইতে গৃহীত। নিশা, ক্ষেত্র, তীর, কুটীর প্রভৃতি শব্দের সহিত উহা এক পংক্তিতে বসিতে পাইয়াছে; তাহার কারণ, উহা যে ভাবসম্পদে সম্পন্ন কোন সংস্কৃতসম বা সংস্কৃতোদ্ভব কথা এখানে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। তাই ঐ শব্দ কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছে। আবার ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

পোড়া আকালেতে নাকাল করে
ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের ন্যাড়া শিক্ষে ধরে
ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে॥

এখানেও ভাষা ঠিক ভাবেরই অনুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু সেই নজীরে যে চাষার ভাষা সাহিত্যে আমদানী করিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। উপরি উদ্ধৃত কবিতার ভাষা চাষার ভাষা নহে। উহা সমাজের উচ্চস্তরের চলিত ভাষা। কিন্তু তথাপি সেই ঈশ্বরগুপ্তের লিখা এখন লোক আর তেমন আগ্রহের সহিত পড়ে না কেন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অন্যান্য কারণের মধ্যে তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, উহাতে অনেক গ্রাম্য ও প্রাদেশিক শব্দ আছে,—সকলে উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' কথা লোক প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে,—কিন্তু মহাভারতের অনুবাদ 'পড়িতে' পায় না। বঙ্কিমবাবুর উচ্চ প্রশংসা সত্ত্বেও পিয়ারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের 'আলালের ঘরের দুলাল' এখন বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিতে বসিয়াছে, ইহা কি সরকার মহাশয় দেখিয়াও দেখিতেছেন না? কিন্তু তারাশঙ্করের কাদম্বরীর কথা ত কেহ ভুলে নাই। আবার ভূদেববাবুর প্রবন্ধগুলির আদর বাড়িতেছে।

সকল দেশেই চলিত ভাষার, কথোপকথনের ভাষার সহিত, সাহিত্যের

ভাষার পার্থক্য আছে। সাম্যবাদী ইংরেজ জাতির চলিত ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। তথাকার চাষার ভাষা ত একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। Provincialism (প্রাদেশিকতা) ও Solecism (রীতিবিরুদ্ধতা) ইংরাজী সাহিত্যের ভাষায় আমদানী করিলে বিশেষ দোষ হয়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিত ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীনকালেও সাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহা সংস্কৃত; কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহা প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষায় যদি কোন সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য অমর হইয়া রহিয়াছে। জয়দেবের গীত গোবিন্দ রহিয়াছে—কিন্তু তাঁহার সময়ের চলিত ভাষায় রচিত গ্রন্থ নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিয়া এখনও লোক মুগ্ধ হয়,—উহার ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইলেও লোক উহা পড়ে,—কিন্তু তাঁহাদের সমসাময়িক সাধারণ কবিদিগের রচনায় কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। আমরা অলঙ্কারপ্রিয় জাতি। আমাদের ভাষাকে সাজাইয়া গুছাইয়া লোকের নিকট উপস্থিত না করিলে লোক উহা পড়িতে চাহে না। চাষার ভাষা বা চলিত ভাষার আমদানি করিলেই ভাষায় প্রাণ সঞ্চারিত হয় না।

বক্তা বা লেখকের প্রাণে যদি সত্য সত্যই ভাবের প্রবাহ ছুটে, আর সেই ভাব যথাযথভাবে ভাষায় ফুটাইবার যদি তাহার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই ভাষাই প্রাণবন্ত হয়। কৃত্রিমতায় ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং ভাষা প্রাণবন্ত হয় না। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন ;—

ঐ ছন একগুণ, বহুদোষ নাশই
এক দোষে বহু গুণ হানি।
গরল সহোদর গুরুপত্নীহর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাশন, বারিজি নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা॥

এখানে চলিত ভাষার ভূয়ঃপ্রয়োগ নাই,—কেবল উহার অক্ষরে অক্ষরে কবির হৃদয় গঙ্গোত্তরীনিসৃত ভাবের তরঙ্গ অবাধে খেলিতেছে,—তাই উহা প্রাণবন্ত। এখনও কীর্ত্তনে যখন গীত হয়,—

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহ না।,
হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহ না।
কোকিলাকুল কুর্ব্বতি কল, অলিঝঙ্কার কুসুমে
হরিলালসে প্রাণ তেজব, পাওব আর জনমে।

তখন শ্রোতার মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, শিরায় শিরায় যে ভাবের প্রবাহ ছুটে তাহাতেই উপলব্ধি হয় যে, এই বহুশত বর্ষের পুরাতন গান এখনও কেমন জীবন্ত,—কেমন প্রাণবন্ত। সাধক রাম-প্রসাদের গানগুলি অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইলেও প্রাণবন্ত; কারণ উহা ভক্তের ভক্তিমন্দাকিনী হইতে স্নাত হইয়া বাহির হইয়াছে, তাই উহা অমর। দেওয়ান মহাশয়ের গানগুলি কি এখনও লোকের মর্ম্মস্পর্শ করে? পক্ষান্তরে—

ন্যাংটা মেয়ের এত আদর জটে ব্যাটা তো বাড়ালে
নৈলে কেন এমন করে সাধতে হবে মা মা বলে।

প্রভৃতি গানে রচয়িতার কৌশল, প্রাণের স্পন্দনও অনুভূত হয়, কিন্তু তথাপি উহার আদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ভাষার প্রাণ শব্দে নহে,—ভাবে। ভাষা যেরূপই হউক না কেন, উহাতে ভাব যদি সম্যক প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই উহাতে প্রাণ পদার্থ আপনিই সংক্রমিত হইবে। তাহার জন্য চাষার খামারে, ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, চলিত ভাষায় কতকগুলি শব্দ ক্রমশঃ ভাব-সম্পদে সম্পদশালী হইয়া উঠে। ঐ সকল শব্দকে সাধুভাষায় উন্নতী করা নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা ভাষার দীনতা ঘুচিবে না। গুরুচণ্ডালী দোষের বহরটা একটু কমাইতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক চলিত শব্দ সাধু ভাষায় উন্নীত হইয়াও অভিধানে আপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আছে। অভিধান-কারদিগের ইহা একটা প্রবল দোষ। ঐ সকল শব্দকে একঘরে করিয়া রাখাতে বিভিন্ন অঞ্চলের লেকের পক্ষে ঐ সকল শব্দের অর্থবোধ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সরকার মহাশয় অভিধানকারদিগকে যদি কিছু বলিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার হইত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দেব-প্রসাদ।

ধর্ম্মযাজক হইয়াও ক্লিওন দেবদ্বেষী। সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা আছে এবং দেবতার উদ্দেশে আনীত উপাচারের কল্যাণে ভরণপোষণের কোন ভাবনাই তাঁহাকে ভাবিতে হয় না। তাহার গৃহসংলগ্ন উদ্যানে নিত্য নয়নাভিরাম কুসুমনিচয় প্রস্ফুটিত হয়। তাহার লাবণ্যময়ী প্রেয়সী পত্নী যখন সেই রম্য উপবনে ভ্রমণ করে তখন বিমুগ্ধ পথিকের বিস্ময়দৃষ্টি সেই সমস্ত চারুদর্শন কুসুম উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কমনীয় বদনকমলের উপরেই নিবদ্ধ থাকে। ক্লিওন জ্ঞানী—ক্লিওন পণ্ডিত। কিন্তু এই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের মোহেই ক্লিওন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন। এই দেবতার অদূরদর্শিতার ফলেই তাহার নিজের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের হইতে পারে নাই—বিধিবিড়ম্বনায় ক্লিওন জন্মান্ধ। তাহারই উদ্যানজাত কুসুমসম্ভার সৌন্দর্য্যে, সৌরভে দেশের মধ্যে বিখ্যাত; তাহারই পত্নী ম্যাগনোলিয়া নিজ পর্য্যাপ্ত যৌবন-সৌন্দর্য্যে দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধা। কিন্তু ক্লিওন এমনই হতভাগ্য যে, নিজ উদ্যানজাত অনিন্দ্যসুন্দর কুসুমের সুরভি আঘ্রাণ করিয়াই বা লোকললামভূতা প্রেয়সী পত্নীর কোমল কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাহাকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়, প্রাণ ভরিয়া তাহাদের ললিত মাধুরী উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হইতে দেবতা তাহাকে চিরবঞ্চিত করিয়াছেন!

গ্রকাস সেই দেশেরই প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, যৌবন ও পুরুষোচিত তেজোবীর্য্যের পুঞ্জীভূত অপর্য্যাপ্ততায় দেব-আশীর্ব্বাদ তাহার জীবনে সার্থক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রৌঢ় অন্ধ ক্লিওনের মনে হইল, যেন সেই কণ্ঠস্বরের মধ্যে ব্যর্থ আশার বেদনা স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। যেন তাহার মনে হইল, সে গ্রকাসের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস অনুভব করিতেছে, তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে নিখিল-পার্থিব-গৌরব-উপেক্ষী নিগূঢ় নৈরাশ্যের ব্যাপ্ত হাহাকার স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। দেবতার খেয়ালই এই!

তত্ত্বদর্শী ক্লিওন তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আমি অন্ধ, কিন্তু এই নিষ্প্রভ অক্ষিগোলকের অতীত এক দিব্য দর্শন আছে যাহা অব্যক্ত অনাগত ভবিষ্যতের বিপুল রহস্য-যবনিকা উত্তোলন করিতে সমর্থ। স্থূলদর্শন কোন লিখনাদি পাঠ করিবার সামর্থ্য ইহার নাই সত্য, কিন্তু ইহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মানবহৃদয়ের মর্ম্মস্থলে পর্য্যন্ত অব্যাহত। এই দিব্যদৃষ্টি সহযোগে আমি বুঝিতেছি যে, তোমার গোপন মর্ম্মতলে অপূর্ণ বাসনার নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হইয়া তরুণ যৌবনেই তোমার জীবনকে ব্যর্থতায় অবসন্ন করিতে চাহিতেছে।"

গ্রকাস কোন উত্তর করিল না। ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া সে যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কপোলদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল ও তাহার দৃষ্টি আপনা আপনি অবনত হইয়া আসিল,—যেন তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে অন্ধ ক্লিওনের দৃষ্টিহীন নয়নসমক্ষে তাহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিতে হইয়া উঠে।

অতঃপর ক্লিওন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিল,—"হে দেবগণ, জানি না, কেন তোমরা এতকাল ধরিয়া পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে আকাশে বাস করিতেছ। কি পাইলে যে মনুষ্যজীবন সার্থক হয়, তাহা ত তোমরা কখনও জানিতে

চাহ নাই। তাই তোমরা দয়া করিয়া মানুষকে যে সমস্ত সম্পদের অধিকারী করিয়াছ তাহা পাইয়াও জীবনে তাহারা সুখী হইতে পারে নাই। ভগবান্, মানবের কাতর প্রার্থনার অতীত সুদূর স্বর্গ হইতে একবার নামিয়া আসিয়া শুনিয়া যাও, কি পাইলে তাহারা কৃতার্থ হয়। জগদীশ, আমায় চক্ষু দাও, আর কিছু আমি চাহি না—প্রিয়তমা ম্যাগনোলিয়াও অন্য কোন দান তোমার কাছে প্রার্থনা করিবে না। আমি যেন দেখিতে পাই, যেন ম্যাগনোলিয়ার কমনীয় মুখমণ্ডলের নিরুপম মাধুরি সন্দর্শন করিতে পারি, যেন সে বুঝিয়া সুখী হইতে পারে যে, তাহার প্রিয়তম তাহার ললিত দেহলাবণ্যের দর্শনসুখে বঞ্চিত নহে। ভগবান্, আর যে প্রেমের অকৃতার্থতায় প্রকাসের প্রাণ অনন্ত তৃষায় উদ্বেল, তাহার সেই প্রেম সার্থক করিয়া দাও। কর সেই আশীর্ব্বাদ। সহস্র অযাচিত সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও যাহার আকাঙ্ক্ষায় তাহার প্রাণ তৃষিত।"

আশ্চর্য্য! ভগবান্ এবার ক্লিওনের প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন। তাহার অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ে তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং রাগ করিয়া তিনি এ যাবৎ যাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, সে সমস্তই দান করিলেন!

মন্দির-সোপানে অবরোহণ করিতে করিতে যেমন ক্লিওন পদতল-বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে মুখ ফিরাইল অমনই দিগন্তচুম্বিত নীল গগনের বিরাট সৌন্দর্য্য তাহার নয়নে প্রতিভাত হইল এবং বিস্ময়-বিহ্বল উন্মাদচীৎকারে তাহার অন্তরাত্মার গূঢ় গভীর পুলক ধ্বনিত হইল।

ক্লিওন দেখিতে পাইতেছে।

এ যেন পুনর্জ্জন্ম! বালকও যে সুখের নিত্য অধিকারী, এতদিনপরে জ্ঞানবৃদ্ধ ক্লিওনের সম্মুখে সেই চির-অভিপ্সীত সৌভাগ্য সত্য আসিয়াছে। ক্লিওন দেখিল—উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত উদার নীল আকাশ; শ্যামল-শষ্পায়িত বিচিত্র পুষ্পপল্লবসমাচ্ছন্ন ধরণীর দিব্য মোহনমূর্ত্তি তাহার নয়নগোচর হইল; কনক-অরুণকিরণোজ্জ্বল তটিনীহৃদয়ে লহরীলীলা দেখিয়া আনন্দাশ্রুতে তাহার নয়ন সজল, উল্লাসে তাহার হৃদয় উদ্বেল ও নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার অন্তরাত্মা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই শুভসংবাদ ম্যাগনোলিয়াকে প্রদান করিবার অত্যধিক উৎসাহে, "আমি দেখিতে পাইতেছি," উচ্ছ্বসিত এই কয়টি কথা তাহাকে বলিবার একান্ত অধীর আগ্রহে ক্লিওন গৃহের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। সে মনে মনে আশা করিতেছিল যে, এ যাবৎ যে অনিন্দ্য মাধুরী সে মাত্র স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়াছে এবং যাহার স্বরূপ তাহার নিকট স্বপ্ন হইয়া রহিয়াছে—আজ সে তাহা নয়ন ভরিয়া—প্রাণ ভরিয়া দেখিবে। পাতলা চর্ম্মপাদুকা ও ঢিলে পায়জামা পরিহিত ক্লিওনকে বেগে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া সকলে সেই পক্বকেশ বৃদ্ধের কাণ্ড দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল,—"দেখ দেখি, অন্ধ ক্লিওন কেমন সহজে জনতা ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! ভগবানের অপার করুণা! তাঁহারই দয়ায় রুদ্ধদৃষ্টি ক্লিওনের অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় কেমন সজাগ, কেমন তীক্ষ্ণ! পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের কি মঙ্গল বিধান!" ক্লিওনের ইচ্ছা হইল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—"ভগবানের জয় হউক। আমি আর অন্ধ নহি।" কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রিয়তমা ম্যাগনো-

লিয়ার কর্ণে এই দেব-আশীর্ব্বাদের অনাবিল আনন্দ সঞ্চারিত করিবার জন্য সে মত্ত বাসনাকে সংযত করিল।

স্পর্শ-পরিচিত পথ দেখিয়া চিনিয়া লইবার জন্য, দৃষ্টবিষয়ের সম্যক্ পরিচয় স্পর্শদ্বারা যাচাইয়া লইতে ইতস্ততঃ পথিমধ্যে থামিয়া থামিয়া সে অগ্রসর হইতেছিল। এ যাবৎ অন্ধ থাকার ফলে তাহার স্পর্শানুভূতি এরূপ সজাগ ও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোথায় কোন্ পথ দিয়া চলিতেছে তাহা বুঝিবার জন্য সময় সময় সে দাঁড়াইয়া গাছপালা স্তম্ভ প্রভৃতি স্পর্শ করিতেছিল।

অবশেষে নীল-গগনপটে অরুণকিরণোদ্ভাসিত কনকোজ্জ্বল গম্বুজবিশিষ্ট এক রম্য আবাস-বটীকা তাহার নেত্রপথে পতিত হইল। সে দক্ষিণ হস্তদ্বারা পার্শ্বস্থ 'সিডার' বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া বুঝিল যে, সে নিজগৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে।

নবলব্ধ দৃষ্টিসাহায্যে ঘনশ্যাম-বৃক্ষবল্লরীর বিকচ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিল। অবশেষে যে ঘরের মধ্যে ম্যাগনোলিয়া বসিয়া ছিল, পর্দ্দা সরাইয়া ক্লিওন সেই ঘরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। সে জানিত, তাহার স্ত্রী সুন্দরী; স্পর্শানুভূতিতে সে সেই সুন্দরীর কপোলযুগলের কোমলতা, তাহার কেশদামের মসৃণতা; ও তাহার বরবপুর নিটোল শ্রী অনুভব করিয়াছিল; বুঝিয়াছিল, তাহার হাত দুইখানি কত কোমল, নয়নযুগল কেমন আকর্ণবিশ্রান্ত, নাসিকা কেমন সুবঙ্কিম। আজ সে দেখিল, তাহার স্ত্রী সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। সুপক্কফলভারাবনত দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখিয়া এইমাত্র স্পর্শ ও রসনা-নিরপেক্ষ যে নূতন সৌন্দর্য্য তাহার সদ্যোলব্ধ নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, ম্যাগনোলিয়ার বালারুণপ্রভ অলকগুচ্ছ দেখিয়া ও তাহার সহস্রবার-চুম্বিত চারু বিম্বাধর নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নয়নে সেইরূপ অপূর্ব্ব নূতন মহিমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সুন্দরী ম্যাগনোলিয়াই তাহার পত্নী, তাহার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ! তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা প্রেমের আবেগে এই পত্নীর প্রতি উদ্যত হইয়া উঠিল। ম্যাগনোলিয়ার হাসি দেখিয়া আত্মহারা ক্লিওন আনন্দের আতিশয্যে ডাকিল,—"ম্যাগনোলিয়া!"

ম্যাগনোলিয়া চমকিয়া উঠিল—ক্লিওন তাহার অজ্ঞাতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

সে উত্তর করিল—"নাথ।" কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধরে হাসি মিলাইয়া গেল। কারণ বুঝিতে না পারিয়া ক্লিওন অপ্রস্তুতের মত চাহিয়া রহিল।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে প্রকাসের মত কাহার ছায়া দেখা যাইতেছিল।

তাহার কি গরীয়ান্ মূর্ত্তি, তাহার নয়নে কি দীপ্তি, তাহার ললাট কি মহিমা। তাহার দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধর, তাহার মনপ্রাণ ও কলেবরের অকুতোভয়তা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল।

প্রকাসের বক্ষে মস্তক রাখিয়া মিষ্ট কথায় ম্যাগনোলিয়া ক্লিওনকে স্বাগত জানাইল। পরক্ষণেই—

"হা ভগবান! একি দেখাইলে; সোহাগের কথায় স্বামীর মন ভুলাইবার সময়েও ম্যাগনোলিয়ার হস্ত প্রকাসের হস্তে সংবদ্ধ, তাহাদের চক্ষু পরস্পরের দৃষ্টিসুখে বিভোর।

এই কয় বৎসর ধরিয়া তাহার চক্ষুর উপরে যে গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল, তদপেক্ষাও নিবিড়তর কালিমা দেখিতে দেখিতে ক্লিওনের সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলিল।

তাহারা জানিত না যে, দেবতার বরে ক্লিওন লব্ধদৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে। তাই তাহার সমক্ষেই তাহাদের পাপ ওষ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় নীরব চুম্বনের অভিনয় করিতেছিল।

ক্লিওন বুঝিল যে, তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই ভগবান্ আজ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। সে চক্ষু লাভ করিয়াছে, আর যে প্রেমের ব্যর্থতায় গ্রকাসের হৃদয় বিষাদ বেদনায় সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই প্রেম তাহার ভাগ্যে সার্থক হইয়াছে!

সেই ত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করিয়াছিল।

আর দেখিতে না পারিয়া ক্লিওন চলিয়া গেল। "আর একটিমাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর—ভগবান্,—মৃত্যু দাও; আমাকে মৃত্যু দাও।"

সে ছাতে উঠিল—সেই উচ্চ সৌধশিখরের প্রান্তভাগে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ না করিয়া সে করযোড়ে প্রার্থনা করিল—"শেষ ভিক্ষা ভগবান্—মৃত্যু!" বলিতে বলিতে কক্ষচ্যুত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় সেই উচ্চ স্থান হইতে সে পড়িয়া গেল। *

যাহারা এই দৃশ্য দেখিল, তাহারা সহানুভূতি জানাইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"হায়! বেচারা অন্ধ ক্লিওন! চক্ষু থাকিলে আর আজ এরূপে তাহার প্রাণান্ত ঘটিত না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ।

গ্রীষ্মের ছুটীর পর কলেজ খুলিয়াছে। আবার গোদাবরীতীরস্থ বিশাল শল্মলীতরুশাখায় নানাদিগ্‌দেশাগত পক্ষীর মত নানাস্থান হইতে নানাছাত্র আসিয়া ছাত্রাবাসটি পূর্ণ করিয়াছে। আমিও আসিয়াছি। কেবল এখনও আমার বাল্যবন্ধু অমল আইসে নাই। অমল আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকে। আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। আর অনেক বিষয়েই উভয়ে ঐকমত্য বিদ্যমান। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিবাহ করিব না। বাঙ্গালী যে বাল্যেই বিবাহ করিয়া বিপন্ন হয় ও কোন মহৎ অনুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। তাই আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিবাহ করিব না।

অমলের আগমন-বিলম্বে আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা হইতেছিল। বিশেষ সে যে লিখিয়াছে, আসিয়া একটা একান্ত অপ্রত্যাশিত সংবাদ দিবে, তাহাতেই আমার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়াছে।

অপরাহ্নে কলেজ হইতে আসিয়া দেখি, অমল আসিয়াছে। আমি হাসিতে

* জনসন-রচিত ইংরাজি গল্পের অনুবাদ।

হাসিতে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তাহার মুখে হাসি যেন সহসা মিলাইয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর কক্ষে আমরা দুইজন ছিলাম; আর কেহ ছিল না। অমল আমাকে বলিল, "ভাই, আমাকে ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিয়াছি।"

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, অমল বিবাহ করিয়াছে! আমি বলিলাম, "তোমাকে ক্ষমা করিতে হইলে আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হয়। তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে সমস্ত জীবন অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তোমার কি আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে না?"

অমল বলিল, "আমার কথা শুনিলে তুমি হয় ত আমাকে ক্ষমা করিবে। বাবা ও মা চক্রান্ত করিয়া বৈশাখ মাসে আমার একটি আত্মীয়ের সঙ্গে আমাকে কনে দেখিতে পাঠাইলেন। সেই কনে দেখিতে যাইয়াই আমার বিপদ ঘটিল। মেয়েটির বয়স বারো বৎসর। এমন মেয়ে আমি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে ইচ্ছা হয়—

One shade the more, one ray the less
Had half impaired the nameless grace.

ক'নে দেখিয়া আসিয়া বাবার ও মা'র কাছে কনের প্রশংসা করিলাম। সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করায় দোষ কি? শেষে আমি ইহাও বলিলাম, 'যদি আমার বিবাহ না করিবার যথেষ্ট কারণ না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ মেয়ে বিবাহ করিতাম।' তাহার পর আমার ছোট ভগিনী চারুর কাছে শুনিলাম, বাবা ও মা আমার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। চারুকে বলিলাম, 'যাহা নহে, তাহাই! এ বড় অন্যায়। আমাকে মহৎ উদ্দেশ্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের উচিত নহে। অধঃপতিত বাঙ্গালী পিতা পুত্রবধূর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করেন, আর নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালী যুবক মধুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া জীবনের সার ধর্ম্ম কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়।' চারু আমার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, 'দাদা, তোমার পাগলামী পরে করিও। বাবা শীঘ্রই ক'নে দেখিতে যাইবেন—পাকা দেখা।' এই বলিয়া চারু দৌড়াইয়া পলাইল।"

অমলের গল্প জমিয়া আসিতেছিল, সে বলিয়া যাইতে লাগিল—"বাবার

কি অন্যায়! যাহাই হউক, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'আমি পূর্ব্বশপথ কখন ভুলিব না, আর যদি, ঈশ্বর না করুন, এমন কোন কারণ উপস্থিত হয় যে, বিবাহ করা ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকে, তবে এই মেয়ে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

অমলের কথায় উত্তরোত্তর আমার রাগ বৃদ্ধি পাইতেছিল সত্য; কিন্তু তাহার শেষ কয়টি কথা আমার একদিনে প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমিও গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটীতে একটি মেয়ে দেখিয়াছিলাম। বাবা মা যখন আমার বিবাহের যুক্তি করিতেছিলেন, তখন আমিও মনে মনে শপথ করিয়াছিলাম, যদি বিবাহ করিবার কোন বিশেষ বিঘ্ন না থাকিত, তাহা হইলে এ মেয়েটি ছাড়া আর কাহারও ভার সহ্য করিতাম না। সে যাহা হউক, আমার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়াছিলাম,—মনের দুর্ব্বলতা যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়াছিলাম,—এমন কি, নিজের অনাপত্তি সত্ত্বেও শুধু একটি Principleএর খাতিরে বিবাহ করি নাই। মনে মনে অমলকে বলিলাম, 'তুমি যদি সেই মেয়েকে দেখিতে, তা হ'লে তুমি-তোমার পরিণীতার রূপ ব্যাখান করিতে ঘৃণা বোধ করিতে।'

অমল আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "ভাই, তাহার পর যাহা হইবার, তাহাই হইল--হারাণবাবু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তিনি জিদ করিয়া ধরিলেন, শুভ-কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাকে শেষকালে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতে আমার কোন মনস্তাপ হয় নাই। ভাই, আশীর্ব্বাদ কর, আমার পত্নী যেন আমার হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করে।"

হারাণ বাবুর মেয়ে! আমি ত অবাক্। আমার সন্দেহ-ব্যাকুল হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। এ কি সেই? ঈশ্বর না করুন—

অমল আমার স্বগতোক্তিতে বাধা দিয়া বলিল, "কি হে, তোমার মুখ যে শাদা হ'য়ে গেল! মোটের উপর আমার কথা এই যে, যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা আমি সহধর্ম্মিনীর সাহায্যে আজীবন স্খালন করিব। তরুণ অনভিজ্ঞ বয়সের প্রতিজ্ঞা কখনও স্থিরবুদ্ধির অনুমোদিত হইতে পারে না। আমি না বুঝিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ঈশ্বর তাহা ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

অমল রাগিয়া শেষ কথা কয়টি বলিল। আমিও হতাশ হইয়া রাগিয়া

কর্কশস্বরে প্রশ্ন করিলাম, "কেন তুমি হারাণ বাবুর মেয়েকে বিবাহ করিতে গেলে? আমার সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, আমারও তাহাতে বড় একটা অমত ছিল না।" অমলের হাসির তরঙ্গে আমার বজ্রগভীর স্বর ডুবিয়া গেল। হঠাৎ সে হাসি চাপিয়া গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, "ভাই, সে কি কথা? তুমি চিরকুমার থাকিবে—তুমি এ কি বলিতেছ?"

আমার ক্রোধ আত্মপ্রকাশের ভাষা পাইতেছিল না। আমি উত্তরোত্তর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেছিলাম, কেবলই অমলকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, "কেন তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে? She is my affianced—"

অমল জ্বালাময় হাস্যের সহিত বলিল, "ভাই, চিরকৌমার ব্রতধারীর মনে যে এত ছিল, তাহা কেমন ক'রে বুঝিব, বল? যদি হারাণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা পূর্ব্বেই হইয়াছিল, আর যদি তাহা কেবল তোমার মতের উপরই নির্ভর করিতেছিল, তাহা হইলে তুমি তাহাকে বিবাহ কর নাই কেন?"

আমি পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলাম, 'তখন বিবাহ করি নাই বলিয়া যে পরে করিব না, তাহা তোমাকে কে বলিল? বাবা একটু বেশী জিদ করিয়া ধরিলেই আমি রাজী হইতাম।"

অমল পূর্ব্ববৎ হাসিতেছিল। আমার শরীর রাগে জ্বলিয়া যাইতেছিল—আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম!

অমলের হৃদয়ে অবশ্য দয়া হইয়াছিল। সে আমার অশ্রু মুছাইয়া বলিল, "ভাই, ব্যস্ত হইও না। উত্তরনগরের হারাণ বাবুর জ্যোষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশীলাবালার সঙ্গে তোমার ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তমালিনীর সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। তোমার মনের ভাব তোমার বাপ মা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বোধ হয়। এই ১৪ই আষাঢ় দিন স্থির হইয়াছে। সেই তারিখে মহাশয় সবান্ধবে ভাবিশ্বশুরালয়ে গমন করতঃ শ্রীমতী সুশীলাবালাকে নিজস্ব করিয়া আমার পথ পরিস্কার করিয়া দিবেন।"

আমি অবাক! আমি জাগিয়া আছি, না স্বপ্ন দেখিতেছি? আমার নয়নে অশ্রু—মুখে হাসি, অন্তরে?

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ মজুমদার।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত



যুগল।

চিত্রকর···লর্ড লেটন।

K. v. Seyne : Bros

শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি।

অতি প্রাচীন কালে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থ ভূভাগ সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল। তখন গঙ্গার সহিত সমুদ্র-সঙ্গম মালদহের কৌশিকী সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী ছিল। এই স্থানে পাণ্ডবরা সমুদ্রকূলে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কহ্লণের বর্ণনায় সমুদ্র যে তখন প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে অধিক দূরে ছিল না, তাহা বুঝা যায়। হিমালয়ের তুষারধৌত জলরাশি গঙ্গাখাতে বহুল পর্ব্বতরেণু বহন করিয়া সমুদ্র-সন্ধানে ছুটে এবং মৃত্তিকা ও বালির সংযোগে একপ্রকার পলিমাটী দেশে দেশে রাখিয়া যায়। উহা হইতে ক্রমে ভূমি জন্মে; গঙ্গার মত ভূমিগঠনের ক্ষমতা পৃথিবীর আর কোন নদীর নাই। এই নবোত্থিত ভূমিভাগের নাম ছিল বকদ্বীপ। বকদ্বীপের উত্তরে গঙ্গা, পূর্ব্বে পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমে ভাগীরথী, এইরূপ সীমানির্দ্দেশ আছে। এই বকদ্বীপকেই আমরা ইংরাজীর অনুকরণে 'ব' দ্বীপ করিয়া লইয়াছি। বকদ্বীপই বৌদ্ধ আমলে ভাষার অপকর্ষ বশতঃ বগ্‌দি নামে পরিণত হয়। উহা হইতেই সেনরাজাদিগের সময়ে একটি উপবিভাগের নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ী। বদ্বীপ বা বগ্‌দির জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে যে অসভ্য জাতি বাস করিত, তাহারা এখনও বাগ্‌দী বলিয়া পরিচিত হয়।

এই 'ব'দ্বীপ আজ যেমন বিস্তৃত, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু ইহার আকৃতি যাহাই থাকুক, ইহার সমুদ্রকূলবর্ত্তী অংশ যে বহুকাল হইতে কাননাবৃত ছিল, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাণিনির মহাভাষ্যে পতঞ্জলি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের সীমানির্দ্দেশ করিতে উহার পূর্ব্বভাগে কালক বনের উল্লেখ করিয়াছেন। * এই কালক বনই বোধ হয়, সুন্দর বন। দিগ্বিজয়প্রকাশে বঙ্গদেশস্থ সরস্বতী ও কালিন্দী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে কিলকিলা বলা হইয়াছে। এখনও খুলনা জিলায় কালিন্দীতটে কলকলি নামে স্থান আছে। কলিকাতার নামোৎপত্তির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, বলা যায় না। জনৈক বিখ্যাত জৈন স্থবির নাম কালক। কাহারও কাহারও মতে ইনিই পর্য্যষণা পর্ব্ব পরিবর্ত্ত

* "প্রত্যক্কালক বনাদ্দক্ষিণেন হিমবন্তং" ইত্যাদি পা ২।৪।১০ মহাভাষ্য। বিশ্বকোষ চতুর্থ খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা ও ১৫৫ পৃষ্ঠা।

করেন। এই জৈন কালকের সহিত কালকবন নামের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানি না।

যাহা হউক, কালক বন ছিল এবং নবনির্ম্মিত দ্বীপভাগ যত দক্ষিণ দিকে বর্দ্ধিত হইতেছিল, বনও তত দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছিল। উত্তর দিকে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে নদীকূলে ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইলে সেই সকল স্থানে জঙ্গল কাটিয়া লোকের বসতি হইতেছিল। ক্রমে তথায় অনার্য্যগণ আসিয়া বাস করে। বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ অনার্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল এবং তীর্থ-যাত্রা ব্যতীত এই স্থানে আসা নিষিদ্ধ ছিল। † বহুকাল পরে এতদঞ্চলে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয়, এবং আর্য্যজাতি আসিয়া বাস করেন। ভাগীরথীর এই পূর্ব্বভাগকে উপবঙ্গ বলিত ও উপবঙ্গে যশোহরাদি কাননসংযুক্ত দেশ ছিল। ‡

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাভারত তাহার প্রমাণ দেয়। সভাপর্ব্বে আছে যে, সে সময়ে বঙ্গে সমুদ্রসেন ও পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে বাসুদেব রাজত্ব করিতেন। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেবের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কপিল। তিনি কোন কারণে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ইনি সাংখ্যকার কপিল নহেন। পৌণ্ড্রক কপিল মুনিব্রতাবলম্বী হইয়া কানন-কুন্তলা যশোহরের দক্ষিণাংশে আশ্রম-নির্ম্মাণ করেন।* খুলনা জিলার দক্ষিণাংশে কপোতাক্ষকূলে কপিলমণি গ্রাম আছে। তথায় কপিলের প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বরী কালী আছেন ; এবং প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে কপিল মুনির মেলা হয়। যদিও কপিল দক্ষিণে বহু দূর গিয়া বনভূমি বাছিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,

† অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥”
মনুসংহিতা।

‡ “ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যুপবঙ্গো হি ভূমিপঃ ॥
উপবঙ্গে যশোরাদি-দেশাঃ কাননসংযুতাঃ
জ্ঞাভব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষু চ॥
দিগ্বিজয় প্রকাশ।

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ১২১ পৃঃ

তবুও কপোতাক্ষ ভৈরবের কূলে বহুদূর পর্য্যন্ত যে প্রাচীন কালে আর্য্যসভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

সেই প্রাচীন বকদ্বীপ বা উপবঙ্গ সমতল তটভূমি বলিয়া সমতট আখ্যা পাইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে সমতটের প্রথম উল্লেখ আছে। আরও অর্দ্ধশতাব্দী পরে যখন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং ভারতে আইসেন, তখন তিনি হর্ষভট্ট নামক একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজাকে সমতটে রাজত্ব করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে হুয়েন সাঙ্ সমতট পরিদর্শন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমস্ত উপবঙ্গ বা গঙ্গার বদ্বীপ সমতটের অন্তর্ভূক্ত ছিল। * হুয়েন সাঙ্ সমতট সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থানের ভূমি উর্ব্বরা, লোকসকল ক্ষুদ্রাকৃতি কৃষ্ণকায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সমতটে ৩০টি সঙ্ঘারাম ও শতাধিক প্রাচীন হিন্দুমন্দির ছিল। ২০০০ বৌদ্ধশ্রমণ ও বহুসংখ্যক নিগ্রন্থ জৈন এ দেশে বাস করিতেন। চৈনিক সাধু এ দেশে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সমতটের রাজধানীর পরিধি ৪ মাইল এবং উহা কামরূপ হইতে ১২।১৩ শত লী বা ২০০ মাইল দক্ষিণে ও তাম্রলিপ্তি হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। † কানিংহাম বহু বিবেচনা করিয়া এই প্রাচীন রাজধানী মুড়লী বা যশোহরের সন্নিকটে নির্দ্দেশ করেন। ¶ কিন্তু তাহার কি কোন চিহ্ন আছে? এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে স্বতঃই মনে হয়, এই ৩০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম কোথায় ছিল?

শুধু বৌদ্ধ ধর্ম্ম নহে, জৈন ধর্ম্মও বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। জৈন গুরু মহাবীরের অন্য নাম বর্দ্ধমান। সম্ভবতঃ তাঁহা হইতে রাঢ়ীয় বর্দ্ধমান প্রদেশের নাম হয়। পুরাণাদির আলোচনা দ্বারা ইহাও জানিতে পারা যায় যে, জৈনদিগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জনের সহিত বাঙ্গালীর সংশ্রব ঘটিয়াছিল। ‡ চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং সর্ব্বত্রই জৈন ধর্ম্মের প্রবল প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। কারণ, তিনি স্বয়ং জৈন-

* Cunningham's Ancient Geography p 593.

† Beal's Buddhis't Records pp. 199-200.
Julien's Hiouen Thsang iii,81.

¶ Ancient Geography pp. 501-2.

‡ বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ।

মতাবলম্বী বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট "বৃষল" আখ্যায় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। অশোকের সময়ে যখন পূর্ব্বদিকে চট্টল-রাজ্য পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল, তখন সমতটে বা যশোহর রাজ্যেও বৌদ্ধ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুয়েন সাঙ্ যে ৩০টি সংঘারামের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এই সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এই যুগে জৈন ও বৌদ্ধমত এরূপভাবে সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল যে, সুঙ্গ ও কাম্ববংশীয়দিগের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। মহারাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মে দেবদেবীর পূজা প্রচলিত করিয়া যে মহাযান মত প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাই লোকের চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। তাহার পর গুপ্ত-রাজগণ আসিলেন—সমুদ্র গুপ্ত আসমুদ্র সমগ্র বঙ্গ অধিকার করিলেন। পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা চলিল। এবার শাসনের বলে ও কৌশলে হিন্দু ও বৌদ্ধের সংখ্যা সমান হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে হিন্দুদিগের তান্ত্রিক মত প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিল। গুপ্তরাজগণের মুদ্রাতেও তান্ত্রিক মূর্ত্তি প্রকটিত হইল; সুদূর চীন, জাপান, যবদ্বীপ পর্য্যন্ত এই মত বিস্তৃতিলাভ করিল। বৌদ্ধ-বিগরে তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল; বুদ্ধমূর্ত্তি-সমূহ কোথায়ও তান্ত্রিক দেবীর ভৈরব হইলেন, কোথায়ও কপোতাক্ষ ভৈরব প্রভৃতি নদ-নদীর গর্ভস্থ হইয়া বিলুপ্ত হইতে থাকিলেন। এই সময়ে শশাঙ্ক নরগুপ্ত বোধিদ্রুম উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করেন ও কনোজপতি রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যাসাধন করেন। ফলে দুর্দ্ধর্ষ হর্ষবর্দ্ধনের কোপে শশাঙ্কের দেহান্ত ঘটে এবং তৎসঙ্গে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। এইরূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনে মহা সংঘর্ষ চলিয়াছিল এবং ক্রমে এ দেশ হইতে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তবুও তাহার চিহ্ন ছিল; হিন্দুরা বৌদ্ধপ্রতিমা ভাঙ্গিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বৌদ্ধ-বিহার বা চৈত্য ভাঙ্গেন নাই। সে কার্য্য পাঠানদিগের দ্বারা হইয়াছিল; সে জন্য পাঠান আমলের নরকুলাঙ্গার কালাপাহাড়ই দায়ী। সেনরাজগণের সুশাসনে যখন দেশমধ্যে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন হিন্দু-দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ দেশে গণেশ-পূজা ছিল না, আবার তাহা আসিল। চতুর্ভুজ বাসুদেব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে পূজিত হইতে লাগিল। যশোহরের ও খুলনার সর্ব্বত্র তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। কোথায়ও

কোন প্রাচীন পল্লীতে পুষ্করিণী খননকালে, কোথায়ও কোন নদীর শুষ্ক খাতে এমন কত মূর্ত্তি উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি যশোহর খুলনার ইতিহাস কখনও প্রকাশিত হয়, পাঠকগণ তাহার কিছু নিদর্শন পাইবেন। কিন্তু সে বৌদ্ধ-বিহারমালা, সত্যনিষ্ঠ চীনদেশীয় সিদ্ধ পুরুষের বিবরণীভুক্ত সমতটের সে ৩০টি সংঘারাম কোথায়?

যদিও এই গুরু প্রশ্নের সমাধান জন্য বহু বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, তথাপি দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও সদুত্তর দিবার সময় আইসে নাই। খুলনা যশোহরের অনেক স্থলে অনেকগুলি স্তূপ আছে। উহার কয়েকটির একটু পূর্ব্বাভাষ 'আর্য্যাবর্ত্তে' এক বৎসর পূর্ব্বে "পরিষদের প্রতি নিবেদন" প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। * কিন্তু সে নিবেদনই সার হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে একটু উত্তরের প্রত্যাশা করিবার ভাগ্যও আমার হয় নাই বুঝিয়াছি যে রাজশক্তি সারনাথে রত্নোদ্ধার করিতেছে, তাহারই কৃপা-কটাক্ষের অধিকারী না হইলে এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা হইবে না; অর্থ, উৎসাহ ও উপায়হীন দেশবাসীরা অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া এরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবেন না।

বর্ত্তমান যশোহর নগর হইতে আরম্ভ করিয়া কপোতাক্ষের পূর্ব্বকূল বহিয়া দক্ষিণদিকে চাঁদখালি পর্য্যন্ত যাইলে বহু স্থানে স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঝাপার কাছে, তালার নিকট আগর ঝাড়ায় কপিলমুনির সান্নিধ্যে আগ্রায়, চুকনগরের নিকট ভরত-ভায়নায় এমন অনেকগুলি স্তূপ দেখা যায়। সবগুলি খনন করিবামাত্রই ইষ্টক-গৃহাদির প্রাচীর ও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভরত-ভায়নায় বিশাল স্তূপ বহুবিস্তৃত ও প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ। নিকটবর্ত্তী স্থানে কত ভগ্ন দেববিগ্রহ, কত প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে! অন্য স্থানে না হউক, ভরত-ভায়নায় যে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ-বিহার ছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এইরূপ বহু স্থানে বহু চিহ্ন বর্ত্তমান।

কিন্তু যাহা আছে, সে অতি সামান্য। অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। সেনরাজত্বের শেষভাগে এক সময়ে প্রাকৃতিক উপদ্রবে সমতটের দক্ষিণভাগ জলমগ্ন হওয়ায় কিছুকাল পরে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তথায়

* 'আর্য্যাবর্ত্ত'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

লোকের বসতি ছিল না। মন্দির ও অট্টালিকাদি মৃত্তিকায় অধিকাংশ প্রোথিত হইয়া যায়। এই সময়ে পাঠান-রাজত্ব আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে দুরবিস্তৃত সুন্দরবন আবাদ করিবার জন্য খাঁ জাহান আলি প্রভৃতি বহু পাঠান দলে দলে এ দেশে আগমন করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ ;— জঙ্গলময় দেশ আবাদ করিয়া রাজ্যবিস্তার এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার। এই সকল লোকের প্রকৃতিও একটু নূতন রকমের ছিল। ইহাঁরা কার্য্যতঃ বীরধর্ম্মী ; কিন্তু ইহাঁদের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার। ইহাঁরা কতকটা সংসারত্যাগী হইলেও অর্থলোলুপ, অথচ সে অর্থ দানধর্ম্মাদিরূপ সদ্ব্যবহারে ব্যয়িত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজকগণের মত ইহাঁদেরও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। খাঁ জাহান আলি প্রভৃতি আউলিয়াগণ বীরদর্পে সুন্দরবন আবাদ করিয়া লোক বসাইলেন, এই কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্থাপনের জন্য নানাস্থানে মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। সে সকল দীর্ঘকালস্থায়ী হর্ম্ম্যরাজি এখনও আছে। দেশের লবণাক্ত বায়ু ও স্বার্থসেবী মানুষের খনিত্রের আঘাত সহ্য করিয়া তাহারা এখনও অনেক স্থানে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সকল অট্টালিকার মালমসলা কোথা হইতে আসিয়াছিল ? সমতটে প্রস্তর নাই ; কিন্তু যথায় তথায় প্রস্তরস্তম্ভ পড়িয়া রহিয়াছে ! এক সাতগুম্বজ নামক অট্টালিকাতেই ৬০টি স্তম্ভ আছে। কোথায়ও কৃষ্ণ প্রস্তর এবং কোথায়ও রাজমহল অঞ্চলের প্রস্তর দেখা যাইতেছে। অনেকে বলেন, এ সকল পাতর খাঁ জাহান আলি চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে আনিতেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য না হইলেও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পাতরগুলি দেখিলে চট্টগ্রামের পাতর বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই প্রথম সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ কেহ মসজিদাদি নির্ম্মাণের জন্য স্বয়ং স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলে, উহার সকলগুলি সমান, উপযুক্তভাবে পুষ্ট, পরিমাণানুকারী করিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু খাঁ জাহান আলির সাত গুম্বজে বা মসজিদ-কুড়ের নবগুম্বজে স্তম্ভগুলি দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। উহার অনেকগুলি দৈর্ঘ্যে কমবেশী আছে, অনেকগুলি বিপর্য্যস্ত করিয়া লাগান হইয়াছে, অনেকগুলির গাত্র ইষ্টক দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, অনেকগুলি দেখিলে সম্পূর্ণ ভারবহনক্ষম বলিয়া বোধ হয় না।* তৃতীয়তঃ

* Sir James Westland writes of the pillars of the Masjedkur mosque:—
"These stones were not brought there and were not fashioned for the

মুসলমানের স্তম্ভাদিতে কোন জীবজন্তুর মূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকিতে পারে না। কিন্তু খাঁ জাহান আলির কয়েকটি স্তম্ভে মনুষ্যমূর্ত্তি আছে, উহার একটি এক্ষণে সিন্দুর-চর্চ্চিত হইয়া হিন্দুর পূজা পাইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এ নহে। তবে বহুদিনের আলোচনা-ফলে আমার ধারণা হইয়াছে যে, এই সকল স্থানে প্রাচীন কালে কোন কোন বৌদ্ধবিহার বা প্রাচীন হিন্দুমন্দির ছিল। বৌদ্ধযুগে, অশোকের রাজত্বকালে যে সকল প্রস্তরে ভারতের নানাস্থানে বিশাল বিহার, চৈত্য, স্তম্ভ বা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে ভাস্কর্য্যের ফলে প্রস্তরগাত্রে মানুষের চিত্তপ্রকৃতি সহজে ফুটিয়া উঠিত, তাহারই আয়াসবিহীন অস্ত্রকৌশলে এই সকল স্তম্ভ ও পাদপীঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহার বা হিন্দুমন্দিরের প্রস্তর আনিয়া মুসলমান শিল্পী তাহার সাহায্যে গুম্বজ ও মিনার গড়িয়া বঙ্গদেশে মহম্মদীয় স্থাপত্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। কত বৌদ্ধমূর্ত্তি যে মৃত্তিকার নিম্নে, জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া ছিল তাহার ইয়ত্তা করিবার উপায় নাই। পাঠান বা মোগলের হাতে যদি কিছু নিস্তার লাভ করিয়া থাকে, পাশ্চাত্য নীলকরের হস্তে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক সময়ে যশোহর জিলার নানা স্থানে যে শত শত নীল-কুটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অনেক উপকরণ নিকটবর্ত্তী ভগ্ন মন্দির বা মসজিদ হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যে স্থানে নদীর কূলে নিকটে ভগ্ন, অট্টালিকা ও বিস্তৃত সমুচ্চ প্রান্তর ছিল, নীলকরগণ সেই স্থানেই প্রবল-প্রতাপে গদি পাতিয়া ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের সেই ৩০টি সংঘারাম কোথায় গেল,তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিবার কি কিছুই নাই?

এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। খাঁ জাহান ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার প্রাক্কালে যখন তাঁহার বর্ত্তমান সমাধি-মন্দিরের নিকটে একটি বহুবিস্তৃত পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন, তখন কয়েক হাত মাটীর নিম্নে একখানি প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরের বৌদ্ধপ্রতিমা পায়েন। সম্পূর্ণ প্রস্তরখানি পাদপীঠ বাদে ৩½ ফুট দীর্ঘ ও ১ ফুট ৮½ ইঞ্চি প্রস্থ। প্রতিমার নিম্নে একটি কীলক

purpose they at present fulfil. The belonged to some other structure and they were taken from it or from its ruins to form pillars in this mosque"

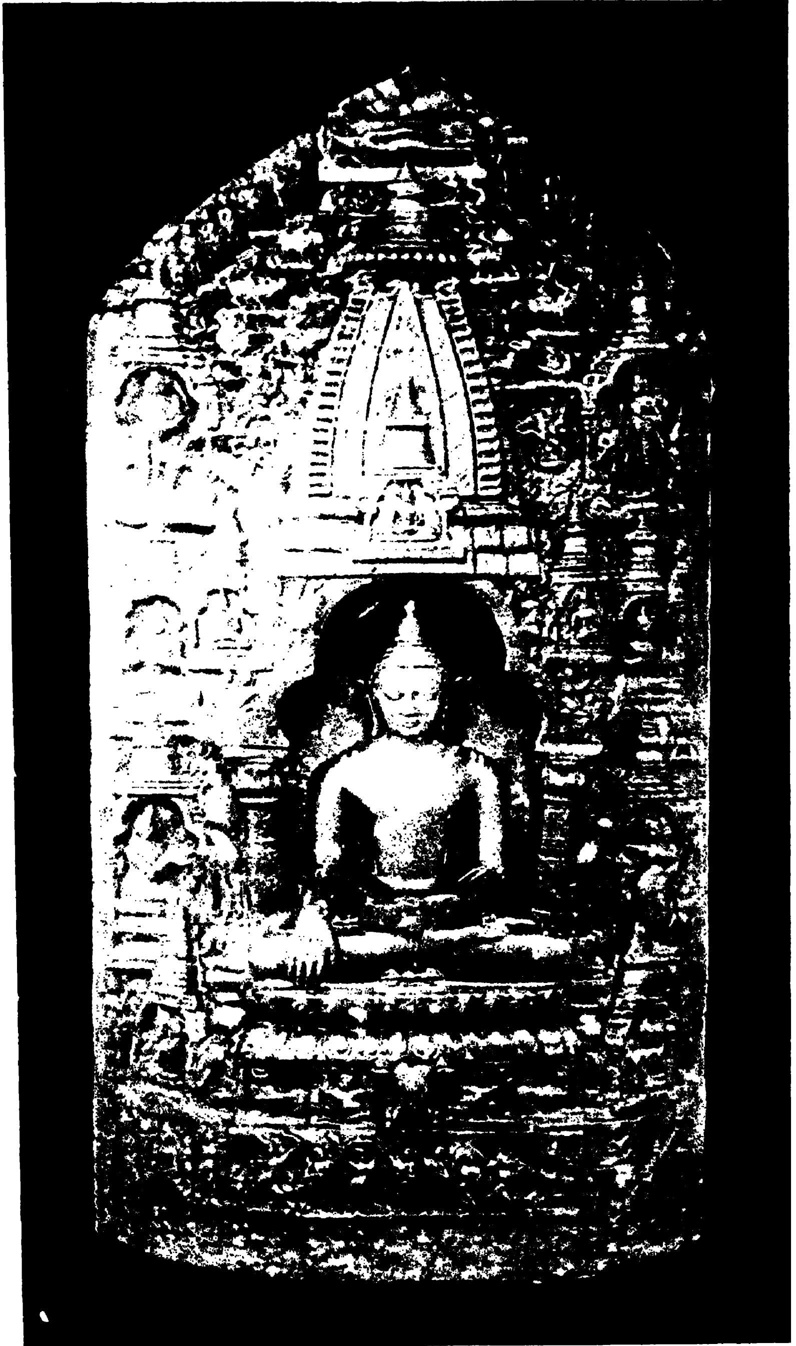
Report on Jessore pp. 16-7.

প্রাচীন গ্রীকদিগের মত এদেশে মুসলমানরাও নক্সা স্থির করিয়া শিল্পীকে দিতেন। যাহারা পাতর কাটিত, তাহারা সেই নক্সা দেখিয়া নক্সার মত পাতর কাটিত। সুতরাং কোন একটি গৃহের জন্য নির্ম্মিত স্তম্ভের গঠনাদি একরূপ হইবারই কথা। — সম্পাদক।

আছে ও বিস্তৃত পাদপীঠে একটি গর্ত্ত আছে, তাহার মধ্যে প্রতিমা বসাইয়া রাখিতে হয়। প্রতিমা-প্রস্তরের সম্মুখভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; সুতরাং মধ্যভাগে উহার বেধ প্রায় ১ফুট হইবে। প্রস্তরের মধ্যস্থানে একটি বড় বুদ্ধমূর্ত্তি। বুদ্ধদেব যোগাসনে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় ধ্যানস্থ, বহুযুগবর্ষী মালিন্যমণ্ডিত প্রস্তর-মূর্ত্তির বদনমণ্ডল হইতে দিব্যজ্যোতিঃ এখনও বিস্ফুরিত হইয়া পড়িতেছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ এবং স্তম্ভের উপরি ভাগে নানা ভাবে বিহার দেশীয় বৌদ্ধ মন্দির ও চৈত্যের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। চারি দিক বেড়িয়া বুদ্ধের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীর সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধের সাধনা, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। নিম্নে পদ্মাসনতলে হস্তিমুণ্ড ও বহু শিষ্য ও সাধকের সমাবেশ। বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তির বামহস্তে খনকের অস্ত্রাঘাতচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রতিমাখানি উত্থিত হইলে উহা খাঁ জাহান মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ উহা লইয়া বাগেরহাটের ৪ মাইল দূরে বর্ত্তমান শিবপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি উহা সেই স্থানেই আছে; কিন্তু বুদ্ধরূপে পূজিত না হইয়া শিবরূপে পূজিত হইতেছে। গ্রামের নাম শিবপুর। যে স্থানে মূর্ত্তি আছেন, তাহার নাম শিববাড়ী। এই স্থানে শিবচতুর্দ্দশীতে মেলা হয়; অহিংসা যাঁহার ধর্ম্মমতের প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে কালভৈরব কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ছাগ বলি দেওয়া হয়। বৌদ্ধমতের এতদপেক্ষা আর কত পরাজয় হইতে পারে? কিন্তু তবুও একটি আনন্দের কথা আছে। প্রস্তরের গুণে ও মূর্ত্তিমাধুর্য্যে হিন্দুর হাতে তাহা বিনষ্ট না হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে; এবং তাহার পূজার উপস্বত্ব হইতে প্রকারান্তরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পরিবারের উদরান্নের সংস্থান হইতেছে। এই প্রশস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও তাহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ও ভাবপ্রবণতা দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে স্থানকে আজ আমরা বাগেরহাট বলি, সে স্থানে এক প্রাচীন যুগে এক বৌদ্ধসঙ্ঘারাম থাকা বিচিত্র নহে।

এক্ষণে কিরূপে এই বুদ্ধমূর্ত্তি আজ লোকনেত্রের পথবর্ত্তী করিতে পারিনাম, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পরমশ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যখন কার্য্যব্যপদেশে বাগেরহাটের সন্নিকটে ভাণ্ডারকোলায় ছিলেন, তখন তাঁহাকে শিবপুরের এই



শিব বাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি।

বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করি। তদনুসারে তিনি উদ্যোগী হইয়া শিববাড়ী গিয়াছিলেন; মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলস্বরূপ একটি বিবরণী লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন। যশোহর খুল্‌নায় ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বন্ধুর মুখে শিববাড়ীর কথা শুনি। তখন তথাকার স্থাপিত মূর্ত্তিটি শিবমূর্ত্তি কি না এ বিষয়ে দুই একজন একটু সন্দেহ করিতেন, কিন্তু সাধারণে উহা শিবমূর্ত্তি বলিয়া মানিয়া লইয়া নিঃসন্দেহ ছিলেন। গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে আমরা উক্ত মূর্ত্তি প্রথম দর্শন করি। আমাদের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। কতকগুলি প্লেট খরচ করিয়া দেখিলাম, ফটো হয় নাই। কাল-পাথরের মূর্ত্তি, তাহাতে বহুকালের তৈলাভিসিঞ্চন ও কালিমাসঞ্চয়, ঘরের মধ্যে মূর্ত্তির উপর যথোপযুক্ত আলোকপাত হয় না; এই সব কারণে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শুধু আমাদের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে; খুল্‌নার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্রাডলি-বার্ট মূর্ত্তিটি বাহিরে আনাইয়া যে ফটো লইয়াছিলেন, তাহাতেও ছবি হইল না। আমরা পরের দ্বারা আর একবার চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলাম। অবশেষে গত পৌষ মাসে এক দিন সদলবলে যাইয়া ৮ জন বলীয়ান্ ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তরমূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া ফটো লওয়া হইয়াছিল। আমার ছাত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র মিত্র ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জম লইয়া গিয়াছিলেন। ফটো লইয়া ঐ স্থানেই বসিয়া উহা develop করিবার ব্যবস্থা করিয়া যখন দেখা গেল যে, ছবি হইয়াছে, তখন আমরা সানন্দে স্থান ত্যাগ করিলাম। ঐ ফটো হইতে যে ব্লক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইতেই আজ বুদ্ধমূর্ত্তির ছবি প্রকাশিত করিলাম।*

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

* চিত্রের ব্লকখানি লেখক মহাশয়ের যশোহরের ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। গত পৌষ মাসের পল্লীচিত্রে' যে ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সতীশ বাবুর ফটো হইতে প্রস্তুত। সম্পাদক।

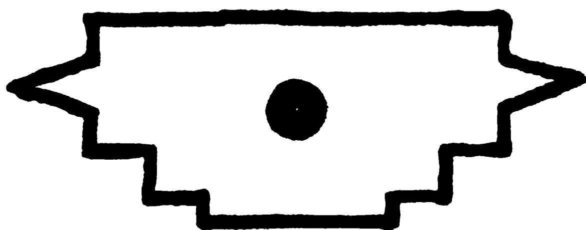
শিববাড়ী

পৃথিবীর ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন ধর্ম্মমত জটিলতাজড়িত ক্রিয়াকাণ্ডবহুল হইয়া উঠিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়-বিশেষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, তখনই জনসাধারণের মধ্যে সরল ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তনবাসনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জাতির শক্তি জনসাধারণ হইতেই উদ্ভূত হয়; তাই তাহাদের বাসনাও বহুদিন অপূর্ণ রহে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। নির্ব্বাণকামী স্বার্থত্যাগী শাক্য রাজকুমারের আদর্শ, বৌদ্ধধর্ম্মমতের সরলতা ও সহজবোধ্যতা এবং তাহার প্রচারপদ্ধতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তারে বিশেষ সহায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ধর্ম্মমত এক সময় কিরূপ সর্ব্বজনসমাদৃত—সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে আজ আমাদিগকে বুদ্ধের জন্মভূমি ও প্রচারকেন্দ্র ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এসিয়ার অন্যান্য দেশে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কারণ, ভারতবর্ষে বৌদ্ধমত যে ব্রাহ্মণ্যমতকে পরাভূত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে আবার সেই ব্রাহ্মণ্যমতই যুক্তিতে, বলে ও কৌশলে বৌদ্ধ-মতকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। কুশাগ্রবুদ্ধি শঙ্করাচার্য্যের তর্ক-যুক্তিতে বৌদ্ধবিহার ব্রাহ্মণ্যমঠে পরিণত হইয়াছিল; শশাঙ্কপ্রমুখ নৃপতি কৃপাণকরে বৌদ্ধমতের উচ্ছেদ-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন; আর নানা স্থানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারকগণ দুরারোহ পর্ব্বত ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গকুল-সঙ্কুল পারাবার অতিক্রম করিয়া যে সকল দেশে সুগতের ধর্ম্মমত প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে সকল দেশে আজও বৌদ্ধ ধর্ম্মমত বর্ত্তমান। সেই সকল দেশের অবস্থা দেখিলে আমরা ভারতে এক সময় বৌদ্ধ-প্রাধান্যের বিষয় অনুমান করিতে পারি। ভারতের নানাস্থানে সে প্রাধান্যের পরিচয়ও যথেষ্ট আছে। কেবল শিল্পে নহে; পরন্তু শিল্পে ও সাহিত্যে সে প্রাধান্যের পরিচয় পরিস্ফুট। পেশোয়ার হইতে গয়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সে পরিচয়-প্রমাণ যত অধিক, বঙ্গে তত অধিক নহে। কিন্তু বাঙ্গালাও যে বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, "ধর্ম্ম"-পূজায় ও "ধর্ম্মের গানে" তাহা অনায়াসেই অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধ-মূর্ত্তিও বাঙ্গালায় মিলিতেছে।

বাঙ্গালায় বৌদ্ধ-প্রভাবের আবির্ভাব তিরোভাবকাল আজও নির্ণীত হয় নাই। বাঙ্গালার যে অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত ও স্বচ্ছন্দবিচরণশীল ব্যাঘ্রকুরঙ্গাদির বাসভূমি, সে অংশও যে এককালে জনগণে অধ্যুষিত ছিল, নিবিড় অরণ্যমধ্যে ভূষ্ট প্রোথিত প্রাসাদে, দার্যদ দেবালয়ে, শৈবালসমাচ্ছন্ন সরোবরে ও বকুলবীথিকায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে, কি শাসনশিথিলতায় এই ভূমিখণ্ড অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু শত শত বৎসর পূর্ব্বে যখন এই স্থানে শ্বাপদ-গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে জেতার জয়ধ্বনি ও জিতের আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইত, যখন এই স্থানে বিহগ-বিরাবের পরিবর্ত্তে বিরহ-মিলনের উচ্ছ্বসিত প্রেমগীতি শ্রুত হইত, যখন এই স্থানে পরিখাপরিবেষ্টিত প্রাসাদমধ্যে কত বেপমান হৃদয় আশায় আন্দোলিত, আশঙ্কায় বিকম্পিত, দ্বিধায় বিচলিত, ঘৃণায় সঙ্কুচিত ও বেদনায় বিদারিত হইত, তখনও এই স্থানে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল।

খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগের হাট মহকুমা হইতে একটি রাজপথ সেলিমাবাদ পরগণার মধ্য দিয়া বনগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। পথটি সুগঠিত ও সুরক্ষিত। পথ সুরক্ষিত হইবার প্রধান কারণ, এ দিকে অশ্বযানের বা গোশকটের ব্যবহার নাই। এ দেশ অগণিত খালপূর্ণ। যখন জোয়ার আসিলে সুখসুপ্তা সুন্দরীর স্পন্দিত বক্ষের মত তরঙ্গ-স্পন্দিত নদীবক্ষে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন এই সকল খালে জল প্রবেশ করে—আর বর্ষায় এই সকল খালে জলস্রোত প্রবাহিত হয়। এই সকল খালে জলযানেই যাত্রী ও পণ্য বাহিত হয়। এই বহুবিহগকূজন-মুখরিত ছায়াস্নিগ্ধ পথের সৌন্দর্য্যও যথেষ্ট। পথের পার্শ্বে কোথাও শুষ্ক ভূমিতে শাল্মলীর সমুন্নত শরীর, কোথাও ঘনশ্যাম বেতসকুঞ্জ, কোথাও নারিকেল তরুর আনত পত্রমুকুটপরিশোভিত সরল দীর্ঘ দেহ, আর যে দিকে চাহ, সুপারী তরুর বাহুল্য। এই বর্ত্মে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর পথিপার্শ্বে একটি পুরাতন দীর্ঘিকার জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় লক্ষিত হয়। দীর্ঘিকা মজিয়া উঠিয়াছে, জল জলজ গুল্মে ও পদ্মপত্রে পূর্ণ—অপেয়। ইহারই অদূরে একখানি জীর্ণ কুটীরে একটি বিগ্রহ বহুকাল—প্রায় পঞ্চশত বর্ষ হইতে পূজিত হইতেছে। এই গ্রামের নাম শিবপুর, কুটীরের নাম শিববাড়ী, বিগ্রহের নাম শিব। শিবচতুর্দ্দশীতে ও চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই স্থানে মেলাও বসে। কিন্তু এই

বিগ্রহ যে বুদ্ধমূর্ত্তি, দেখিলে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই মূর্ত্তি প্রস্তরে ক্ষোদিত। প্রস্তরখানি বহুকাল তৈলনিষেকে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে ; সেই জন্য এই প্রস্তরের স্বরূপনির্ণয় আর সহজসাধ্য নহে। তবে প্রস্তরের পশ্চাদ্ভাগ ও পীঠ দেখিলে বোধ হয়, ইহা গ্রানাইট শ্রেণীর। এই পীঠভাগ স্বতন্ত্র—ইহার আকার এইরূপ—



ইহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে ; সেই ছিদ্রে উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ডের কীলকাকৃতি পশ্চাদ্ভাগ প্রবিষ্ট। প্রয়োজনানুসারে দুইখানি প্রস্তর স্বতন্ত্র করা যায়। উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ড শূর্পাকৃতি। বেষ্টনীভাগে ৫ ইঞ্চ পরিমাণ স্থান অপেক্ষাকৃত গভীর ; মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই মধ্যভাগে চৈত্য খোদিত। চৈত্যচূড়ার অব্যবহিত নিম্নে একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি—যুক্তপাণি বক্ষে স্থাপিত। তন্নিম্নে প্রধান মূর্ত্তি—প্রচারকভাবে ক্ষোদিত। মূর্ত্তির মুখভাব স্নিগ্ধ প্রশান্তিব্যঞ্জক। মূর্ত্তির নিম্নে হস্তিমস্তক। তন্নিম্নাংশ দুই স্তরে বিভক্ত—নিম্নস্তরে উপবিষ্ট ও উর্দ্ধস্তরে দণ্ডায়মান উপাসকমণ্ডলী। প্রস্তরের অগ্রভাগে সামান্য অংশ ভগ্ন ; কিন্তু তথায় কোন মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল না। এই অংশ ও প্রধান মূর্ত্তির হস্তের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ ব্যতীত প্রস্তরখানি সম্পূর্ণ আছে। মার্জ্জনে ও প্রাকৃতিক প্রভাবে বেষ্টনীর খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বেষ্টনীর উচ্চতম অংশে—প্রধান চৈত্যচূড়ার অব্যবহিত উপরে একটি নারীমূর্ত্তি। রমণী শয়ন করিয়া আছেন—পদপ্রান্তে আর একটি রমণী (পরিচারিকা) দণ্ডায়মানা। এই শয়ানা নারীমূর্ত্তি বুদ্ধ-জননীর মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ ভাস্করকীর্ত্তিতে বুদ্ধ-জননীকে প্রসবের পূর্ব্বে বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ও শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়—পার্শ্বে পরিচারিকা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইহার পর দুই পার্শ্বের মূর্ত্তি প্রভৃতি একইরূপ। সর্ব্বোচ্চে ছয়টি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ; তন্নিম্নে হস্তী ; তাহার পর

চৈত্যমধ্যে দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি; তন্নিম্নে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি; তন্নিম্নে আবার চৈত্য ও নারীমূর্ত্তি; তন্নিম্নে আর একটি চৈত্য।

এই ভাস্করকার্য্যে নিপুণতার পরিচয় যেমন পরিস্ফুট, ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব তেমনই সপ্রকাশ। হস্তিমূর্ত্তিগুলি স্বভাবানুকারী। নরমূর্ত্তি সামঞ্জস্যসুন্দর—বলব্যঞ্জক। নারীমূর্ত্তির বক্ষের বিপুলতা ও নিতম্বের নিরতিশয়তা কালিদাসের "শ্রোণীভারাৎ অলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং"—যুবতীর বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হয়, প্রস্তরখানি বৌদ্ধশিল্পের সমুন্নতিসময়ে ক্ষোদিত। ইহা এই বিগ্রহের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। ইহা অন্য স্থান হইতে আনীত, কি বাঙ্গালায় ক্ষোদিত, তাহা জানিবার উপায় নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বিগ্রহ প্রায় পঞ্চশত বর্ষ হইতে এই স্থানে পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন যশোহর জিলার—অর্থাৎ বর্ত্তমান যশোহর ও খুলনা জিলাদ্বয়ের নানা স্থানে খাঁ জাহান আলি নামক একজন মুসলমান ভূম্যধিকারীর কীর্ত্তিপরিচয় বিদ্যমান। নানা স্থানে নানা রাজপথের ও গৃহের সহিত ইহাঁর স্মৃতি জড়িত। বাগেরহাট নগরের উপকণ্ঠস্থিত প্রাসাদ ও সমাধি সুপরিচিত ও বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কিন্তু এই মুসলমান শাসনকর্ত্তার সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক বিবরণই পাওয়া যায় না। কেবল তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত গৃহে তাঁহার স্মৃতি বিরাজিত, তাঁহার আদেশে খনিত জলাশয়ের সলিলমুকুরে তাঁহার কীর্ত্তি প্রতিবিম্বিত। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি বাদশাহের (বা গৌড়ের রাজার) নিকট হইতে এই বনভূমি জায়গীর লইয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন ও বন কাটাইয়া আবাদ পত্তন করেন। সেই জন্য বাগের হাটের এই ভাগ খলিফাৎ-আবাদ নামে পরিচিত। খলিফার অর্থাৎ বাদশাহের জন্য বা তাঁহার আদেশে এই আবাদের পত্তন হয়। তোডরমল্লের বন্দোবস্তে খলিফাৎ-আবাদের উল্লেখ আছে। খাঁ জাহান আলির মৃত্যুর ১২০ বৎসর পরে (১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে) খলিফাৎ-আবাদ ও আর ৩৪ খানি পরগণা হইতে বার্ষিক ১,৩৫,০৫৩ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। খাঁ জাহান আলির সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্থানীয় কিম্বদন্তী শিববাড়ীর বিগ্রহের সহিত খাঁ জাহান আলির স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

খাঁ জাহান আলি যে স্থানেই গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেন, সেই স্থানেই পুষ্করিণী

খনন করাইতেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদ হইতে কিছু দূরে মসজেদ ও স্বীয় সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করান। ভূমি খনিত হইতে লাগিল; কিন্তু জল উঠিল না। শেষে ভূগর্ভে এই বিগ্রহ পাওয়া গেল। খাঁ জাহান আলির লোক বহু চেষ্টায় ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। বিগ্রহের বর্ত্তমান সেবায়েৎদিগের পূর্ব্বপুরুষ অত্যল্প দিন পূর্ব্বে উপনীত বালক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সহজেই বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন। তখন উৎসযুক্ত নির্ম্মল জলে জলাশয় পূর্ণ হইল। এ দিকে ব্রাহ্মণ-বালক বিগ্রহ স্বীয় গৃহে আনয়ন করিয়া তথায় স্থাপিত করিলেন এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া খাঁ জাহান আলি বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করিয়া তজ্জন্য ১৬০ বিঘা ভূমি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেন। বর্ত্তমান পূজারীরা এখনও সেই ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। সেই সময় হইতে গ্রামের নাম শিবপুর, ব্রাহ্মণের গৃহের নাম শিববাড়ী, বিগ্রহ শিবমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত। প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তির হস্তের ভগ্নাংশ দেখাইয়া এখনও লোক বলে, পুষ্করিণীখননকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে ঐ অংশ ভাঙ্গিয়া যায়।

এই কিম্বদন্তী ব্যতীত বিগ্রহ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। বর্ত্তমান অধিকারীদিগের নিকট কোন দলিল নাই। যদি পূর্ব্বে কোন দলিল থাকিয়া থাকে, তাহা গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎকাল-প্রচলিত সনন্দ তাম্রনির্ম্মিত "পাল্লা" এই পরগণা জরিপকালে ব্রহ্মোত্তরের প্রমাণজন্য আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল, আর আনয়ন করা হয় নাই।

গৌরদাস বসাক-লিখিত বাগের হাটের বিবরণে * বা ওয়েষ্টল্যাণ্ডকৃত যশোহরের ইতিহাসে এই মূর্ত্তির উল্লেখ নাই † কিন্তু ওয়েষ্টল্যাণ্ডকৃত ইতিহাসে পূর্ব্বোল্লিখিত কিম্বদন্তীর অনুরূপ একটি কিম্বদন্তী সংগৃহীত আছে। খাঁ জাহান আলি প্রথমে ষাট গম্বুজে বাস করিতেন। বৃদ্ধ হইয়া তিনি কোন্ স্থানে জরাজীর্ণ দেহ রক্ষা করিবেন, জানিতে চাহিলে ভগবান্ তাঁহাকে যে

* J. A. S. B-1867

† সাণ্ডার (D. H. E. Sunder) তাঁহার Tomb of Khan Jahan and the Sat-gumbuz—পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, শুনিয়াছি শিববাড়ীতে এই মূর্ত্তি আছে। বাগেরহাটের কীর্ত্তিপরিচয় লিখিতে যাইয়া অদূরবর্ত্তী শিববাড়ীর মূর্ত্তির সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দান বিস্ময়কর বটে।

স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তিনি তথায় মসজেদ ও সমাধি নির্ম্মিত করাইয়া জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করেন। বহুদূর খনিত হইলেও জল মিলিল না। শেষে খননকারীরা একটি মন্দির বাহির করিল। সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ জাহান আলি এক হিন্দু যোগীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যোগীর নিকট জল চাহিলে উৎসমুক্ত জল দ্রুতবেগে বাহির হইতে লাগিল। খাঁ জাহান আলি ও তাঁহার অনুচরবর্গ বহু কষ্টে কূলে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। লোকের বিশ্বাস, এই মন্দির এখনও জলতলে বিদ্যমান। ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক সংগৃহীত কিম্বদন্তীতে যে স্থানে মন্দিরমধ্যস্থ হিন্দু যোগীর উল্লেখ আছে, স্থানীয় কিম্বদন্তীতে সেই স্থানে এই বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিম্বদন্তীতে এরূপ পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ‡

এ অঞ্চলে আর কোন বৌদ্ধশিল্প-নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের আলোচ্য বিগ্রহ যে এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে আকৃষ্ট করে নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এই বৌদ্ধপ্রভাবনিদর্শনবিরল স্থানে ইহার আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, ইহার প্রবীণত্ব তেমনই নিশ্চিত। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান আলির মৃত্যু হয়। তাঁহার আগমনের কত কাল পূর্ব্বে এই খলিফাৎ-আবাদ জনহীন হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। আর এই স্থানে অতি গভীর জলাশয়ের তলদেশে—বহু শতাব্দীর সঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরনিম্নে এই বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। যতদিন এ অঞ্চলে পুরাবস্তুর অনুসন্ধানফলে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার না হয়, ততদিন আমরা এই মূর্ত্তির বয়স অনুমান করিতেও অসমর্থ থাকিব। তবে এই দূর পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতপ্রায় অংশে এই বৌদ্ধমূর্ত্তি যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রদেশে বৌদ্ধ-প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধুনাবিলুপ্ত অধ্যায়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

‡ গৌরদাস বাবু যে কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে মন্দিরমধ্যে এক ফকিরের কথা বলিয়াছেন। ফকির ভৈরবের কূলে আশ্রম সংস্থাপিত করিয়া ধ্যানস্থ হয়েন; যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় তখন মন্দির মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

অদৃষ্ট-চক্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

সপত্নী-সন্তাষে।

জ্যৈষ্ঠের প্রথমে এক দিন ইচ্ছাপুরে সংবাদ আসিল,নীরজা অসুস্থা—তাহার বিসূচিকার মত হইয়াছিল, রোগ কিছু উপশমিত হইয়াছে—আরোগ্য হয় নাই। এই সংবাদে ভট্টাচার্য্য-গৃহে আশঙ্কার নিবিড় ছায়াপাত হইল। রাধাচরণ পার্ব্বতীচরণের সহিত পরামর্শ করিয়া দানাপুর-যাত্রার উদ্যোগ করিল। পিসী-মা বলিলেন, তিনি যাইবেন। বিরজার হৃদয় ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বিধবা হইয়া সে আর কোথাও যায় নাই; সেই জন্য সে যাইবার কথা বলিল না। সরোজা বলিল, সে যাইবে।

সরোজা যাইতে চাহিলে বিরজা বারণ করিল না। তাহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, নীরজার শুশ্রূষার আবশ্যক হইতে পারে; সে জন্য পিতৃগৃহ হইতে কেহ যাইলে ভাল হয়; বিশেষ যদি তাহাকে আনিতে হয়; দ্বিতীয়, যতীশ দানাপুরে; কে জানে, অদৃষ্ট কখন্ কোন্ পথে, কাহাকে কোথায় লইয়া যায়?

সেই দিনই সরোজাকে লইয়া রাধাচরণ দানাপুর যাত্রা করিল। বিরজা গোপনে রাধাচরণকে যতীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে বলিয়া দিল।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণ চলিল; প্রভাতে দানাপুরে পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া রাধাচরণ ভগিনীকে নামাইল; তাহার পর তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিল। তখন রাধাচরণ শুনিল, ষ্টেশনের নাম দানাপুর হইলেও খাস দানাপুর দুই মাইল পথের কম নহে!

গাড়ী চলিতে লাগিল। পথ কঙ্করাস্তৃত—সুরক্ষিত। পথের পার্শ্বে কণ্টক-গুল্ম। বৃক্ষলতা নূতন—প্রান্তর ধূলিধূসর। সেই তৃণহীন প্রান্তরে মহিষদল তৃণ সন্ধান করিতেছে—আর প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী খালের জলে কয়টি মহিষ দেহ ডুবাইয়া আছে—তাহাদের মুখমাত্র জলের উপর রহিয়াছে। কোথাও বা রাখাল-বালক একটি মহিষের পৃষ্ঠে শয়ন করিয়া অন্যগুলিকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রান্তরে এক প্রকার চিল ঘুরিতেছে; তাহাদের দেহ পক্ষ-বিরল—কদাকার। সরোজার নিকট এ সকলই নূতন। সে মুগ্ধনেত্রে এই

নূতন দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে রাধাচরণকে কোন বৃক্ষের নাম বা স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাধাচরণ যে সে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিতেছিল, এমন নহে।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া গোরা-বারিকে পৌঁছিল। পোষ্ট অফিসের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া চালক রাধাচরণকে তাহার গন্তব্য স্থানের কথা জানিয়া লইতে বলিল।

রাধাচরণের প্রশ্ন শুনিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবু বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং চালককে তাহার গন্তব্য স্থান লালকুঠীর কথা বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া রাধাচরণ আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিল।

শরৎচন্দ্র "বসু কোম্পানীর" বৈঠক হইতে ফিরিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। বাহিরে ফটকের সম্মুখে গাড়ী থামিল দেখিয়া তিনি কাগজ রাখিয়া বাহির হইলেন। তিনি খুল্লতাতের বিবাহের সময় রাধাচরণকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া যাইয়া প্রণাম করিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে কে ?"

রাধাচরণ বলিল, "আমার সেজ ভগিনী।"

শরৎচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আসুন, ছোট কাকী-মা ভাল আছেন।"

রাধাচরণ যান-চালককে ভাড়া দিলেন ও ব্যাগটি নামাইয়া লইলেন।

শরৎচন্দ্র রাধাচরণের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া আগন্তুকদ্বয়কে গৃহে লইয়া চলিলেন।

নীরজার শ্বাশুড়ী দালানে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। নীরজা নিকটেই বসিয়া ছিল। শরৎচন্দ্র পিতামহীকে জানাইলেন, তাঁহার ছোট কাকীমার দাদা ও দিদি আসিয়াছেন। শুনিয়া বৃদ্ধার মুখে বিরক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন,—"এ কি, বাপু! বলা নাই—কহা নাই, ঢং করিয়া কুটুম্ব-বাড়ী আসা কেন ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"চুপ কর, ঠাকুর-মা।"

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। সরোজা শরৎচন্দ্রের পশ্চাতেই ছিল; সেও সে কথা শুনিতে পাইয়াছিল।

সরোজা ভগিনীর শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন,—"আইস,

মা! ছোট বৌমা, তোমার দিদিকে তোমার ঘরে লইয়া বসাও—হাত-মুখ ধুইতে দাও।"

নীরজা ভগিনীকে আপনার ঘরে লইয়া গেল; ঘরে যাইয়াই বাষ্পজড়িত-কণ্ঠে বলিল, "দিদি, কেন তোমরা আসিলে?"

সরোজা সস্নেহে ভগিনীর অশ্রু মুছাইয়া বলিল,—"তুই কাঁদিস্ কেন? আমাদের কাছে তুই বড়, না তোর শ্বাশুড়ীর দুইটা কথা বড়? কই, তাঁহার কথায় আমার কোন কষ্ট হয় নাই!"

নীরজা তবুও কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর সরোজা ভগিনীর অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করিল; জানিল, কয় দিন হইতে নীরজা কিছু অসুস্থ ছিল—ক্ষুধা ছিল না। কিন্তু খাবার নষ্ট হইলে শ্বাশুড়ী বড় রাগ করেন বলিয়া সে আহার করিয়াছিল। তাহাতেই সে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। আর সে অসুস্থ হওয়াতে তাহার শ্বাশুড়ী বড় রাগ করিয়াছেন; কারণ, অসুখ হইলেই ডাক্তার ডাকিতে হয়—তাহা হইলেই অর্থব্যয়।

সরোজা হাসিয়া বলিল, "এ ত দোষ তোরই। শ্বাশুড়ী আদর করিয়া খাইতে দিবেন, আর তুই খাইয়া অসুখ বাধাইবি?"

তাহার পর সরোজা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে একবার লইয়া যাইবার কথা বলিব কি?"

ব্যস্ত হইয়া নীরজা বলিল, "না, না। এই সে দিন আসিয়াছি; আবার যাইবার কথা? তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। আর তোমরা কল্যই চলিয়া যাও। আমি জানিলে কিছুতেই তোমাদের আসিতে দিতাম না।"

সরোজা বলিল, "তবে দেখিতেছি, তোকে না জানাইয়া আসিয়াই ভাল করিয়াছি।"

সরোজা ক্রমে ক্রমে ভগিনীর সংসারের সকল সংবাদ লইতে লাগিল। সব শুনিয়া সে বলিল, "দেখ্, নীরজা, তোর শ্বাশুড়ী লোক মন্দ নহেন। তিনি টাকা ভালবাসেন; তা সে ও তোদেরই জন্য। তিনি হয় ত একটু অধিক বকেন;—কিন্তু তোদের অযত্ন করেন না;—আদরও নাই—অনাদরও নাই।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে দুই ভগিনীতে আবার কত কথা হইল। তখন

নিদাঘের উত্তপ্ত পবনে অনলের স্পর্শ—আকাশ তাম্রবর্ণ—রজতরেণুর মত ধূলিকণা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে নদীগর্ভের বালুবিস্তার; মধ্যে যে যে স্থানে একটু জল বাধিয়া আছে বা শীর্ণ জলস্রোত শাণিত ছুরিকার মত দেখাইতেছে, সেই সেই স্থানে পাখীরা আসিয়া জল পান করিতেছে—পানান্তে একবার ঊর্দ্ধমুখে চাহিতেছে—তাহার পর উড়িয়া কোন বৃক্ষের পল্লবচ্ছায়াস্নিগ্ধ আশ্রয় সন্ধান করিতেছে। পথে পথিক নাই—নদীপারে দেয়াড়া জমিতে পশুরাও আর চরিতেছে না,—বৃক্ষতলে ছায়ায় শয়ন করিয়া অলসভাবে রোমন্থ করিতেছে। গৃহে গৃহে বাতায়ন রুদ্ধ।

সরোজা ভগিনীর নিকট দানাপুরের বাঙ্গালীদিগের সংবাদ লইল। নীরজা জানাইল, যে সকল বাঙ্গালী সপরিবারে দানাপুরে বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই গৃহ নিকটে। পোষ্ট অফিস, বসুভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহ, রসদ-বিভাগের কর্ম্মচারী যতীশচন্দ্রের গৃহ সবই নিকটে। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের পত্নী, "ডাক্তার সাহেবের" গৃহিণী, "উকীল সাহেবের" ঘরণী, যতীশ বাবুর স্ত্রী সকলেই যে তাহার অসুখ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহাও সে ভগিনীকে বলিল; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল যে, হয় ত তাঁহারা অপরাহ্ণে আসিবেন, গ্রীষ্মকালে এ স্থানে প্রভাত ও অপরাহ্ণ ব্যতীত মধ্যাহ্নে গতায়াত দুঃসাধ্য। প্রাতে গৃহকার্য্যবশতঃ মহিলাদিগের পক্ষে গৃহত্যাগ সম্ভব হয় না; তাই দেখা-সাক্ষাৎ অপরাহ্ণেই হইয়া থাকে। সরোজা ভগিনীর নিকট সকলের সংবাদ লইতে লাগিল; কে কেমন আলাপী, কাহার বাড়ী কোথায়—তাহার কয়টি সন্তান, সে সেই সব সংবাদ লইল। তাহারই মধ্যে সে যে কল্যাণীর কথাটা বিশেষ ভাবে জানিয়া লইল, নীরজা তাহা ধরিতে পারিল না। তাহার কারণ, নীরজার সন্দেহের কোনই কারণ ছিল না। কল্যাণী সরোজার কে, সে তাহা জানিত না। সরোজা শুনিল, কল্যাণী স্বভাবগুণে সকলের প্রিয়। কল্যাণীর ছেলেটি দেখিতে কেমন—কত বড়, সে কথাও সরোজা জানিয়া লইল।

নীরজার দিদি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, সে সংবাদ দানাপুরের প্রায় সব বাঙ্গালী পরিবারে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই সঙ্কীর্ণ সমাজে আগন্তুকের আবির্ভাব সচরাচর হয় না। তাই যে সকল মহিলা সে সংবাদ শুনিয়াছিলেন—তাঁহারা তাহাকে দেখিতে আসিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। বেলা পড়িতে না পড়িতে উকীল-গৃহিণী ডাক্তার-গৃহিণীকে বলিলেন, "দিদি!

লালকুঠীতে যাইবে না?" তিনি বলিলেন, "যাইব। এই খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া—খুকীকে কাপড় পরাইয়া—তোমার ভাশুরের আর বরের জলখাবার গুছাইলেই হয়।" উকিল-গৃহিণী দিদির অবশিষ্ট কাযের ফিরিস্তি শুনিয়াই বুঝিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কায শেষ হওয়া দুর্ঘট। তিনি বলিলেন, "আমি খুকীকে কাপড় পরাইয়া, জলখাবার গুছাইতেছি। তুমি খোকাকে দুধ খাওয়াও।" দিদি ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দুগ্ধ গরম করিবার জন্য উঠিলেন এবং ব্যস্ততাবশতঃ যাইতে দুগ্ধের বাটিটাতেই পদের আঘাত লাগাইয়া অনেকটা দুগ্ধ ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাদের কায শেষ হইতে না হইতে পোষ্টমাষ্টার ঘরণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—"কি গো, তোমরা আজ লালকুঠীতে যাইবে না? ছোট বৌর দিদি আসিয়াছে।" উকীল-গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যাইবার উদ্যোগই করিয়া আছি। অপেক্ষা কেবল তোমার। তোমার কর্ত্তা যে বড় আজ সকাল সকাল ছুটী দিলেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ গো হাঁ। বলে, 'অনেক মেয়ে সতী আছেন, ধরা পড়েছেন রাধা'। আমি ত তবু আসিয়াই উপস্থিত। তোমাদের যে এখনও দেখি, সবই অস্থিত। চল—একটু শীঘ্র কর। কল্যাণীকে আমি খবর দিয়া আসিয়াছি।"

সরোজার আগমন-সংবাদ কল্যাণী পূর্ব্বে পায় নাই; পোষ্টমাষ্টার বাবুর পত্নী বাহির হইবার সময় দাসীকে দিয়া তাহাকে সে সংবাদ দিয়া আসিয়াছিলেন। সে সংবাদ পাইয়া—সংসারের কায সারিয়া লালকুঠীতে যাইতে কল্যাণীর কিছু বিলম্ব হইল। কিন্তু সে যথাসম্ভব শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। কারণ, নীরজার দিদি আসিয়াছেন। তিনি কে? তিনিই কি সরোজা? সে এই কথা যত ভাবিতেছিল—সে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাহার ব্যগ্রতা ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল।

কল্যাণী যখন লালকুঠীতে উপস্থিত হইল, তখন আগন্তুক ও গৃহস্থাদিগের সঙ্গে নীরজা অন্তঃপুরে দালানে বসিয়া ছিল। তাহার শাশুড়ীও তখন তথায় ছিলেন। কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইলেই নীরজা সরোজাকে বলিল,—"দিদি! ইহাঁরই কথা তখন তোমাকে বলিতেছিলাম।—ইনি যতীশ বাবুর স্ত্রী।"

সরোজা কল্যাণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল; মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখে পাণ্ডুবর্ণ ব্যাপ্ত হইল—নয়নে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পর সে অকম্পিতকরে স্বীয় কণ্ঠ হইতে

হার খুলিয়া লইয়া কল্যাণীর অঙ্কস্থ শিশুর কণ্ঠে পরাইয়া দিল ও তাহাকে মাতৃবক্ষ হইতে লইয়া আপনার বক্ষে ধারণ করিল।

কল্যাণী সরোজাকে ভাল করিয়া দেখিল, এই সপত্নী! ইহাকে ভয়? ইহাকে যে দেখিলেই শ্রদ্ধা করিতে—ভালবাসিতে ইচ্ছা করে! সরোজা কল্যাণীকে দেখিল, এই সরলা সপত্নী! ইহাকে স্নেহ না করিয়া কি থাকা যায়? দুইটি রমণীহৃদয়ে পরস্পরের স্বরূপ প্রতিভাত হইল—পরস্পরের প্রতি স্নেহের আকর্ষণ অনুভূত হইল। কল্যাণী সরোজাকে প্রণাম করিল। সরোজা কল্যাণীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

মহিলাদিগের মধ্যে কেহই সরোজার কার্য্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। তাহার পর নীরজার শ্বাশুড়ী তাঁহার পার্শ্বস্থা জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে বলিলেন, "এ কি বাপু? যাহাকে জানি না, চিনি না, তাহার ছেলের মুখ দেখিতে পাঁচ শত টাকার হার দেওয়া! অবাক্ কাণ্ড!"

সরোজা সে কথা শুনিতে পাইল; বলিল, "মা, এ যে আমারই ছেলে। আমার সবই ইহার।"

নীরজার ভগিনীর যে সপত্নী আছে এবং সে পিত্রালয়বাসিনী, সকলে তাহা জানিতেন; কিন্তু কল্যাণীই যে তাহার সপত্নী, কেহই তাহা জানিতেন না। সরোজার কথায় সকলে তাহা বুঝিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনে সকলেই বিস্মিত এবং কেহ কেহ শঙ্কিত হইলেন। নীরজার শ্বাশুড়ী সরোজার কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "তাহা হউক। মা, তোমরা—আজকালের মেয়েরা বড় অবুঝ—বড় অসাবধান। গহনা যে সময় অসময়ের জন্য, তাহাও বুঝ না।" স্বামীর অনাদৃতা রমণী যে সপত্নীপুত্রকে দেখিয়া এমন স্নেহ জানায়—তাহা তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইতেছিল না।

শিশু তখন সরোজার কাপড়ের পাড় লইয়া খেলা করিতেছিল। তাহার মুখচুম্বন করিয়া আপনার নিষ্ফল বক্ষে তাহাকে ধরিয়া সরোজা মনে করিতেছিল, সে অননুভূতপূর্ব্ব অসীম সুখ লাভ করিতেছিল। সে শিশু যেন একান্তই তাহার।

কল্যাণীকে বসিতে বলিয়া সরোজা বসিল। শিশু সরোজার কাছেই রহিল। সরোজা সকলের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু নীরজা কেমন অন্যমনস্কা! সে কেবলই কি ভাবিতেছিল।

যতক্ষণ অন্য সকলের সঙ্গে কল্যাণীও গমনোদ্যতা না হইল, ততক্ষণ শিশু সরোজার কাছেই থাকিল। কল্যাণী বিদায় চাহিলে সরোজা শিশুকে দিল। যাইবার সময় কল্যাণী বলিয়া গেল, "দিদি, ছেলে তোমার—সংসার তোমার। আমি সকালেই আসিব। তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

এত দিনে!

সন্ধ্যার পর ভগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরোজা দেখিল, নীরজা একা বসিয়া ভাবিতেছে। ভগিনীকে দেখিয়া নীরজা কান্দিয়া ফেলিল; বলিল, "দিদি, কেন তুমি আমাকে দেখিতে আসিলে!"

সরোজা ভগিনীর কাছে আসিল—হাসিয়া বলিল, "দেখ, আমার কথা তুই ত সবই জানিতিস্; কেবল জানিতিস্ না যে, তোদের কল্যাণী আমার সপত্নী। ইহাতে কান্দিবার কি আছে?"

সত্যই ইহা ত কিছুই নূতন নহে। তবুও নীরজার মনে হইল, যেন বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় বেদনা আজ নূতন করিয়া অনুভূত হইতেছে—যেন পুরাতন ক্ষত আজ নূতন হইয়া উঠিয়াছে। সে কাঁদিল। তাহার পর সরোজার কথায়—আর সরোজার ব্যবহারে নীরজা আপনার ক্রন্দন যে অকারণ—তাহা বুঝিল; স্থির হইল।

সরোজা ভগিনীকে শান্ত করিল বটে; কিন্তু আপনি শান্ত হইতে পারিল কি? সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না; কেবল ভাবিতে লাগিল। অদৃষ্ট-চক্রের এ কি অপ্রত্যাশিত আবর্ত্তন! এ আবর্ত্তন তাহাকে কেমন করিয়া কোথায় আনিল? কল্যাণী তাহাকে লইয়া যাইবে বলিয়াছে। সে যাইবে কি? পতিপুত্র লইয়া কল্যাণী সুখে আছে, সে তাহার পথে পদার্পণ করিবে কি? নূতন সংসারে যতীশচন্দ্র ত তাহাকে ভুলিয়াছে। তবে—? কিন্তু যতীশচন্দ্র তাহাকে ভুলিয়াছে, ভাবিতেও তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী তাহাকে গ্রহণ করুন, আর নাই করুন—ভুলিয়াছেন কি? তাহার পর সে আবার ভাবিল, সে ত কল্যাণীর সুখের পথে কণ্টক হইবে না; সে ত সে সংসারে থাকিবে না। তাহার দুঃখের ভার লইয়া সে ত আবার পিতৃগৃহেই ফিরিয়া যাইবে! তবে—তবে সে একবার স্বামীকে দেখিবে না? হয় ত জীবনে আর দেখিবার সুযোগ ঘটিবে না। সে কি ইচ্ছা করিয়া এ সুযোগ হারাইবে?

পিপাসিত হৃদয় জুড়াইতে পাইবে না; কিন্তু তৃষিত নয়ন ত জুড়াইতে পারে। এ কি প্রলোভন! বিরজা কাছে থাকিলে সে তাহার পরামর্শ লইত—তাহার উপদেশ-মত কায করিত। আজ সে একাকিনী—অস্থিরচিত্তা—কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া। হায়! রমণীর জীবনে কি বিষম পরীক্ষার সময় সমাগত!

সরোজা সারা রাত্রি ভাবিল। কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বিনিদ্র রজনীর বিশুষ্ক মলিনতা মুখে মাখিয়া সে প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিল। তাহার পর কল্যাণী আসিয়া যখন বলিল, "দিদি, চল আমি সব কায ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি"—তখন সে আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। স্বামি-সন্দর্শনের আশায় সে চিন্তাশক্তিহীনার মত তাহার সঙ্গে গেল। সে নীরজাকে বলিয়া গেল। নীরজা ভগিনীর কথা শুনিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। সরোজা স্বামিসন্দর্শনে গেল।

সরোজা যখন যতীশচন্দ্রের বাসায় আসিল, যতীশ তখন বাসায় নাই। গ্রীষ্মের কয় মাস প্রভাতেই আফিস হয়; যতীশ আফিসে গিয়াছিল। সরোজার কাছে ছেলেকে দিয়া কল্যাণী সংসারের কায করিতে লাগিল; আর এত দিনের সব কথা বলিতে লাগিল। যেন সরোজার নিকট তাহার গোপন করিবার কিছুই নাই তাহার সব কথা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার সরোজার আছে। পিতামহীর মৃত্যু যতীশের অর্থাভাব—তাহার অলঙ্কার ও সম্পত্তি বিক্রয়—বিদেশে চাকরী-প্রাপ্তি কল্যাণী সব কথাই সরোজাকে বলিল। শুনিতে শুনিতে সরোজারও মনে হইতে লাগিল, যেন সে সব কথা জানিতেই তাহার অধিকার। যতীশের অর্থাভাব ও কল্যাণীর স্বার্থ-ত্যাগের কথা শুনিয়া সে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিল, "আমাকে জানাইলে না কেন?" কল্যাণী বলিল, "আমি লিখিতে চাহিয়াছিলাম; উনি বারণ করিয়াছিলেন।" শুনিয়া সরোজার মনে অভিমানের উদয় হইল। হায় প্রেম! তোমার মোহন স্পর্শ মুহূর্ত্তে কত বেদনার—কত যাতনার উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া দেয়, কালের দীর্ঘতা দূর করিয়া দেয়, স্বার্থের নিগড় দূরে নিক্ষেপ করে, সংসার স্বর্গে পরিণত করে! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই—তোমার তুলনা দিবার কিছুই নাই—তোমার মত শক্তি কাহারও নাই। তুমি বিশ্বজয়ী—আর তদপেক্ষাও অজেয় মানব-হৃদয়ও তুমি অবহেলায় জয় করিতে পার। সর্ব্বত্র তোমার গতি—সর্ব্বত্র তোমার অপ্রতিহত প্রভাব।

কল্যাণী রন্ধন শেষ করিল। আবার দুই জন আসিয়া বিরলকক্ষ গৃহের

মধ্যবর্ত্তী কক্ষে বসিল। তাহার পর অদূরে পদশব্দ শুনিয়া কল্যাণী বলিল, "তিনি আসিতেছেন।" সে পুত্রকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সরোজাও দাঁড়াইল।

যতীশ কক্ষে প্রবেশ করিল।

সরোজা দেখিল, সম্মুখে—স্বামী। যে মূর্ত্তি সে হৃদয়ে অহরহঃ ধ্যান করিয়াছে—আজ সেই মূর্ত্তি যেন তাহার হৃদয় হইতে আসিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাহার রমণী-হৃদয় কত ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যতীশ দেখিল, সম্মুখে—সরোজা।

মুহূর্ত্ত উভয়েই নির্ব্বাক্—নিশ্চল হইয়া রহিল। কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিত অবস্থায় রমণী যত সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হয়েন, পুরুষ তত সত্বর তাহা পারে না। সরোজা স্বামীকে প্রণাম করিল—যেন সে হৃদয়ের সকল বেদনা—সকল আকাঙ্ক্ষা পতি-পদে স্থাপিত করিল।

যতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ ?" তাহার হৃদয়ে আজ তাহার সমস্ত জীবনের কত কথা জাগিয়া উঠিতেছিল !

সরোজার মনে হইল, সে স্বরে যেন তাহার হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আকুল আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর দিতে পারিল না। আর সে কেন জানে না—তাহার দুই নয়ন পূর্ণ হইয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু সুখের, কি বেদনার, সরোজা তাহা বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে চাহিল না। কল্যাণী দেখিল, সরোজা কাঁদিতেছে। সে যতীশকে বলিল, "তুমি স্নান করিয়া আইস। বেলা হইয়াছে।"

যতীশ কক্ষান্তরে যাইতেছিল, এমন সময় নীরজার এক ভাশুর-পুত্র আসিয়া বলিল, "ঠাকুর-মা মাসীমা'কে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন।"

কল্যাণী সরোজাকে বলিল, "দিদি, তুমি থাক।"

সরোজা বলিল, "না। আমি যাই।" সে কল্যাণীর নিকট হইতে পুত্রকে লইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর তাহাকে কল্যাণীর নিকট দিয়া বিদায় লইল।

সরোজা জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভগিনীর গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার চক্ষুর সমক্ষে যতীশচন্দ্রের মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল,—তাহার কর্ণে যতীশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছিল।

আপনার হৃদয়ের শক্তিতে যে বিশ্বাস-বশে সে মনে করিয়াছিল, সে ত থাকিতে আইসে নাই—তবে স্বামীকে একবার দেখিবে না কেন?—যতীশকে দেখিয়া—যতীশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার সে বিশ্বাস চূর্ণ—বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, মানুষের হৃদয় দুর্ব্বল—রমণীর হৃদয়ের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে নাই। সে সরলা কল্যাণীর কথা মনে করিল, তাহার প্রেম-প্রফুল্ল সংসারের কথা স্মরণ করিল, আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিল, ভাবিল—এ কি প্রলোভন!

তাই সে গৃহে আসিয়াই রাধাচরণকে বলিল, "চল, আমরা আজ ফিরিয়া যাই।"

রাধাচরণ পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে যতীশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিল, তাহার এক-জন সতীর্থ নিকটবর্ত্তী বাঁকিপুর সহরে আসিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্নে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বাঁকিপুর দেখাও হইবে, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎও হইবে। তাই সে বলিল, "আজই যাইবে?"

সরোজা বলিল, "হাঁ।"

"কল্য হইলে হয় না?"

"না। কুটুম্ববাড়ী অধিক দিন থাকা ভাল দেখায় না।"

রাধাচরণ আর কিছু বলিল না।

কিন্তু সে দিন সরোজার যাওয়া হইল না। নীরজার শ্বাশুড়ীকে যাইবার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "পথ ত অল্প নহে—পরশ্ব সারা রাত জাগিয়া আসিয়াছ, আবার আজই যাইবে না, সে হইবে না। অন্ততঃ আর এক-দিন থাকিয়া—সুস্থ হইয়া যাও। দুই দিন থাকিতে বলিতাম; কিন্তু দেশের যে অবস্থা, বলিতে সাহস হয় না। এই পোড়া রোগ আসিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিল—নহিলে এ স্থানের এমন অবস্থা ছিল না। সে তোমরা শুনিয়াছ।"

তিনি প্লেগের কথা বলিতেছিলেন। তখন বিহারে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে; প্রতি বৎসর বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে শোকার্ত্ত গৃহস্থের আর্ত্তনাদে তাহার বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠে, আর বর্ষার বারিপাত না হইলে তাহার তিরোভাব হয় না।

অপরাহ্নে কল্যাণী আবার আসিল, জিদ করিয়া সরোজাকে বলিল, "দিদি, তুমি যাইতে পাইবে না। তুমি কেন যাইবে?"

সরোজার হৃদয়ে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল। এক দিকে রমণীর প্রেম—

আর এক দিকে স্বার্থত্যাগবুদ্ধি; সে কি করিবে? কল্যাণী যাহাই বলুক, সে কেমন করিয়া তাহার সাজান সংসারে আসিয়া বসিবে? বিধাতা তাহার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই, সে দুঃখ ভোগ করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া অপরের সুখ নষ্ট করিবার অধিকার তাহার নাই। স্বামিসন্দর্শনের সৌভাগ্য—স্বামীর সম্ভাষণ শ্রবণের সৌভাগ্য সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্মৃতি লইয়া সে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবে। সে-ই তাহার নিয়তি; সে প্রবল বলে প্রেমপ্রণোদিত বাসনাকে পরাভূত করিল; কিছুতেই কল্যাণীর অনুরোধ রাখিল না। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি চিরসুখিনী হও। তোমার স্নেহ-ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। তুমি আমাকে দেবদর্শন করাইয়াছ—আমার জীবন সার্থক করাইয়াছ। কিন্তু আমি থাকিতে পারিব না।"

কল্যাণী বলিল, "তুমি আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ আমরা তোমার। স্বামী তোমার—ছেলে তোমার—সংসার তোমার—আমি তোমার। তোমাকে আসিতে হইবে। সংসারে সুখ পাই ভাগ করিয়া লইব; দুঃখ পাই—ভাগ করিয়া ভোগ করিব। তুমি আসিবে না কেন?"

সরোজা যুক্তিতে কল্যাণীকে পরাস্ত করিতে পারিল না; কল্যাণীর যুক্তিই তাহার হৃদয়ে উদ্গত হইতেছিল। কিন্তু সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিল—সে যাইবে, থাকিবে না।

কল্যাণী শেষে বলিল, "তুমি যাইবে যাও; কিন্তু তোমাকে আসিতেই হইবে। তোমাকে আনিতে আমি যাইব—খোকাকে লইয়া যাইব;—উনি যাইবেন। তুমি কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?"

সরোজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য।

কিন্তু কল্যাণীর স্বার্থত্যাগ—আত্মত্যাগ দেখিয়া তাহার হৃদয়েও স্বার্থত্যাগবুদ্ধিই প্রবল হইয়া উঠিল।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

(২)

উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহারীলালের প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের চারি বর্ষ পরেই তাঁহার প্রথমা পত্নী অভয়া দেবীর একটি মৃত সন্তান প্রসবের পর সূতিকাগারেই মৃত্যু হয়। বিহারীলাল 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের "সরলা" নামক সর্গে তাঁহার সাময়িক শোকোচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহারীলাল দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। বিহারীলালের দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বরী দেবী সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তিনি পতির কবিত্বের অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি স্বামীর কবিতা-রচনায় সহানুভূতি দানে এবং রূপে ও গুণে স্বামীকে আজীবন মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন। বিহারীলালের অপরিসীম পত্নীপ্রেম তাঁহার অধিকাংশ রচনাতেই পরিব্যক্ত। 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের শেষ গীতটি বিহারীলালের পত্নী-প্রেমাত্মক রচনার চূড়ান্ত নিদর্শন।

অনুমান পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিহারীলালকে অর্থচিন্তা করিতে হয় নাই। তাঁহার পিতা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। কিন্তু এই সময়ে তাঁহর পিতার শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। বিহারীলাল তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে কাশ্মীরী রেশম রপ্তানী করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। নীলাম্বর বাবু তৎকালে কাশ্মীর-রাজ্যে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু বিহারীলাল সেই রেশমের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে তাঁহার আত্মসম্মান লাঘব হইবার আশঙ্কা দেখিলেন এবং উহা ত্যাগ করিলেন। অনুমান চল্লিশ বৎসর বয়সে বিহারীলালের পিতার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত বিহারীলাল পৈত্রিক যজমান রক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কমলার কৃপাপাত্র সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য করিয়া তিনি মাসিক প্রায় আড়াই শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। বিহারীলাল মিতব্যয়ী ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি দয়ালু ছিলেন। সুতরাং তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। তিনি স্ত্রী-পুত্র কন্যাগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা

বৃদ্ধির জন্য সাধ্যাতীত ব্যয় করিতেন। আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অতি উপাদেয় ভোজন করাইতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। এতদ্ভিন্ন পুত্রগণকে তিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন ও কন্যাগণের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে শেষ জীবনে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

বিহারীলাল বাল্য বয়সে উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত ছিলেন এবং কুসংসর্গেও মিশিয়াছিলেন। কিন্তু পাপের উপর তাঁহার তৎকালেও দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি জীবনে এমন কোনও কার্য্য করেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে বিবেকের নিকট লজ্জা পাইতে হয়। বাল্যকালের অবাধ জীবনযাপন তাঁহার স্বভাবকে অগ্নিপরীক্ষায় শোধিত করিয়া দিয়াছিল,—উত্তর কালে তাঁহার চরিত্রের শ্যামিকা বিদূরিত হওয়াতে তিনি খাঁটি সোণায় পরিণত হইয়াছিলেন। বিহারীলাল উন্মুক্তহৃদয় ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। তিনি মনের সকল কথা অকপটে প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও অতিশয় তেজস্বী ছিলেন। দুর্ব্বলের পীড়ন দেখিলে তিনি সাধ্য থাকিলে প্রতীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। যৌবন কালে একবার একটি সমারোহের বরযাত্রা দেখিবার জন্য রাজপথে সমবেত নিরীহ জনসঙ্ঘের উপর একজন য়ুরোপীয় সার্জ্জনকে অত্যাচার করিতে দেখিয়া, তিনি সেই সার্জ্জণ্ট পুঙ্গবকে গ্রীবাধারণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। আর এক দিন বড়বাজারে একটি কাবুলী মেওয়া বিক্রেতা অকারণে তাঁহাকে অপমানসূচক কথা বলাতে তিনি মুষ্ট্যাঘাতে তাহার মুখ বিকৃত করিয়াছিলেন। উভয় স্থলেই তাঁহার নিজের নির্য্যাতিত হইবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবার সময় তাঁহার বিপদের ভয় থাকিত না। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্যের অনুরূপ মনের সাহসও যথেষ্ট ছিল। বিহারীলালের আকৃতি ও চাল চলন দেখিলেই তাঁহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি যখন পথে চলিতেন তখন মনে হইত তিনি জগৎ সংসারের কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা ছিল না এবং মান-সম্ভ্রম লাভেও তাঁহার স্পৃহা ছিল না। জনসাধারণের নিকট কবিখ্যাতি লাভ করিবারও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি বাণীসেবায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি একদিকে যেমন তেজস্বী ছিলেন, অপর দিকে আবার তেমনই পরম দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার দীনহীনের প্রতি

বদান্যতার, আর্ত্তের সেবার ও পরোপকারিতার কথা শুনিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না।

এ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট একটি দীর্ঘকায় হিন্দুস্থানী তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। বাটী আসিয়া তিনি সেই ভিক্ষুকের কাতর দৃষ্টি ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, হয় ত সে যথার্থই ক্ষুৎপীড়িত। তিনি অবিলম্বে বাটী হইতে কিছু মিষ্টান্নাদি আহার্য্য লইয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি ক্ষুধায় অবসন্ন ও বাক্‌শক্তিরহিত অবস্থায় শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে পুষ্টকায় দেখিয়া কেহ তাহাকে ভিক্ষা দেয় নাই। সে কলিকাতায় নবাগত এবং চারিদিন অনাহারে ছিল। তিনি ধীরে ধীরে নিজ হস্তে আহার ও জলপান করাইয়া তাহাকে সুস্থ করেন। আর একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় তিনি দেখেন যে, পথের ধারে একটি বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতেছে এবং তাহার ক্রোড়ে তাহার প্রৌঢ়া কন্যা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া শুইয়া আছে। তাহারা পল্লীগ্রাম হইতে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল এবং কলিকাতায় নিরাশ্রয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া নিকটস্থ ডাক্তার হনিংবার্কের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইলেন এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে আরোগ্যলাভ করিলে তিনি তাহাদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

বিহারীলাল নিরতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি দুই চারিটি কথায় অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতেন। ভাসা ভাসা ভালবাসা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি বন্ধুগণকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা ছিল যে, বিহারীলাল তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন। তিনি বন্ধুদিগের বিপদে সম্পদে দুঃখে সুখে সমভাবে সহায় থাকিতেন। বিহারীলালের বাল্যকালের বন্ধুগণের মধ্যে হাইকোর্টের উকিল ৺ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকোর কবিরাজ ৺ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, ডাক্তার ৺ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকমল বাবুকে তিনি সোদরাধিক ভালবাসিতেন এবং কৃষ্ণকমল বাবুও তাঁহার সহিত সোদরের মতই ব্যবহার করিতেন। সাহিত্য-চর্চ্চা ও পুস্তক মুদ্রাঙ্কনাদি সূত্রে তিনি বটতলার পুস্তকপ্রকাশক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল

ভক্ত ও চোরবাগানের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দের সহিত সখ্যতায় আবদ্ধ হয়েন। যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া তিনি রামবাগানের ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সুকবি দার্শনিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে আকৃষ্ট হয়েন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে কবিভ্রাতা বলিয়া আদর করিতেন এবং বিহারীলালও সেই শ্রদ্ধার তুল্য মূল্যে প্রতিদান করিতেন। সাহিত্যের পীঠস্থান যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীর পরিবার-বর্গের সহিত তিনি এরূপ ঘনিষ্ঠ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং ঠাকুর বাটীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার কবিতায় এত অনুরাগী ছিলেন যে, বিহারীলাল এক সময়ে "ঠাকুর বাড়ীর কবি" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিহারীলাল তাঁহার প্রীতিভাজন বয়ঃকনিষ্ঠদিগের সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন এবং খোলা প্রাণে আলাপ করিতেন। তাঁহাদের সম্মুখে তক্তপোষ বাজাইয়া গান করিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, ৺ রাজকৃষ্ণ রায়, ৺ অধরলাল সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অনেকানেক তৎকালীন উদীয়মান কবি ও সাহিত্য-সেবী বিহারীলালের ক্ষুদ্র ভবনে যাতায়াত করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন, কবির সাহায্যে সাহিত্য-সেবায় উদ্দীপিত হইতেন এবং কবির নিকট উৎসাহ, প্রীতি ও সদুপদেশ পাইতেন।

রঙ্গপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়ের সহিত জীবনে কখনও সাক্ষাৎ না হইলেও কেবল মাত্র পত্রবিনিময়েই তিনি প্রগাঢ় হৃদ্যতা স্থাপন করেন। অনাথবন্ধু বাবু 'সারদা মঙ্গল' পাঠে মুগ্ধ হইয়া কবিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একখানি পত্র লিখেন এবং তাহাতেই এই সখ্যতার সূত্রপাত। বিহারীলালের বন্ধুপ্রসঙ্গে দুই জন ভদ্র মহিলার কথা উল্লেখ না করিলে কবির বন্ধুর তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের কথা 'সাধের আসন' কাব্য রচনার প্রসঙ্গে পরে বলিব। আর এক জনকে কবি তাঁহার সারদা মঙ্গল কাব্য "উপহার" দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাকে কবি কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা সেই "উপহার" কবিতাতেই সপ্রকাশ।

বিহারীলালের কবিতা রচনাপ্রণালীরও কিছু বিশেষত্ব ছিল। বিহারীলাল রজনীযোগে, শয়ন কক্ষে কখনও বা উন্মুক্ত ছাদোপরি কবিতা রচনা

করিতেন। সাধারণতঃ শয়নাবস্থাতেই লিখিতেন। তিনি লিখিবার সময় শ্লোকগুলি মৃদুস্বরে গান করিতেন এবং সে সময়ে এত তন্ময় হইতেন যে, সন্ধ্যায় সজ্জিত তাম্রকূট ভোররাত্রে সবে মাত্র সাজিয়াছেন ভাবিয়া সেবন করিতে যাইতেন। তিনি যখন লিখিতেন, তখন তাঁহার বিরাম থাকিত না, কিন্তু মনের সে ভাব চলিয়া যাইলে তিনি আবার বহুদিন ধ্যানভগ্নই থাকিতেন, লেখনী স্পর্শ করিতেন না। লেখনী হস্তে বৃথা বসিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি রচনা বহুবার সংশোধন করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহার মনঃপূত হয়, ততক্ষণ তাঁহার কবিতা সংশোধনের বা পরিবর্ত্তনের বিরাম থাকিত না। নিজের মনঃপূত না হইলে তিনি কখনও কবিতা প্রকাশ করিবার সম্মতি দিতেন না। মুদ্রাঙ্কণে প্রমাদের উপর তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি সে কালের পদ্ধতি অনুযায়ী একটি দপ্তর বাঁধিয়া তাহার মধ্যে তাঁহার রচনা রক্ষা করিতেন। টেবল দেরাজ বাক্সের তাঁহার প্রয়োজন হইত না।

অনুমান ৪৫ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিহারীলাল নিরাময় স্বাস্থ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কয়েকবার মাত্র তাঁহার পাদমূলে বিস্ফোটক হইয়া তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি কঠিন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েন। তাঁহার শেষ রচনাগুলি এই অসুস্থতার সময়েই রচিত হয়। মৃত্যুর ২।৩ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে পীড়া প্রবল আকার ধারণ করে। তখনও কিন্তু তিনি শয়ন কক্ষের নিভৃতে বসিয়া দুর্ব্বল হস্তে লেখনী ধারণ করিতেন ও নিজের রচনাগুলি গুণ গুণ স্বরে গান করিতেন। কখনও দেহ ও মনের শ্রান্তি বশতঃ রচনা কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া তিনি সাশ্রুনয়নে গাহিতেন—

"ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে।"

এই সময়ে তিনি বাহির হইতে পারিতেন না। কিন্তু শেষ দশায় তিনি বাটীতে থাকিলে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের মত অস্থির হইয়া উঠিতেন ও কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীর বাহিরে যাইয়া, পল্লীর মধ্যে যেখানে হয় এক জায়গায় বসিয়া থাকিতেন। এই অবস্থায় বিহারীলাল একদিন রাজপথে বাহির হইতেই দেখিলেন, যেন তাঁহার সম্মুখস্থ সৌধমালা ও জনস্রোত সমস্তই বিলীন হইয়া এক তীব্র জ্যোতিতে তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া যাইল এবং সেই দীপ্ত আলোকের মধ্যস্থলে তাঁহার আজীবনের আরাধ্যা কবিকল্পনার

সৌন্দর্য্যসার সারদা মূর্ত্তি। আর এক দিন নিজ বাটীর ত্রিতলের ছাদের উপর বসিয়া তিনি ঠিক এইরূপ দৃশ্য দর্শন করেন। বঙ্গীয় ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণ ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সারদাভক্ত কবির ধ্যানস্তিমিত নেত্র চির-মুদ্রিত হইয়া যায়।

মৃত্যুকালে বিহারীলাল ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্যা রাখিয়া যান এবং তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নীও তখন জীবিতা ছিলেন। কন্যাগণের মধ্যে ৫জন তৎকালে বিবাহিতা এবং পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যতীত অপর সকলেই পঠদ্দশায়। বিহারীলালের পত্নীকে তাঁহার জনৈক স্নেহাস্পদ বন্ধু "রত্নগর্ভা" সম্ভাষণ করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিহারীলাল তাঁহার মধ্যম পুত্রকে এম্ এ পরীক্ষায় এবং তৃতীয় পুত্রকে বি এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিতে এবং চতুর্থ পুত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উচ্চ বৃত্তি পাইতে দেখিয়া যান। কবির তৃতীয় পুত্র এক্ষণে ব্যারিষ্টার ও কবিকুলতিলক রবীন্দ্রনাথের জামাতা হইয়াছেন। ঠাকুর বাটীর পরিবারবর্গের সহিত বিহারীলাল জীবিতকালে যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর কুটুম্বিতায় পরিণত হইয়াছে।

শ্রীনবকুমার ঘোষ।

তুমি ও আমি।

তুমি আঁধার কুটীরে জ্বা'ল দীপটিরে আশা উজ্জ্বল করি'
আমি ঝটিকা ভীষণ পরশ্রীকৃপণ লই সে আলোক হরি'।
তুমি জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ আতপদগ্ধ জগতে দিতেছ শান্তি,
আমি প্রলয়ের মেঘে রুদ্র আবেগে উরি সংহারকান্তি।
তুমি প্রদোষ-গগনে শোণিত-বরণে দাও যেই আলিপনা,
আমি আঁধারের বেশে ধীরে সেথা এসে মুছে দি' যত্নে কত না।
তুমি তৃষিত নয়নে ধূসর বালুর পরপারে জল-রেখা
আমি খলখল হাসি মরীচিকা আসি দিই নিরাশার লেখা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সুকবি ও নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু একান্ত অতর্কিত—অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। তাঁহার মৃত্যুতে যে নাটকসুলভ আকস্মিকতা ছিল, তাহা বাস্তব জীবনে সচরাচর লক্ষিত হয় না। মৃত্যুর দিন মধ্যাহ্নের পর হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্যিক কার্য্যে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। যিনি বঙ্গ বন্দনায় গাহিয়াছিলেন, "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়," তিনি মৃত্যুমূর্চ্ছার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'সিংহল-বিজয়' নাটকের সংশোধন কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। সেই কার্য্য শেষ করিতে না করিতে তিনি অবসন্ন হইয়া আসন হইতে হর্ম্ম্যতলে পতিত হয়েন ও পুত্রকে ডাকেন। তাহার পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অজ্ঞান অবস্থাতেই কয় ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগ-যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা-বিহ্বল না হইয়া সম্মান-সম্পদ-সন্তান-পরিবৃত হইয়া—সাহিত্য-সাধনা-সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে এই মৃত্যু কবির কাম্য হইতে পারে; কিন্তু আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া—বাঙ্গালী পাঠককে আশায় হতাশ করিয়া—প্রতিভার পরিচয়মাত্র দিয়া—অকালে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মহাপ্রস্থান বাঙ্গালীর পক্ষে বিষম বেদনার কারণ। এরূপ মৃত্যু বজ্রাঘাতের মত যাহার বক্ষে পতিত হয়, তাহাকে যন্ত্রণা জানিতে দেয় না; কিন্তু আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অনুরক্ত ভক্ত, আশ্রিত অনুগত সকলের পক্ষে বেদনাদায়ক হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীর বেদনার বিশেষ কারণ বিদ্যমান। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল অবলম্বিত রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া নষ্ট স্বাস্থ্য কতকাংশে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি আবার সেই কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া রাজকার্য্য হইতে বিদায় লইয়া যখন অনুশীলন-তীক্ষ্ণ প্রতিভার সাহায্যে বঙ্গ-সাহিত্যকে নূতন সৌন্দর্য্যে সুন্দরতর করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখনই মৃত্যু তাঁহাকে আপনার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রাজ্যে লইয়া গেল! বঙ্কিমচন্দ্র একদিন স্বীয় কণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য লইয়া যে তরুণ সাহিত্য-সেবীকে পরাইয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের শোক-সভায় বলিয়াছিলেন, সেই

"বাঙ্গালা পাঠকদিগের সুহৃৎ, এবং সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তান"—"জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে, নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া * * অকালে অস্তমিত হইলেন।" আজ দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধেও আমরা সেই কথাই বলিব।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজসংসারে দাওয়ান ছিলেন। "কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে" ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥"

মদনগোপাল কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের প্রপিতামহ ও রামগোপাল তদীয় অগ্রজ। কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সহিত রায়পরিবারের প্রভুকর্ম্মচারিসম্বন্ধ পুরুষানুক্রমিক। মদনগোপাল "রায় বক্সী পদাভিষিক্ত হওয়া অবধি তাঁহার অধস্তন পুরুষদের রায় উপাধি হইয়া রহিয়াছে।" কার্ত্তিকেয়চন্দ্র দীর্ঘকাল রাজসংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি 'আত্মজীবন-চরিতে' লিখিয়াছেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই রাজাদের অতি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এবং জ্ঞাতি কুটুম্বের ন্যায় সমাদৃত ও সম্ভাবিত হইতেন।" কার্ত্তিকেয়চন্দ্রও প্রাণপণে এই পরিবারের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। রাজা শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজসংস্থাপন, বিধবা-বিবাহপ্রবর্ত্তনাদির সপক্ষ হওয়ায় কৃষ্ণনগরের হিন্দু-সমাজ যখন বীরনগরের (উলার) বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া—নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের সহায়তায় ও তারিণীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বুদ্ধিবলে চালিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তখনও কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রাজাকে ত্যাগ করেন নাই; উচ্ছৃঙ্খল সতীশচন্দ্র যখন সমাজে নিন্দিত হয়েন, তখনও কার্ত্তিকেয়চন্দ্র তাঁহাকে স্নেহদানে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, সদালাপী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু জরা তাঁহার দেহ হইতে রূপ-লাবণ্য মুছিতে পারে নাই; পরন্তু তাহাতে গাম্ভীর্য্যের সৌন্দর্য্য যোগ করিয়াছিল। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সহিত দীনবন্ধুর প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। দীনবন্ধু কৃষ্ণনগর-বর্ণনায় জলাঙ্গীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

"এখন সতীশচন্দ্র রাজা তথাকার।

* * *

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্যপ্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্,
সুললিতস্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হ'য়ে উজান-বাহিনী,

দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনীতে'ও কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের উল্লেখ আছে ;

"যদবধি হাঁদা পেট হেরেছি নয়নে,
পূর্ণচন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।"

এই "কার্ত্তিকেয়" এক দিকে ময়ূরবাহনপক্ষে, অন্য দিকে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়পক্ষে প্রযুক্ত। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি তাঁহার 'আত্মজীবন-চরিত' ও কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে লিখিত কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' গ্রন্থদ্বয়ে সপ্রকাশ। উভয় গ্রন্থেই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে। উভয় গ্রন্থেরই ভাষা সরল, এবারত (style) সরস। সুতরাং বলা যাইতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভা দুই পুরুষের অনুশীলনের স্ফুরণ। দ্বিজেন্দ্রলালের দুই ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলালও বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রলালের 'পতাকা' এক সময় বাঙ্গালার সংবাদপত্রের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক বরদাপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহযোগী ছিলেন। 'নবজীবনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"এম এ, বি, এল, এল কত উড়ায়ে পতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত শত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা
সঙ্গে তার শাস্ত্রী মিস্ত্রী"—ইত্যাদি

রায় ভ্রাতৃগণের প্রবর্ত্তিত 'নবপ্রভা' পত্রও উল্লেখযোগ্য।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বিশেষ যশস্বী। ইহাঁদের অনেকে হিন্দু সমাজে বিবিধ পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে সকল চেষ্টার সহিত কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সে কথা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন।

সাহিত্যপ্রীতি ও সঙ্গীতানুরাগ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "বাল্যকালাবধি আমার সঙ্গীত-

বিদ্যায় অতিশয় অনুরাগ ছিল।" 'আর্য্যগাথা'র (১ম ভাগ) ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "শৈশব হইতেই গীতি-রচনায় আমার আসক্তি ছিল।"

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এস, কে, লাহিড়ী নামে সুপরিচিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত শরৎকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের এই গীত সংগ্রহই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। ইহাতে প্রকাশিত "মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার" প্রভৃতি দুই চারিটি গান আজও সমাদৃত। এই 'আর্য্যগাথায়' দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের বিশেষত্ব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইহাতে স্থানে স্থানে বিদেশীয় কবিদিগের রচনার ভাব আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের ভাব-সম্পদে প্রয়োজনানুসারে আপনার রচনার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেন। যিনি পরবর্ত্তী কালে "আমার দেশের" ও "আমার জন্মভূমির" লেখক বলিয়া বঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশভক্তি—দেশ মাতৃকার চরণে প্রণত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই 'আর্য্যগাথা'য় সপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলাল এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"প্রণয় রমণী জীবন
ইহকাল পরকাল।"

তিনি আপনার রচনায় প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রেমকেই রচনার একমাত্র বিষয় বিবেচনা করিতেন না। 'আর্য্যগাথার' ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্য্যগাথা' তাঁহাদের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরাসঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্য্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।" 'আর্য্যগাথা' দ্বিজেন্দ্রলালের ইংলণ্ডযাত্রার পূর্ব্বে প্রকাশিত। তাঁহার প্রবাসে প্রকাশিত ইংরাজী কবিতাপুস্তক 'The Lyrics of Ind' পুস্তকেও এই স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় আছে। সে পুস্তকের প্রথম কবিতা "The Land of the Sun" (সূর্য্যের দেশ) ভারতবর্ণনা। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"O my land ! can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled ?
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O sweet Ind ! once the queen of the world"

ভুলিতে কি পারি তোমা হে মোর স্বদেশ,
যদিও আঁধারে—দুখে নিমজ্জিতা তুমি ?
এক দিন ছিলে তুমি জগতের রাণী
মধুর সৌন্দর্য্যে ভরা হে ভারত-ভূমি !

এই ইংরাজী কবিতা-পুস্তক-সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক ইংরাজীতে লিখিত হইলে সভ্য জগতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। কিন্তু বিদেশীর পক্ষে ইংরাজীতে কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করিয়া স্থায়ী যশের আশা করা যায় না—যাইতে পারে না। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে দিক্‌পাল ; কিন্তু তাঁহাদের ইংরাজী রচনা আজ বিস্মৃতির অন্ধ অতলে স্থান লাভ করিয়াছে। তরু দত্ত বা মনোমোহন ঘোষ কেহই ইংরাজী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলে সাহিত্যের সম্পদ্ সম্বর্দ্ধিত হইত—তাঁহাদের ভাগ্যেও স্থায়ী যশোলাভের সম্ভাবনা থাকিত। দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী রচনায় নিপুণতা ছিল। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী কবিতা-পুস্তক বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, ইংরাজী ও ভারতীয়—উভয় কবিতাই মধুর ; তবে একটিতে ধর্ম্ম কবিতায় পরিণত, অপরটিতে কবিতা ধর্ম্মে পরিণত। দুই দেশের সঙ্গীতের প্রভেদও তিনি একবার এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "ইংরাজিগানে একটা সংযমের ভাব আছে, যাহা হিন্দুগানে নাই। ইংরাজিগান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর, হিন্দু গান আনন্দাধিক্য হেতু পীড়াজনক। একটি উন্মীলনোন্মুখ, অপরটি অর্দ্ধ-নিমীলিত। একটি জাগরণ, অপরটি তন্দ্রা। একটি আনন্দ, অপরটি ভোগ। একটি দিবা, অপরটি সন্ধ্যা। একটি যেন রাজপথে নির্ভয়া, স্বাধীনগতি, স্বাবলম্বা, বিংশতিবর্ষীয়া সুকুমারী ইংরাজ-মহিলা ; অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গণে সলজ্জা, সশঙ্কগতি, গৃহপ্রবেশোদ্যতা, ষোড়শী, সুন্দরী, বঙ্গবধূ। একটি যেন প্রভাতের আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া ; অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল। একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্য্যমুখী ; অপরটি যেন সভয়া

বিনতনয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য; অপরটি বিলাপ।" * তিনি এই মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন কি না, জানি না। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সঙ্গীতের মত তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাকেরও তুলনা করিয়াছিলেন। † তাহাতে "চলিবার পক্ষে প্যাণ্টকোট ধুতিচাদরের চেয়ে সুবিধা" স্বীকার করিয়াও তিনি বলিয়াছিলেন—"ইংরাজি পোষাক বাঙ্গালিকে ভালো মানায় না" আর "ইংরাজি পোষাক আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালি মহিলাকেই মানাইতে দেখি নাই।" এই প্রবন্ধের শেষাংশ তিনি বলিয়াছিলেন, "মহিলাদের অলঙ্কার-পরা উঠিয়া যাইতেছে। সেটি দুঃখের বিষয়। হাতে বলয়াদি, গলদেশে চিক ও হার, কর্ণে দুল ও মাথায় ফুল এবং ফুলের অনুকারী গহনা দেখিতে সুন্দর।" এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আশা করি, পরিণত বয়সে তিনি তাহার জন্য লজ্জিত হইয়াছিলেন ও তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। কলিকাতা যখন অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন কৃষ্ণনগর কলেজে বঙ্গের বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। দ্বিজেন্দ্রলালের পঠদ্দশায় কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অবশেষ ছিল। এম, এ,. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী ছাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারী বৃত্তি পাইয়া বিলাতে গমন করেন; উদ্দেশ্য—কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন। কৃষিবিষয়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তাহার নাম Crops of Bengal. সেই পুস্তকে তিনি চাকরী হইতে বিদায় লইয়া কৃষিকার্য্য করিবেন—এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পৈতৃক বাসগৃহের পার্শ্বে তাঁহার জন্য বাঙ্গলো রক্ষিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। হিন্দু-সমাজ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত তাঁহাকে অঙ্কে স্থান দিতে অসম্মত। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হিন্দু সমাজের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন—প্রতিবাদের ভাষা জ্বালাময়ী—ভঙ্গী ভীষণ। দ্বিজেন্দ্রলালই বলিয়াছেন, "ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার

* ভারতী—১৩০৩।
† ভারতী—১৩০২।

ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।" দ্বিজেন্দ্রলাল এই পুস্তকে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। তবে এই রচনার ভাষায় অসংযমের চিহ্ন অত্যন্ত অধিক। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবেশের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু বলুন, কোন্ পাপের? আমরা বানর ছাড়িয়া দেবতার সহিত মিশিয়াছি বলিয়া? * * * বরং আমরা আপনাদের সমাজে যে ছিলাম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, রাজি আছি।"—আবার—"হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার * * শরীরে বেদনা হয়, গায়ে জ্বর আসে;—এক কথায় আপনাকে শালা বলিতে ইচ্ছা করে।" বিচলিত হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা যে তীব্র হইয়া উঠিত, তাহা 'মন্দ্রে'র ভূমিকাতেও দেখা যায়। 'একঘরে'য় দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাসক্ষমতার—বিদ্রূপ-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হাসির গানে—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপরচনায় তিনি বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় 'একঘরে'য় পাওয়া যায়। তবে 'একঘরে'য় যাহার অঙ্কুর—পরবর্ত্তী রচনায় তাহা বিহগবিরাবিতশাখ—ঘনচিক্কণশ্যামপল্লব-সুশোভিত—অলিকুলসঙ্কুলকুসুমশোভাসুন্দর বৃক্ষ।

'আর্য্যগাথা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, "দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে * * আজ আমি আর সেই পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ় জগতের দূরস্থ পরিদর্শক বিস্মিত বালক নাই * * * মলয়ানিলস্পৃক্ত প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।" এই পুস্তকখানি—

"শিশির-স্নিগ্ধ মেদুরা, কিশলয়পেলব বামা
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা॥

"বঙ্গগরিমা" বঙ্গাঙ্গনা "দেবী গৃহলক্ষ্মীর" করে উপহার। পুস্তকের অর্দ্ধাংশ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদেশীয় গীতের অনুবাদে ও অর্দ্ধাংশ মৌলিক রচনায় পূর্ণ। ইহার কয়টি গান বড় মধুর—

"আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে
নিরখি তোমার হাসি।"

পড়িলেই এডগার্ এলেন পো'র কবিতা মনে পড়ে –

"—The moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I see the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee"

যখন চন্দ্রমা উঠে আমার হৃদয়ে ফুটে
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সেই তাহারি স্বপন;
যখনি তারকা হাসে আমার নয়নে ভাসে
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সেই তাহারি নয়ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনায়' এই গীতসংগ্রহ সমালোচিত হয়। সে সমালোচনায় গানগুলির গুণও যেমন দেখান হইয়াছিল—দোষেরও তেমনই উল্লেখ ছিল। "আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজি প্রথার ভাষা আমাদের কানে খারাপ লাগিয়াছে। ইংরাজি ভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে দোষ নাই কিন্তু এমন অনেকগুলি ভাব আছে যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, সেগুলি বাঙ্গালায় বর্জ্জনীয়। 'চেয়োনা বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে।' ইংরাজীতে Cold শব্দের সহিত যে একটি অপ্রিয় ভাবের যোগ আছে বাঙ্গলায় তাহা নাই এবং হইতেও পারে না। সেই জন্য 'হিম আঁখি শব্দটা কানে বিজাতীয় বলিয়া ঠেকে।" "আর্য্যগাথায় স্থানে স্থানে ঘৃণা শব্দের অপপ্রয়োগ হইয়াছে।"

"কাঁদিব না দীনহীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ!"

"দুটি ছত্রের অর্থ বুঝাই কঠিন।" "কোন কোন গানের পদ এতই বিপর্য্যস্তভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার অর্থগ্রহ চেষ্টাসাধ্য হইয়া পড়ে। * * * গানের ভাষায় এরূপ অসরলতা দোষ মার্জ্জনীয় নহে।" "গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কবি স্কচ্, ইংরাজি এবং আইরিশ্ গানের যে সকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাষা অনেক স্থলে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছে।"

সন ১৩০১ সালে 'সাধনা'র যে সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপ কবিতা 'কেরাণী' প্রকাশিত হয়। কবিতার নিম্নে কবির নাম ছিল না; তাই এই কবিতায় নূতন রসের ও

নূতন ভাবের পরিচয় পাইয়া বাঙ্গালার বহু সাহিত্যিক সন্ধান করিয়া লেখকের নাম জানিয়াছিলেন। এই "কেরাণী" কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিহাস কবিতায় নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করে। অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা'য় "কেরাণী" ও চৈত্র মাসে 'সাহিত্যে' "অদল-বদল" প্রকাশিত হয়। ইহার পর 'সাহিত্যে' দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি বিদ্রূপ কবিতা ও 'ভারতী'তে কতকগুলি হাসির গান প্রকাশিত হয়।

এই সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যিক সমাজের অবস্থা সাহিত্যালোচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। সকল দেশেই এক এক সময় সাহিত্যে বা শিল্পে সমুন্নতির যুগ দেখা যায়। এ দেশেও এই সময় সাহিত্যের সমুন্নতির যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রবর্ত্তিত করেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্য রাজতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত; বঙ্কিমচন্দ্র সম্রাট। তিনি হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রপ্রমুখ কবি, অক্ষয়চন্দ্র চন্দ্রনাথপ্রমুখ প্রবন্ধলেখন, রামদাস রাজকৃষ্ণপ্রমুখ ঐতিহাসিককে লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের অনেকের প্রতিভা চন্দ্রমারই মত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাভাস্করের প্রতিফলিত জ্যোতিঃতে দীপ্তিসমুজ্জ্বল হইয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র বিলোপের পর হইতে তাঁহাদের রচনায় আর বৈশিষ্ট লক্ষিত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের আভির্ভাবকালে বঙ্গসাহিত্য সাধারণতন্ত্রশাসিত। বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মত সাংনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যে ভাবগঙ্গাপ্রবাহ প্রবাহিত করাইয়াছিলেন তখন তাহার পুণ্য-ধারা শত শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র সাহিত্যকে স্নিগ্ধ শ্রী ও সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে; কিন্তু তখন আর একজন সেই শত ধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না। তখন সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নানা সাহিত্যসেবকের আবির্ভাব হইয়াছে। 'সাধনা'র এই সমৃদ্ধি-সময়কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ জোয়ারের সময় বলা যাইতে পারে। তখন রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়, রসরচনায় বাঙ্গালাসাহিত্যে নূতন শক্তিসঞ্চার করিতেছেন। তাঁহারই আহ্বানে বিজ্ঞবর কৃষ্ণবিহারী সেন, সুধী উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হিন্দু সভ্যতার ঐতিহাহিক রমেশচন্দ্র দত্ত, সাহিত্যশিল্পী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রমশীল সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি লেখকগণ 'সাধনা'য় নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। তখন 'সাধনায়' বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র শক্তি সাহিত্যের প্রসাধনে নিযুক্ত হইয়া যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেছে সে সকল সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 'সাধনায়' আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে নবীন লেখকদিগের রচনার প্রতি বর্ত্তমান মাসিকপত্র-সম্পাদকদিগের অযথা অবজ্ঞার প্রতিবাদকল্পে 'সাহিত্য' সৃষ্ট হইয়াছে! আর 'সাহিত্য'ক্ষেত্র সুসজ্জিত করিয়া হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত চুনীলাল গুপ্ত, নিত্যকৃষ্ণ বসু, কুলভূষণ ভাংড়ী, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি তরুণ লেখকদিগের রচনাকুসুম বিকশিত হইতেছে। যে ইণ্ডিয়া ক্লাব আজ জীবিত, কিন্তু জীবন্মৃত—বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যের অভাবে যাহা সমাজে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না, সেই ইণ্ডিয়া ক্লাব তখন বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মিলন-স্থান। এই ইণ্ডিয়া ক্লাবের কতিপয় সভ্য আবার 'ডাকাইত ক্লাব' সংগঠিত করিয়া সভ্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের ও সৌহার্দ্দ্যের উপায় করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া ক্লাবে ও ডাকাইত ক্লাবে সাহিত্যিক আলোচনা হইত; কখন ক্লাবগৃহে, কখন কোন উদ্যানে, কখন বা নৌকায় সম্মিলিত সভ্যগণ সঙ্গীতসাহিত্যাদির আলোচনা করিতেন। সম্মিলনে নানা সাহিত্যিক কথার আলোচনা হইত। এই সকল সম্মিলনে দ্বিজেন্দ্রলালও থাকিতেন, রবীন্দ্রনাথও থাকিতেন। একের উপর অপরের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল—বা কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না তাহা কে বলিবে? এই প্রসঙ্গে আমায় "সাহিত্যসমাজের"ও উল্লেখ করিতে হয়। এই সমাজও সাহিত্যিকদিগের মিলনক্ষেত্র ছিল। আজ সমাজের কথা স্মরণ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সেই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সমাজের সভ্যাদিগের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, 'রায় মহাশয়'-লেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, কবি চুনীলাল গুপ্ত, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন মিত্র অকালে মৃত্যুর মহানিদ্রায় অভিভূত। কেহই বাঙ্গালী পাঠকের আশা পূর্ণ করিয়া পরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করেন নাই—কেহই প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই এ হতাশার ঔষধ নাই।

(ক্রমশঃ)

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১৫)

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিদ্যাসাগরের একটা চিরকালের অভ্যাস ছিল যে প্রায় ছোকরা দলের সকলকেই তিনি কখনও 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলিতে পারিতেন না। তিনি আমাকে যে 'তুই' বলিতেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি যখন ৬।৭ বৎসর বয়সে কেবল আব্দার করিয়া আমার দাদার সঙ্গে কলেজে যাইতাম, প্রত্যহ তাঁহাদের ক্লাসের ঘরের এক পাশে সমস্ত দিন বেঞ্চের উপর গড়াগড়ি দিয়া বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী আসিতাম, তখন বিদ্যাসাগর এক দিন (তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) আমাকে লইয়া নিম্নতম শ্রেণীতে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের ঘরে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই অবধি প্রায় আমার চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়াছি, কখনও 'তুই' ব্যতীত 'তুমি' সম্বোধন পাই নাই। ইহা যে কখনও আমার মন্দ লাগিয়াছিল এমন কথা আমি বলি না; আমি বরং ভাবিতাম যে, তিনি যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ও আমাকে যে স্নেহ করেন, 'তুই' সম্বোধন তাহারই পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতাম যে, ইহা সকলের ভাল লাগিত না। সংস্কৃত কলেজের একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন; তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র গুপ্ত। বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা তিনি অনেক junior ছিলেন; এক দিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন 'তুই বলিতে যতক্ষণ, তুমি বলিতেও ততক্ষণ; তবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে তাহাকে তুই বলিয়া বসেন, তুমি বলিতে বড়ই বিমুখ, ইহার মানে বুঝা যায় না।' উমেশ গুপ্ত এই কথা বিরক্তির ভাবেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই বোধ হয় যে, এই অভ্যাসটি বিদ্যাসাগরের সারল্যগুণের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ ছিল না; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোকদেখান বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সেটা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা'কে ছেলে বেলা হইতে যে 'তুই' সম্বোধন করিতেন, মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তন করেন নাই।

ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। বিধবাবিবাহের গল্প করিতে বসিয়া এক দিন তিনি বলিলেন,—যখন আমি বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আপনার মত স্থির করিয়া বসিয়াছি, তখন ভাবিলাম যে, ম'াকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না, তিনি কি বলেন? আমাকে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে বলেন, কি মানা করেন? এই অভিপ্রায়ে এক দিন তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, 'মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্ব (আমি মা'কে চিরকালই 'তুই' বলে ডাকি; ছেলে বেলার অভ্যাস কখনও ছাড়িনি) আমি ত বিধবাবিবাহ চালাব স্থির করেছি, এতে তোর মত কি?' মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এটা যে শাস্ত্রের যথার্থ মত, তোর কি তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে? আমি বলিলাম, হঁা আমার তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তুই চালাগে যা, আমার তাতে অমত নেই।

"এখনকার দিনে আমি দেখিতেছি যে, পুত্র একটু বড় হইলে এবং রোজগারি হইলে, পিতা তাহাকে 'তুই' বলা দূরে থাকুক, পরোক্ষে 'তিনি' বলিয়া থাকেন। আমি অনেক পিতার মুখে এইরূপ শুনিয়াছি; এবং আমার এটা যেন কেমন কেমন লাগে। কোনও কোনও পরিবারের মধ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, বাল্যকালেও পিতা পুত্রকে 'তুমি' বৈ 'তুই' বলেন না; পুত্রও পিতাকে শৈশবাবস্থা হইতে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিতে অভ্যাস করে। ইহার একটা মানেও আছে। সেই সকল পরিবারের কর্ত্তারা বিবেচনা করেন যে, সভ্যতার সমুদাচার কথাবার্ত্তা আদবকায়দা ইত্যাদি) শিক্ষা করা বালকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, এবং খুব অল্প বয়সেই অভ্যাস করা ভাল।

"বিদ্যাসাগর যে সকল ছোকরাকেই 'তুই' বলিতেন, আমি এমন কথা বলিতে চাহি না। আমার মনে হয় না যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' কখনও বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নিজের কথা আমি জানি; রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথা জানি; ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথাও জানি। কলিকাতায় একবার হোসেন খঁা নামক বাজীকরের দিনকতক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সূর্য্যবাবু তাহার দু' চারিটা ভেল্কি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া এক দিন বিদ্যাসাগরের কাছে গল্প করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আরে আমি তোর কথা শুনিনে। তোকে আমি

জানি, তুই কতকটা আহ্লাদে। আমি আমার হাতে আংটি মুঠো করে ধরে থাকি; যদি আমার হাতে থেকে হোসেন খাঁ আংটি উড়িয়ে দিতে পারে তা হোলে বুঝব যে, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।' শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় যখন কাশ্মীরের দেওয়ানী করিয়া মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন ভোগ করিয়া ফিরিয়া আইসেন তখনও বিদ্যাসাগরের কাছে সেই সাবেক 'তুই' সম্বোধন পাইলেন, ভুলেও একবার 'তুমি' নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধীকারী, প্রসন্নকুমার রায় (মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম হেড মাষ্টার) ইঁহাদের কাহাকেও কখনও তিনি 'তুই' বলেন নাই। অথচ প্রসন্ন বাবুর দুই এক বৎসরের ছোট তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সূর্য্যবাবুকে তিনি 'তুই' বলিতেন। এই বিষয়ে তিনি যে কি পার্থক্যের নিয়ম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। ইদানীন্তন বালকদিগের মধ্যে তাঁহার অপরিচিত একটি এম, এ, চাকরীর প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গিয়াছিল। ছোকরাটি থিয়সফিষ্ট; লম্বা চুল রাখিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, 'আরে তোকে মাষ্টারি কর্ম্ম দোবো কি! তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।' এরূপ অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও তিনি কাহাকেও বা 'তুমি' কাহাকেও বা 'তুই' বলিতেন।

"শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য্য হইয়াছিল যে, অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ অসার যে, অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কায নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কোনও কোনও বিধবাবিবাহদ্বেষী তার্কিক তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অনেক বেশী; যদি বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক অপরিণীতা কুমারীর বিবাহ হওয়া ভার হইবে; সেটা কি মঙ্গলকর? এই আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া তিনি এক দিন বলিলেন, —'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না; অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।'

"এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে

অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অসভ্যজাতিদিগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কর্ম্মাটাড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতাল জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙ্গালী সাঁওতাল পরগণায় কিছু জমী খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমী আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সীমাসম্বন্ধ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীটি অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে যে অমুক শিমুল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজী হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—অমুক শিমুল গাছটা বটে; পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ঐ গাছটি বটে," বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন, আর হাসিতেন; বলিতেন, দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।

"আমার এই পুরাতন প্রসঙ্গের মধ্যে বিদ্যাসাগর কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বোধ হয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ; কিন্তু যখন তিনি তাঁহার মেছোবাজার ষ্ট্রীটের ছোট একতালা বাসাবাড়ীর একটি কক্ষে বসিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা শুনাইতেন, তখন আমার অন্তরে যে পুলক সঞ্চারিত হইত তাহার ক্ষীণ আভাসটুকুও বোধ হয় তোমরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছি; বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন; আসবাববিহীন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারায় হেলান দিয়া একখানি বহি হাতে করিয়া বিদ্যাসাগর নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন; কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম; বলিলাম 'শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার বাড়ীতে এক ডিনার-পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ নাই, সেখানে আমি কি করিয়া যাই?' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তাই ত; কাজটা বেশ বিবেচনার কাজ হয় নি।' আমিও

আর নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেলাম না। এমনইতর কত ছোট বড় কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তাম্রকূট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; সট্‌কা নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার হাতে থাকিত। তিনি নস্যও লইতেন; তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিন্তু নস্য কিংবা তামাক কিছুই সেবন করিতেন না।

"বিদ্যাসাগর নিজের ছাত্রাবস্থার কত গল্পই করিতেন! যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার বিশেষ একটি ক্ষমতা ছিল; আমার বোধ হয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহারই হাতে গড়া। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতাপদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাহার স্বামীকে সে চিনিতে না পারে; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিয়া রাখিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

"দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত

কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

"সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

"অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছ্বাসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থ দেখিয়াছি। তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন—

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥

তখনই আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।

"ঐ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদের নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। বায়রণের 'চাইল্ড্ হ্যারল্ড্' পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন ভাবোন্মত্ত হইতাম যে, আহা, হা করিয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইত।

শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত।

সারনাথের অশোক-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর)

১ম পংক্তি। দেবা [নাং প্রিয়]—অশোকের একটি উপাধি। অশোকের যতগুলি লিপি পাওয়া গিযাছে তাহাতে কুত্রাপি অশোক নাম লিখিত হয় নাই, প্রত্যেক স্থলে,"দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরাণে কিন্তু সর্ব্বত্র অশোকের পূর্ব্বনাম অশোকবর্দ্ধন লিখিত হইতে দেখা যায়। অশোকের কাল্‌সিস্থিত পর্ব্বত-লিপির (Rock Edict VIII) প্রথম পংক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অশোকের পূর্ব্বপিতামহগণও "দেবানাং প্রিয়" নামে অভিহিত হইতেন। "পিরয়দস্সন" উপাধি—"পিয়দসির"ই রূপান্তর ; এই শব্দ সিংহলীয় বংশোপখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শব্দই আবার 'মুদ্রারাক্ষসে' চন্দ্রগুপ্তের নামের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সিংহলীয় উপাখ্যানের অশোক,পুরাণের অশোক ও ক্ষোদিত লিপির অনুশাসন-কর্ত্তা যে অভিন্ন তাহাতে আর সংশয় নাই। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দের J. R A. S. পত্রিকায় এ বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ অনুসন্ধেয়।

৩য় পংক্তি। ভেতবে—বৈদিক তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ভিদ্ ধাতু "গুণ" করিয়া তাহাতে "তু" যুক্ত হওয়াতে একটি বিশেষ্যপদ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার সম্প্রদানকারকে এইরূপ পদ পাওয়া যায়

ভিদ্+তু
=ভেদ্+তু
=ভেত্+তু
=ভেত্তু
=ভেতু এই পদে সম্প্রদানের বিভক্তি

সংযুক্ত হইয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃতে এই তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মণি বাচ্যের অর্থ পরিগ্রহ করে। পালিভাষায়ও এই আকারের পদের অভাব নাই। "ইচ্ছৎথেসু সমান কত্তুকেসু তবে তুম্ বা" (S. C. Viyabhusan's edition of Kachayan VII. 2. 12) যথা কাতবে, সোতবে। 'ধম্মপদের' ৩৪ শ্লোক তুলনীয়—

অপিচ, 'পরিফন্দৎ' ইদং চিত্তং মারধেয়ং পহাতবে

"বায়সং পি পহেতবে (পোহেতুং) Jataka. II. 175.

চুং খো—'চু'=চ+তু { চ+তু=চ+উ=চু { এর সংযোগে উৎপন্ন।

'খো' অর্থাৎ খলু। পালিতে ক্ খু পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, খো এবং ক্-খু উভয় শব্দই একটি আদিম সাধারণ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া উচ্চারণবৈষম্যবশতঃ বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে আদিম শব্দটি বোধ হয় খ্‌ লু। খলু>(*) কু খু, অথবা খ্‌ লু>খলু>খ উ>খো।

কণ্ঠ্যবর্ণ অথবা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বপদের অন্তঃস্থিত স্বরের পর কখনো কখনো অনুস্বর হইয়া থাকে।

চু+খো=চুংখো।

৫র্থ পংক্তি। ভাখতি—সং ভক্ষ্যতি। ডাঃ ভোগেল প্রথমে এই শব্দটিকে ভিখতি রূপে পড়িয়াছিলেন, পরে ডাঃ ভিনিসের 'তাখতি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। (J. A. S. B. Vol. III, No I N. S. Page 3)

সং নংধাপয়িয়া—সং, সং+নহ+নিচ্‌+ল্যপ্‌ (cf. নধ্‌ ধাতু হইতে পালি পিনদ্ধ্যতি ; নদ্ধঃ Latin Nodus) ; নিজন্ত ধাতুতে 'প' এবং স্বরের বৃদ্ধি অবিরল নহে।

অনাবাসসি—ডাঃ ভোগেল "আনাবাসসি" পাঠ করেন। আমরা ডাঃ ভিনিসের পাঠ অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করায় গ্রহণ করিলাম। কারণ, স্পষ্টতঃই দেখা গিয়াছে, ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ (Sacred Books of the East Vol. XVII, P-388) দ্রষ্টব্য। সাঁচীর অশোক-লিপিতেও এই শব্দই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬ষ্ঠ পংক্তি। হেদিসা—সং ঈদৃশী।

ইকা—একা (সং) > ইকা। একার ঠিক একার নহে ; ইহা অকার ও ই কারের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। সুতরাং সহজেই এই একারটি ইকার অথবা অবস্থা বিশেষে অকারে পরিণত হইতে পারে। 'ইকা' শব্দ পর্য্যন্ত আর কোন অশোকীয় লিপিতে পাওয়া যায় নাই। হেমচন্দ্র তাঁহার প্রাকৃত কাব্য 'কুমার চরিতের' ৭ম অধ্যায়, ২০শ শ্লোকে "ইকমনু=একমনা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব সারনাথ-লিপিতে "ইক", "ইকিকে" (৮ম পংক্তি) এই দুই প্রয়োগ ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট অপভ্রংশ অথবা "ভাষা" হইতে

* এই সাঙ্কেতিক চিহ্নটি "10" অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। বাম হইতে দক্ষিণে।

বিভিন্ন হইলেও সাধারণের ভাষার দুইটি সুন্দর উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

তুফাকং—এই শব্দটি বোধ হয় অতি প্রথমে তুষ্মাকংরূপে উচ্চারিত ও ব্যাবহৃত হইত। তুষ্মাকং > তুস্মাকং (কারণ, পালিতে ষ নাই), > তুস্বাকং (যথা মন্মথ > বম্মহো), > তুস্পাকং (যথা, লোচেত্বা > লোচেৎপা) > তুস্ফাকং (যথা, বিপ্রস্ফুষ্ট > বিস্ফুট্ট), > তুফাকং (কারণ অশোকীয় ভাষায় অভ্যন্তবর্ণের স্থানে একটি মাত্র বর্ণের প্রয়োগ হয়। বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের সংযোগে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সংযোগে চতুর্থটি অবশিষ্ট থাকে, প্রথম ও তৃতীয়টি লুপ্ত হয়)।

সংসলনসি—সং সংসরণং অর্থ সঙ্গতি। পালিতে এই শব্দের অর্থ চক্র অথবা সংক্রমণ হইতে পারে। অনুশাসনানুসারে ইহার অর্থ সমাগমস্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সমাগমস্থান যতদূর সম্ভব পাটলি-পুত্রকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

৮ম পংক্তি। বিস্বং সয়িতবে—অধ্যাপক কার্ণ ও ডাঃ ব্লক্ এই শব্দের সং "বিশ্বাসয়িতুম্" শব্দের সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়া—"নিজকে সুপরিজ্ঞাত করান" অর্থ করিয়াছেন।

ধুবায়ে—সংঞ্রুবং। অর্থ, অবশ্যই।

ইকিকে—=ইক+ইক; ই কারের পূর্ব্বস্থিত অ কারের লোপ হইয়াছে। এই সূত্রে সন্ধিশূন্য বৈদিক 'এক এক' প্রয়োগ তুলনীয়। অথবা ইকিক <(*) একেক < একৈক।

মহামাতে—সং মহামাত্রা (মহামাত্যা)—উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তুলনা'
"মন্ত্রে কর্ম্মসি ভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে।
মাত্রা চ মহতী যেষাং মহামাত্রাস্ততে স্মৃতাঃ॥ আপ্তে
কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইতেন।

৯ম পংক্তি। আহালে—সং আধার—অর্থাৎ প্রদেশ। সমাসবদ্ধ "সাহার" শব্দে (Mahavagga VI. 30, 4) এই অর্থই পাওয়া যায়।

১০ম পংক্তি। বিয়ংজনেন—সং ব্যঞ্জন। অশোকের ৩নং পর্ব্বতানুশাসনে ডাঃ বুহ্লার (Dr. Buhler) ইহার "অক্ষরে অক্ষরে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

(*) এই সাঙ্কেতিক চিহ্নটি "হইতে" অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। দক্ষিণ হইতে বামে।

ডাঃ ভিনিস এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ভোগেল "রাজ ঘোষণা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (*)

কোট—এই শব্দের অর্থ চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দৃষ্টান্তের সহিত বিবৃত হইতে দেখা যায়। "নৃপতি নব নব পল্লীর প্রতিষ্ঠা করিবেন; সেই সকল পল্লীতে এক শত হইতে পাঁচ শত গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে হইবে .... প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে এক শত গজ দূরবর্ত্তি-স্থানে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্তম্ভযুক্ত এক একটি দুর্গ থাকিবে...............প্রত্যেক আট শত পল্লীর মধ্যস্থলে যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহার নাম "স্থানীয় হইবে", ইত্যাদি (Indian Antiquary, XXXIV. 7)

১১শ, ১২শ পংক্তি। 'বিবাসয়াথ' ও 'বিবাস-পয়াথা'—অধ্যাপক কার্ণ প্রথম শব্দটির অর্থ করিয়াছেন "পর্য্যবেক্ষণার্থ চারিদিকে গমন করা"। এ অর্থ লইলে মূলের সহিত ভালরূপ সম্বন্ধ থাকে না। রূপনাথের অশোকীয় প্রস্তরলিপিতে "বিবসে তবয়" শব্দ পাওয়া যায়। ডাঃ ভিনিস রূপনাথের শব্দের সহিত তুলনা করিয়া এই দুইটি শব্দ দ্যোতনার্থ "বস্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি এই শব্দ দুইটি "বস্" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে রূপনাথ-লিপির "ব্যঠ" ও "বিবাসা" শব্দদ্বয় উক্ত ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন, মনে করা যাইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিসংবাদিত সংখ্যা ২৫৬ বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ-রূপ সুবিধা হয়। "বিবাসায়াথ" শব্দের "দীপ্তি" অর্থ গ্রহণ করিলে মোটামোটি "জ্ঞাপন করিবে" এই অর্থ অনুশাসনের অনুগত হইয়া পড়ে।

বঙ্গ-ভাষান্তর।

"প্রাট

"দেবানাং প্রিয়" ... ...

সংঘ বিভক্ত হইতে পারিবে না। ভিক্ষুই হউক অথবা ভিক্ষুণীই হউক যে কেহ সংঘ ভগ্ন করিবে তাহাকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া বিহারবহি-র্ভূত স্থানে বাস করাইতে হইবে। এই ভাবে এই অনুশাসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

(*) Epigraphia Indica Vol VIII, Part IV.

"দেবানাং প্রিয়" এইরূপ বলেন,—এইরূপ একখানি লিপি জনসমাগম-স্থানে তোমাদের নিকট থাকিবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঠিক এইরূপ আর একখানি লিপি উপাসকগণের জন্য লিখিবে। তাহারা প্রত্যেক ব্রতোপবাসের দিন এই অনুশাসনের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস জাগরূক রাখিবার জন্য আগমন করিবে। প্রত্যেক উপবাসের দিনে মহামাত্রাগণ উপবাস-ব্রতের সম্পাদন উদ্দেশ্যে এই অনুশাসনের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস জাগরূক রাখিবার জন্য ও ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিবে। এবং তোমাদের শাসনান্তর্ব্বর্ত্তী সকল স্থানে এই অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে জ্ঞাপন করিবে। এই প্রকারের দুর্গসমন্বিত প্রত্যেক জনপদেও এই অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে জ্ঞাপন করিবে।

লেখ্য-বিবরণ। প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকায় লিপিখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অনুবাদে তাহাই অবলম্বিত হইল।

প্রথমভাগে মূল শাসনটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘ-বিভাগ করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া সংঘের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত করাইতে হইবে সাময়িক নির্ব্বাসন ধর্ম্ম-কলহের শাস্তি-স্বরূপে গৃহীত হইবে। ইহার অনুরূপ একটি আদেশ একই ভাষায় প্রয়াগের দুর্গস্থিত "তথা কথিত" "কৌশম্বী-অনুশাসনে" ও সাঁচীর অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। (Buhler's Papers, I. A. Vol XIX & E. I. pp. 366-67) দুঃখের বিষয় এই তিন লিপিরই প্রথমাংশ এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, সেই অংশের কোনরূপই অর্থ করা যায় না। অশোক তাঁহার সময়কার কোন কোন সংঘের প্রতি অতি কঠোর আদেশ প্রচার করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ চলিত আছে, এই লিপি তাহা নানাভাবে সপ্রমাণ করিতেছে। আর তিনি যে, সমস্ত সংঘগুলিরই নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাহাও এই অনুশাসনপত্র হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

লিপির দ্বিতীয় ভাগে সম্রাটের প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করান হইয়াছে যে, একখানি লিপি তাঁহাদেরই উপকারের নিমিত্ত উৎকীর্ণ হইয়াছে। সাধারণের উপকারের জন্য ইহার অনুরূপ লিপি উৎকীর্ণ করিতে তাঁহারা আদিষ্ট হইতেছেন। এই লিপিখানি সারনাথ-বিহারের অন্তর্ব্বর্ত্তি-স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল; কারণ,

নগরের কর্ম্মচারিগণকে ও জন-সাধারণকে প্রত্যেক "উপোসথ" দিনে তথায় অবশ্যই আসিতে হইবে বলিয়া আদেশ ইহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লিপির অন্তভাগে অনুশাসনের প্রত্যেক বাক্যে বিশেষরূপ মনোযোগ দিবার জন্য অনুজ্ঞা করা হইয়াছে। 'কোট' শব্দের অর্থ যদি সুরক্ষিত স্থান ধরা যায়, আর এই স্থান যদি "মহামাতা"গণের অধীনে না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই কর্ম্মচারিগণকে কেন যে তাহাদের এলাকার বাহিরে অনুশাসন জ্ঞাত করাইতে বলা হইয়াছে তাহার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

লিপিখানির উদ্দেশ্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কি কারণে ধর্ম্ম-কলহকারিগণকে সংঘচ্যুত করিতে ও জন-সাধারণকে উপোসথ দিনের নিয়ম পালন করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে বিহারের ধর্ম্মবন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল এবং প্রকৃতই কাহাকেও কাহাকেও সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইয়াছিল। সিংহলীয় সাহিত্যেও আমরা এ কথার আভাস দেখিতে পাই। ধর্ম্মকীর্ত্তির 'সদ্ধর্ম্ম সংগ্রহ' (Edited in the J. P. T. S. for 1890, pp, 21-89) নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ২২৮শ পরিনির্ব্বানাব্দের পরে সমগ্র ভারতবর্ষে ছয় বৎসর যাবৎ ভিক্ষুগণ উপোসথ প্রতিপালন করে নাই। সম্রাট অশোক সদ্ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া 'অশোকারামে' ভিক্ষুগণকে সমবেত করাইয়াছিলেন। স্থবির মৌদ্‌গলী-পুত্র তিষ্য এই সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। সম্রাট অনুসন্ধানের দ্বারা জানিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত ভিক্ষু নহে। ইহাতে তিনি তাহাদিগকে শ্বেতবস্ত্র প্রদান করিয়া সংঘ হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর সম্মিলনের সকলে উপোসথ ক্রিয়া প্রতিপালন করিলেন। তাই প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন ঃ—

"সংবুদ্ধ পরিনিব্বানা দ্বে চ বস্স সতানি চ।
অট্‌ঠাবীসতি বস্সানি রাজা সোকো মহীপতি।"

শ্লোকটি 'মহাবংশ' হইতে গৃহীত হইয়াছে, গদ্যাংশের ভিত্তি বুদ্ধঘোষের 'সমন্ত পাসাদিকা' নামক পুস্তক। শ্বেতবস্ত্র পরিধানের কথা বুদ্ধঘোষের "সেতকানি বট্‌ঠানি" বাক্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে। লিপির "ওদাতানি দুসানি" বাক্যও ইহাই। লিপির "পাট" পাটলিপুত্রের সম্মিলনের কথাই নির্দ্দেশ করিতেছে। "ভাঘতি" পাঠও সংঘভঙ্গের বিষয় প্রচার করে। সে

সময়কার "সম্মাসংবুদ্ধের" ধর্ম্মের যেরূপ সঙ্কট-সময় উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সারনাথের লিপিই যে বুদ্ধঘোষ-বর্ণিত অশোকানুশাসন তাহাতে আর বিচিত্র কি? (*)

যে কারণে সারনাথের অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলি ছিন্নদেহ হইয়াছে, সেই কারণেই অশোকস্তম্ভও ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়াছে। ৮ম পংক্তিতে "মহামাতে" শব্দ উল্লিখিত। ইহারা "ধর্ম্ম মহামাতা" অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণকারিগণ ভিন্ন আর কেহই নহেন। ইঁহাদিগকেই অশোক তাঁহার সিংহাসনারোহনের ১৩শ বৎসর পরে নিযুক্ত করেন। অতএব সারনাথস্তম্ভের নির্ম্মাণ সময় অশোককর্ত্তৃক মহামাতাগণের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫৫ খৃঃ পূঃ পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এই মতই এখন অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণ করিয়াছেন। †

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

লছ্‌মী।

(১)

বাবা যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন বিবাহবিষয়ে মা'র অনুরোধ কোনরূপে এড়াইতে পারিয়াছিলাম। নহিলে বাঙ্গালী পরিবারে একমাত্র সন্তান যুবক পুত্রের বিবাহ এত দিন স্থগিদ থাকে না। মা বিবাহের জন্য জিদ করিলে আমি যখনই তাহাতে আপত্তি করিতাম, বাবা তখনই আমার পক্ষ লইয়া বলিতেন, "না হয় কিছুদিন পরেই বিবাহ করিবে।" আমি বুঝিতে পারিতাম, পাছে বিবাহ করিয়া আমি সংসারের ভারে বিব্রত হই ভাবিয়াই বাবা আমার পক্ষ লইতেন। কারণ আমাদের পিতাপুত্রে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে বাবার আর্থিক অবস্থা আমার অজ্ঞাত ছিল না। বাবা যে বেতন পাইতেন, সেই বেতনে কন্যার বিবাহের ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও অতিমিতব্যয়ী লোক কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। কিন্তু বাবা সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। আমরা ভাড়াবাড়ীতে থাকিতাম। কিন্তু দক্ষিণ-খোলা—খট্‌খটে বাড়ী না

(*) মদীয় অধ্যাপক এইচ, সি, নর্ম্মান্‌ লিখিত J. P. A. S. B. Vol IV. No 1 এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† সারনাথ-সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের বিস্তৃত গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক।

হইলে বাবার পছন্দ হইত না। গৃহস্বামী প্রতি বৎসর গৃহের সংস্কার করিতে চাহিত না—বাবা নিজব্যয়ে তাহা সারিয়া লইতেন। উঠানে আবর্জ্জনা বা ঘরে ধূলা বাবা সহিতে পারিতেন না। কাযেই গৃহে দাসদাসীর বাহুল্য ছিল। আমার পাঠের ব্যবস্থাও বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল। এরূপ অবস্থায় সঞ্চয় সম্ভব নহে। বাবা অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাই পাছে বিবাহ করিয়া আমি সংসারের ভাবনা ভাবিয়া বিব্রত হই, সেই জন্য তিনি আমার পাঠশেষে বিবাহ-সঙ্কল্পের সমর্থন করিতেন। বাবার কথায় প্রতিবাদ করা মা'র প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই বাবা যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন আমি বিবাহ করি নাই।

কিন্তু আমি যেবার বি, এ, পরীক্ষা দিলাম সেবার পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু হইল। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। অনেকে ওকালতীর জন্য পড়িতে পরামর্শ দিলেন। অনিশ্চিত সাফল্যের আশায় সর্ব্বস্ব ঘুচান সুবুদ্ধির কার্য্য নহে মনে করিয়া আমি স্থির করিলাম, চাকরী করিব। মা'কে সে কথা জানাইলাম। মা বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর। তুমি যাহা করিবে, আমি তাহাতেই সম্মতি দিব।"

বাবা যে আফিসে কায করিতেন, সেই আফিসের কন্যাদায়গ্রস্ত "বড়বাবু" পূর্ব্বেই আমার সন্ধান পাইয়া বাবার নিকট আমাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বাবারও তাহাতে বিশেষ অমত ছিল না। এখন তিনি সেই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সমর-বিভাগে আমার মাসিক এক শত টাকা বেতনের একটি চাকরী করিয়া দিলেন।

কথা পাকা হইয়া রহিল, কালাশৌচ গতে আমার বিবাহ হইবে। বিবাহে আমার সম্মতি পাইয়া মা'র ম্লান মুখে একটু প্রফুল্লতা দেখা গেল।

(২)

যথাকালে আমার বিবাহ হইল। চাকরীতেও আমার বেতনবৃদ্ধি হইল। কুটুম্বিনীরা ইহাতে আমার পত্নীর ভাগ্য-পরিচয় পাইলেন—আমার কার্য্যক্ষমতা দেখিলেন না।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। জননীর স্নেহে ও পত্নীর প্রেমে দুই বৎসর সুখেই কাটিল। কেবল মধ্যে মধ্যে বাবার কথা মনে পড়িলে একটা অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

তৃতীয় বৎসরের শেষভাগে আফিসে একটা ভাঙ্গাগড়া হইতে লাগিল।

কে কোথায় বদলী হইবে, এই ভাবনায় সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই সময়—পৌষ-সংক্রান্তিতে "সাগর-স্নান" হইতে ফিরিয়া মা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং সপ্তাহকালমধ্যে সংসারের মায়া কাটাইলেন। আমি বিষম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমি সংবাদ পাইলাম, আমাকে মাদ্রাজে বদলী করা হইল।

আমি কি করি, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কখনও বিদেশে যাই নাই—কখনও একক থাকি নাই। এবার বিদেশে যাইতে হইবে। মা নাই। সন্তান-সম্ভাবিতা পত্নীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না; কারণ, বিদেশে বিপদ্ হইলে দেখিবার কেহ নাই।

আমি অনেক ভাবিলাম; স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলাম; শেষে স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া এক দিন বিষণ্ণ—শঙ্কাকুলচিত্তে মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম। বাবার ও মা'র কথা মনে করিয়া আমার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

(৩)

মাদ্রাজে আসিয়া দেখিলাম, সবই নূতন—দেশের প্রকৃতি, লোকের আকৃতি, বেশভূষা, ভঙ্গীভাষা সবই নূতন। কেবল আমার আফিসের কায পুরাতন। কতকগুলি কর্ম্মচারী এক সঙ্গে—এক বাসায় বাস করে। আমরা একটা বাসায় আশ্রয় লইলাম। আমি আশ্রয় লইলাম বটে; কিন্তু আশ্রয় লইয়াই বুঝিলাম, এ আশ্রয়ে অবস্থান আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কখনও অপরিচিত—নানা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে বাস করি নাই; পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান আমিই তাঁহাদের স্নেহ-যত্নের কেন্দ্র ছিলাম। অপরিচ্ছন্ন গৃহে বাস—কদর্য্য খাদ্য আহার—নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে অবস্থান আমার পক্ষে বিষম ক্লেশকর। আমি স্বতন্ত্র বাসা করিব, মনে করিতেছি, এমন সময় গৃহিণীর পত্র পাইলাম। তাঁহাকে আমি সব কথা লিখিয়াছিলাম। তিনি আমার অবস্থা জানিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি আসিতে পারিবেন না বলিয়া অদৃষ্টকে দোষ দিয়াছেন আর লিখিয়াছেন, "তোমার কষ্ট সহ করা অভ্যাস নাই। তুমি কষ্ট সহিতে পারিবে না। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিও। পয়সার জন্য শরীরকে কষ্ট দিও না। অদৃষ্টে থাকে—পয়সা অনেক হইবে।"

গৃহিণীর পত্রে আমার সঙ্কল্প স্থির হইল। আমি স্বতন্ত্র বাসা করিলাম।

(৪)

বাসা করিলাম। কিন্তু সংসার চালাইবার যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা কিছুই আমার ছিল না। কাযেই আমাকে পাচক-ভৃত্যের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইল। সে সংসার পাতাইয়া বসিল। সে-ই একটি দাসী আনিল। দাসীটি নায়ারজাতীয়া—যেন রবিবর্ম্মার দেবী-চিত্রের আদর্শ! তাহার দেহে যৌবনের লাবণ্যশ্রী—মুখে বিষাদ্-গাম্ভীর্য্য। তাহাকে দেখিলে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইত। সে নীরবে সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া যাইত—তাহার আগমনে বিলম্ব ছিল না—কার্য্যে ক্রটি ছিল না। এই বিদেশিনীর জীবনে কি রহস্য নিহিত ছিল?

ভৃত্য সংসারের সব ভার লইল। আমি তামিল-ভাষা শিখিতে লাগিলাম; অল্প দিনের মধ্যেই আমি তামিলে কথা কহিতে শিখিলাম।

কথোপকথনে ভাষা-শিক্ষার যত সুবিধা হয়, পাঠে তত হয় না—তাই আমি তামিলে কথোপকথন করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলাম। আমি গৃহে ফিরিয়া যখনই অবসর হইত, ভৃত্যের সহিত তামিলে কথা কহিতাম।

সে দিন রবিবার—আফিস নাই। মধ্যাহ্নে আমি একখানি ইংরাজী পুস্তকে নায়ারদিগের আচারের বিবরণ পাঠ করিতেছিলাম, এমন সময় কায সারিয়া ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি পুস্তক রাখিয়া তাহাকে নায়ারদিগের সংস্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

ভৃত্য আমাকে বুঝাইয়া দিল, প্রচলিত রীতি অনুসারে একজন উপযুক্ত পাত্র ডাকিয়া আনিয়া নায়ার-বালিকার গলদেশে সূত্র বন্ধন করান হয়। ইহাই বিবাহ-সংস্কার। তাহার পর আর সেই পুরুষের সহিত বালিকার হয় ত সাক্ষাৎও হয় না। কিশোরী হইয়া সে ইচ্ছামত স্বামী বাছিয়া তাহার সহিত ঘর করে। সেই জন্য নায়ারদিগের পুত্র সম্পত্তি পায় না—ভাগিনেয় পাইয়া থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিশোরী যখন ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণ করিতে পারে, তখন তাহার ইচ্ছামত স্বামীকে ত্যাগেরও অধিকার থাকা উচিত।"

ভৃত্য বলিল, "তাহাদের সে অধিকার আছে। কেন, আমাদের দাসী লছ্মী ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিল!"

লছ্মী আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যময় বোধ হইত। উদ্ভিন্ন যৌবনের অতুল সৌন্দর্য্য লইয়া সে দাসীবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে

কেন? তাহার বিষাদ-গম্ভীর ভাব তাহার হৃদয়ের কি দারুণ বেদনার বাহ্য বিকাশ? এ সব আমি অনেকবার ভাবিয়াছি। আমি ভৃত্যকে বলিলাম, "ব্যাপারটি কিরূপ! বল ত।"

ভৃত্য বলিল, "সংসারে জননী ব্যতীত লছ্‌মীর আর কেহ ছিল না। তাহার জননী সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার পর লছ্‌মী যাহাকে লইয়া ঘর করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া সে তাহাকে ত্যাগ করে। লছ্‌মী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে সে এমনই বেদনা পাইয়াছিল যে, সে আর পত্যন্তর গ্রহণ করে নাই। তাই সে দাসীবৃত্তি করিয়া আপনার ও জননীর জীবিকা অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া লছ্‌মীর বিষণ্ণতার কারণ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। উন্মেদোন্মুখ যৌবনের অনাবিল উচ্ছ্বসিত প্রেম লইয়া সে যাহাকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিতে গিয়াছিল, তাহার দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত প্রেম তাহার জীবনকে যন্ত্রণাময় করিয়াছে। তাহার মত দুঃখ কাহার? আমি বলিলাম, "আহা তাহার বড় দুঃখ।"

সহসা আমি পশ্চাতে কাহার দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগের শব্দ শুনিতে পাইলাম; ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারের নিকট লছ্‌মী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সে কখন আমাদের অলক্ষ্যে আসিয়াছে—আমরা জানিতে পারি নাই। তাহার নিষ্ফল জীবনের কি দারুণ বেদনা তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিতেছিল—কে বলিবে?

(৫)

সেই দিন হইতে আমি লছ্‌মীর ব্যবহার একটু লক্ষ্য করিতাম। আমি দেখিতাম, সে ভালবাসিতে পায় নাই বটে; কিন্তু রমণীর স্বভাবিক ভালবাসিবার প্রবৃত্তি নষ্ট করিতে পারে নাই। বিড়াল, কুক্কুর প্রভৃতি জীবজন্তুকেও সে ভালবাসিত; বিশেষ কাহারও শাবক থাকিলে সে তাহাকে অত্যন্ত যত্ন করিত। অথচ কেহ তাহার জীব-প্রীতি লক্ষ্য করিতেছে দেখিলে সে লজ্জিতা হইত। প্রান্তরচারী বিহঙ্গী নিকটে মনুষ্য দেখিলে যেমন ত্রস্তে উড়িয়া যায় সেও তেমনই নিকটে কাহাকেও দেখিলে পালিত জীবটিকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত।

এই সময় আমার জ্বর হইল। প্রথম হইতেই জ্বর অবিরাম দেখা দিল।

ডাক্তার বলিলেন, "ভুগিতে হইবে।" পরিচিত বাঙ্গালীরা বলিলেন, বিদেশে সেবা শুশ্রূষা হইবে না। তাঁহারা জিদ করিলেন, বাড়ীতে সংবাদ দিবেন। আমি বিপদ গণিলাম। দেশে স্ত্রী অসন্ন-প্রসবা; তাঁহাকে এ সংবাদ দেওয়ায় বিবিধ বিপদের সম্ভাবনা। অনেক ভাবিয়া আমি বলিলাম, "দেশে আমার সংবাদ দিবার কেহ নাই।" কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু কেহই আর জিদ করিলেন না। পরের জন্য কে বৃথা ব্যস্ত হয়?

কিন্তু আমার সেবা শুশ্রূষা যে না হইতে লাগিল, এমন নহে। আমার পীড়া যতই বাড়িতে লাগিল, লছ্‌মী ততই আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কয়দিন পরে জ্বর বাড়িয়া উঠিল। আমি জ্ঞান হারাইলাম।

(৬)

কয় দিন পরে জ্ঞানোন্মেষ হইল বলিতে পারি না। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমি দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলাম; আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে আমার শিয়রে বসিয়া আমার কপালে কর বুলাইতেছিল। আমি সব ভাল মনে করিতে—ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমি হস্ত উত্তোলিত করিয়া সেই কর আপনার করে ধরিলাম। সে হস্তের কম্পন-চাঞ্চল্য আমি স্পষ্টই অনুভব করিলাম। এ কি?

আমি চাহিয়া দেখিলাম। আমি আমার প্রবাসের বাসগৃহে। তখন সব কথা মনে পড়িল। আমি চাহিয়া দেখিলাম—লছ্‌মী আমার শিয়রে বসিয়া। আমি তাহার দিকে চাহিলেই তাহার নয়ন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার মুখে যেন এক প্রদীপ্ত দীপ্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, আমার কর-ধৃত তাহার করের কম্পনচাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইল, আমার মনে হইল তাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে। সে কি কেবল আমার জ্ঞানলাভের—রোগমুক্তি-নদর্শনের আনন্দে? প্রেম রমণীর নয়নের যে দৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশ করে—তাহার আননের যে ললিত লাবণ্যে আপনাকে বিকশিত করে সে দৃষ্টির ও সে লাবণ্যের স্বরূপ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। প্রেমোদ্বেলিত রমণী-হৃদয় দেহের যে চাঞ্চল্যে—করের যে বৈদ্যুতিক স্পর্শে আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে সে চাঞ্চল্য—সে স্পর্শ কে না বুঝিতে পারে? তাই জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমার দুশ্চিন্তা আসিল। কি করি? মানব-হৃদয় দুর্ব্বল। তাহার শক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাসে বিপদ ঘটিতে অধিক সময় লাগে না।

(৭)

আমার অসুস্থ অবস্থায় আমার কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। আমি সেগুলি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। সেই সকল পত্রের একখানিতে আমার ঈপ্সিত সুসংবাদ ছিল। গৃহিণী একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, প্রসূতী ও প্রসূত উভয়েই সুস্থ আছেন। পত্র পাঠ করিয়া আমি পুলকিত হইলাম; আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল দুশ্চিন্তা দিবালোকবিকাশে কুজ্‌ঝটিকার মত দূর হইয়া গেল। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; স্থির করিলাম, একটু সবল হইলেই যাইয়া গৃহিণীকে লইয়া আসিব!

এক পক্ষপরে একটু সবল হইয়া আমি পক্ষকালের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী চলিলাম; উদ্দেশ্য—গৃহিণীকে লইয়া আসিব।

(৮)

ছুটী যে দিন শেষ হইবে তাহার পূর্ব্বদিনে সপরিবারে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলাম। ভৃত্য ও লছ্‌মী আমার অপেক্ষায় গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। লছ্‌মীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু গাড়ীর উপর মালের বাহুল্য দেখিয়া সে যেন বিস্মিতা হইল। তাহার পর আমি খোকাকে কোলে লইলাম—গৃহিণী নামিলেন। লছ্‌মীর মুখ সহসা যেন রক্তশূন্য—পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। আমার মনে হইল, সে কাঁপিতেছিল। সে দ্বারের চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইল। আমি মনে করিলাম, লছ্‌মীকে বিদায় দিতে হইবে। কিন্তু বিনা দোষে তাহাকে কেমন করিয়া বিদায় দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। আমি তাহার ব্যবহারে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে সন্দেহের কথা ত কাহাকেও বলিতে পারি না।

যাহা হউক ভাবিয়া একটা উপায় স্থির করিলাম। যে বৃদ্ধা বামা দাসী আমার গৃহিণীকে 'মানুষ করিয়াছিল', সে-ই মায়ার টানে—পাছে বিদেশে তাঁহার কষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় তাঁহার ছেলেকে 'মানুষ করিতে' তাঁহার সঙ্গে মাদ্রাজে আসিয়াছিল। আমি গৃহিণীকে বলিলাম, "বামা ত রহিয়াছে, আর ঝি দরকার নাই। লছ্‌মীকে বিদায় দেওয়া যাউক।" কিন্তু আমার কথা টিকিল না। গৃহিণী বলিলেন, "সেও কি হয়? বামা কি আর কায করিতে পারে? ও খোকাকে লইয়া থাকিবে।" তাহার পর তিনি লছ্‌মীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার জীবনকথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আহা, উহাকে তাড়ান হইবে

না।” আমি নিরুপায় হইয়া আর একটা অবসরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদননৈপুণ্যে লছ্‌মী গৃহিণীর এমন কি বামারও প্রিয় হইয়া উঠিল। বাস্তবিক সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এমন সুসম্পন্ন করিত যে তাহার উপর বিরক্তির কারণই উপস্থিত হইত না। সে অতি প্রত্যুষে আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত—কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রিতে গৃহে যাইত। তাহার মুখে কথা ছিল না। বাঙ্গালায় এমন দাসীলাভসৌভাগ্য গৃহিণীর ঘটে নাই। তাই এই মদ্রদেশে—এই মদ্রজার গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সমুদ্রতীরে একটু বেড়াইয়া গৃহে ফিরিলাম। রজনী জ্যোৎস্নাপুলকিতা, আকাশ নক্ষত্রখচিত, পবন নাতিশীতোষ্ণ। বেশ-পরিবর্ত্তনের পর শয়ন-কক্ষে যাইয়া দেখিলাম, শিশু শয্যায় সুপ্ত, গৃহিণী তথায় নাই। সেই কক্ষের দক্ষিণে একটা খোলা ছাত। আমি কক্ষ হইতে ছাতে গমন করিলাম; দেখিলাম, গৃহিণী ছাতে একখানি মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া আছেন আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া বসিলাম। গৃহিণী কি ভাবিতেছিলেন—আমার আগমন ও উপবেশন জানিতেই পারিলেন না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ভাবিতেছ?

গৃহিণী আমার দিকে ফিরিয়া মুখ তুলিয়া আমার মুখে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, ভাবিতেছিলাম।”

আমি গৃহিণীর চন্দ্রালোকস্নাত সৌন্দর্য্য দেখিলাম—বুঝিলাম, চন্দ্রালোকে সুন্দরীকে আরও সুন্দর দেখায়,—চন্দ্রালোকে নয়নের প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টি আরও মুগ্ধকর—প্রেমপ্রফুল্ল আননের লাবণ্যশ্রী আরও মধুর বোধ হয়। আমি উচ্ছ্বসিত আবেগে গৃহিণীর ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আনন চুম্বন করিলাম।

সহসা পশ্চাতে কিসের পতনশব্দে আমরা চমকিয়া চাহিলাম—স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন জগতে আসিলাম। দ্বারের সম্মুখেই লছ্‌মী। সে পড়িয়া গিয়াছে—তাহার দেহ তখনও বাতস্পর্শে অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতেছে। আমরা তাহার নিকটস্থ হইতে না হইতে না হইতে সে উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। গৃহিণী কক্ষমধ্য হইতে জল আনিয়া তাহার মস্তকে, মুখে, চক্ষুতে দিলেন। লছ্‌মী উঠিয়া বসিল।

গৃহিণীর কথামত আমি লছ্‌মীকে বলিলাম, "তুমি আজ আর বাড়ীতে যাইও না—আমাদের বাড়ীতেই ঘুমাও।"

সে বলিল, "না—সহসা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। এখন ভালই আছি।"

আমার সন্দেহ ঘনীভূত হইল। আমি গৃহিণীকে বলিলাম, "লছ্‌মীকে আর রাখা চলে না। কবে খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া পড়িয়া যাইবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ভয় নাই; বামা আর কোন দাসদাসীকে খোকাকে ছুঁইতে দেয় না। আহা, বেচারার শরীর ভাল নাই বলিয়া কি তাড়াইতে আছে? উহার অপরাধ কি?"

পরদিন প্রত্যূষেই বামার বিরক্তি-ব্যঞ্জন কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "কি আক্কেল, বাপু? বাবুর সকলে চা চাহি, এখনও দেখা নাই! এখনও উনানে আগুন দেওয়া হইল না।" গৃহিণী বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাহার অসুখ বাড়িয়াছে! শরীরের উপর কি কোন জোর আছে?" বামা বলিল, "তাহাত নাই। কিন্তু এ সব করে কে?"

গৃহিণীর উত্তর আমি শুনিতে পাইলাম না। ভৃত্য আসিয়া আমাকে জানাইল, সে বাড়ীর সম্মুখে কূপে জল তুলিতে গিয়াছিল কূপে জল নাই! শুনিয়া হাসি পাইল—কূপে জল নাই!—কেন

হাবাতে যদ্যপি যায় সাগর শুকায়ে যায়;
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া!

কৌতুহলপরবশ হইয়া আমি বাহিরে আসিলাম; কূপমধ্যে চাহিয়া দেখিলাম, জল আবৃত করিয়া একটি শ্বেত পদার্থ দেখা যাইতেছে। আমি ভৃত্যকে কূপমধ্যে নামিতে বলিলাম, সে সাহস করিল না। সেই সময় পথ দিয়া কয়জন পারেয়া মজুর যাইতে ছিল; আট আনা চুক্তিতে তাহাদের একজন কূপে নামিল।

কূপমধ্য হইতে পারেয়া বলিল, "মানুষ পড়িয়াছে।" তাহার সঙ্গীরা দড়া নামাইয়া দিল। পারেয়া উপরে উঠিয়া আসিল; তাহার পর তাহারা কয়জন দড়া টানিয়া শব উপরে তুলিয়া কূপপার্শ্বে রাখিল।

লছ্‌মীর মৃত মুখে প্রভাতের দিবালোক পতিত হইল। সে মুখে যন্ত্রনার কোন চিহ্ন নাই।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, "কেন আমি কাল তাহাকে একা যাইতে দিলাম? সঙ্গে কেহ থাকিলে সে পড়িয়া মরিত না।"

আমি বুঝিলাম, লছ্‌মী আপনার হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে জয় অসম্ভব বুঝিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার অনাবিল ব্যর্থ জীবনের বেদনার কথা স্মরণ করিয়া আমারও নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

সমালোচনা।

মানবের আদিজন্মভূমি।*

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার আলোচনার ও গবেষণার পরিচয় নানা পত্রে—নানা প্রবন্ধে পাওয়া গিয়াছে। তিনি বেদাদি গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিয়া ভারতের ইতিহাসে বহু অজ্ঞাত কথার আলোচনা করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যেমন অনুসন্ধিৎসু তেমনই অকুতোভয়। তিনি উপহৃত উপাদানের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন তাহা এমনই নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেন, পূর্ব্ববর্ত্তী মত এমনই অনায়াসে পরিত্যাগ করেন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা যে তাঁহার আন্তরিকতারই পরিচায়ক তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। ভাবের আবেগে তিনি অনেক সময় ভাষার প্রসাধনে মন দেন না। তিনি আলোচ্য গ্রন্থেই একস্থানে "বালটিক বেলা"কে "অজাত-শ্মশ্রু" বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় আলোচ্য পুস্তকে যে বিরাট বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, যে অনন্যসাধারণ অনুসন্ধিৎসা দেখাইয়াছেন, যে শ্লাঘ্য শ্রমশীলতার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাতে পুস্তকের ত্রুটিগুলি নিতান্তই নগণ্য না বলিয়া থাকা যায় না। মাসিক পত্রের সীমাবদ্ধ সমালোচনায় এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য প্রস্তাবের সম্যক আলোচনা হইতে পারে না। সেরূপ আলোচনার স্থান এ পত্রের নাই, সেরূপ আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই, সেরূপ আলোচনার অনুসরণ করিবার সহিষ্ণুতাও বোধ হয় পাঠকদিগের অধিকাংশের নাই। এরূপ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ে বহু পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। এরূপ পুস্তকের পাঠকসংখ্যা সর্ব্বদাই অল্প। কিন্তু এইরূপ

---

* মানবের আদিজন্মভূমি—শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ২১৷১, পটুয়াটোলা লেন—সাথী প্রেস হইতে শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।



শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারঃ

পুস্তকেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়—সাহিত্যের সম্পদ সম্বর্দ্ধিত হয়—লেখকের যশ স্থায়ী হয়। তাই এই পুস্তক-প্রকাশে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। প্রত্নতত্ত্বানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকগণ যে এই গ্রন্থ সাগ্রহে পাঠ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপে ম্যাক্সমুলারাদি বহু কোবিদ ও ভারতে বালগঙ্গাধর তিলকপ্রমুখ বহু সুধী ইতঃপূর্ব্বে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে তাঁহাদের মত খণ্ডনের চেষ্টা আছে। আমরা পাঠকদিগকে এই পুস্তকের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

পুস্তকখানিতে প্রথমে পূর্ব্বপ্রচারিত মত খণ্ডিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় "নেতি" "নেতি" করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন,—"যদি জগতের আমূল মানবজাতি, ভিন্ন ভিন্ন নিদানপ্রভব হইতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের নানাদিকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাচীনতম পিতৃভূমি দেখিতে পাইতাম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহেও উহাদের কোন না কোনও প্রকারে সমুল্লেখও থাকিত, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, জনশ্রুতিও উহার কোনরূপ সমর্থন করে না। কি ভারতবর্ষ বা আরব, পারস্য, তুরুস্ক, কি ইউরোপ কিংবা আফ্রিকা অথবা আমেরিকা ইহার প্রত্যেক স্থানের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এই সকল দেশের ঔপনিবেশিক বা আগন্তুক বলিয়াই অবগত, পরন্তু আদিম অধিবাসী বলিয়া নহে। পৃথিবীর সভ্যজাতির কোনও প্রাচীনতম বা আধুনিক গ্রন্থেও এই সকল স্থানের মধ্যে কোনও একটি স্থান সমগ্র মানব জাতির বা কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতৃভূমি বলিয়া প্রখ্যাপিত বা প্রখ্যাত নহে। 'পিতা', 'পিতৃভূমি' বা 'পিতৃলোক' প্রভৃতি শব্দও জগতের অন্য কোনও জাতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জগতের সমগ্র মানবজাতির আদি সাধারণ পৈত্রিকগ্রন্থ বেদসমূহে যেমন ইহা রহিয়াছে যে, 'স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম জনপদ' তদ্রূপ সমগ্র বৈদিকগ্রন্থে 'পিতৃলোক' বা 'পিতৃভূমি' বলিয়াও একটি পবিত্র প্রত্নৌকঃ বা পুরাতন স্থানের নাম বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়।" "জগদ্বরেণ্য সেই পবিত্র 'পিতৃভূমি' বা 'আদি প্রত্নৌকঃ' কোন্ দেশ?" "পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ জগতের সমগ্র আর্য্যজাতিকে 'ককেশীয়ান রেশ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি বহুসংখ্যক ভারতসন্তানও ককেশশ পর্ব্বতের পাদদেশকে সেই আদি প্রত্নৌকঃ

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী।" কিন্তু বাইবেলে দেখা যায় মনুষ্যেরা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিলেন। শীনার দেশ ককেশশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং যদি ককেশশ আদিস্থান হইত, তাহা হইলে বাইবেল নিশ্চিত লিখিতেন যে মনুষ্যসকল উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে চলিতেছিলেন। তাহা না লেখাতেই বুঝিতে হইবে যে, বাইবেলের লেখকেরা ককেশশকে আদি প্রত্নৌকঃ বলিয়া অবগত ছিলেন না।"

আবার "বৃত্র ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া যে অন্তরিক্ষের এক দেশ উত্তর পারস্যে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। তাহাতেই ঐ স্থান ইরাণ নামের বিষয়ীভূত হয়। ঐরূপ ভারত হইতে বিতাড়িত বৃত্রভ্রাতা বলাসুর যাইয়া যে স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আসুরীয় বা আসিরিয়া নামে বিশেষিত হয়। সুতরাং এহেন আসিরিয়া বা বাবিলন ভারতীয়গণ বা পৃথিবীর কোনও মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না।"

"সংস্কৃত কিরাত ও কৈরাতিক শব্দ হইতেই প্রতীচ্য কেণ্ট ও কেণ্টিক শব্দ ব্যুৎপাদিত। তাঁহারা কেহই বালটিক বেলার ক্লিন্ন ভূমিপ্রভ ও ভূইফোড় বস্তু নহেন। ঐরূপ ভারতের শকস্নু ও শর্ম্মন্ যাইয়া ইউরোপের শাকশন ও জর্ম্মাণ জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা করেন। * * সুতরাং বালটিকবেলা কি প্রকারে * * আদি জন্মভূমি হইতে পারে?" "ফলতঃ কি বালটিক-বেলা, কি ভল্‌গা নদীর সৈকতভূমি, ইহার একটিও পবিত্র আদি সূতিকাগার নহে।"

কেহ কেহ বলেন, "পৃথিবীর মধ্যে মিশর দেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান।" কিন্তু ইহার "মিশর নামও আমরা ভারতগন্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী। উহা সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেরূপ শকস্নুদিগের সহিত কতকগুলি শর্ম্মন্ (পুরোহিত) ইউরোপে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ সগর-লাঞ্ছিত ভারতসন্তানদিগের সহিত কতকগুলি চিকিৎসাব্যবসায়ী মিশ্রব্রাহ্মণও আফ্রিকায় যাইয়া থাকিবেন। তাঁহাদিগের 'মিশ্র' নাম হইতে তদধ্যুষিত জনপদের মিশ্র বা মিশর নাম হওয়া অসম্ভব নহে।" অম্‌বাইটদিগকে অম্বষ্ঠ ও শিওয়ানগরকে শৈবনগর নির্দ্দেশ করা যায়। এ অবস্থায় মিশর পিতৃভূমি হইতে পারে না।

আবার মিডিয়ার ন্যায় "ইরাণের পিতৃভূমিত্ব সংসিদ্ধি বিষয়ে কোনও যুক্তি বা প্রমাণই বর্ত্তমান নাই। * * আর্য্যনামধারী অসুরগণ ভারত

হইতে পারস্যে গমন করাতেই আর্য্যদিগের অয়ন উক্ত উত্তর পারস্য আর্য্যায়ণ (আর্য্য+অয়ন=আর্য্যায়ণ) নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সেই আর্য্যায়ণ শব্দই বিকৃত হইয়া আইরাণ ও ক্রমে ইরাণে পরিণত হইয়াছে।" আবার জেন্দাভেস্তায় যে আরিয়ানা ভেইজোকে ইরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই আর্য্যাবর্ত্ত।

আবার কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, "মধ্য এশিয়া মানবের আদি জন্মভূমি এবং সে স্থান আমূ বা জারজাকটাস নদীর পুলিনদেশ কিংবা বাক্‌ট্রিয়া অথবা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের প্রান্তভূমি"—তাহারও প্রমাণাভাব।

ইহার পর ভারতবর্ষের কথা। "পাশ্চাত্য মণীষিগণ সমস্বরে বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এমন একটী কথাও নাই যে তাঁহারা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।" কিন্তু বেদাদি গ্রন্থের পর্য্যালোচনায় জানা যায় এই মতের মূলে "কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই।" আবার ভারতবাসীরাও স্বাভাবিক স্বদেশ-প্রীতি প্রযুক্ত ভারতবর্ষকেই "মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ ও প্রতিপন্ন" করিতে চাহেন। কিন্তু বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যায়—বেদাদি "সুবাস্তু বা ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি বা মানবের আদি নিকেতন বলিয়া সংসূচিত করেন নাই।" পরন্তু ভারতবর্ষ "জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ।" চরকের উক্তিতে দেখা যায়—"ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদিগের ন্যায় নর বা মানুষ ছিলেন এবং স্বর্গটা পাদগম্য ছিল। সেই স্বর্গ কোথায়? উহার সহিত আমরা কখন পরিচিত ছিলাম কি না? চরক পাঠেই জানা যায় যে, স্বর্গ হিমালয়ের পরপারে বিদ্যমান এবং স্বর্গৈক দেশ হইতেই স্বর্গগঙ্গা ভাগীরথীর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, উহা দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং উহাই ভারতবাসী আমাদিগের পূর্ব্বনিবাস।"

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "উত্তর কুরু বা উত্তর কেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি।" ওয়ারেণ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আর তিলক এই মতেরই সমর্থন করিয়া ইহার প্রচার করিয়াছেন। বেদে বহুবার যে দীর্ঘকালব্যাপিনী ঊষার উল্লেখ আছে উত্তর কুরু বা উত্তর কেন্দ্রেই তাহা লক্ষিত হয়। "কিন্তু তাহাতে সেই উত্তর কুরুর আদি জন্ম-গেহত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, আমরা তাহা অবগত নহি। উত্তর কুরুতে যে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হইয়া থাকে তাহাও আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ জানিতেন; তথায় যে অরোরা বরিয়ালিস রাত্রিতে আলোকের

কাজ করিত তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন (রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ শেষ দেখ) এবং দীর্ঘকালব্যাপিনী ঊষার সহিতও তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। কেন? তাঁহারা ভারত হইতে উত্তর কুরুতে সদাসর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। তাঁহারাই হয় তথায় বসিয়া, না হয় তথা হইতে ভারতে আসিয়া উহা বৈদিক মন্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন।" "আমরা যে আদি স্বর্গ মেরু পর্ব্বত বা আদি দেবলোক হইতে চলিয়া ভারতাদিতে আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা—'স এষ পর্ব্বতোমেরু দৈবলোক উদাহৃত' এবং আমাদিগের আদি জন্মভূমি মেরু পর্ব্বতের সানুদেশ যে ইলাবৃতবর্ষস্থ তাহাও অতি প্রকৃত সংবাদ। 'মেরু মধ্যম্ ইলাবৃতম্' (বায়ু) কিন্তু সেই মেরুপর্ব্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ, উত্তর কেন্দ্রবিহারী নহে, উহা মনুষ্যদেহে নাভির ন্যায় আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।" 'মেরু' বর্ত্তমান উত্তর মেরু নহে—উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণে অবস্থিত।

ঋগ্‌বেদ স্বর্গবাসী দেবতাদিগকে ও আমাদিগকে এক মাতার সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম' (১০-২৭ সূ—৮ম হে দেবগণ তোমরা আমাদিগকে পর বলিয়া হিংসা বা দ্বেষ করিও না, তোমরা আমাদের সজাতি ও বন্ধু ব্যক্তি। 'অশ্বিনঃ ইন্দ্র এষাম বিষ্ণো সজাত্যানাম্ ইতা মরুতো অশ্বিনা' (৭-৭ সূ—৮ম) হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! হে মরুদ্‌গণ! আমরা তোমাদের স্বজাতি। তোমরা আমাদিগের নিকট আগমন কর। 'প্রভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা। মাতুর্গর্ভে ভরামহে' (৮-৭২ সূ—৮ম) আমরা ও তোমরা এখন দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি বটে, এখন তোমরা স্বর্গবাসী ও আমরা ভারতপ্রবাসী। কিন্তু তোমরা ও আমরা এক মাতা স্বর্গভূমির সন্তান। তোমাদের সহিত আমাদের নিকট ভ্রাতৃত্বই রহিয়াছে।" "তবে কি স্বর্গ এক দিন জগতের সাধারণ মাতৃভূমি বলিয়াও বিশেষিত হইত? অবশ্যই হইত। যখন ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তর কুরুতে গমন করেন ও আমরা ভারতে আগমন করি, তখনই মাতা দ্যৌ বা আদি স্বর্গ পিতৃ নামের বিষয়ীভূত হয়। যদাহ ঋগ্‌বেদঃ 'যুক্তা মাতা আসীৎ ধুরি দক্ষিণায়াঃ' (৯-১৬ সূ—১ম) তত্র সায়ণঃ 'মাতা নির্ম্মীয়তে অস্মিন্ ভূতানি ইতি মাতা দ্যৌঃ। দক্ষিণায়াঃ অভিমতপূরণসমর্থায়াঃ পৃথিব্যাঃ ধুরি নির্ব্বাহণে যুক্তা আসীৎ।' সায়ণের এ ব্যাখ্যা অতীব শোভন হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা ভারতে আসিয়া

উপনিবিষ্ট হইলে দৈত্য দানব, অসুর (পার্সী) ও এদেশের কৃষ্ণত্বগণ আমাদিগের প্রতি প্রভূত অত্যাচার করেন। তজ্জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে আমাদিগের এই দক্ষিণ দেশ রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তথাহি 'সং পস্যামি প্রজা অহম্ ইড় প্রজসো মানবী '(কৃষ্ণযজু)' 'পশবো বৈ উত্তরবেদী' 'পশরোবৈ ইড়া,' 'অভিন ইলা যূথস্য মাতা (১৯—৪১ সূ—৫ম) অর্থাৎ ইল বা ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া মানবজাতির মাতৃভূমি।"

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-বর্ণিত স্থানগুলির অবস্থান নিরূপণে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পাতাল কোথায়? দক্ষিণ আমেরিকায় বলির নিকেতন রসাতলে ছিল বলিয়া আমরা সমগ্র আমেরিকাকেই পাতাল বলিতে অভিলাষী।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যুক্তিগুলি যে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও বিচারযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি অনেক স্থলে শব্দ সদৃশ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন। উদ্ধৃতাংশগুলিতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। আরও কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—"ভারতীয় আর্য্যগণই পেলেষ্টাইনের ইস্রাইল বা আর্য্যবংশের নিদান।" (১৩ পৃষ্ঠা) "হরিয়ুপীয়ার অপভ্রংশেই 'ইউরোপীয়া ও ইউরোপীয়ার অপভ্রংশ" 'ইউরোপা' হইয়া শেষে তাহা হইতে ইউরোপ শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।" (২০ পৃষ্ঠা) রোম "ভাস্করাচার্য্যের ভুবনকোষধৃত রোমক পত্তন, সুতরাং সংস্কৃত ভাষা।" (২২ পৃষ্ঠা) ইলা হইতেই "গ্রীক ও লাটিনগণের ইলিশিয়ান ও ইলিশিয়াম শব্দ বুৎপাদিত হইয়াছে।" (১৫৩ পৃষ্ঠা) "যাহাকে এইক্ষণ 'পেটাগোনিয়া বলে, উহাই হিন্দু-শাস্ত্রের পাতাল।" (২০৫ পৃষ্ঠা) শব্দ সাদৃশ্য সর্ব্বত্র নিরাপদ ও নিশ্চিত প্রমাণ নহে।

সর্ব্ববিধ লেখকের মত খণ্ডনপ্রয়াসী হইয়া গ্রন্থকার অকারণ গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। তিনি যেরূপ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেরূপ বিষয়ের বিচারদক্ষতা অনেকেরই নাই। তিনি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লেখকদিগের মতের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত কেহই এখন প্রামাণ্য বিবেচনা করে না। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় এই "পলিটিক্যাল পদরীর" মত পূর্ব্ব হইতেই পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করা একান্ত অনাবশ্যক।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উত্তম সংগ্রহকার; উত্তম সংগ্রহগ্রন্থ বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থের আদর। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার মৌলিক মতের মূল্য অধিক নহে। তীক্ষবুদ্ধি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে প্রতিভা আইনের কূটতর্কবিচারে, সাহিত্যের সৌন্দর্য্যসংবর্দ্ধনে, সমাজতত্ত্বের সমস্যাসমাধানে, শাস্ত্রোক্তির অর্থোদ্ধারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল—সে প্রতিভা প্রত্নতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পথিপ্রদর্শকদিগের অন্যতম—তাঁহার তত্ত্বানুশীলনপ্রণালী প্রশংসনীয়; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত নহে। এরূপ অবস্থায় ইঁহাদিগের মতের বিচারে অধিক সময়ক্ষেপ অনাবশ্যক।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "৪৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর গবেষণা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন" সাহিত্যিক সমাজে তাহা সমাদৃত ও সমালোচিত হইবে সত্যনির্ণয়ে বিশেষ সহায়তা করিবে।

নিশীথে।

গাঢ় সুপ্তি বিশ্বব্যাপি' পাতিয়াছে কোল,
ল'য়ে বুকে এ নিখিল স্নেহে জননীর—
থেমে গেছে কোলাহল যত গণ্ডগোল
ঝিল্লিডাকে বহে রক্ত বিশ্ব-ধমনীর।

তরুতল কি পর্য্যঙ্ক কোন' ভেদ নাই,
একাকার নাহি জ্ঞান ঘুমে অচেতন;
জেতাজিত, প্রভুভৃত্য, সমান সবাই,
লক্ষ্য নাই লাভ ক্ষতি কাহার' এখন।

হিসাবের ভুলচুক্ হিসাবেই আছে—
লাভজয়ে সে দ্বন্দ্বিতা সব অবসান্
এ নীরব এ বিশ্রান্ত জগতের মাঝে,
জাগিতেছে এক শুধু সমস্যা মহান্।—

"এই ভ্রান্তি. পবিত্রতা—সুপ্তি দিতে পারে,
জ্ঞানময় জাগরণ দিতে কেন নারে?"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দান-প্রতিদান।

দিগান্তপ্রসারী মরুভূমির মধ্য দিয়া নীল নদের সুস্বাদু সুশীতল বারিধারা প্রবাহিত হইয়া কুঞ্জ-বন-বীথি-পূর্ণ একটি হরিৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছে। দুই দিকের বালুবিস্তীর্ণ নিরাশাপূর্ণ দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যস্থলে এমন সজল—শ্যামল দেশ বিধাতার করুণার পরিচয়;—নীলনদ দুই কূল ভাসাইয়া অমৃতধারায় এই শোভাটুকু সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। দিগন্তের যত পাখী এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লয়, আঙ্গুর ও বেদানায় বনকুঞ্জ ভরিয়া উঠে; খর্জ্জুর-কুঞ্জে তোতা সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাহে, দয়েল শীস দেয়, আর গোলাব-কুঞ্জে বুলবুল মসগুল থাকে, শ্যামল ক্ষেত্রে সোনার শস্য পাকিয়া উঠিলে পাগল হাওয়া দোল দেয়, রবি স্বর্ণ আভা বিছায়, চাঁদ নীল নদের জলে ও বনকুঞ্জের মাথায় সোহাগে ঢলিয়া পড়ে।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সম্মুখে নীল নদ। অপরাহ্ন। বনকুঞ্জের মধ্যদিয়া রবির আভা গলিত স্বর্ণরেখার মত আসিতেছিল। দয়েল বহুক্ষণ শীস দিল; শেষে ক্লান্ত হইয়া উড়িয়া গিয়া পক্কশ্রী খর্জ্জুরের বক্ষে চঞ্চু বিদ্ধ করিল, অতিপক্ক ফলগুলি চঞ্চুর তীক্ষ্ণ স্পর্শেই মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। দুইটি বালক বালিকা আসিয়া তাহা কুড়াইতে লাগিল। পাখী নিরাশ হইল না; ক্রমাগত চঞ্চুবিদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক ফল ঝরিল, কিন্তু একটিতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। শেষে দয়েল অন্য এক বৃক্ষে উড়িয়া গেল; ক্লান্ত শুষ্ক কণ্ঠে সেই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ফল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল।

গাছের তলে যে দুইজন ফল কুড়াইতেছিল তাহাদের নাম—সোরাব ও মিশরী। উভয়েই কিশোরবয়স্ক। মিশরী সোরাবের পিতার লালিত কন্যা; উভয়েই বাল্যসঙ্গী ও সৌহৃদ্যপরায়ণ। সোরাবের পিতার ইচ্ছা এই দুই জনকে একত্র বিবাহসূত্রে গ্রথিত করেন। দুই জনই সে কথা অবগত ছিল, কিন্তু তাহাদের সৌহৃদ্য সেজন্য গাঢ় হয় নাই। তবে কেন?—সে কথা তাহারাও বলিতে পারিত না। দুইজনই পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিত; বোধ হয় তাহা আত্মার টান - হৃদয়ের সঙ্গেও তাহার সংস্পর্শ ছিল না। শৈশবের নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতির সঙ্গে প্রাণের প্রবাহ বাড়িয়া উঠিলে তাহাকে প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবা অসম্ভব হইয়া উঠে। দুইজনের তাহাই হইয়াছিল।

* * * *

সোরাব বড় হইয়াছে। সোবার যে যুদ্ধে যাইবে সে কথা শুনিয়া মিশরী দুঃখিত হইল না। কিন্তু তাহার জীবনটার সার্থকতার সঙ্গে সোরাবের জীবনের কতটা ছাড়াছাড়ি তাহাই সে ভাবিতেছিল। মানব একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ সঙ্গীকে যদি অদৃশ্য দেখে, তবে যেমন তাহার মনে একটা ভাবের আবেগ উপস্থিত হয় মিশরীর তাহাই হইয়াছিল। মিশরীর আন্তরিক দুঃখ আর কিছুই নহে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে সোরাবের সঙ্গিনী হইতে পারিবে না, এই দুঃখ। এই স্থানেই জীবনের একটা বিশাল ব্যর্থতা তাহার জীবন-পথ অবরোধ করিয়া দাড়াইয়াছে। শৈশব হইতে দুইজন এক কার্য্যে ব্রতী থাকিত ; আজ সহসা একজন যদি স্বীয় কর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় অথবা কোন গৌরব আসিয়া যদি একজনকে বরণ করে, তবে মনে মনে একটা আঘাত অনুভূত হয়। তাহা ব্যর্থতারও নহে ঈর্ষ্যারও নহে, তবু তাহা হৃদয়কে ব্যথিত করে। মিশরীর তাহাই হইয়াছিল। কে বলিবে এই কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে বেদনা আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিবে না। জীবনের গতি কয়জন নিশ্চিত ও অবধারিত পথে পরিচালিত করিতে পারে? স্রোতের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ঘূর্ণাবর্ত্তের কুটিলতাও সৃষ্ট হয়। কাযেই মিশরীর মনে অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সোরাবের সঙ্গে তাহার যে যোগ স্ত্রীধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইলেও সে যোগ সে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে না। কিন্তু কোনমতেই মিশরী সোরাবের যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী হইতে পারিল না।

সোরাব পিতার সঙ্গে যুদ্ধে গেল। যুদ্ধে যাইবার সময় সোরাব বলিয়া গেল,—"মিশরী, আমাদের ভালবাসা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না।"

তাতার দস্যুরা মিশর দেশ আক্রমণ করিয়াছে। অধীনতা অথবা মৃত্যু এই লইয়া যুদ্ধ চলিতেছে। মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, কান্তারে উভয় পক্ষের তরবারীসঙ্ঘর্ষে শ্মশানক্ষেত্র রচিত হইতেছে।

সোরাবের পিতা যুদ্ধে অন্তিম শয্যার বিশ্রাম লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ করিতে পুত্রকে রাখিয়া গেলেন। সোরাব অল্প-সংখ্যক মিশর সৈন্যের সাহায্যে বিশাল তাতার দস্যুদলের ভীতি উৎপাদিত করিতে লাগিল।

ক্রমে দেশ তাতারদিগের করায়ত্ত হইল। স্বদেশরক্ষার্থ যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তাহারা বিপ্লববাদীরূপে গণ্য হইয়া গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত

হইতে লাগিল। পরাজিত দেশবাসীরা যুদ্ধ ত্যাগ করিল। সোরাব তাহা পারিল না, সে লোকালয়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যে স্বাধীন সিংহের মত বিচরণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল।

কিছুদিন পরে সোরাব বন্দী হইয়া তাতার সেনাপতির সম্মুখে নীত হইল। কারাদণ্ড অপেক্ষা মৃত্যু সোরাবের নিকট অধিক গৌরব-জনক বোধ হইল। সোরাব শৃঙ্খলিত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইল। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা;—সোরাবের বিচারফল নির্দ্ধারিত হইল।

* * * * *

ঘনান্ধকার রাত্রি—বর্ষণক্লান্ত, স্তব্ধ। মেঘমালা আকাশের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মেঘে বিদ্যুতস্ফুরণ হইতেছিল। সোরাব কারাগারের গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আকাশের অবস্থা দেখিতেছিল; আর ভাবিতেছিল—নিজের অদৃষ্টের কথা।

মৃত্যুর জন্য সোরাব ভীত নহে; কিন্তু সে যে পিতার আদেশ পালন করিতে পারিল না, সে জন্য সে দুঃখিত। আর মিশরী—তাহার হৃদয়ের অধীশ্বরী না জানি সে কেমনে আছে! সোরাব প্রকৃতির অবস্থার সঙ্গে আপনার অদৃষ্টের তুলনা করিতেছিল। আজ প্রকৃতির এই ভীষণ অবস্থা, কিন্তু কাল হয় ত মেঘমুক্ত গগনে দিবালোকবিকাশ হইবে। সোরাবের মনে হইল, সে যদি কোন প্রকারে আজ মুক্ত হইতে পারিত হয় ত সে চেষ্টা করিলে পিতার আদেশ পালন করিতে পারিত—হয় ত মিশরের সুখসূর্য্য আবার উদিত হইত। হায়! মৃত্যুসময়েও লোক আশার বশীভূত হয়! মৃত্যু ত সোরাবের কণ্ঠলগ্নই রহিয়াছে।

এমন সময় কে আসিয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত করিল। সোরাব মনে করিল, বুঝি ঘাতুক আসিল, কিন্তু সে বিদ্যুতস্ফুরণের ক্ষণস্থায়ী আলোকে দেখিল, না, একজন মহিলা!

মহিলা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীর স্বরে বলিল,—"সোরাব তুমি মুক্ত হইলে কি কর?"

সোরাব দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল,—"পুনরায় তাতার দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করি।"

রমণী ধীর স্বরে উত্তর করিল,—"আমার সঙ্গে আইস। যদি মুক্তি চাহ, বিলম্ব করিও না।"

রমণী সোরাবের হস্তপদের শৃঙ্খল মুক্ত করিল।

সোরাব কারাগারের বাহিরে আসিয়া বলিল,—"রমণী, তুমি কে জনি না; যদি সফলকাম হই, তবে হয় ত পুনরায় দেখা হইবে। এই লহ আমার হস্তের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। যদি কখন আমার সুদিন আইসে, এই অঙ্গুরী লইয়া যাইও। সোরাব কৃতজ্ঞ কি না জানিতে পারিবে।"

সোরাবের মনে হইল, রমণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে সেই স্থান হইতে একটি অশ্ব লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

* * * * *

ত্রিশ বৎসর মিশরবাসীরা তাতারবাসীর অত্যাচার সহ্য করিয়া আবার সজাগ হইল। অত্যাচারের আধিক্যে মৃত্যুর বিভীষিকা লোকের মন হইতে দূর হইতে লাগিল।

আবার যুদ্ধ বাধিল। সৈন্যাধ্যক্ষ সোরাবের সঙ্গে তাতার সেনাপতি ইস্মাইল খাঁ'র সমর বাধিল।

মরুপ্রান্তরের দুই দিকে মুখামুখী হইয়া তাতার সৈন্য ও সোরাবের সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই বোধ হয় সংগ্রামের শেষ অভিনয়।

কয়েক দিন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর বহু তাতার সৈন্য নিহত হইল; অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

ইসমাইল খাঁ'কে বন্দী করা সোরাবের একান্ত ইচ্ছা ছিল; কারণ ইসমাইল মিশরসীমা অতিক্রম করিতে পারিলে পুনরায় সৈন্যদল লইয়া মিশরের ধ্বংসের চেষ্টা করিতে পারে। এই জন্য এই শত্রুকে ধৃত করাই সোরাবের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

ইসমাইল স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু এখনও মিশর-সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

সোরাব সারাদিন অশ্ব ছুটাইয়া নীল নদের কূলে কুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিল, এমন সময় একজন লোক একজন মহিলা ও দুইটি শিশু সন্তান লইয়া নদ অতিক্রমণের জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উহাদের পরিচ্ছদাদি দেখিয়া সোরাবের স্বতঃই সন্দেহ জন্মিল, উহারা বিদেশী। মহিলার আপাদমস্তক বোরকায় অবৃত।

সোরাব তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিল,—"কে তোমরা? কোথায় যাইতেছ?"

পরুষ কণ্ঠে উত্তর হইল,—"তোমার প্রয়োজন?"

সোরাব বলিল,—"কাপুরুষ! কলঙ্ক লইয়া পলাইতেছ?"

পুরুষ উত্তর করিল,—"আইস, সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের পরীক্ষা হউক।"

সোরাব ও সেই পুরুষ অসি নিষ্কাষিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। উভয়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে উক্ত পুরুষ সোরাবের অসিতে ছিন্নশির হইয়া ভূপতিত হইল।

মহিলাটি ধীরে অগ্রসর হইল। অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ হইতে সুমিষ্ট করুণ স্বর বাহির হইল,—"বীর পুরুষ, এই অনাথ শিশুপুত্র দুইটিরও তুমি সদ্গতি কর।"

সোরাব উত্তর করিল,—"ক্ষমা করিলাম। যাও, ইহাদের লইয়া তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

রমণী উত্তর করিল,—"আমার দেশ! সে কোথা? এই ত আমার দেশ।"

রমণী অবগুণ্ঠন অর্দ্ধেক উন্মোচন করিল। তাহার আয়ত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সোরাব সবিস্ময়ে দেখিল রমণী আর কেহই নহে,—মিশরী—তাহার বাল্যের সহচরী, ও যৌবনের সমস্ত সুখস্মৃতির অধীশ্বরী।

উর্দ্ধফণ সর্প দেখিলে লোক যেমন শিহরিয়া পিছাইয়া আইসে, সোরাবও তেমনই করিল। তাহার পর সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কি পিশাচী! কলঙ্কিনী! আমার চিরদিনের সুখস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিলি?"

রমণী এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"সোরাব, যদি অন্যায় কিছু করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। আমার কথা শুন।"

সোরাব সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল,—"অন্যায়! আমার জীবনের সব আশা, সব গৌরব, সব স্পর্দ্ধা অতলতলে ডুবাইয়াছ। অন্যায়! যদি প্রতিশোধ চাহ, আজই দিব।"

রমণী সগর্ব্বে উত্তর করিল,—"সোরাব, ভেদ তুমিই আনিয়াছিলে। যদি শৈশবের কথা মনে পড়ে ভ্রাতার মত ব্যবহার করিও। জানিও আমি পতিপ্রাণা। মৃত পতির শব আমার সম্মুখে। আমার কি প্রতিশোধ দিবার নাই? তবে আমি রমণী, ভ্রাতার দোষ মার্জ্জনা করিতে পারি, আবার স্বামীর সহস্র অন্যায়ও বহন করিতে পারি।"

সোরাব ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া রহিল, তাহার পর আত্মসম্বরণ করিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—"মিশরী, আমার অপরাধ ক্ষমা

কর। আইস আবার আমরা শৈশবের স্নেহস্মৃতিকুঞ্জে ফিরিয়া যাই।—তোমাকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থ হইবে। আইস সংসারের কঠোর নিষ্পেষণ অগ্রাহ্য করিয়া আবার নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করি—আবার দুই জন এক হই।"

মিশরী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল.—"সোরাব, কর্ত্তব্য তুমি যেমন জান আমিও তেমনই জানি। আমার পতি-ভক্তি এত শিথিল নহে যে, প্রলোভনে বা অতীত স্নেহমোহে আমি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইব। অতীত! যাহার ধ্বংস হইয়াছে, সোরাব, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিও না। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতা আমার কি তোমার নাই। যদি আমাকে ভালবাস তবে ভ্রাতার মত স্নেহ দিও, ইহার অধিক ইচ্ছা বা আশা করিও না।

সোরাব এবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মিশরীর মুখের দিকে চাহিল; বলিল -"মিশরী, আজ এ কি বলিতেছ? ঘটনা অকরুণ হইয়াছিল বলিয়া আজ তুমিও অকরুণ হইলে! ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধনায় অরণ্যে পর্ব্বতে কাটাইয়াছি কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আজ এই কি প্রতিদান, মিশরী? কর্ত্তব্য আমিও বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু, তাই বলিয়া কি সব বিস্মৃত হইব. মিশরী?"

মিশরী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"তোমার কর্ত্তব্য তুমি সম্পন্ন কর—আমার কর্ত্তব্যপালনে তুমি বাধা প্রদান করিও না।"

সোরাব দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"মিশরী, তবে আমি তাহাই করিব। তোমার সঙ্গী এই বালকদ্বয় আমার বন্দী। আমি ইহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলাম—ধর্ম্মাধিকরণে ইহাদিগকে সমর্পিত করিব, কারণ ইহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে দেশে অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে। তুমি যথায় ইচ্ছা যাইতে পার।"

মিশরী পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সোরাব বালক দুইটিকে লইয়া চলিয়া গেল। মাতৃসঙ্গছিন্ন বালক দুইটির করুণ ক্রন্দনধ্বনি বহু দূর হইতে মিশরীর কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া দৌড়াইল; কিয়ৎক্ষণমধ্যে সোরাবের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল,—"সোরাব, তুমি যাহা চাহ দিতে প্রস্তুত আছি। বালক দুইটিকে ছাড়িয়া দাও।"

সোরাব বলিল,—"জীবনের তৃপ্তি—তোমার ভালবাসা ;—তুমি আমাকে বিবাহ করিবে এই প্রতিশ্রুতি চাহি।"

"অসম্ভব"।

মিশরী ফিরিয়া আসিল।

*   *   *   *   *

ঘন অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত ; বায়ুর শন শন শব্দ ক্রন্দনের মত চতুর্দ্দিকে বাজিতেছিল।

সোরাব বালক দুইটিকে লইয়া পুনরায় নীলনদের দিকে আসিতেছিল। স্তব্ধ অন্ধকারে সুদূর আকাশের তারা একমাত্র আলোকবর্ত্তিকা।

সোরাব ডাকিল,—"মিশরী! মিশরী!"

কোন সাড়া শব্দ নাই। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

সোরাব আবার ডাকিল,—"ভগিনী, মিশরী! ভগিনী, আইস আমি আর কিছুই চাহি না ; কেবল মাত্র তোমার ভ্রাতৃস্নেহের ভিখারী।"

কোন উত্তর আসিল না। চতুর্দ্দিক খুঁজিয়া সোরাব যথায় আসিল তথায় তাহারই তরবারীছিন্ন শব ভূপতিত। একটি অন্তিম করুণ কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "মিশরী স্বাধ্বী! সোরাব, জানিও—মিশরী ভ্রাতৃস্নেহপরবশ। সে যাহা রচনা করে তাহা নিষ্কাম কামনার।"

সোরাব করুণ কণ্ঠে বলিল, —"কোথায় ভগিনী? আমি আসিয়াছি।"

মিশরীর জড়িত কণ্ঠ হইতে কথা বাহির হইল—"প্রেম নিষ্কাম পুণ্য।"

সোরাব করুণ কণ্ঠে বলিল,—"ধূলি শয়নে কেন তুমি, মিশরী?—উঠ।"

মরণাহতা রমণীর মুখ আর খুলিল না। কণ্ঠে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া মিশরী স্বামীর সহযাত্রী হইয়াছে। মিশরীর একটি অঙ্গুলী হইতে হীরকের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল ; সে অঙ্গুরীয়কে লিখিত ছিল,—"সোরাব"।

ঘনান্ধকার রাত্রিতে কারাগারে—মৃত্যুর প্রলয়ঙ্করী বিভীষিকা সোরাবের মনে পড়িল। তবে মিশরী তাহাকেই রক্ষা করিতে ইসমাইল খাঁ'কে আত্মদান করিয়াছিল ; আর সতীত্ব রক্ষা করিতে আজ প্রাণদান করিয়াছে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

মিলন।

গাক্‌সা চংকুর প্রতিবেশিনী—তাহাদের মধ্যে খুব ভালবাসা। একজন অন্যজনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে।

একদিন প্রত্যুষে আসিয়া গাক্‌সা দেখিল চংকু খুব বিষণ্ণ, জিজ্ঞাসা করিল "চংকু, আজ তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে?"

চংকু বলিল, "গাক্‌সা, বিধাতা আমাদের সুখে বাদ সাধিয়াছেন।"

গাক্‌সা বলিল "কেন, কেন?"

চংকু বলিল "কাল রাত্রিতে বিধাতা আমাকে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখাইয়াছেন—আমাদের গ্রামের দেবতার কাছে একজন নরবলি না দিলে আমাদের পরিণয় অসম্ভব। গাক্‌সা আমরা বিধাতার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি?"

গাক্‌সা হতবুদ্ধি হইয়া গেল,—কি ভয়ানক আদেশ বিধাতার! সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে বলিয়া উঠিল "তাহার জন্য ভাবনা কেন? একটা নরবলি হইলেই ত হইল!"

চংকু বলিল "পাগ্‌লি, কে আমাদের জন্য আপনার প্রাণ দিবে?"

গাক্‌সা উৎফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল "আর ভাবিও না, দেখিবে কাল ভোরে দেবতার সম্মুখে একটি নরবলি হইয়াছে।"

চংকু গাক্‌সার কথা পাগলের প্রলাপতুল্য জ্ঞান করিল।

গাক্‌সা জিজ্ঞাসা করিল—"চংকু, তুমি আমাকে ভালবাস?" চংকু সস্নেহে গক্‌সার হাত দুইখানি আপনার হাতের মধ্যে লইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভাষা যাহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইত, চংকুর নীরব চাহনি তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিল—সে গাক্‌সাকে কত ভালবাসে।

সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, গাক্‌সার বিদায় লইবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। গাক্‌সা বলিল, "চংকু, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কিছুই ভাল লাগে না। আমি এ জগতে আর কিছুই চাহি না; চাহি শুধু তোমাকে—অবিচ্ছিন্ন ভাবে।"

* * * * *

চংকু রাত্রিতে ঘুমাইয়াছে; ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। সে কি সুখের স্বপ্ন! গাক্‌সা যেন নব বধূর বেশ পরিয়া সর্ব্বাঙ্গে ফুল দিয়া সাজিয়াছে, আজ

তাহার আনন্দের সীমা নাই। চংফুর যেন গত রাত্রির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে পড়িল ; গাক্‌সার ব্যবহার দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। গাক্‌সা তাহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া যেন বলিল, "চংফু, বিধাতার আদেশমত কায হইয়াছে, আজ আমাদের মিলন—অবিচ্ছিন্ন, অনন্ত মিলন। এ মিলন কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না—বিধাতাও না। আজ কি আনন্দ, চংফু!" চংফু তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা লইয়া গাক্‌সাকে বক্ষে ধারণ করিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কঠোর সত্য প্রভাত-আলোক তাহার নয়নে সূচি বিদ্ধ করিতে লাগিল।

গাক্‌সার কথা যদি সত্যই হয় এই মনে করিয়া চংফু মন্দিরের দিকে চলিল, মন্দিরে পৌঁছিয়া যাহা দেখিল তাহতে তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল, মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত হইল। সে দেখিল, তাহারই গাক্‌সা তাহাকে পাইবার জন্য মন্দিরের সম্মুখে আত্ম-বলি দিয়াছে! চংফু মাতালের মত টলিতে লাগিল, উন্মত্তভাবে গাক্‌সাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। সে শয্যা সে আর ত্যাগ করিল না। আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তৃপ্তিকে ধরিল।

পত্র-বিরল বৃক্ষের ফাঁক দিয়া সূর্য্যদেব তখন সহস্র করে চংফুর স্বর্গগামী আত্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্বর্গরাজ্যে এক বৃন্তে দুইটি ফুল ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ মজুমদার।

নিদাঘে।

আজি এ নিদাঘে মরু-নির্ঝরে ভরি' ল'য়ে হেমঘটে·
খর্জ্জুরবীথি বাহি' কেবা আসে তৃষিত হৃদয়তটে।
মেহেদি-পাতায় রঞ্জিয়া কর চুয়ারসে আঁকা ভুরু,
কর্পূর আর কস্তুরীবাসে হিয়া নাচে দুরু দুরু ;
পাকা দাড়িমের মতন গণ্ড গোলাপী - কাজল চোখে
চামর দুলায়ে নেমে আসে কেগো ধীরি ধীরি নরলোকে।

খুলে দে রে আজি শীষ-মহলের সব বাতায়নগুলি,
জ্যোছনা নিশীথে যমুনার জলে তরিখানি দে রে খুলি,
তাজমহলের সোপানে লভরে শীতল-শয়ন সুখ,
সব স্নানাগারে দে'রে দে' খুলিয়া স্ফটিক-উৎস-মুখ।
কুঙ্কুম-রাঙ্গা গালিচার পরে বসোরা গোলাপ আনি'
কাঁটা বাছি' বাছি' দাও ছড়াইয়া ছিটাও গোলাপি পানি।

মন্দাকিনীতে তরী বেয়ে আজ দেবতা এসেছি নামি,'
ডুবি' আকণ্ঠ মানস সরসে রহিয়াছে দিবাযামী।
ভোগবতী হ'তে নাগবালা উঠি' মিলিয়াছে তা'র সাথে
জলকেলি করে হাসিয়া হাসিয়া ধরি তা'র দু'টি হাতে।
এলায় দুকূল বনবালাকুল অপ্সর-সর-ঘাটে
তরুণ শিকারী রাজার তনয় চঞ্চল বনবাটে।

আলবালে আজি সেঁচিতে সলিল কাতর হয়েছে বাহু,
তরুশাখে যাহা ফুটিবে আশীষ সেই করে তা'র আয়ু।
অসহ হয়েছে বিরহ-বেদনা রামগিরিচূড়া'পরে,
দাঁড়ায়েছে আজ যক্ষ যুবক দূতসন্ধানতরে।
কনক-মরালকণ্ঠ বেড়িয়া কোন্ বিদর্ভ-নারী
তাপিত হৃদয় করিছে শীতল মাখিয়া পাখার বারি!

বৃক্ষের শাখে কিরাত ঘুমায় ধনুঃশর পড়ে ভুঁয়ে
ডালে ডালে পাখী, গহন গুহার পশু তা'র তলে শুয়ে।
পিয়াল তরুর মঞ্জরীরেণু ফেলেছিল চোখ ঢাকি,'
নমেরুর তলে মৃগকদম্ব আজি মেলিতেছে আঁখি।
আজি জীবলোক সারা বরষের স্মৃতির শষ্পদলে
করে রোমন্থ নয়ন মুদিয়া নিদাঘের ছায়াতলে।

প্রাঙ্গণোপরি পুণ্য তরুটি ঝলসিত তা'র পাতা;
প্রান্তর মাঝে পথিকের লাগি' কে পুড়ায় ঐ মাথা?
আজিকার দিনে করুণা-প্রতিমা ওগো ভারতের নারী
কোথা হ'তে তব ঢাল গো একটু ঝারার গঙ্গাবারি।
অশথের মাঝে কি দেবতা রাজে হিন্দু পেয়েছে সাড়া;
তটিনীরে তা'রা জননী বলিতে হয়েছে আত্মহারা।

ধরা হিমবারিপর্ণ ত্যজেছে উগ্রতপের লাগি'
কাতর পরাণে নীলকণ্ঠের করুণার ধারা মাগি'।
এ কোন দধিচি বসিয়াছে তপে দিতে তনু যোগাসনে
অশনি-অস্থি করিবে ইন্দ্রে জয়ী অসুরের রণে!
বরুণ দেবতা খুলিবে তোরণ নিরাপদ নির্ভয়ে,
করুণার ধারা ঝরিবে রাজার হাজার চক্ষু বয়ে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

কেরীর আমলে ভারত।

উইলিয়ম কেরীর নাম বঙ্গে বিশেষ পরিচিত। কেরীর আমলে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল এখন তাহা জানিবার জন্য অনেকের বিশেষ কৌতূহল হইতে পারে। সম্প্রতি মিঃ কে, সি, চাটার্জ্জি 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নামক বিখ্যাত ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় এই পুরাতনী কথার আলোচনা করিয়াছেন। এই সন্দর্ভে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে সেই জন্য আমরা নিম্নে সেই রচনার সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

ভারতের ইতিহাসে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই বৎসর ভারত-সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবন্দোবস্তে সংহত করিতেছিলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ

সালবাই ও মাঙ্গালোরের সন্ধিফলে ভারতে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। এই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে কলিকাতা গেজেটে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির কথা আলোচিত করিয়া এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস যে বৎসর এই লোকহিতকর ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই বৎসর বিলাতের ব্যাপ্টিষ্ট মিসনরী সমিতি কেটারিং সহরে এক বৈঠক বসাইয়া কেরী ও টমাসকে ভারতীয় "বিধর্ম্মীদিগের" নিকট খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নিযুক্ত করেন। উঁহাদের দুই জনের বেতন তদানীন্তন কালের হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ইহাতে তাঁহাদের দুই জনের, তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের ও চারিটি শিশুসন্তানের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহিত করিতে হইত। ঐ সময়ে উক্ত সমিতির শৈশবস্থা। দ্বাদশ জন পল্লী-পাদ্রি মিলিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন এই সমিতির তহবিলে এক হাজার তিন শত টাকা মাত্র জমিয়াছিল। এই টাকা লইয়া কেরী ও টমাস এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ, সর্ব্ব সাকল্যে আটজন লোক দিনেমারদিগের একখানি জাহাজে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে বিলাত হইতে ভারতে রওনা হইয়াছিলেন। টমাসের অত্যন্ত খরচ হইত; তাঁহার কিছু ঋণ ও হইত। সেই জন্য কেরীকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। বিখ্যাত পাদ্রি জন নিউটনের সহিত টমাসের চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, যে সময় কোনও ইংরেজই ভারতবাসীদিগের দেহের বা আত্মার মঙ্গলের কোন চেষ্টাই করিতেন না সেই সময় তিনি ভারতে চিকিৎসক পাদ্রি-রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেরী মিশনরী হইবেন সঙ্কল্প জানাইয়া তাহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন,—উইলিয়ম ক্ষেপিল নাকি?

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর জাহাজখানি বালেশ্বরে আসিয়া পৌঁছে। এই সহরে টমাস তিন ঘণ্টা কাল ধর্ম্মবক্তৃতা করেন। ইহার পর তথাকার লোক এই ক্ষুদ্র খৃষ্টান প্রচারকদলকে দেশীয় প্রথায় ভোজন করায়। ইঁহারা তথায় কলার পাত পাতিয়া ভোজ্যদ্রব্য খাইয়াছিলেন। অঙ্গুলিই ইঁহাদের কাঁটা-চামচের কার্য্য করিয়াছিল। ১১ই নবেম্বর তাঁহারা কলিকাতায় আইসেন। এক পক্ষকাল কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর কেরী অনুমান করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় দুই লক্ষ লোকের বাস। সহরের বাহিরে জঙ্গল। তিনি তাঁহার জর্ণালে লিখিয়াছিলেন,—"এই দেশ অতি সুন্দর। ইহার অধিবাসীরা অত্যন্ত কর্ম্মঠ। কিন্তু তথাপি এই দেশের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ জঙ্গলে আবৃত; বন্য পশু ও ভুজঙ্গের বাসভূমি। ভগবদীচ্ছায় যদি এই দেশে বাইবেলের প্রচার হয়, তাহা হইলেই অরণ্য সর্ব্বতোভাবে ফল-পূর্ণ কুঞ্জকাননে পরিণত হইবে।"

ভারতে পদার্পন

ইঁহারা যে সময় এ দেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, সে সময় সার জন শোর ভারতের মসনদে বিরাজ করিতেছিলেন। তখন এক দল ইংরেজ শৌর্য্যবলে ভারত-সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছেন, আর এক দল এই দেশের জন সাধারণের মনে খৃষ্ট ধর্ম্মের আলোক সমুদ্ভাসিত করিয়া দিবার জন্য উপনীত হইলেন। ধর্ম্ম-প্রচারক মহাশয় উপাখ্যান রচনায় ও খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারে সুদক্ষ ছিলেন।

ভারতের অবস্থা

কেরী হিন্দুদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করিতে পারিলে সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইবে। ভারতবর্ষ হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া প্রাচীর পাঁচ ভাগের দুই ভাগ লোকের মুক্তি পথের প্রদর্শক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দেশের লোক কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী। বাঙ্গালার শাখানদীবহুল ভাগে কোম্পানী যে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন তথায় একই জাতির বাস ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু ১৭৬৯—৭০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরে অনুগঙ্গ প্রদেশের বাঙ্গালী জাতি একেবারেই উজাড় হইয়াছিল। কোম্পানীর রাজপুরুষগণ স্বমুখেই স্বীকার করিতেন যে, ঐ দুর্ভিক্ষে এক কোটী বিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। ইহার বিশ বৎসর পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থার প্রতীকার করিবার উদ্দেশেই লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক ২ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭ শত ২০ টাকায় সমস্ত জমী বিলি করিয়া-ছিলেন। তিনি যে সময় ঐ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালায় দশ আনা আন্দাজ জমীতে আবাদ হইত। ইহা ভিন্ন জমীর সীমানাও নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ইহাতে জমীদার-দিগের খাজানাবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখা হইয়াছিল।

বাঙ্গালার দশা

কেরী এ দেশে আসিবার আট মাস কাল পূর্ব্বে দশ শালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হইয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে ঐ বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। লেখক

লিখিয়াছেন যে, এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের প্রভূত উপকার ও মঙ্গল সাধিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু যদি মাঝখানে জমীদার রাখিবার ব্যবস্থা না হইত তাহা হইলে ইহা আদর্শ ব্যবস্থায় পরিণত হইত। ইহার কয়েক বৎসর পরে ষ্টীন জর্ম্মনীকে ঐরূপ ব্যবস্থা করাতে জর্ম্মনীর সুখসমৃদ্ধি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস যোতদারদিগের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই। অজন্মার বৎসর যাহাতে প্রজাকে খাজানা দিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা হয় নাই। সেই জন্য জমীদারবর্গ প্রজাদিগকে অত্যধিক পীড়ন করিয়া খাজানা আদায় করিতেন। এই বন্দোবস্তের ফলে রাইয়ত সকল ইংরেজের উপর চটিয়া যায়। সেই জন্য কেরী প্রভৃতির ধর্ম্মপ্রচারের কাযও সফল হয় নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

লেখকের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। জমীদার-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালায় জ্ঞানের আলোক এত শীঘ্র ও সত্বর চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আত্মস্বত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ও হইতেছে। জমীদার কর্ত্তৃক প্রজাপীড়নের কথা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। তখন জমীদারে প্রজায় সদ্ভাব ছিল, এখন নাই। তখন গ্রামে গ্রামে জমীদারের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় ছিল, জলাভাবে লোক এমন করিয়া মরিত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য রাইয়তদল সরকারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর সেই অসন্তোষের ফলে কেরীর কার্য্য ব্যাহত হইয়াছিল,—এইরূপ উদ্দাম কল্পনা লেখকের অসমসাহসিকতারই পরিচয় দিতেছে। ইহার পর লেখক হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, যে সময় কেরী এ দেশে আসিয়াছিলেন সে সময় সুন্দর, সবল ও হিতকারী বৈদিক ধর্ম্ম বিস্মৃতির ক্রোড়ে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, অসভ্যের ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম খিচুড়ী পাকাইয়া হিন্দু সমাজকে অনুশাসিত করিতেছিল। ফলে কুসংস্কার, মূর্খতা ও পাশুবিক অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে নৈতিক অবনতি ঘটাইতেছিল। যে সময় কেরী এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন সে সময় সতীদাহ ও শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে বহুবিবাহ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। স্ত্রী জাতির অবস্থা ও মর্য্যাদা অত্যন্ত হীন ছিল।

আমাদের মন্তব্য

সমাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কেরীর মনে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠামূলক ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কেরী যে সময় এ দেশে আগমন করেন সেই সময় ঘনশ্যাম দাস নামক জনৈক হিন্দু খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। এই ব্যক্তি বাল্যকালে ক্লাইভের সেনাদলে ভর্ত্তি হয়েন। উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে ইনিই প্রথমে বিলাতে যায়েন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদিগের সহিত এ দেশে ফিরিয়া আসিলে ইনিই জজদিগের পারসী ভাষার দ্বিভাষী নিযুক্ত হয়েন। কিয়ারনাণ্ডার নামক জনৈক সুইডিস মিশনরী ইঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত

ঘনশ্যাম

করিয়াছিলেন। বিচারপতি চেম্বার্স ইঁহার দীক্ষাকালে Sponsor এর কার্য্য করিয়াছিলেন। কেরী এ দেশে আসিয়া প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে একজনকেও খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। লেখক কেরীর আমলে হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান শাসনের প্রভাবে হিন্দু সমাজ যে কতকটা অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পুরাণ ও তন্ত্রের অনুশাসন লোক ভুল বুঝিত এবং তাহার ফলে কতকগুলি অনাচারী ও কদাচারী সম্প্রদায়ও আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌলিন্য প্রথা সমাজের অস্থিমজ্জাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কতকগুলি আচার শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রতিকূল ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু অবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজ তখন একেবারে অবনত হইয়া পড়ে নাই। তখন সমাজে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ছিল, লোক অধিক সত্যপরায়ণ ও সরল ছিল। উচ্চ শিক্ষা সমাজের মধ্যে অতি অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও তখনকার শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হইত।

ধর্ম্ম-প্রচারক যাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অবস্থিত করিবেন, তাহাদের দশ জনের মধ্যে এক জন হইয়া থাকিবেন, ইহাই কেরীর ধারণা ছিল। সেই জন্য তিনি নদীয়া ও মালদহের সুদূর মফস্বলে চাষীর মধ্যে চাষীর মত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি কখনও শ্রমজীবিগণের সর্দ্দারের, কখনও বাঙ্গালা শিক্ষকের, কখনও সংস্কৃত অধ্যাপকের, কখনও সরকারের প্রাচ্য ভাষার অনুবাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিয়া যে আয় হইত, তাহা তিনি প্রচার-কার্য্যেই ব্যয়িত করিতেন। তিনি নানা স্থান পর্য্যটন করিতেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুটানে গমন করেন। ভুটানবাসীরা তাঁহাকে ও টমাসকে খৃষ্টান লামা বলিয়া সম্মান করিত। প্রথম ছয় বৎসর কাল কেরী এ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ভাষাশিক্ষার ফলে তিনি বাইবেলের অনুবাদকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন।

কেরীর কার্য্য

কেরীর লোকহিতৈষণা অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহারই চেষ্টার ফলে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দু বিধবাদিগের চিতানলে দেহত্যাগপ্রথা রহিত করেন। কেরীর পরামর্শ অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, নীতি, যুক্তি ও মনুষ্যত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশীয়দিগের ধর্ম্মমত রক্ষা করাই ইংরেজ শাসনের মূল মন্ত্র। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। ঐ সময় কেরী Friend of India নামক সংবাদ পত্রে হিন্দু বিধবার পক্ষ অবলম্বন করিয়া অনেক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান "জজ পণ্ডিত" স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় স্পষ্টই বলেন যে, দাম্পত্য সুখলাভের জন্য স্ত্রীলোকের চিতানলে দেহত্যাগের অভিলাষ ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত ও পাদ্রি কেরীর চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়াছে। কেরী শিক্ষাপ্রদানসম্বন্ধে বিশেষ ও বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ কেরীর কীর্ত্তি। উদ্ভিদ বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহার alFro Indica ও Hortus Bengalenesis বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ কেরীর জীবনে বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তিনি বাঙ্গালীকে প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হয়েন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ক্রমাগত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কেহ খৃষ্টান হইল না। তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। পরিশেষে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষ সৌরবাসরে কৃষ্ণপাল নামধেয় চন্দননগরের জনৈক সূত্রধর শ্রীরামপুরে কেরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবারবর্গ শীঘ্রই তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়। কৃষ্ণের শ্যালিকা জয়মণী ও পত্নী রাসু কৃষ্ণের পরই দীক্ষিত হয়। হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে "উমা"ই প্রথম খৃষ্টান। উমার পর গোকুল সস্ত্রীক খৃষ্টান হইয়াছিল। উচ্চ বর্ণের মধ্যে কায়স্থই প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে। পীতাম্বর সিংহ নামক জনৈক স্কুলের শিক্ষক প্রথম কায়স্থ খৃষ্টান। তৎপরে শ্যামদাস, পীতাম্বর মিত্র ও তস্য সুন্দরী ভার্য্যা দ্রৌপদী খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মুসলমানদিগের মধ্যে পীরু মিঞা প্রথমে যিশু খৃষ্টকে ভজিয়াছিলেন।

দেশীয় খৃষ্টান

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান হয়েন নাই। ঐ বৎসর কৃষ্ণপ্রসাদ নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ খৃষ্টান হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮০৪ অব্দে আরও দুইজন ব্রাহ্মণ কেরীর নিকট জর্ডনের জলে অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণকে দীক্ষিত করিয়া কেরীর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। ইহার পর কেরী দেশীয় খৃষ্টানদিগের বিবাহাদির নিয়ম কানুন প্রস্তুত করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ব্রাহ্মণ খৃষ্টান কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত পিতাম্বর ছুতারের দ্বিতীয়া কন্যা আনন্দের শুভ পরিণয় হইয়াছিল। ইহাই দেশীয় খৃষ্টান সমাজে প্রথম বিবাহ। ঐ বৎসরই গোকুল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্য এই বৎসর ডাক্তার কেরী দেশীয়দিগের অন্তেষ্টিক্রিয়াসম্পর্কিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন ও তাহাদের সমাধির জন্য কয়েক বিঘা জমীও খরিদ করেন। শ্রীরামপুর ষ্টেশনের সান্নিধ্যে সেই গোর-স্থান আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ খৃষ্টান

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন ধারাবর্ষ দুর্দ্দিনে প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় ডাক্তার কেরী ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। নীলের চাষ প্রভৃতি কার্য্যে তিনি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সমস্তই তিনি প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শেষ

টিথোনাস্।*

(টেনিসন)

বনানী যে তা'রো আছে নাশ, ওগো, শীর্ণ হয়ে সে পড়ে
বাষ্পও পারে বারিভার তা'র ঢালিতে ভূমির 'পরে,
কৃষাণেরা আসে, মৃত্তিকা চষে, ঢাকা পড়ে তলদেশে.
গ্রীষ্মকয়েক যাপিয়া হরষে হংসও মরে শেষে।
আমাকেই শুধু ক্রূর অমরতা ফিরিছে জীর্ণ করি,'
তিলে তিলে তিলে হতেছি শুষ্ক তোমার বক্ষোপরি।
ভুবনের এই বিজন সীমায় ;—ঘনঘোর কুয়াসায়,
চির নির্ব্বাক্ উদয়াচলের যতদূর দেখা যায়,
প্রভাত কিরণ-কক্ষে কক্ষে, ফিরি স্বপনের পারা
শুভ্রকেশের ছায়াখানি টানি' আমি গো লক্ষ্যহারা।

হায়! আজিকার এ ধূসর ছায়া ছিল একদিন নর
তব পতিত্ব-স্বরগে যে জন বেঁধে তুলেছিল ঘর—
রূপবৈভবে, তোমার প্রণয়-অভিষেক-গরিমায়
দেবতা ব্যতীত আর কেহ বলি জানেনি যে আপনায়!
বলেছিনু তোমা,—"কর মোরে, দেবি, অমর জীবন দান,"
মধুর হাসিয়া দিয়াছিলে তুমি অবিনশ্বর প্রাণ
ভ্রূক্ষেপহীন ধনশালীসম অনায়াসে বিতরিয়া।
তথাপি তোমার প্রবল প্রহর রোষ-বিষাক্ত হিয়া
পূর্ণ করেছে তাদেরি ইচ্ছা,—নাই আর কিছু নাই,
যা' ছিলাম আমি, যা' ছিল আমার, সকলি হয়েছে ছাই।
যদি বা আমার জীবলীলা তা'রা পারেনি করিতে শেষ,
দলিয়া আমায়—অঙ্গ বিকলি' ফেলে গেছে অবশেষ

* 'টিথোনাস্' 'অরোরার' (Goddess of the dawn) মানব-পতি। অরোরার কৃপায় তিনি অমরতা লাভ করেন ; কিন্তু চির-যৌবন প্রাপ্ত হয়েন নাই। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অবস্থায় এই অমরতা তাঁহার নিকট অভিশাপস্বরূপ হইয়া ওঠে এবং জীবনধারণ করা তিনি যন্ত্রনাময় মনে করেন। ভারতীয় বেদ ও গ্রীক পুরাণের বহু রূপক-সাদৃশ্যের ন্যায় এই 'অরোরার' এবং ঋগ্বেদ-কথিত 'উষাদেবীর' মধ্যেও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

চির-যৌবন-সম্মুখে পড়ি' করিবারে বসবাস,
যাপিতে অমর দগ্ধজীবন চির-যৌবন-পাশ!
যদিও আজিকে দুঁহু শিরোপর সাথী তব শুকতারা,
ত্রস্ত চাহনি. এ কাহিনী শুনি' গলে-পড়া বারিধারা
পূর্ণনয়নে, আগেকারই মত ছড়াইছে মৃদুজ্যোতিঃ,
তবু তব প্রেম, রূপ, লাবণ্য এই নিদারুণ ক্ষতি
পূরণ করিতে পারে কি আবার? দাও মোরে ছেড়ে দাও,
ফিরে লও তব সোহাগের দান,—হায় নর! কেন চাও
ভিন্ন করিতে স্বভাব-সুলভ জীবনের পরিণাম?
সুনির্দ্দিষ্ট বিধান-গণ্ডী লঙ্ঘিয়া অবিরাম
ছুটিতে উধাও? এড়াইতে তা'রে, সকলেই যেথা থামে,
যে শুভ নিয়তি এক দিন শেষে. সকলেরই তরে নামে?

ঐ মৃদুবায়ু-ব্যজন-বীজনে সরে মেঘ দু'টি ভাগে
জন্মভূমি ও আঁধার ধরার আভাস নয়নে লাগে।
স্বচ্ছ তোমার ভ্রূযুগ বাহিয়া, অংসযুগল বাহি'
নবচেতনায় কম্পিত তব বক্ষেতে অবগাহি'
রহস্যঘন সেই পুরাতন ক্ষীণালোক-বিভারাশি
আবার তেমনি গোপনে গোপনে পশিতেছে যেন আসি'।
তিমিরের তলে লাল হয়ে ওঠে ও কম কপোল দু'টি,
এ নয়ন-আগে মৃগ-আঁখি তব ধীরে ধীরে ওঠে ফুটি'—
এই বেলা তবু তারকাপুঞ্জ না হ'তে দৃষ্টিহারা
তব অনুরাগী বন্য-বলাকা—লুব্ধ সেবক যারা—
না হ'তে অন্ধ, শিথিল তাদের রোমগুলি ঝাড়ি' ঝাড়ি'
জড়াইয়া থাকা তিমিরগুচ্ছ দাও দাও অপসারি';
তা'রপর এই ছায়ালোক-ভরা গোধূলি-লগনখান্
উজ্জ্বল করি,' রশ্মিরেখায় কর পরিণতি দান।
ওগো, কেন তুমি এমনি নীরবে চিরদিন চিরদিন
সুষমায় ফুটি' চলে যাও পরে কোন উত্তর হীন
আঁখিজল তব ঢালি দিয়ে মম বিলোল কপোলময়?
কেন গো এমন নীরব রোদনে দেখাও আমারে ভয়?
শিহরিয়া উঠি—সে প্রবাদ, অহো, সত্য হয় বা পাছে
সুদূর অতীতে শুনেছিনু যাহা আঁধার ধরণী মাঝে,

সে প্রবাদ, অহো—"দেবতাগণেরও নাহিক সাধ্য আর
ফিরাইয়া নিতে বারেক দত্ত অভিশাপ, উপহার!"

হায়! হায়! লয়ে কোন্ সে হৃদয়, কোন্ সে অপর চোক
(যদি অতীতের সে এবং আমি না হই ভিন্ন লোক)
বিগত-জীবনে দেখিতাম বসি'—ধীরে ধীরে অতি ধীরে
স্বচ্ছ তোমার তনুরেখাগুলি ফুটিছে পূরব-তীরে;
দেখিতাম, ক্ষীণ কুঞ্চন ক্রমে তপন-চক্রে জ্বলে;
পরিবর্ত্তিত পলে পলে তব যাদুদণ্ডের তলে;
দেখিতাম আর মনে হ'ত যেন মর্ম্মশোণিত মম
আভাময় হ'য়ে রাঙ্গায়ে তুলেছে লালিমায় গাঢ়তম
তোমার প্রকাশ, তোমার সকল প্রাসাদ-তোরণ, প্রিয়া,
আধবিকশিত বাসন্তীফুলমুকুলে লজ্জা দিয়া
গন্ধমধুর চুম্ব'কুসুম পড়িত গো ঝরি' ঝরি'
—লভিলে শয়ন—ললাটে, অধরে, আঁখিপল্লবে মরি
শিশিরের মত মৃদু-সঞ্চারী উত্তাপ বিতরিয়া;
পুলক-নেশায় বিভোর, লুব্ধ, আবেশমুগ্ধ হিয়া
শুনিতাম সেই চুম্বন-রত ওষ্ঠযুগলে ঝরে
কি যেন কি গান বন্য মধুর বিচিত্র সুধাস্বরে!

তবু চিরতরে রাখিও না মোরে ধরি' এ উদয়াচলে,
প্রকৃতি আমার তোমা' সাথে আর মিশিবে কিশের বলে!
মরণাধিকারী মহাসুখী নর আবাসগুলিরে ঘেরি'
আরো সুখী যত শবের তৃণাচ্ছাদিত শকট বেড়ি'
আবছায়া-ঘন প্রান্তর হ'তে তপ্ত বাষ্পরাশ
উড়ে চলে যবে লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধ ও নিলাকাশ—
গোলাপী তোমার ছায়া-স্নাত আমি শীতে কাঁপি টলমল,
শীতল তোমার কিরণ পরশ; কুঞ্চিত পদতল
জমে আসে হিম ঠেকিয়া তোমার স্নিগ্ধাভ দেহলীতে।
দাও ছেড়ে দাও—মিশে যাই পুনঃ আমার ধরণীটীতে।
সকলি ত তুমি দেখিবারে পাও, আমারো সমাধি পা'বে,
প্রভাতে প্রভাতে নব-লাবণ্যে নিত্য আসিবে, যা'বে;
মাটীর পলিতে পলিতে মোরে এ সোহাগ ভুলিতে দাও—
রৌপ্য-চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাও তুমি ধেয়ে যাও।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।



অনুসরণ

K. V. Seyne : Bros.

পল্লী-রক্ষা।

(১)

"যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি লিখিত হয় এবং সাধারণ মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য ৬ষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে পরিষদের সম্পাদক মহাশয়—এই প্রস্তাবটি যে "চট্টগ্রামের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ সম্মিলনের অধিবেশনে" "সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে" "অনুকূল মন্তব্য সহ" এই সংবাদ প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পরিষদের নিয়মাবলীতে দেখিলাম—"বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি-সাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য।" নিয়মাবলীর দ্বিতীয় দফায় দেখা যায়,—"এই সভার উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নিম্নলিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায়-সমূহ অবলম্বিত হইবে, যথা —(ক) বাঙ্গালা-ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন, (খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন, (গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, (ঘ) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ, (ঙ) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ, (চ) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার।" বিবৃত উপায়সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নতিবিষয়ক সাহিত্যপ্রচারের উল্লেখ নাই। সুতরাং হয় ইহা অতিরিক্ত উপায়ের মধ্যে ধরিতে হইবে, নহে ত স্বাস্থ্যোন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধের ও পুস্তকাদির প্রচারে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইবে, ইহাই পরিষদের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদের বিশ্বাস। কিন্তু সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ ও আলোচ্য মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের মনে হয়, এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের উন্নতি-সাধন সম্মিলনের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু ইংরাজীতে যাহাকে propaganda work বলে, সেইরূপ লোকমত গঠনার্থ প্রচারকার্য্যই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস যে, এ কার্য্য পরি-

ষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা পরিষদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

এখনই এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরিষৎ আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অকারণে সঙ্কুচিত করিয়া কেবল পুরাতত্ত্বের আলোচনায় মন দিতেছেন। ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনকার্য্যে পরিষদের মন নাই, পরিষদের চেষ্টায় ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদও প্রকাশ হইতেছে না, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রকাশবিষয়ে পরিষৎ উদাসীন, পরিষদের আরব্ধ কোন কোন কার্য্যও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে, আর পরিষৎ এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুকরণে আপনাকে গড়িয়া তুলিতেছেন। এমন কথাও আমরা শুনিয়াছি যে, পরিষদের প্রস্তাবিত "রমেশভবন" সম্পর্কে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে যে পরিমাণ ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছিল, ব্যয় তাহার পাঁচ গুণ হইয়াছিল। কে ইহার জন্য দায়ী?—কেন এত ব্যয় হইল?—ইহাতে কি লাভ হইল?—এই সব কথা লইয়া পরিষদের গৃহস্থালীতে যে গোলযোগ হইয়াছিল, তাহার কথা পরিষদের বাহিরেও শুনা গিয়াছে। আলোচ্য প্রস্তাবের ও পত্রের ভাষা দেখিয়াও সন্দেহ হয়, পরিষৎ বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতিসাধনসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেছেন। শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনিও পরিষদের পুরাতত্ত্বপ্রিয়তার প্রতি বিরক্তিব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আজি দশ বৎসর হইল, যখন সাহিত্য-পরিষৎ সৎ-সাহিত্য-প্রচারের ঘোষণা দিলেন, তখন আমি রোগে শোকে মুহ্যমান; তবু তখন আমি যখনই মোহ কাটাইয়া চারিদিকে কর্ণপাত করিতাম, তখনই পরিষদের ঘোষণার স্বরলহরীতে মহা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের আঠার বৎসর বয়সেও যখন আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি কোন শিক্ষাদাতার কাব্য পাইলাম না, তখন সেই হর্ষে এখন আমার নিয়তই বিষাদ আসিতেছে। * * * * * * একটি বৃহৎ ভবন দেখাইয়া, আর কতকগুলি প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক ভাঙ্গা-ফুটা পাথরের সামগ্রী বা কীটদষ্ট পুরাতন পুস্তক দেখাইয়া আর কত দিন চলিবে? সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত সাহিত্যসেবার উপাদান-সংগ্রহে অবহেলার অভিযোগ চারিদিকে ঘোষিত হইতেছে।"

ইহার উপর এবার পরিষৎ স্বাস্থ্যকথায় মন দিয়াছেন কেন? সাহিত্যের

সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য—সাহিত্যের আসরে স্বাস্থ্য-কথা কীর্ত্তনের সার্থকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য চুঁচুড়ায় সরকার মহাশয়কে অনেক কথা বলিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াগিয়াছিলেন—"সাহিত্যসেবিগণ! আপনারাই আমার বন্ধু, আপনারাই আমার সুহৃৎ, আপনারাই আমার মুরুব্বি, আপনারাই আমার ভরসাস্থল। আপনাদের নিকটে আমার নিবেদন, আবেদন, আদর ও আব্দার। করযোড়ে মিনতি করিতেছি, আপনারা একবার বঙ্গের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য করুন, বুঝিয়া দেখুন—পাঁচ দিকে পাঁচ মন করিয়া, আসল দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়াতে 'উৎসন্ন' যাইতে বসিয়াছে। এই যে বাঙ্গালার মরণজীবনের কথাটা যে কেবল ধান ভানিতে শিবের গীত, অর্থাৎ সাহিত্য-সম্মিলনে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথা, তাহা নহে। আমি বলিতেছিলাম, অপ্রাসঙ্গিক আব্দার হইলেও তাহা আমি আপনাদের সমক্ষে করিতে পারি, কেন না, আপনারা ভিন্ন আমার কথা কাণ পাতিয়া, মন দিয়া শুনিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এখন বলিতেছি, এটা অপ্রাসঙ্গিক কথা নহে। মনে প্রফুল্লতা, হৃদয়ে আনন্দ না থাকিলে, সাহিত্য জন্মে না, বাড়ে না, থাকিতে পারে না। দেহ সুস্থ না হইলে মনে প্রফুল্লতা, হৃদয়ে আনন্দ থাকে না। সুতরাং দেহ সুস্থ না হইলে সাহিত্য হয় না, দাঁড়ায় না, থাকে না। অতএব আমি যে সাহিত্যসেবিগণকে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিদান করিতে বলিতেছি, সে কথা অপ্রাসঙ্গিক কি করিয়া?"

কিন্তু এই "অতএব" সকলেই মানিয়া লইবেন কি না, সে বিষয়ে সরকার মহাশয়ের সন্দেহ ছিল। তাই তিনি চট্টগ্রামে "বিপুল সাহিত্য-সজ্ঞ-সমক্ষে" "কাতরকণ্ঠে" "সমস্ত বঙ্গের স্বাস্থ্য-ভঙ্গেরকথা" নিবেদন করিবার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎসরপ্রবর্ত্তিত আপনার নজির আপনি তুলিয়া আপনিই বলিয়াছিলেন যে, গত বৎসরও তিনি "অতি কাতরকণ্ঠে," "অতি আর্ত্তস্বরে" "অশ্রুপূর্ণলোচনে" এই কথা সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সদস্যসম্প্রদায়ের সমক্ষে নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প—সকল বিষয়েই উন্নতি হইবে।"

চট্টগ্রামে সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"বিগত বর্ষে এমনই দিনে, এমনই শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্যজন্মদিনে—এমনই ভারতব্যাপী বসন্তোৎসব—ফল্গুৎসবের

দিনে, আমি পঞ্চম সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে বিশেষ-ভাবে আমার হুগলি জেলার এবং সামান্যভাবে সমগ্র বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার কথা অতি কাতরকণ্ঠে, অতি আর্ত্তস্বরে সমগ্র সাহিত্যসেবিগণ-সমক্ষে অশ্রুপূর্ণলোচনে নিবেদন করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, সাহিত্যসেবিগণ! আমি দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যোন্নতির অভিলাষী, তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটু চেষ্টা করুন। বলিয়াছিলাম, অন্য কাহারও কাছে আমি কখন এমন করিয়া আবেদন নিবেদন করি নাই। আপনাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া, আত্মীয় বলিয়া, মুরুব্বী বলিয়া জানি ও মানি। আমি আপনাদের দরবারে যেরূপেই হই, হাজির হইয়াছি—আপানারাই আমার জজ, আপনারাই আমার জুরি, আপনারা আমার অশ্রুপাতে দৃষ্টিপাত করুন, আমার ক্রন্দনে কর্ণপাত করুন, স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে মন দিন। আমার সেই অভিভাষণের ভূয়ো প্রচার হইয়াছিল, অনেক প্রশংসা হইয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ নিন্দাও হইয়াছিল, কিন্তু এমন কথা একজনও বলেন নাই বা লেখেন নাই যে, সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণে দেশের স্বাস্থ্যের জন্য এতটা কাঁদাকাটি করা ভাল হয় নাই। ইহাতেই আমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। একে ত আমি অতি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছি বলিয়া আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাহাতে আপনাদের প্রশ্রয় পাইয়া আমার আব্দার, আমার স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বাড়িয়াছে; আর বাড়িয়াছে আপনাদের কৃত কার্য্যে, আপনাদের অর্থাৎ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যে। আপনারা আমার মত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কৃতি লোককে সভাপতিত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই আমার পূর্ব্ব অভিভাষণে পাঠ করিয়াছিলেন যে, দেশের দুর্দ্দশার দিকে সকলের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য আমার কতকটা অসাধারণ ঝোঁক, অসাধারণ টান, অসাধারণ আবেগ আছে; এটা জানিয়া শুনিয়াও যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন সেই ঝোঁক, সেই টান, সেই আবেগ যে নিতান্ত উপহাসের ব্যাপার বা অবহেলার সামগ্রী, তাহা কখন আপনারা মনে করেন নাই। তাহা যখন করেন নাই তখন আমি সঙ্কুচিত হইব কেন? অসঙ্কোচ ত বটেই, অধিকন্তু এমন আশা করাও অসঙ্গত হইবে না যে, আপনারা আমার ক্রন্দনে এইবার প্রকৃতই কর্ণপাত করিবেন।"

অভিভাষণের আরম্ভেই সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কথা তাঁহার চিরদিনের কথা। সেই জন্যই তিনি সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়া সে কথার আলোচনা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আর সেই জন্যই বোধ হয়, শ্রীযুত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীসেবক' প্রবন্ধ সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু পরিষৎ সহসা বাঙ্গালার সাহিত্যকথার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কশূন্য স্বাস্থ্যকথায় মন দিলেন কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই উন্নতির যুগে সাহিত্যসম্বন্ধীয় কার্য্যই এত অধিক যে, পরিষৎকে অন্য কার্য্যে মন দিতে দেখিলে আমাদের আশঙ্কা হয়—পাছে কেন্দ্রীভূত মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিয়া পরিষৎ পরিশেষে আপনার প্রকৃত কার্য্যে অবহেলা করেন। সেই আশঙ্কাহেতুই আমরা এত কথা বলিলাম। নহিলে বাঙ্গালার পল্লীরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বাঙ্গালার স্বাস্থ্যকথার উপ-যোগিতা আমরা কখনই অস্বীকার করি না।

বিলাতে পল্লী জনহীন হইতেছে—নগরদানব পল্লীবাসিগণকে আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে। পর্টুগিজ লেখক অলিভেরা মার্টিন্‌স ইংলণ্ডের কথায় বলিয়াছেন, কৃষকগণ বলে—কেবল বালক-বালিকা ও জরাগ্রস্তগণ পল্লীতে বাস করে; শ্রমক্ষম অধিবাসীরা পল্লী হইতে চলিয়া যায়।* ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন পল্লীবাসী ছিল আর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৮ জন পল্লীবাসী পাওয়া গিয়াছিল। রেলপথ-বিস্তার যে সহরের জনসংখ্যাবৃদ্ধির ও পল্লীর জনসংখ্যাহ্রাসের অন্যতম কারণ, তাহাও আজকাল স্বীকৃত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, পল্লীর সর্ব্বনাশই স্বাভাবিক। ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন, যে নিন্দনীয় ও সঙ্কাসঙ্কুল অবস্থা সহস্র বর্ষাধিককাল য়ুরোপে সভ্যতার গতিরোধ করিয়াছিল, তাহা দূর হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর সর্ব্বনাশও অবশ্যম্ভাবী।†

রাধাকমল বাবু বিলাতে পল্লীর সর্ব্বনাশের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, —"বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর সহরের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এজন্য

* The England of To-day.

† The Application of the Historical Method to Economic Science.

সেখানে সহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ। কয়লার খনি অথবা শিল্পদ্রব্যের উপাদান যেখানে সহজে পাওয়া যায়, দ্রব্য-প্রস্তুত-করণ বা দ্রব্যবিক্রয়ের যেখানে সুবিধা আছে, সেখানে কল্‌কারকখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অসংখ্য শ্রমজীবী এবং ব্যবসায়ী আসিয়া সেখানে সহর সৃষ্টি করে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি-মূলক সভ্যতা সহরেই পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়।”

কিন্তু বিলাতেও সহরের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিতে শঙ্কার কথা শুনা গিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার লণ্ডনবাসী বন্ধুদিগের কথায় বলিয়াছিলেন, ব্রাউনিং, টিণ্ডাল, হাক্সলে, আর্ণল্ড প্রভৃতি যে কেমন করিয়া সহরে থাকিয়া কায করিতেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। সমাজের সহস্র কাযে সময় নষ্ট হয়। ইহাঁরা যে সহস্র সামাজিক কায করিয়াও আপনাদের কায করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, ইহাঁদের শারীরিক ও মানসিক উভয়াবিধ শক্তিই অসাধারণ ছিল। সত্য বটে, বন্ধুর সহিত কথায় কথায় সময় সময় ভাবের বিকাশ হয়; কিন্তু তাহার জন্য সহরে বাস করিলে লাভ ক্ষতির অনুপাতে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।*

সহরে অল্প পরিসরে বহু জনাগমে, কলকারখানায় লোকের ঘেঁসাঘেঁসিতে স্বাস্থ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী—সঙ্গে সঙ্গে নাকি প্রতিভারও হ্রাস হয়। অজীর্ণ, যক্ষ্মা, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিক্ষীণতা সহরে অত্যন্ত অধিক। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলেন যে, সহরের হুড়াহুড়িতে ও উত্তেজনায় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জন্মে এবং সেই জন্য পুরুষানুক্রমে সহরবাসী পরিবারে প্রতিভার ক্ষয় অনিবার্য্য। সহরের ধূলি যে বহুবিধ ব্যাধিবীজবহন করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সহরে আকাশ ধূমে মলিন—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ম্লান।

য়ুরোপেও সহরবাসী বালকবালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে পল্লীর মুক্তবায়ুতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা পুণ্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জনারণ্য সহর সংস্থাপনের অনুকূল নহে। শীতপ্রধান য়ুরোপেও যখন সহরের অপকারিতার আলোচনা হইতেছে—সহরের অপকারিতা স্বীকৃত হইতেছে তখন উষ্ণপ্রধান ভারতে সহরের অপকারিতা অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়?

বিশেষ পল্লীর সর্ব্বনাশ করিয়া য়ুরোপ কি সত্য সত্যই লাভবান হইয়াছে? রাধাকমল বাবু বলিয়াছেন—

* Auld Lang Syne.

"আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় নগরজীবন এবং পল্লীজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এখন ভাবিবার বিষয়। সেখানকার পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের যে সম্বন্ধ আছে তাহা কি আমাদের আদর্শ হইবার যোগ্য?—আমাদিগের অনুকরণস্থল? পাশ্চাত্য জগতে গ্রামগুলি সমস্ত বিষয়েই সহর এবং নগরীকে অনুকরণ করে। নগরগুলি এরূপে সমস্ত বিষয়ে গ্রামের চিন্তা এবং কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার ফলে জাতীয় সভ্যতা বিভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতেছে, বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের নিজস্বরুচি আর নাই, 'ভিন্নরুচিহি লোকঃ,' এ কথা এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যজগতে খাটে না। যাহা সহরের রুচি তাহাই গ্রামে আদৃত হইবে। এ জন্য লণ্ডন, প্যারী, নিউ-ইয়র্কের হাটবাজারে দ্রব্য যাচাই না করিয়া কোন ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হয় না, কারণ সেখানে যদি উহার আদর না হয় তাহা হইলে দেশের কেহই উহা লইবে না। যাহা কিছু নূতন—বিলাসের সামগ্রী হউক অথবা চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর গবেষণার ফল বা পাগলের বিকৃত মস্তিষ্কের নিদর্শন হউক না কেন,—উহার দ্বারা যদি সহর একবার মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার আদরের সীমা থাকে না। রাজধানী হইতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া শতধারায় যে বন্যার জল বহিতে থাকে, তাহাতে পল্লীগ্রাম ও সহরের সকল বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধুইয়া যায়। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য শিল্পকলা, গ্রাম্য আচার-ব্যবহার এবং আমোদ-প্রমোদ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। গ্রামের আপনার হৃদয় বা প্রাণ নাই, গ্রাম এখন সহর এবং রাজধানীর ছায়ামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ সহরগুলি তাহাদিগের নিজেদের মাপকাঠির দ্বারা দেশের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মকে বিচার করিতেছে। এই ঐক্য ও সমতা এখন সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব লুপ্ত হইয়া জাতীয় সভ্যতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিতেছে।

"ইউরোপ তাহারই সভ্যতার জন্মস্থান পল্লীগ্রামকে এখন ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন পল্লীগ্রাম হইতে মহাপ্রাণ মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইত, তাহার ফলে ইউরোপীয় জগৎ তাঁহাদের প্রতিভা এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে স্তব্ধ হইয়াছিল।

"পল্লীগ্রামের সে দিন আর নাই। ইউরোপীয়েরা এখন অসংখ্য রেল-রাস্তা স্থাপন করিয়াছে, অসংখ্য কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে, বৈষয়িক উন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অসংখ্য জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে এখন ইউরোপের কুঠি এবং বাণিজ্যাগারের উপকরণ যোগাইতেছে। অসংখ্য শ্রমজীবী পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরের কলকারখানায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহা-দিগের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইলেও প্রকৃতিজাত দ্রব্যের অভাব নাই, কারণ বিদেশ হইতে দ্রব্যের আমদানী হইতেছে। যতই গ্রামগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তাহার পল্লী-গ্রামগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছে—বিপুল অর্থলাভের জন্য তাহার সামাজিক জীবনের সুখ এবং শান্তি চিরকালের জন্য হারাইয়াছে।"

প্রিয়-দর্শনে।

আপনার প্রাণ দিয়া যে যাহারে ভালবাসে
তাহারে পাইলে তা'র হৃদয় আনন্দে হাসে।
আকাশে উঠিলে ফুটি' রবির ময়ূখমালা,
হরষে হাসিয়া উঠে সরসে কমলবালা।
গৃহে ফিরি' এল পতি, লভি' দরশন তা'র,
সতীর নয়নে প্রাণে ধরে না পুলক আর।
সুনীল অসীম নভে হেরি পূর্ণচন্দ্রহাস।
সিন্ধুর বিশাল বক্ষে উঠে হর্ষে জলোচ্ছ্বাস।
বিশ্বমাঝে করি' ভক্ত হরি-দরশন লাভ,
নেত্রে তার বহে ধারা, প্রাণে গদ গদ ভাব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।



দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ ।

দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ।

হিন্দুজাতি যে এককালে উন্নতির কত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা আমরা আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় ধারণা করিতেও অক্ষম। তাই যখন হিন্দুর অতীত গৌরবের কোনও উজ্জ্বল নিদর্শন আমাদের মনে সেই বিস্মৃত যুগের একটা ক্ষীণ আভাস আনিয়া দিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমরা যুগপৎ বিষাদে ও বিস্ময়ে অভিভূত হই। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা কেবল কাব্যে ও দর্শনেই আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া পর্য্যবসিত হয় নাই। বিজ্ঞান-রাজ্যেও যে তাহা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসদ্বারা জগতসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। এখন আমরা জানি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এমন অনেক কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, যাহা এই উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষেও সম্ভবপর কি না, সন্দেহ।

সে দিন দিল্লীর কুতব-মিনারের সন্নিকটস্থ সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা মনে হইতেছিল। যে কুবাত-উল-মস্‌জিদ্‌ দেখিয়া আফ্রিকাদেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন্‌ বাতাতু বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ অথচ অনিন্দ্যসুন্দর মস্‌জেদ্‌ আর নাই, তাহা এখন ধ্বংসাবশিষ্ট ;—নানা কারুকার্য্যখচিত উচ্চ প্রাচীরগুলির কিয়দংশ ও কয়েকটি তোরণমাত্র সেই বিস্ময়কর মস্‌জিদের স্মৃতিকে কালের কবল হইতে রক্ষা করিতেছে। ইহারই সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণমধ্যে হিন্দুর অদ্ভুত কীর্ত্তি লৌহস্তম্ভ শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহার সম্মুখে অর্থাৎ মস্‌জেদের প্রবেশপথে দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; এক পার্শ্বে প্রথম পাঠান-সম্রাটের কীর্ত্তিস্তম্ভ কুতব-মিনার এবং পশ্চাতে আল্‌তামাস ও রাজ্ঞী রেজিয়ার সমাধি; কিয়দ্দূরে ভগ্নস্তূপে পরিণত প্রবল-প্রতাপান্বিত আলাউদ্দিন খিলিজীর প্রাসাদ। হিন্দু ও মুসলমান গৌরবের এই বিষাদময় নিদর্শনগুলি যখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্ট করিয়া অতীতের কুহেলিকাময় যবনিকা উত্তোলন করিতেছিল, তখন সহসা পার্শ্বস্থিত পাণ্ডার স্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল।

'বাবুজী' সম্বোধনে আমাদের মনোযোগ তাহার দিকে আকর্ষণ করিয়া

সে এই লৌহস্তম্ভের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কাহিনী আমাদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করিল। সে যাহা বলিল, তাহা এই:—মহম্মদ ঘোরী প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের নিকট ঘোরতররূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এক বৎসর পরে রাজা যখন সংবাদ পাইলেন যে, মহম্মদ এক বিরাট বাহিনী লইয়া পুনরায় ভারত আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তাকুল হইলেন, এবং কি উপায়ে রাজ্যরক্ষা হইতে পারে, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষিগণকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা গণনা করিয়া রাজাকে বলিলেন যে, একটি লৌহস্তম্ভ যদি ভূগর্ভে এরূপ করিয়া প্রোথিত করা যায় যে, তাহা বাসুকির মস্তক স্পর্শ করে, তাহা হইলে ম্লেচ্ছকবল হইতে রাজ্যরক্ষা হইতে পারে। রাজাদেশে তখনই এক প্রকাণ্ড লৌহস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল এবং প্রাসাদের সম্মুখে তাহা প্রোথিত করা হইল। কিন্তু তাহা যে বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? রাজার মনে এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে স্তম্ভটি পুনরায় উত্তোলিত হইল; তখন সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, তাহার অগ্রভাগে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। তখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, স্তম্ভাগ্রভাগ নাগমস্তক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আবার তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল; কিন্তু প্রথম বারে যতটা অংশ ভিতরে গিয়াছিল, এবার শত চেষ্টাতেও ততটা গেল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এবার তাহা আর বাসুকির মস্তকোপরি সংস্থাপিত হইল না। ফলে দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয়। স্তম্ভটি ভাল করিয়া না বসাতে একটু ঢিলা হইয়াছিল; এবং এই 'ঢিলা' শব্দ হইতেই নাকি সহরের নাম ঢিল্লী বা দিল্লী হয়।

এ সমস্তই যে অনৈতিহাসিক প্রসঙ্গমাত্র, এবং এই স্তম্ভ যে রায় পিথৌরার রাজত্বকালের অন্ততঃ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ইহার শীর্ষে উৎকীর্ণ লিপি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পৃথ্বীরাজের নামের সহিত ইহা এইরূপে সংযুক্ত হওয়ায় যে এই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয়, তাঁহার নামের গৌরব ও এই স্তম্ভের তাঁহার প্রাসাদসান্নিধ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই গোলাকার স্তম্ভটির ২২ফিট ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া আছে। যে লৌহে ইহা নির্ম্মিত, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা

এই যে, যদিও ইহা দেড় হাজার বৎসর মুক্ত বায়ুতে অনাবৃত স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তবুও ইহাতে একটুও মরিচা পড়ে নাই! ইহার ঘনকৃষ্ণ ও মসৃণ আকৃতি দেখিলে মনে হয় যে, ইহা অল্পদিন মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অত প্রাচীন কালে এইরূপ সুবৃহৎ স্তম্ভ বিশুদ্ধ লৌহদ্বারা—এবং তাহাও আবার কোন কলকারখানার সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে পারেন না। যখন তাঁহারা দেখেন যে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে জল ও বায়ু ইহার তিলমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

হিন্দুর এই প্রাচান কীর্ত্তিস্তম্ভের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়কল্পে আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। ইহার শীর্ষভাগে যে লিপি ক্ষোদিত আছে, এখনও বোধ হয়, ভাল করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু যদিও এই লিপিতে কোন তারিখ নাই, তথাপি প্রিন্সেপ ইহার আকার ও গঠন দেখিয়া এই স্তম্ভটি খৃষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফার্গুসন বলেন,—"আমাদের বিশ্বাস যে, ইহা গুপ্তবংশের কোন রাজার রাজত্বকালে ৩৬৩ কিংবা ৪০০ খৃষ্টাব্দের পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৪০০ খৃষ্টাব্দই যদি ইহার নির্ম্মাণকাল হয়—এবং ইহাই প্রকৃত সময় বলিয়া বোধ হয়—তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুরা অতি প্রাচীনকালে যেরূপ বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে পারিত, সেরূপ বৃহৎ স্তম্ভ অল্পদিন পূর্ব্বেও য়ুরোপে নির্ম্মিত হয় নাই এবং এখনও যে বেশী অধিক হয়, তাহা নহে। আর এই চৌদ্দ শত বৎসরের বাতাস ও বৃষ্টিতেও যে ইহাতে মরিচা পড়ে নাই এবং চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার শীর্ষদেশে যে লিপি খোদিত হইয়াছিল, তাহা যে এখনও ঠিক সেই রকমই পরিষ্কার আছে, তাহাও কম বিস্ময়ের বিষয় নহে।" *

রস্কো বলেন,—"হিন্দুরা লৌহের কারবারে যে কিরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছিল, তাহা দিল্লীর নিকটস্থ কুতব-মসজিদের মধ্যবর্ত্তী অন্যূন ৬০ ফীট দীর্ঘ লৌহস্তম্ভ হইতে বুঝিতে পারা যায়। * * বাষ্পচালিত সুবৃহৎ হাতুড়ী এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যেও বর্ত্তমানকালে এরূপ লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত

* Indian and Eastern Architecture.

করা সহজ ব্যাপার নহে; হাতে কাজ করিয়া হিন্দুরা কিরূপে এইরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।" *

হিন্দুর লৌহশিল্প এককালে এতই উন্নত ছিল যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও তাহা বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে কিন্তু কয়জন হিন্দু এখন এ সংবাদ রাখেন? হিন্দুর এই শিল্পজ্ঞান ও কৌশল শুধু ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু সুদূর সিংহলাদি স্থানেও তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে সংবাদও আমাদিগকে বৈদেশিকের নিকট পাইতে হয়। সার রবার্ট হ্যাডফিল্ড নামক বিলাতের রয়াল সোসাইটীর অন্যতম সদস্য সম্প্রতি 'Sinhalese Iron of Ancient Origin' শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত ইংরাজ প্রত্নতাত্ত্বিক সিংহলে একখানি লৌহ-নির্ম্মিত ক্ষোদাই যন্ত্র (Chisel) এবং আরও কয়েকটি লৌহদ্রব্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই যে এগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণও তিনি পাইয়াছেন। অতঃপর রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই লৌহ দিল্লীস্তম্ভের লৌহ হইতে প্রায় অভিন্ন। এই জন্য তাঁহাকে শেষোক্ত লৌহটিরও এক টুকরা পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। একই প্রকারের লৌহ একই সময়ে যে আর্য্যাবর্ত্তে ও সিংহলে প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে। সংখ্যাগুলি শতকরা পরিমাণজ্ঞাপক—

	অঙ্গার	বালু	গন্ধক	ফস্ফরাস	বিশুদ্ধ লৌহ	আপেক্ষিক গুরুত্ব
সিংহলে প্রাপ্ত লৌহ	চিহ্নমাত্র	০.১২	০.০০৩	০.২৮	৯৯.২৭	৭.৬
দিল্লীস্তম্ভের লৌহ	০.০৮	০.০৪৬	০.০০৬	০.১১৪	৯৯.৭২	৭.৮১

* Roscoes' Chemistry, P. 1146.

এই তালিকায় দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ গন্ধকের পরিমাণের অল্পতা। গ্রন্থকার বলেন, ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, এই লৌহ-কারবারে অগ্নির জন্য যে ইন্ধন ব্যবহৃত হইত, তাহা অতীব বিশুদ্ধ ছিল; সম্ভবতঃ অঙ্গারের দ্বারা এই কার্য্য নিষ্পাদিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, এই লৌহে Manganeseএর চিহ্নমাত্র নাই। ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়; কারণ, বর্ত্তমান কালে এমন বিশুদ্ধ লৌহ খুব কমই পাওয়া যায়, যাহাতে একটুও Manganese থাকে না।

এই স্তম্ভের লৌহ পূর্ব্বেও বিশ্লেষিত হইয়াছিল। ফার্গুসন বলেন যে, জেনারল কানিংহাম ডাক্তার মারেকে দিয়া ভারতে একখণ্ড পরীক্ষা করাইয়াছিলেন; অপর একখণ্ড বিলাতে School of Minesএ ডাক্তার পার্সীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। উভয়েই ইহা খাদলেশশূন্য বিশুদ্ধ লৌহ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। * সার রবার্টের বিশ্লেষণে যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পরিমাণে এতই সামান্য যে, তদ্দ্বারা ইহার বিশুদ্ধতার কোন হানি হয় নাই।

পরিশেষে Staffordshire Iron and Steel Institute নামক সভার সভাপতি মিঃ আইজাক লেষ্টার উক্ত সভার একটি অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে ভারতীয় লৌহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশাবিশেষ অনুবাদ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলেন,—"ভারতবর্ষ হইতেই দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারকে দমস্কাস লৌহের একটি দণ্ড উপঢৌকন দিয়াছিলেন; এবং যখন প্রাচীন ব্রিটনরা অসভ্য বর্ব্বরমাত্র, তখন এই ভারতেই মুদ্রা প্রস্তুত করণের জন্য ইস্পাতের ছাঁচ (dies) ব্যবহৃত হইত। জগতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ লৌহ ও ইস্পাতের জন্য এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, যে সকল দেশে লৌহপিণ্ডের (ores) অভাব ছিল না, সে সব দেশেও ভারতীয় লৌহ রপ্তানি হইত; আর ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষই পৃথিবীবিখ্যাত দমস্কস তরবারীর নির্ম্মাণস্থান ছিল, যদিও সম্ভবতঃ দমস্কাসে ইহা লোকের রুচির উপযোগী 'ফিনিস্' করিয়া দেওয়া হইত এবং তথা হইতে বহুমূল্য বিনিময়স্বরূপ (নানাস্থানে) প্রেরিত হইত। পাশ্চাত্য-জগৎ লৌহের ব্যবহার শিখিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবাসী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত করিত। * * বিশ্বস্ত প্রামাণ অনুসারে ভারতের এই লৌহযুগ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩৭০ অব্দে আরব্ধ হয়।"

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

* Indian and Eastern Architecture.

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের নাম সুপরিচিত হইলেও তাঁহার জীবনকথা সুপরিচিত নহে। দরিদ্র-সন্তান প্রেমচাঁদ পঞ্চত্রিংশবর্ষ বয়ক্রম উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ব্যবসায়ে লাভবান্ হইয়া প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা দানের পর প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ঋণের দায়ে দেউলিয়া হইয়া আবার নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন। সে কথা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর—প্রেমচাঁদের চরিত্রবলের পরিচায়ক। সংপ্রতি মিষ্টার দীনসা ইদালজী ওয়াচা প্রেমচাঁদের জীবন-কথা বিবৃত করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরে প্রেমচাঁদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রায়-চাঁদ দীপচাঁদ তথায় সামান্যভাবে কাষ্ঠের কারবার করিতেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী বণিক্‌জাতীয় দোষা আশোয়াল বংশে তাঁহার জন্ম। আশোয়ালগণ ব্যবসায়-বুদ্ধি, অর্থোপার্জ্জনকল্পে শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও একাগ্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। সুরাটে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে না পারায় রায়চাঁদ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে আসিয়া লালা রতনচাঁদ নামক জনৈক দালালের অধীনে কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে প্রেমচাঁদ বোম্বাই সহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হয়েন। তরুণবয়স্ক প্রেমচাঁদের সামান্য ইংরাজী-জ্ঞানেই ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইবে মনে করিয়া রতনচাঁদ তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করাইয়া স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার অল্প দিন পরে রতনচাঁদের মৃত্যু হইল এবং প্রেমচাঁদরা পিতাপুত্র তাঁহার ব্যবসায়ের অধিকারী হইলেন। প্রেমচাঁদের উন্নতি আরব্ধ হইল।

রায়চাঁদ ও প্রেমচাঁদ দালালীর সঙ্গে সঙ্গে হুণ্ডির কায ও কতকগুলি ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয়-বিক্রয়ের কায আরম্ভ করিলেন। শুনা যায়, এই সকল কার্য্যে তাঁহারা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে লক্ষ টাকার ক্রয়কারী শক্তি অনেক অধিক ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পিতাপুত্র যখন রতনচাঁদের অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন হইতেই বোম্বাইয়ের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি আরব্ধ হইয়াছে। তৎকালে চীনের সহিত ব্যবসায় এমনই লাভজনক ছিল যে, লোক বলিত—চীনের সহিত একবার কারবার করিয়া আসিতে পারিলে ব্যবসায়ীকে সমস্ত জীবনে আর অর্থের ভাবনা ভাবিতে হইত না। তখন ভারতবর্ষ হইতে চীনে অহিফেন রপ্তানি হইত,

—আর চীন হইতে ভারতে রেশম, রেশমী বস্ত্র, চা ও মিছরী আমদানী হইত। প্রথমে পার্শীরা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েন। ইহুদীরাও পার্শীদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। য়ুরোপের সহিত ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হইলেও কোন ভারতবাসী সে পথের পথিক হইতে সাহসী হয়েন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কেমা এণ্ড কোম্পানী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যুবক দাদাভাই নাওরোজীকে প্রতিনিধিরূপে বিলাতে প্রেরণ করেন। তখনও বাষ্পীয় যানের ও বাষ্পীয় পোতের বহুল-ব্যবহার আরব্ধ হয় নাই; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবহেতু ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ ছিল। বোম্বাইয়ের ব্যবসা দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতেছিল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রায়চাঁদ ও প্রেমচাঁদের ব্যবসায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইল। দালালী ও হুণ্ডীর কায উভয় বিভাগেই যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। তখনও বোম্বাই অঞ্চলে যথেষ্ট তুলা উৎপন্ন হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার গাঁইট তুলা রপ্তানী হয়। এই সময় বৈদেশিক রাজনীতিক ব্যাপারে অতর্কিতভাবে এ দেশে তুলার ব্যবসায়ের উন্নতি সংসাধিত হয়। দাস-ব্যবসায় লইয়া আমেরিকায় অন্তর্বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তুলার রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। ইংলণ্ডে সুতার ও কাপড়ের কলের কায বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা বুঝিলেন, ভারতীয় তুলা ব্যতীত বিলাতের কলওয়ালাদিগের আর গতি নাই। বোম্বাইয়ে দুরদর্শী ব্যবসায়ীরা সরকারকে বলিলেন, তুলার রপ্তানীর ব্যবস্থা, গুদামের বন্দোবস্ত ও চুক্তিপত্র সকলের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক।

প্রেমচাঁদ তখন বোম্বাইয়ের সমস্ত প্রধান য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীর ও ব্যাঙ্কের সহিত সংসৃষ্ট। সুযোগ বুঝিয়া তিনি গুজরাটের ও কাথিবাড়ের সমস্ত তুলার আড়ংএ তুলা খরিদ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, আমেরিকার যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না; ইংলণ্ডকে তুলা কিনিতেই হইবে, কাযেই ভারতে তুলার দর উত্তরোত্তর বাড়িবে। প্রধান প্রধান ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবহেতু প্রেমচাঁদের তুলার ভবিষ্যৎদরের আন্দাজ করিবার সুবিধা হইল। এই সময় তিনি রিচি-ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর প্রধান দালাল নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানী যাহাদিগকে দাদন দিবেন, তাহাদিগের অবস্থা তদন্ত করিয়া দাদনের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা ও দাদনে জামীন হওয়াই প্রেমচাঁদের প্রধান

কার্য্য হইল। পিতাপুত্র এই সঙ্গে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কামার্সেল ও মার্কেণ্টাইল নামক স্থানীয় ব্যাঙ্ক দুইটির অংশ লইয়া "তেজীমন্দী" খেলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ তুলার কাযেই তাঁহারা মনোযোগ দান করিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এমনই দাঁড়াইল যে, বোম্বাই সহরের ব্যবসায়ী মহলে প্রেমচাঁদকে বাদ দিয়া কায করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এ দিকে তুলার ব্যবসা বাড়িয়া চলিল। ইংলণ্ডের টানে এ দেশ হইতে সর্ব্ববিধ তুলা চড়া দরে বিক্রীত হইয়া রপ্তানী হইতে লাগিল। ছোট বড় সব ব্যবসায়ীই দাদন দিয়া তুলা খরিদ করিয়া রপ্তানী করিতে লাগিলেন। ধনী দরিদ্র সকলেই তুলার ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমনও শুনা যায় যে, লোক শয্যা ছিন্ন করিয়া তুলা রপ্তানী করিতে লাগিল। মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থলেই গাঁইট বাঁধিবার কল ছিল না; গাঁইট না বাঁধিয়াই তুলা বোম্বাই সহরে আনা হইত। তখন বিলাতের সহিত এ দেশের টেলিগ্রাফ সংযোগ ছিল না; মাসে দুইবারমাত্র বিলাতী ডাক আসিত; 'হোম নিউজ' ও 'ওভারল্যাণ্ড মেল' নামক পত্রদ্বয়ের উপরেই সংবাদের জন্য নির্ভর করিতে হইত। এই দুইখানি পত্রে লিভারপুলের তুলার দরের সংবাদ পাওয়া যাইত। সময় সময় ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিরা বিলাত হইতে ডাকজাহাজের কাপ্টেনের নিকট বাজার দরের সংবাদ পাঠাইতেন। এই সংবাদ লইবার জন্য দ্রুতগামী নৌকায় লোক বন্দরের বাহিরে অপেক্ষা করিত ও সংবাদ লইয়া আসিত। সময় সময় পথনির্দ্দেশকরা (পাইলট) সংবাদ দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। ডাক বন্দরে পৌঁছাইয়া বিলি হইতে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগিত; ব্যবসায়ীদিগের তত বিলম্ব সহিত না। কারণ, মিনিটে মিনিটে তুলার বাজার উঠিত পড়িত; ৩।৪ ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ লোকসান হইয়া যাইত।

এই সুযোগে প্রেমচাঁদ স্বয়ং ও অন্যের সহযোগিতায় তাঁহার ব্যবসায় শত-গুণ বর্দ্ধিত করিলেন। প্রেমচাঁদ দেউলিয়া হইবার পর যখন জর্জ্জ র‍্যামজে উইলসন তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করেন, তখন তাঁহার সহকারী রূপে শ্রীযুত ওয়াচা সে সকল হিসাব দেখেন; তিনি বলেন—এ কথা অতিরঞ্জিত নহে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ বোম্বাইয়ের সর্ব্বপ্রধান শেয়ারের দালাল ও তুলার একজন প্রধান ব্যবসায়ী ও ফাটকাওয়ালা (Speculator) বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে বোম্বাই অঞ্চলে তুলার ব্যবসায়ে গড়ে বার্ষিক ১১ কোটী টাকা আমদানী হয়। এই আকস্মিক অভ্যুদয়ে বোম্বাই প্রদেশে ব্যাঙ্ক হইতে ইট টালির কারখানা পর্য্যন্ত বহুবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইল। তুলার ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত অর্থ লাভ করিয়া প্রাচুর্য্য-প্রহৃষ্ট ব্যবসায়ীরা কিরূপে টাকা খাটাইবেন, তাহাই ভাবিয়া বিব্রত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, ব্যবসায় করিতে হইলে ব্যাঙ্ক না বসাইলে চলিবে না। সেই জন্য ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইল। প্রেমচাঁদ তাহার প্রধান দালাল নিযুক্ত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের মূলধন দ্বিগুণ করিতে হইল। সুযোগ বুঝিয়া ব্যাঙ্ক অব বোম্বাইও মূলধন ৫২ লক্ষ হইতে ১০৪ লক্ষে পরিণত করিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের পুরাতন কার্য্যাধ্যক্ষ অবসর লওয়ায় যিনি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, তিনি এই বাজারে মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া স্বয়ং ফাটকাওয়ালা হইয়া দাঁড়াইলেন। সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায়, এই সময় বোম্বাইয়ে যে সকল যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সকলের মোট মূলধন ২৯০৲৬কোটী টাকা; এবং অংশের মূল্য গড়ে শতকরা ১২৭ টাকা বাড়িয়া গেল! প্রেমচাঁদের সাহায্য ব্যতীত কোন কোম্পানীই সাফল্য লাভ করিত না। প্রেমচাঁদই বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ে এই অতর্কিত পরিবর্ত্তনের কারণ।

তখন প্রেমচাঁদের প্রতিপত্তি এতই অধিক যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নিয়োজিত কমিটী বলিয়াছেন, এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক ও বোম্বাই ব্যাঙ্ক সাধারণ্যে তাঁহারই বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি যে কেবল আপনি যখনই ইচ্ছা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইতেন, তাহাই নহে; পরন্তু তাঁহার সুপারিশে যে কেহ ব্যাঙ্ক হইতে বিনা জামীনে টাকা পাইতে পারিত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণাংশের প্রধান সেনাপতি লি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে বোম্বাইবাসীর সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তুলার দর সহসা পড়িয়া গেল; ফাটকায়ালারা প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সার জর্জ্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন, যখন বোম্বাই সহরে লির আত্মসমর্পণ-সংবাদ আসিল, তখন প্রেমচাঁদ এবং কয়জন য়ুরোপীয় ও ভারতবাসী কার্য্যব্যপদেশে এক স্থানে সমবেত। সর্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়া প্রেমচাঁদ প্রশান্তভাবে সার জর্জ্জকে বলিলেন, "আমাকে আবার নূতন করিয়া জীবনসংগ্রাম আরম্ভ করিতে

হইবে।" সকলেই জানিত, আমেরিকায় যুদ্ধ এক দিন শেষ হইবে। কিন্তু যুদ্ধ যে এত শীঘ্র শেষ হইবে, তাহা বোম্বাইয়ে কেহই মনে করেন নাই।

যুদ্ধ শেষ হইলে আমেরিকায় তুলার চাষের ও রপ্তানীর সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই-য়ের তুলায় দর পড়িয়া গেল। যাঁহাদের মাল মজুদ ছিল, তাঁহারা সে বৎসর কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। পরবৎসর প্রধান ব্যবসায়ীদের সর্ব্বনাশ নিবারণের আর উপায় রহিল না। বৈরামজী কামা প্রথম দেউলিয়া হইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেনার পরিমাণ ৩ কোটী টাকা। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পাওনাদাররা টাকায় দশ আনার অধিক পাইলেন না। অপর দেউলিয়াদিগের মধ্যে কাহারও পাওনাদাররা এত পায়েন নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ কোনরূপে কাটিল; পরবৎসর প্রেমচাঁদের পক্ষে কায চালান অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি জহরৎ ও নানা কোম্পানীর সেয়ার জামীন রাখিয়া এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক ও বোম্বাই ব্যাঙ্কের নিকট ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ চাহিলেন। জামীন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় তিনি ঋণ পাইলেন না। তৎকালে ব্যাঙ্ক দুইটির অবস্থাও ভাল নহে। এই টাকা পাইলে প্রেম-চাঁদ হয় ত সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন; আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ী বাঁচিয়া যাইতেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে প্রেমচাঁদ দেউলিয়া হইলেন। উত্তমর্ণদিগের পক্ষ হইতে তিনজন য়ুরোপীয় তাঁহার সম্পত্তি হস্তে লইলেন। হিসাবপরীক্ষায় সাব্যস্ত হইল, প্রেমচাঁদের কোনরূপ অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তিন বৎসরে প্রেমচাঁদের হিসাব নিকাশ হইল। পাওনাদাররা শতকরা ১৸৹ টাকা মাত্র পাইলেন। দেখা গেল, ব্যাঙ্কে তাঁহার আপনার ঋণ ৪২ লক্ষ টাকা; আর তাঁহার কথায় অন্যকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের দাদনের টাকার শতকরা ৫০ টাকা নষ্ট হইয়া গেল।

প্রেমচাঁদ ইহার পর নূতন করিয়া কায আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট তারিখে প্রাণত্যাগ করেন। আবার ব্যবসায় করিয়া মৃত্যুকালে তিনি কিছু টাকা রাখিয়া যাইতেও পারিয়াছিলেন।

তাঁহার উপার্জ্জন যেমন অসাধারণ ছিল—তিনি তেমনই উপার্জ্জনের অনুসারে দানও করিয়াছিলেন। তাঁহার মোট দানের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা তিনি স্বীয় ধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। এই অর্থে বহু ধর্ম্মশালা, জৈন মন্দির ও পিঁজরাপোল নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বহু জীর্ণ জৈন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই

বিশ্ববিদ্যালয়ে পুস্তকাগারের জন্য ২ লক্ষ ও ঘটিকাস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য ২ লক্ষ—মোট ৪ লক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহার অন্যান্য দানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) আমেদাবাদ কলেজের জমী ও গৃহের জন্য ২৯ হাজার টাকা ও বৃত্তির জন্য ২০ হাজার টাকা, (২) রায়চাঁদের নামে প্রতিষ্ঠিত সুরাটের বালিকা-বিদ্যালয়ে ১০ হাজার টাকা, (৩) বোম্বাইয়ের স্কটিস্ অনাথাশ্রমের জন্য ৬০ হাজার টাকা (৪) বোম্বাইয়ের ফ্রেয়ার-ফ্লেচার স্কুল-গৃহের জন্য ৬০ হাজার টাকা (৫) বোম্বাই আলেকজান্ড্রা বালিকা-বিদ্যালয়ে ৫ হাজার। সার জর্জ্জ বার্ডউডের কথায় তিনি স্থাপত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশকল্পে ফার্গুসনকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার মাইকেল স্কটের নিকট বিলাতের বিবিধ দাতব্য ভাণ্ডারে দিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড (বর্ত্তমান হিসাবে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) প্রেরণ করেন। বঙ্গে তাঁহার দান কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই; পরন্তু তিনি ঘূর্ণাবর্ত্তপীড়িত বাঙ্গালীর সাহায্যার্থ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। তাঁহার দান জাতিধর্ম্মদেশ-নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইত। শ্রীযুক্ত ওয়াচা বড় দুঃখে বলিয়াছেন, বোম্বাই সহরে তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই। সার জর্জ্জ বার্ডউডের সহিত প্রেমচাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, প্রেমচাঁদ ধর্ম্মপ্রাণ, সদানন্দ, উদারহৃদয় ছিলেন। তাঁহার ধনতৃষ্ণা ছিল না। অর্থ পাইলে তিনি তাহার সদ্ব্যয় করিতেন। এ বিষয়ে তিনি জৈন ব্যবসায়ীর মত ছিলেন না—জৈন যতীর ন্যায় ছিলেন। ব্যবসায়ব্যাপারে তিনি ফাটকাওয়ালা ছিলেন সত্য, কিন্তু পুরস্কারে তাঁহার স্পৃহা ছিল না—কাযের মত্ততাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে বৈকল্লায় বাস করিতেন। তখন বৈকল্লা স্নিগ্ধপল্লী-শোভায় সুন্দর ছিল। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই স্নান-পূজা সমাপনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত কায সারিয়া তিনি সহরে বাসায় আসিতেন। তথায় সমাগত ব্যবসায়ীদিগের কায শেষ করিয়া দিয়া আহারান্তে বেলা ১০টার মধ্যে তিনি রিচি ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর আফিসে উপস্থিত হইতেন। তথায় আবশ্যক কায শেষ করিয়া তিনি অন্য যে সকল আফিসের সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন, সেই সকল আফিসে গমন করিতেন।

প্রেমচাঁদ দরিদ্র-সন্তান।—তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা ও শ্রমক্ষমতা সত্যসত্যই অসাধারণ ছিল। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন; সামান্য আফিস গাড়ীতে বা পদব্রজে নানা আফিস ঘুরিয়া তিনি শেয়ার-বাজারে উপনীত হইতেন। দালালের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিত; কেহ হয় ত সসম্ভ্রমে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিত। রাস্তায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক জমিয়া যাইত। তখন ছায়াবহুল বটবৃক্ষতলে শেয়ার-বাজার বসিত। প্রেমচাঁদ তথায় কাহাকেও শেয়ার কিনিতে কাহাকেও বিক্রয় করিতে বলিতেন। তিনি বহুক্ষণ এক স্থানে থাকিতে পারিতেন না—নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি দ্রুতগামী ও বলিষ্ঠ ছিলেন। পথে লোকের সহিত কথা কহিতে তাঁহার বিরক্তি ছিল না। এমন কি, পথের ভিক্ষুকও তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিয়া বিফলমনোরথ হইত না। সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত। তাঁহার সৌজন্যও বিস্ময়কর ছিল। শ্রীযুক্ত ওয়াচা বলেন, বোম্বাই ব্যাঙ্কে কায করিবার সময় তিনি দেখিয়াছেন, প্রেমচাঁদ এক এক দিন ১০। ১২ বার দ্রুতবেগে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ব্যাঙ্কে যাইতেন। সময় সময় তাঁহার পিতা পুত্রের সঙ্গে যাইতেন। তাহার পর তিনি নানা আফিসে ঘুরিতেন। বাস্তবিক প্রেমচাঁদের যেরূপ শারীরিক শ্রমক্ষমতা ছিল, সেরূপ শ্রমক্ষমতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শ্রান্তি কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না।

প্রেমচাঁদ খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, তনুদেহ, পরিচ্ছন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু অত্যুজ্জ্বল ছিল। বেশবিষয়ে তিনি অনাড়ম্বর ছিলেন। তিনি সামান্য অঙ্গরাখা ও পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। সম্পদে, বিপদে—অভ্যুদয়ে, দুর্দ্দশায় তিনি সর্ব্বদাই স্থির—ধীর—অক্ষুণ্ণ—সহাস্যানন ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যলাভকালেও বিলাস কখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার মত অতর্কিত উন্নতিলাভ ও দুর্দ্দশাভোগ সচরাচর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি অধীর বা বিচলিত হয়েন নাই।

তাঁহার স্মরণশক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমস্ত দিনে তিনি নানা লোকের সহিত লক্ষ লক্ষ টাকার কায করিতেন; কিন্তু কিছুই লিখিতেন না। দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া তিনি স্মৃতির সাহায্যে কর্ম্মচারীকে সে সব কথা বলিতেন, কর্ম্মচারী লিখিয়া রাখিত।

সার জর্জ্জ বার্ডউড বলিয়াছেন, কোন সৎকার্য্যে তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য

চাহিলে কখনও সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিত না। কোন সৎকার্য্যে বহু লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হইলে প্রেমচাঁদ অগ্রণী হইয়া সাহায্য করিয়া অপরকে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেন। বোম্বাইয়ের হিতকারী-দিগের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার মত সাহসী, অকুতোভয় ও প্রশংসার্হ লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম-ভারতে তাঁহার মত ভারতবাসী দুর্লভ।—He was the most fascinating character in Western India since Sargiya Sivaji.

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কামনা।

হে তপন তোমাপানে চাহিয়া চাহিয়া
নয়নকমল দু'টি রহিয়াছে ফুটি'।
হে তরু কুসুমদাম বহিয়া বহিয়া,
তোমারে গড়াতে চাহে বাহুলতা দু'টি।
ওগো শুক, তব রক্ত চঞ্চুপুট লাগি'
বিম্বাধরে রসধারা পড়িতেছে ঝরি',
হে বিহগ, নিশিদিন রহিয়াছে জাগি'
প্রাণের কুলায় মম দ্বার মুক্ত করি'।
ওগো সিন্ধু তব প্রাণে ঢালিতে পরাণ,
প্রেমনদী শ্রান্ত হ'ল ছুটিয়া ছুটিয়া।
ওগো ইন্দু না করিলে কৃপাকণাদান,
কুমুদীর লাজ-বন্ধ কে দিবে টুটিয়া।
হে দেব! মরম-ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া
চরণে মরিতে চাহে লুটিয়া লুটিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

(৩)

বিহারীলালের জীবদ্দশায় লোক বলিত, তিনি নিরীশ্বরবাদী। তিনি রচনাতেও এই বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন

ফক্কিকার ফক্কিকার ফক্কিকার
(আমি) চোক বুজিয়ে শুধুই দেখি অন্ধকার!" ইত্যাদি

উপসনার সার্থকতা সম্বন্ধে বিহারীলালের বিশ্বাস ছিল না। অন্তিম-শয্যায় তিনি কয়েক দিন অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভগবানের নাম করিতে বলিলে তিনি সেই প্রস্তাব,—যাতনায় জ্ঞানহারা হইয়াই হউক বা তাঁহার মনের বদ্ধমূল বিশ্বাস-বশতঃই হউক—নির্ব্বোধের কথা বলিয়া অশ্রদ্ধার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু নামে কি আসিয়া যায়? তিনি যে একজন প্রকৃত সাধক, সারদার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি ভক্তি পাইবার জন্য কাঁদিয়াছেন, সাধনার ধনকে প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য আকুল-ব্যাকুল হইয়া ডাকিয়াছেন,—কোথায়! দাও দরশন!

"কাতর হ'য়েছে প্রাণ, রহে না জীবন।
চিরসাধনের ধন! ধ্যানে কেন অদর্শন।"

শেষজীবনে শান্তিস্নিগ্ধ অন্তরে তিনি গাহিয়াছেন,—

"কে, কে জানে আমারে ভালবাসে মনে মনে।
যখন যেখানে থাকি, চেয়ে আছে মুখপানে।
কে আমার কাছে, কাছে, সদাই আগুলে আছে,
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে,
আকাশে প্রকাশে আসি, হাসি হাসি চন্দ্রাননে!"

বিহারীলাল কবিতাকে কখনও অবসরের ক্রীড়নক, আমোদের যন্ত্র ভাবেন নাই—তিনি কবিতাকে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ ভাবিতেন—কবিতার মত প্রত্যক্ষ সত্য তিনি জীবনে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার কাব্যরচনা সারদার ধ্যান—সাংসারিক কার্য্যের অবকাশক্রমে হইত না, পরন্তু জীবনের অন্যান্য কার্য্যই এই ধ্যানের অবকাশেক্রমে হইত। তাঁহার জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ বাগ্দেবী-সেবার তুলনায় তিনি অতি সামান্য কবিতাই রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গান অতি মহান্ ও উচ্চ অঙ্গের;

কিন্তু সেই গানে তাঁহার আজীবন ধ্যানের—সাহিত্য-সেবায় আজীবন আত্মোৎসর্গের পরিমাণ পাওয়া যায় না।

বিহারীলাল যৌবনকালে 'স্বপ্নদর্শন' নামক একখানি গদ্য পুস্তিকা এবং 'বন্ধুবিয়োগ,' 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'প্রেম-প্রবাহিনী' নামক তিনখানি খণ্ড-কাব্য রচনা করেন। 'সঙ্গীত-শতক' নামক গীতি-পুস্তকের কয়েকটি গীত এবং 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের কয়েকটি কবিতাও সেই সময়ের রচনা। এই সময়ের আরও কতকগুলি কবিতা 'পূর্ণিমা' নামক একখানি মাসিক পত্রে ১২৬৫ সালে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। তৎকালে ধর্ম্মবিষয়ক বা প্রেমবিষয়ক গীত ভিন্ন, বন্ধুত্ব,স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অপরাপর বিষয়ের গীত বঙ্গভাষায় ছিল না। 'সঙ্গীত-শতক' বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অভাব মোচন করিবার পথ প্রদর্শন করে। 'বন্ধুবিয়োগ' একখানি পয়ারে রচিত বিশেষত্বহীন ক্ষুদ্র পুস্তিকা—কবি শেলীর 'Adonais' ও টেনিসনের 'In Memoriam'এর ন্যায় ইহা কবির বাল্য-বয়সের কয়েকজন প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক-গান। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আছে—এই কাব্যের সমুদ্রবর্ণনা কবির পুরুষোত্তম-প্রবাসের স্মৃতিপ্রসূত। 'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যে কবি প্রেম, বিয়োগ, বিষাদ প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন—ইহাতে কবির ভাবী শক্তির পরিচয় আছে।—ইহাতে 'শারদা-মঙ্গল' কাব্যের অস্ফুট ক্ষীণ তান ধ্বনিত হইয়াছে।

'পূর্ণিমা' পত্রিকার বিলয়প্রাপ্তির পর 'অবোধ-বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল প্রথমে এই পত্রের প্রধান লেখক ছিলেন পরে ১২৭৩ সাল হইতে ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের কিয়দংশ, 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য ও 'সুরবালা' নামক অসম্পূর্ণ কাব্য এই পত্রে প্রকাশিত হয়। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনস্বী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এইপত্রের লেখক ছিলেন। রবীন্দ্র বাবুর ভাষায় "বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাত-সূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধ-বন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।"

'বঙ্গ-সুন্দরী' নারীমাহাত্ম্যমূলক একখানি অপূর্ব্ব কাব্য। ১২৭৬ সালে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য প্রকাশ করিয়াই বিহারীলাল নারীপূজাত্মক কবিদিগের অগ্রণী বলিয়া সাহিত্য-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন। 'বঙ্গসুন্দরীতে' যে দুঃখের অভিব্যক্তি আছে, তাহা পাঠ করিয়াই ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বিহারীলালকে "দুঃখের কবি" উপাধি দেন এবং রবীন্দ্র বাবু বলেন, "আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এই বোধ হয়, কবির নিজের কথা।" 'বঙ্গ-সুন্দরী'কে লক্ষ্য করিয়াই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "আমি এমন মিষ্ট কবিতা আর কোথাও পড়ি নাই।"

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদা-মঙ্গল' প্রথমে ১২৮১ সালে 'আর্য্য:দর্শন' পত্রে, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ১২৮৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বাসন্তী পঞ্চমী উপলক্ষে কবি ৭টি শ্লোক রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। তাহা হইতেই সারদামঙ্গলের সূচনা। কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—"মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদা-মঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।" এই কাব্যের কোনও আখ্যান-বস্তু নাই—ইহা সারদার ধ্যান। সারদা আদি কবিগণের বীণাপাণি, পাশ্চাত্য কবিকুলের Muse,—ইনি কাব্যজননী, সঙ্গীতকলা-মূর্ত্তি-মতী। প্রত্যুত বিহারীলালের সারদা বিশ্বব্যাপী সত্য, শিব, সুন্দরের প্রাণস্বরূপ—জগন্মাতা। 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যের ভাষা ও ভাব অবিচ্ছেদ্য-ভাবে বিজড়িত; এই কাব্যে কবির চিন্তালহরী মনে প্রভাত-স্বপ্নের মত বিচিত্র ভাবে উত্থানপতন প্রাপ্ত হইয়াছে। সারদার সহিত কবির সাক্ষাৎ ও প্রণয়, বিচ্ছেদের ও মিলনের কথা, কবির প্রেম ভক্তি, আশা নৈরাশ্য, হর্ষ বিষাদ, সন্দেহ অভিমান প্রভৃতি শত কথা এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের মত সূত্রে গ্রথিত। বিহারীলাল 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যকে সঙ্গীত বলিয়াছেন। বস্তুতঃই 'সারদা-মঙ্গলের' উচ্ছ্বাসময় কবিতা মধুময়, রহস্যময়, বৈচিত্র্যময় এক মহাসঙ্গীত।

'সারদা-মঙ্গল' কাব্য রচিত হইবার পর বিহারীলাল 'মায়াদেবী' 'দেব-রাণী' ও 'ধূমকেতু' নামে তিনটি কবিতা (প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথ ও নিশান্ত সঙ্গীত পঞ্চাত্মকে) 'শরৎ-কাল' নামে অভিহিত একখানি খণ্ড কাব্য, 'বাউল বিংশতি' আখ্যাত একখানি গীতপুস্তক, 'সাধের আসন' নামক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন আর একখানি খণ্ড কাব্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি কবিতা ও গান রচনা করেন। কবি এই রচনাগুলির সংশোধন ও পরিমার্জ্জন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে গুলির অধিকাংশই প্রথমে 'ভারতী' 'মালঞ্চ' ও 'কল্পনা' পত্রে কবির জীবিত কালে



শ্রান্তি।

প্রকাশিত হয়! কেবল 'শরৎকালে' সন্নিবিষ্ট দুইটি কবিতা (নিশীথ ও নিশান্ত সঙ্গীত) এবং ধূমকেতু কবিতাটি কবির মৃত্যুর পর 'প্রয়াস' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্ষণে এই রচনাগুলি সমস্তই তাঁহার গ্রন্থাবলীতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি সমস্তই চিত্তরঞ্জিনী গীতি-কবিতা। 'মায়াদেবী' একটি উদ্দাম কবিত্বস্বপ্নময় গীতোচ্ছ্বাস। 'বাউল-বিংশতির' গীত-গুলিতে দার্শনিকতা ও নাস্তিকতার আভাস আছে। কবি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তাঁহার কঠোর মতগুলি গীতের সুললিত কথায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

'সাধের আসন' কাব্যখানি কাউপারের Task কাব্যের ন্যায় কবির কোনও রমণী বন্ধুর আদেশে বা সাদর অনুরোধে লিখিত। জনৈক সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া কাব্যানুরাগিণী সুশিক্ষিতা সীমন্তিনী কবিকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্গের তৎকালীন বহু নবীন লেখক সাহিত্য-সেবাকার্য্যে উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার পবিত্র অধরনিঃসৃত প্রশংসা-বাক্য বিহারীলালকে কবিত্বরসে বিশেষ ভাবে অভিসিক্ত করিত; এবং তাঁহার উৎসাহেই বিহারীলাল 'সারদা-মঙ্গল'কাব্য 'আর্য্যদর্শন' হইতে পুনঃ-মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। তিনি কবিকে স্বহস্তে বুনিয়া একখানি কারুকার্য্যময় পশমের আসনে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া উপহার দেন এবং উত্তর চাহেন—

"হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু'নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?"

এই উপহার ও অনুরোধ হইতেই বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্যের সূচনা। এই মহিলার প্রতি কবির প্রীতি ও ভক্তির অবধি ছিল না। নিয়তির কঠোর নিয়মে এই রমণীরত্ন কবির জীবিতকালে, 'সাধের আসন' কাব্যরচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইঁহার অকাল মরণে বিহারীলাল মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছিলেন। বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্যের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি সেই পূত স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে—

"তোমার আসনখানি আদরে আদরে আনি
রেখেছি যতন ক'রে চিরদিন রাখিব;

এ জীবনে আমি আর তোমার সে সদাচার
সেই স্নেহমাখা মুখ পাশরিতে নারিব।
সাক্ষাৎ আমার প্রাণ 'সারদা-মঙ্গল' গান
অসম্পূর্ণ পড়েছিল যেন মরে গিয়েছে ;
বেসুরা বীণার মত জানি না কি দশা হত
তোমারি আদরে দেবি ! ফিরে প্রাণ পেয়েছে।"

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

অচঞ্চল।

(সিলভেষ্টারের কবিতা অবলম্বনে)

আমি যদি হইতাম নীচ বেলাভূমি,
তুমি প্রিয়া নীলিমা সুদূর ;
তবু মোর ভাবরাশি বায়ু পথ চুমি'
ছুটে যেত সুখ-স্বর্গ-পুর !
আমি যদি হইতাম উদার গগন,
তুমি প্রিয়া সাগরের তল,
যখন যেখানে থাক, করিত গমন
প্রেম মোর স্থির—অচঞ্চল !
তুমি যদি হতে পৃথ্বী, অয়ি প্রিয়া মম,
আমি ওই অনন্ত আকাশ,
প্রেম মোর তোমা পরে দিবাকর সম
শত আভা করিত প্রকাশ ;
চাহিত তোমার পানে শত আঁখি দিয়া
ভাবমুগ্ধ নিমেষবিহীন,
যতদিন স্বর্গরাজ্য যেতনা মুছিয়া,
এ ধরিত্রী হ'ত না বিলীন !
ঊর্দ্ধে নিম্নে যেথা রহি তাহে কিবা ডর,
প্রেম মোর চিরদিন রহিবে অমর !

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

অদৃষ্ট-চক্র।

চতুর্থ খণ্ড।

মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরণাহতা।

পরদিন প্রাতে যাইবার সব উদ্যোগ করিয়া সরোজা ভগিনীর সঙ্গে বাড়ীর কথা বলিতেছিল। সরোজা আসিয়াছিল বলিয়া নীরজা রাগ করিয়াছিল; কিন্তু আজ সে যাইবে বলিয়া নীরজার মুখ অন্ধকার—তাহার অন্তরে বিদায়ের বেদনা অনুভূত হইতেছিল! দুই ভগিনী বসিয়া ছিল, এমন সময় পোষ্টমাষ্টার বাবুর দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, কল্যাণীর "বিমার" হইয়াছে। নীরজা ভগিনীর দিকে চাহিল—তাহার নয়নে ভীতিভাব। সরোজা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'প্লেগ?"

নীরজা বলিল, "হাঁ"।

সরোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসীকে বলিল, "আমাকে সে বাসায় লইয়া চল।" সে গমনোদ্যতা হইলে নীরজা দিদির অঞ্চল ধরিল; বলিল, "তুমি কোথায় যাও?"

সরোজা বলিল, "কল্যাণীর কাছে।"

"কেন?"

সরোজা বলিল, "আমার পীড়া হইলে, তুই যাইতিস্ না?" সে স্তম্ভিতা ভগিনীর শিথিল মুষ্টি হইতে অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইয়া দাসীর সঙ্গে গেল—সে-ই অগ্রে গেল, দাসী তাহার সঙ্গে চলিল। নীরজা পীড়িতা শুনিয়া সে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া দানাপুরে আসিয়াছিল, কল্যাণী পীড়িতা শুনিয়া সে তেমনই ব্যস্ত হইয়া যতীশচন্দ্রের গৃহে চলিল। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় চঞ্চল—সে হৃদয়ে আর কোনরূপ বিচার-বিবেচনার স্থান নাই। কল্যাণী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল—তাহাকে ফিরিয়া যাইতেই হইল! সরোজার মনে হইতে লাগিল, তাহার মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে। সে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিয়া যাইয়া কল্যাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

কল্যাণী শয়ন করিয়া ছিল,—যতীশচন্দ্র তাহার শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট। যতীশের মুখ ম্লান।—ডাক্তার আসিয়াছিলেন, বলিয়া গিয়াছেন,—রোগ

প্লেগ। সরোজা কল্যাণীর পার্শ্বে বসিল; কল্যাণীর কপালে করতল সংস্থাপিত করিল। জ্বর প্রবল—উত্তাপ অত্যন্ত অধিক।

সরোজাকে দেখিয়া কল্যাণী হাসিল; হাসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি যাইতে পারিবে না। ভগবান্ বড় সময় তোমাকে আনিয়াছেন। আমি চলিলাম।"

সরোজা বলিল, "ছিঃ, অমন কথা বলিতে নাই। তুমি আজই সারিয়া উঠিবে।"

কল্যাণী আবার হাসিল; বলিল, "আমাকে যম ধরিয়াছে।" সে যতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, "খোকা কোথায়?"

যতীশ দাসীকে ডাকিয়া পুত্রকে আনিতে বলিল। পুত্র আসিলে কল্যাণী তাহার হস্ত লইয়া সরোজার হস্তে দিল, আর যতীশকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি, তোমার সর্ব্বস্ব আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হাতে দিয়া যাইতেছি। তুমি ইহাদের ফেলিয়া দিও না।"

বলিতে বলিতে কল্যাণীর গলা ধরিয়া আসিল। সরোজার অশ্রু উৎস উৎসারিত হইল। সে আর হৃদয়ের চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এই কল্যাণী কি তাহারই জন্মান্তরের সুকৃতি? সে কি তাহারই জন্য সংসার সাজাইয়া লইয়া তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; আর অদৃষ্ট-চক্রের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আবর্ত্তনে তাহাকে পাইয়াই আজ নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে?

প্রবল চেষ্টায় চিত্তচাঞ্চল্য নিবৃত্তি করিয়া সরোজা বলিল, "তুমি কেন ভয় পাইতেছ? কলিকাতায় সংবাদ দিব কি?"

কল্যাণী বলিল, "না। আমার আর কাহাকেও প্রয়োজন নাই। মা—"কল্যাণী একটু ইতস্ততঃ করিল, বুঝি তাহার হৃদয়ে একবার মাতৃ-দর্শন-বাসনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে বাসনা সংযত করিল; বলিল, "মা শুনিলে ব্যস্ত হইয়া আসিবেন। কিন্তু আসিয়া কি হইবে?" তাহার পর সে আবার বলিল, "দিদি, খোকাকে তুমি ফেলিও না।"

যতীশ কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বারান্দায় গেল। দাসীও শিশুকে লইয়া বাহিরে গেল। সরোজা কল্যাণীর মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইয়া তাহার তপ্ত কপালে হস্ত বুলাইতে লাগিল। যেন কল্যাণী সত্যই তাহার ভগিনী। সরোজা ভাবিতে লাগিল, কল্যাণীর মত আপনার তাহার কয়জন আছে? সে তাহার পর নহে।

স্থানীয় বাঙ্গালীরা পরামর্শ করিয়া কল্যাণীর পুত্রকে স্থানান্তরিত করাই সঙ্গত স্থির করিলেন। পোষ্টমাষ্টার বাবুর পত্নী তাহাকে আপনার গৃহে আনাইলেন।

সরোজা ও যতীশ কল্যাণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অপরাহ্নেই কল্যাণীর জ্বর বাড়িয়া উঠিল। জ্বরঘোরে সে এক একবার চমকিয়া উঠিতে লাগিল; আর সরোজার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এক একবার সে ডাকিতে লাগিল, "দিদি!" সরোজা উত্তর দিতে লাগিল, "কি, দিদি?" কিন্তু সে উত্তর সে শুনিতে পাইতেছিল কি না সন্দেহ—শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেছিল না। সে তখন জ্বরঘোরে সংজ্ঞাশূন্য। জ্বর বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বিষম যন্ত্রণায় কল্যাণী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন; বুঝিলেন, আর আশা নাই। যতীশচন্দ্র একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। মনেও বল নাই তাহার দেহেও যেন বল নাই। আজ সে হৃদয়ে যেরূপ যাতনা অনুভব করিতেছিল, সেরূপ যাতনা সে কখনও অনুভব করে নাই। তাহার জীবনে সে চারিটি শোক পাইয়াছে; মাতা, পিতার মাতামহী, পিতা, পিতামহী চারিজন তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মাতার মৃত্যুকালে সে শিশু, তাহার শিশু-হৃদয়ে জননীর কোন স্মৃতিই মুদ্রিত হয় নাই; সে শোক সে অনুভব করে নাই। ধরণীধরের মাতামহী তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার বাল্যকালে তাঁহার মৃত্যুশোক তাহার পক্ষে বেদনার কারণ হইয়াছিল; কিন্তু পিতামহীর স্নেহে সে অল্পদিনেই সে শোকের কথা ভুলিয়াছিল—বিশেষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা কাযে সে সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাহার পর পিতৃশোক। যে বজ্রাঘাতে পুত্র-হৃদয় বিদীর্ণ হয় তাহার অভিমান-কঠোর হৃদয় সে শোকের আঘাতেও বিচলিত হয় নাই। আবার বেদনার যাতনা অনুভূত হইতে না হইতে দুশ্চিন্তা-দহন হইতে মুক্তির আশার আনন্দ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার পর যে বেদনা, সে শোকের নহে—হতাশার। কেবল পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া সে কাঁদিয়াছিল। তখন তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, মোহ কাটিয়াছে। তাই পিতামহীর শোক তাহার পক্ষে পিতামহীর জন্য শোক আর মাতৃশোক হইয়াছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ-শোকের বিষম বেদনাও অনুভূত হইয়াছিল। তিনি মাতৃহীন শিশুকে মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; তিনি তাহার জন্য পুত্রকেও পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন; সে-ই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল। তাই পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া সে বিষম বেদনায় কাঁদিয়াছিল। তিনি তাহার শেষ অবলম্বন ছিলেন। তবুও সে শোকের সান্ত্বনা ছিল। পিতামহী জরাজীর্ণ—শোক-দুর্ব্বল রোগকাতর দেহভার বহন করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় হইয়াছিল। আর আজ এ কি? পিতামহীর মৃত্যুদিন হইতে যে তাহার অবলম্বন ছিল; যে সম্পদে সখী, বিপদেমন্ত্রী ছিল; যাহার স্বার্থত্যাগ—আত্মত্যাগ তাহার সংসার সুখময় ও জীবন আনন্দময় করিয়াছিল; যে পূত প্রেমপ্রবাহে তাহার আত্মগ্লানির দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। যাহাকে না পাইলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীবনমরুপথে ভ্রমণ করিত যে তাহার জীবনে কল্যাণদায়িনী ছিল, আজ সাজান সংসার ফেলিয়া, অতৃপ্ত সুখ-তৃষ্ণা লইয়া সে কোথায় চলিল? পিতৃদ্রোহী পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত এইবার সম্পূর্ণ হইবে। তাহাদের অল্পকালব্যাপী বিবাহিত জীবনের কত কথা আজ যতীশের মনে পড়িতে লাগিল! সে কখন কল্যাণীকে সুখী করিতে পারে নাই। যখন বালিকা বধূ স্বামীর প্রেমস্বপ্নে বিভোর থাকে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা জানিতেও পায় না, সেই সময় হইতে কল্যাণী সংসারের ভাবনা ভাবিয়াছে, সেই সময়েই সে স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে—সানন্দে আপনার যাহা কিছু ছিল, দিয়া স্বামীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছে। যেদিন সে সদর্পে বলিয়াছিল, স্বামীর সুখের অপেক্ষা তাহার নিকট আর কিছুই বড় নহে, সে দিন যতীশ রমণীর যে কল্যাণী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই। আর সেই দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কল্যাণী আপনি সব অসুবিধা ভোগ করিয়া তাহাকেই সংসারের সকল সুখ সাজাইয়া দিয়াছে। কল্যাণীকে না পাইলে তাহার গতি কি হইত—ভাবিলে সে শিহরিয়া উঠিত। আর আজ কল্যাণী তাহাকে ফেলিয়া মহাযাত্রা করিতেছে! আজ যতীশচন্দ্রের বেদনার—যাতনার স্বরূপ কে উপলব্ধি করিতে পারে? আজ যেন জগৎ তাহার পক্ষে শূন্য বোধ হইতেছিল। তাহার মনে বল ছিল না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহেও যেন বল ছিল না।

আশঙ্কায়—উৎকণ্ঠায়—উদ্বেগে রাত্রি কাটিল। কিন্তু কল্যাণীর আর চৈতন্যোদয় হইল না। নিশাশেষ হইতে তাহার চাঞ্চল্য আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘন ঘন চমকিয়া উঠিতে লাগিল—যন্ত্রণায় ছট্ ফট

করিতে লাগিল। সরোজা তাহার মস্তক অঙ্কে লইয়া বসিয়া রহিল, তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল আর তাহার পিপাসা-শুষ্ক ওষ্ঠাধরে জল দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহার চাঞ্চল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি, দিদি। কি কষ্ট হইতেছে?" কিন্তু সে সেই সস্নেহ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পাইল না। তাহার হৃদয় বিষম বেদনায় ব্যথিত—সে আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। আর সে ভাবিতেছিল, কল্যাণী তাহার কে? দুই দিনের পরিচয়ে সে তাহার একান্তই আপনার হইয়াছে! সে কেন তাহাকে পাইতে না পাইতে হারাইতেছে?

ক্রমে দিবালোকবিকাশ হইল। ডাক্তার আবার আসিলেন; দেখিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা অত্যন্ত ভয়প্রদ।

সরোজা তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল; কারণ, কয় ঘণ্টার পর কল্যাণীর চাঞ্চল্য কমিয়া আসিতেছিল। এই চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি জীবনীশক্তি ক্ষয়ের লক্ষণ—জীবনান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কল্যাণী যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া সরোজা, আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া যতীশচন্দ্র তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল।

অল্পকাল পরেই কল্যাণীর চাঞ্চল্য শেষ হইয়া গেল; সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পর—তাহার পর তাহার শ্বাস গভীর হইতে লাগিল—ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস বিলম্বিত—দীর্ঘ হইতে লাগিল। তাহার পর নিশ্বাস বন্ধ হইল।

সরোজা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

যতীশ কম্পিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে "কল্যাণী" বলিয়া ডাকিল। তাহার পর তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ পত্নীর শবের উপর পতিত হইল।

সরোজা কল্যাণীর মস্তক উপাধানন্যস্ত করিয়া স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

না।

গৃহে প্লেগ হইয়াছিল, সেই জন্য যতীশচন্দ্রকে গৃহান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল। যতীশ সেই গৃহের বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিল। সে

বিনিদ্র হইয়া দীর্ঘ রজনী ক্রন্দনে কাটাইতেছে, তখন তাহার হৃদয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল না। আজ সে ভাবিতেছিল। যে বাঁচিয়া থাকিতে মনে হয়, তাহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ অসম্ভব, যাহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া মনে হয়, তাহার সঙ্গে মরিতে না পারিলে জ্বালা জুড়াইবে না, তাহাকে ছাড়িয়াও বাঁচিতে হয়। তখন জীবনের ভার বহিতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার ভারও বাড়িয়া যায়। যতীশ আজ ভাবিতেছিল—অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার ভাবনার শেষ নাই।

সরোজা কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিল। কল্যাণীর পুত্র—তাহার পুত্র তাহার নিকট বসিয়া খেলা করিতেছিল। সরোজাতাহার খেলানাগুলি গুছাইয়া দিতেছিল আর সে সেগুলি ছড়াইয়া ফেলিতেছিল—আর সরোজার দিকে চাহিতেছিল। মাতৃহীন শিশু—সে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু পরিচিত গৃহ হইতে গৃহান্তরে আসিয়া আর জননীকে দেখিতে না পাইয়া সে যেন কি ভাবিতেছিল। সে কিছুতেই সরোজার কাছ-ছাড়া হইতেছিল না। আর সরোজা—সেও কিছুতেই তাহাকে কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেছিল না। আজ তাহার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উছলিয়া উঠিতেছিল। এই বিশ্বে সৃষ্টিরক্ষা-কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভ্রমরকে আকৃষ্ট করিয়া এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে লইতে হয়—তাই ফুলের দলে সৌরভ—তাই কুসুম গর্ভে মধু। আর বীজ রক্ষা করিবার জন্যই ফলের সৃষ্টি। বিহঙ্গীকে মুগ্ধ করিবার জন্য বিহঙ্গের অঙ্গে বিচিত্র বর্ণসঞ্চার—তাহার কণ্ঠে কাকলী। সেই জন্যই জোয়ারের সময় যেমন নদীবক্ষে জল উছলিয়া উঠে, যৌবনে তেমনই রমণী-হৃদয়ে প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়। তখন ভালবাসিবার ও ভালবাসা লাভ করিবার জন্য—প্রিয়তমের নিকটে থাকিবার ও প্রিয়তমকে নিকটে পাইবার জন্য রমণী-হৃদয়ে যে ব্যগ্রতা আত্মপ্রকাশ করে, তাহার বেগ অনেক সময় রমণীর পরবর্ত্তী জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। রমণী তখন প্রেমকেই ইহকাল-পরকাল-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহার পর মাতৃস্নেহে সেই প্রণয়ের পরিণতি। আত্মত্যাগ তখন আত্মোৎসর্গে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেম—এই মাতৃস্নেহ রমণীর পক্ষে সহজাত সংস্কারেরই মত স্বাভাবিক—তাহারই মত প্রবল। ইহার আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী—হৃদয় বিকৃত বা বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে ইহার আবির্ভাব-পথ রুদ্ধ করা যায় না।

সরোজার প্রেমতৃষ্ণা তৃপ্ত হয় নাই—উদ্ভিন্ন যৌবনেই সে স্বামি-প্রেমবঞ্চিতা পতি-পরিত্যক্তা। কিন্তু সে ত হৃদয়ে প্রেমপ্রকাশ রোধ করিতে পারে নাই! সে যে সর্ব্বপ্রযত্নে যতীশকে নিরপরাধ প্রমাণ করিয়া প্রেমকে ভক্তিসীমায় আনিতে প্রয়াস পাইয়াছে! সে ত কল্যাণীর স্বামি-সন্দর্শন-আহ্বান অবহেলা করিতে পারে নাই—সব ভুলিয়া—অভিমান—অপমান সব ভুলিয়া একবার স্বামীকে দেখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই! সে প্রেম তাহার হৃদয়ে বদ্ধ হইয়া কূলে কূলে ভরিয়া ছিল; পরিণতি-প্রাপ্তির সুযোগ পায় নাই। আজ কল্যাণীর পুত্রকে পাইয়া সেই লাঞ্ছিত—উচ্ছ্বসিত প্রেম পরিণতিপ্রাপ্তির পথ পাইয়া সাগ্রহে কখন সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সরোজা তাহা জানিতেও পারে নাই। কল্যাণীর বক্ষে স্বামীর সন্তানকে দেখিয়া যখন তাহার হৃদয়ে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই শিশুর মুখচুম্বন করিয়া—আপনার নিষ্ফল বক্ষে তাহাকে ধরিয়া সে যখন অননুভূতপূর্ব্ব অসীম সুখ অনুভব করিয়াছিল, তখনই তাহারও অজ্ঞাতে তাহার প্রেম পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই স্বামীকে দেখিয়া ফিরিবার সময় সে যখন কল্যাণীর পুত্রকে তাহার মাতৃ-বক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছিল তখন তাহার বক্ষে বেদনা বোধ হইয়াছিল। আজ এ শিশু তাহার। কল্যাণী শিশুকে তাহাকেই দিয়া গিয়াছে। কিন্তু কল্যাণী কিছু না বলিয়া যাইলেও সে তাহার পুত্রকে ফেলিতে পারিত না। কারণ, তখন কল্যানীর পুত্র তাহার হইয়া গিয়াছে--তাহার রমণী-হৃদয়ের মাতৃস্নেহ তখন তাহাকে তাহারই করিয়া লইয়াছে। তাই সে শিশুকে কাছছাড়া করিতে পারিতেছিল না। সে তাহাকে বক্ষে লইয়া তপ্ত বক্ষ শীতল করিতেছিল।

বারান্দায় পদশব্দ শুনিয়া সরোজা সেই দিকে চাহিল—মুক্ত দ্বারপথে দেখিল, রাধাচরণ বারান্দায় আসিল। যতীশ ভাবিতেছিল। সে রাধাচরণের আগমন-বিষয় জানিতেও পারিল না। তাহা বুঝিয়া তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য রাধাচরণ যখন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি আফিসে যাইতে হইবে?"—তখন সে চমকিয়া উঠিল। রাধাচরণ আবার প্রশ্ন করিলে সে উত্তর করিল, "না। আজ যাইব না।"

রাধাচরণ যতীশচন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিল। রাধাচরণ গৃহে ফিরি-বার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। আজ সে সরোজাকে লইবার জন্য আসিয়াছিল।

কিন্তু এরূপ অবস্থায় সহসা কোন প্রস্তাব করিতে স্বভাবতঃই বাধ বাধ বোধ হয়; বিশেষ যতীশচন্দ্রের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সে প্রস্তাব করিতে আরও ইতস্ততঃ করিতেছিল। যাহা হউক, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অন্য দুই একটি কথা বলিবার পর সে বলিল, "আমি আজই ইছাপুরে ফিরিয়া যাইব।"

যতীশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, "আজ?"

রাধাচরণ বলিল "হাঁ। তাই সরোজাকে লইতে আসিয়াছি।"

যতীশ রাধাচরণের দিকে ফিরিল। সরোজা দেখিতে পাইল—তাহার ম্লান মুখে সহসা পাংশুবর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সে কোন কথা কহিতে পারিল না।

রাধাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজা কি এখন যাইবে, না অপরাহ্ণে যাইবে?"

যতীশ কি ভাবিতেছিল, সে উত্তর দিল না।

রাধাচরণ বলিল, "বৈকালে তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। নীরজাও ব্যস্ত হইয়াছে। আমার সঙ্গে এখন যাইলেই হয় না?"

এবার যতীশ উত্তর দিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি আর কি বলিব? আমার বলিবার পথ নাই। কিন্তু—ছেলেটির—" সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে কান্দিতে লাগিল।

কক্ষমধ্যে সরোজা তাহার সহানুভূতিসিক্ত হৃদয়েও যেন ক্রন্দন শুনিতে পাইল; তাহার নয়নেও অশ্রু দেখা দিল।

যতীশের এই অবস্থা দেখিয়া রাধাচরণ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "অত ছোট ছেলে 'মানুষ করা' পুরুষের পক্ষে কষ্টকর—বিশেষ আপনার অবসর কোথায়? আমার বোধ হয়, উহাকে উহার মাতুলালয়ে দিলেই ভাল হয়।"

রাধাচরণের কথা সরোজার হৃদয়ে তীক্ষ্ম অস্ত্রের মত আঘাত করিল। সে বাঁচিয়া থাকিতে তাহার স্বামীর সন্তান কি সত্য সত্যই মাতৃহীন? সে কি কল্যাণীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবে না? সে যে তাহাকেই তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছে! আর তাহার হৃদয়ে কি মাতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল না?

যতীশচন্দ্র যেন আপনার মনে আপনি বলিল, "উহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে হইবে।" সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে দীর্ঘশ্বাস যেন সরোজার হৃদয় বিদ্ধ করিল।

রাধাচরণ বলিল, "কি করিবেন; উপায় নাই।"

যতীশ কোন কথা কহিল না।

রাধাচরণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, "চলুন, সরোজা কখন্ যাইবে —একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" রাধাচরণ উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যতীশ তাহার অনুসরণ করিল।

নূতন লোক দেখিয়া বিস্মিত শিশু সরোজার অঞ্চল ধরিয়া রাধাচরণের দিকে চাহিল, তাহার পর যতীশকে দেখিতে পাইয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার বস্ত্র ধরিল।

রাধাচরণ সরোজাকে বলিল, "আমি আজ যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।"

সরোজা একবার পুত্রের দিকে চাহিল। তাহার পর সে যতীশের দিকে চাহিল। যতীশের ম্লান মুখের বিবর্ণতা ও নত নেত্রের অনুনয়-কাতর দৃষ্টিতে কি যেন তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। তখনই কল্যাণীর কথা তাহার মনে পড়িল—"দিদি, তোমার সর্ব্বস্ব—আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হাতে দিয়া যাইতেছি। তুমি ইহাদের ফেলিয়া দিও না।" সে রাধাচরণকে বলিল, "তুমি যাও।"

রাধাচরণ কিছু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যাইবি না?"

শিশু রাধাচরণের শেষ কথায় পুনরাবৃত্তি করিল—"না।"

সরোজার মনে হইল, সেই কথায় সে বিধাতার আদেশ শুনিতে পাইল। তাহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল। সে বলিল, "না।"

রাধাচরণ সে দিন যাইবার পূর্ব্বে আবার সরোজার সহিত দেখা করিয়া গেল। ভগিনীর এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনে তাহার আনন্দের আর সীমা ছিল না। যাইবার সময় সে যতীশকে বলিয়া গেল, "আপনি দিন কতক ছুটী লইয়া দেশে চলুন। অনেক দিন আসিয়াছেন; আর স্থানপরিবর্ত্তনে মনও ভাল হইবে।"

সে ভাল করিল কি না, সে সম্বন্ধে সরোজার যদি কোন সন্দেহ থাকিয়া থাকে, তবে বিরজার পত্র পাইয়া তাহা দূর হইল। বিরজা লিখিল, "সেজ দাদার কাছে সব শুনিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখিনী হও। তুমি যে কায করিয়াছ, তাহাতে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। সেবায় —শুশ্রূষায়—স্বার্থত্যাগে—আত্মত্যাগে রমণীর গৌরব। আমাদের জীবন সকলের সেবা করিয়া সকলকে সুখী করিবার জন্য। তুমিই সার্থক বাবার উপদেশ শুনিয়াছিলে।" তাহার পর সে লিখিয়াছিল, "আমি কাশী

যাইব। তাহার পূর্ব্বে একবার তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তোমরা একবার আসিও; খোকাকে খুব সাবধানে রাখিও। তোমাদের মঙ্গল-সংবাদ দিতে বিলম্ব করিও না।" শৈলজা এ সংবাদ পাইয়া সরোজকে লিখিল, "আমি বিরজার পত্রে সব জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি বরাবরই বলিয়াছি, জ্যেঠামহাশয়ের পুণ্যে তুমি সুখী হইবে। তবে আমার দুঃখ, তিনি তোমার সুখ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।" শৈলজার পত্রের এই স্থানে দুই বিন্দু অশ্রুচিহ্ন। জ্যেষ্ঠতাতের কথা মনে করিয়া সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর শৈলজা লিখিয়াছে—"তুমি যতীশকে বলিও, আমি শ্রীমতী শৈলজা দেবী শীঘ্রই আমার ভগিনীকে ও ভগিনীপতিকে দেখিতে বাপের বাড়ী যাইব। তখন তোমাদের যাইতে হইবে। আমি কোন ওজর শুনিব না। আমি শীঘ্রই যাইব। কেবল তোমার জামাইবাবুর ছুটী মঞ্জুর হইতে যে বিলম্ব। আমি তাঁহাকে ছুটীর দরখাস্ত করাইয়াছি।"

সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে তাহার হিতকাঙ্ক্ষী ভগিনী দুই জনই পুলকিত হইয়াছে জানিয়া সরোজা অত্যন্ত সুখ অনুভব করিল।

POSITIVISM বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ।

কোমতের যে পঞ্জিকার ব্যাখ্যা করা গেল, তাহাকে কোম্‌ৎ বলিয়াছেন, Concrete Calendar অর্থাৎ ব্যক্তিমুলক পঞ্জিকা। তদ্ব্যতীত তিনি আর একটি Calendar প্রস্তুত করেন, উহার নাম দিয়াছেন Abstıact Calendar ব্যবস্থামূলক পঞ্জিকা (ব্যবস্থা - Social institutions, যথা বিবাহ, ইত্যাদি)। ইহার প্রথম মাসের নাম Humanity; ২য় মাস—বিবাহ (Marriage); ৩য় মাস—পিতৃত্ব সম্বন্ধ (paternal relation); ৪র্থ মাস—পুত্রত্ব সম্বন্ধ; ৫ম মাস—ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ; ৬ষ্ঠ মাস—স্বামিভৃত্য সম্বন্ধ। তিনি এই ছয়টি ব্যবস্থার সাধারণ নাম দিয়াছেন—লোকস্থিতি, বা সমাজের মৌলিক সম্বন্ধ fundamental social relations। ৭ম মাস—জড়পদার্থ পূজা (fetishism); ৮ম মাস—বহুদেব পূজা (polythcism) ৯ম মাস—একেশ্বরবাদ (monotheism); তিনি এই তিন ব্যবস্থার সাধারণ নাম দিয়াছেন—preparatory stage, সমাজ গঠনের আরম্ভকাল। ১০ম মাস—

নারীজাতি। কোমৎ নারীজাতিকে ধর্ম্মনীতির অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে moral providence কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১১শম মাস—যাযকসম্প্রদায় (priesthood); ইঁহারা বুদ্ধিবৃত্তিচালনার অধ্যক্ষস্বরূপ intellectual providence। ১২শ মাস—সম্ভ্রান্তলোকসম্প্রদায়(patriciate) ইঁহাদিগকে তিনি বাহ্যব্যাপারের অধ্যক্ষ (material providenice) বলিয়াছেন। ১৩শ মাস—শ্রমজীবিগণ (proletariate)। ইঁহারা general providence সর্ব্বসাধারণ তাবং বিষয়ের অধ্যক্ষ।

এ স্থলে বলা উচিত কোমৎ providence এই শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেন। সাধারণতঃ লোক ভগবানকেই providence কহে, অর্থাৎ যিনি আবশ্যক বস্তুসকলকে জোগাইয়া দিতেছেন। এই 'জোগাইয়া দেওয়া' অর্থ ধরিয়া কোমৎ মনুষ্যসমাজে সেই সম্প্রদায়কে সেই বিষয়ের providence বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যে সম্প্রদায় যে বিষয়ের অধ্যক্ষতা করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে জোগাইয়া রাখেন। যথা, banker, merchant, manufacturer, farmer এই চারি সম্প্রদায়কে তিনি patriciate কহেন। ইঁহারা উক্ত চারি প্রকার সামাজিক ব্যাপারের অধ্যক্ষ, অধিষ্ঠাতা, এবং যোগক্ষেমকর্ত্তা (যোগক্ষেম বলিতে অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা; কি রহিল, কি খরচ হইল, কি চাহি, এ বিষয় দেখা)। নারীজাতিকে তিনি ধর্ম্মনীতির অধিষ্ঠাত্রী কহেন; তাৎপর্য্য এই—নারীর চারি মূর্ত্তি—জননী, গৃহিণী, ভগিনী ও দুহিতা; আমাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা ইঁহাদিগের নিকট হইতেই হয়। যাযকসম্প্রদায় (priesthood) বুদ্ধিচালনাঘটিত ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা, কোমতের ব্যবস্থামত ইঁহারাই লোকদিগকে লিখাপড়া শিখাইবেন, সর্ব্বদা আবশ্যকমত উপদেশ দিবেন, আচরণে কোথায় কি ভুল হইতেছে দেখাইয়া দিবেন, অযথা বুদ্ধিপরিচালনা হইতে নিরস্ত রাখিবেন, ইত্যাদি। শ্রমজীবিগণ সর্ব্বসাধারণ সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধানকর্ত্তা; আহার, আচ্ছাদন, বসতবাটীনির্ম্মাণ, যাবতীয় অত্যাবশ্যক অপরিহার্য্য কার্য্য, ইঁহাদিগেরই হস্তে। ইঁহারা পরিশ্রম না করিলে সমাজকে অচিরাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাদির অভাবে বিলুপ্ত হইতে হয়। আমরা অভ্যাসদোষে এবং ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া শ্রমজীবিদিগকে নীচ জাতিমধ্যে পরিগণিত করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যেরূপ অক্লিষ্ট কঠোর পরিশ্রমে ইঁহারা সমাজকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের যারপর নাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। এক্ষণকার বিবেচনামত

হয়ত বলিব যে কৃতজ্ঞতা আবার কিসের? পয়সা দিয়া চাউল কিনি, ভাত খাই। শ্রমজীবিরা পেটের দায়ে অত ক্লেশ স্বীকার করে। তাহারা কি আমাদিগকে খাওয়াইবে পরাইবে বলিয়া পরিশ্রম করে? কিন্তু এ প্রকার কুতর্কের চালনা করিলে মা বাপকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি রহিত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ তর্কবাগীশ অনেক নব্য যুবক আধ তামাসার ছলে এ প্রকার পরিহাসও কখনও কখনও করিয়া থাকেন, বাপ মা'কে শ্রদ্ধা করিতে যাইব কেন? তাঁহারা বৃত্তিবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ফলে আমার জন্মলাভ হইল, ইহাতে কৃতজ্ঞতার বিষয় কি-আছে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমরা সকল সময়ে কৃতজ্ঞতাচালনাবিষয়ে অত সূক্ষ্ম বিবেচনা করি না। হিন্দুরা দুগ্ধদাত্রী গাভীর পূজা করিয়া থাকেন, ধান্যাদি শস্যেরও পূজা করেন। আমার স্বর্গীয় বন্ধু যোগেন্দ্র কোমৎ পড়িয়া পড়িয়া মনোবৃত্তিকে এতদূর পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহার আবাদের চাষারা তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে কখনও কখনও আসিত। একদা তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখ, তোমরা আমাদিগকে খাইতে দাও বলিয়া আমরা চারটি চারটি খাইতে পাই।" চাষারা ত শুনিয়া অবাক ও হতবুদ্ধি। তাহারা কখনও কোনও জমীদার বাবুর মুখে এ প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করে নাই। তাহারা শিহরিয়া উঠিল, কিছুই তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিল না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীগণকে এইরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করাই আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য; এবং যত দিন আমাদের সে অভ্যাস না হইতেছে, ততদিন সমাজের সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যাহত হইয়া থাকিবে।

কোম্‌ৎ বিবাহব্যবস্থার নামে একটি মাস গণনা করিয়া ঐ ব্যবস্থা যে সমাজের পক্ষে কত আবশ্যক তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; কারণ এক্ষণে তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের প্রবাহে বিবাহব্যবস্থা ও স্বত্বাস্বত্বের ব্যবস্থা (institutions of marriage and property) একপ্রকার যায় যায় হইয়াছে। বড় বড় গ্রন্থরচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয় যে, মনুষ্যসমাজে বিবাহের আবশ্যকতা নাই। এই ব্যবস্থা পশুদিগের মধ্যে নাই, অন্যান্য ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে নাই, তাহারা কি নির্ম্মূল হইতেছে? কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিলেই বিনা বিবাহে মনুষ্যসমাজ বেশ খাড়া থাকিতে পারে। এ প্রকার কুতার্কিকদিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া কোনও ফল নাই। ইঁহাদিগকে ঘোরতর অবজ্ঞার তলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বত্বা-

স্বত্বের বিষয়েও উক্তপ্রকার বিশ্ববিপ্লাবক অনেক আন্দোলন এক্ষণে চলিতেছে, —Socialism, Communism, Nihilism ইত্যাদি মতের আবির্ভাব তাহার দৃষ্টান্ত। এই সকল কুতর্কের প্রতি কোমৎ এককালে খড়্গহস্ত এবং অবজ্ঞা-পূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তবে শোশ্যালিজমঘটিত একটি কথা তিনি ভুলেন নাই; অর্থাৎ নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত না হইলে পৃথিবীস্থ তাবৎ জীবিত ব্যক্তিরই খাইতে পরিতে এবং উপযুক্ত বাসস্থানে থাকিতে পাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সমাজের নেতৃত্ব করেন, উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। করিতে না পারিলে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নেতৃত্ব করিবার অযোগ্য। ফলতঃ এ কথা সমাজ-নেতারা অনেক সময়ে নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছেন। এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষের সময় আমাদিগের গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা ত এ কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না যে, অনটনবশতঃ লোক মরে, আমাদের কি? আমি শুনিয়াছি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমে যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তৎকালে তথাকার শাসনকর্ত্তা ম্যাকৃডনেল (এক্ষণে লর্ড ম্যাকৃডনেল) অত লোক অনাহারে মরিবে ভাবিয়া পাগলের মত হইয়াছিলেন, এবং দিবারাত্র ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালেও যে সময়ে সময়ে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহাও নিশ্চিত বোধ হয়। ম্যাকৃডনেলের কথা শুনিয়া 'শকুন্তলার' এক পংক্তি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ স্ফুরিত হইয়া উঠে; যখন কশ্যপ ঋষি দুষ্যন্তকে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিতেছেন, তখন কহিতেছেন—পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ—অর্থাৎ ইনি লোকদিগকে খাইতে দিয়া ভরত, ভরণপোষণকর্ত্তা এই নাম লাভ করিবেন। এটাকে আমি বরাবর হ য ব র ল humdrum common-place কথা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম; রাজা রাজপুরুষরা লোকদিগকে খাইতে দেন কি দুশো পাঁচশো কাঙ্গালী খাওয়ান, ইহাতে আবার বাহাদুরি বা পৌরুষ কি? আর খোষনাম পাইবারই বা কি হিসাব আছে? কিন্তু ম্যাকৃডনেলের কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে উদয় হইল যে, কথাটা আর কিছু নহে, দুষ্যন্তের পুত্র বোধ হয় কোনও ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাই 'ভরত' এই খোষনাম পাইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে 'ভরত' এই শব্দটা অতি উন্নত ও ঔদার্য্যপূর্ণ অর্থ ধারণ করে।

এইবার Positivist Chivalry'র কথা বলিব। ইহা কোম্‌তের অপর একটি অভিপ্রেত ব্যবস্থা। Chivalry শব্দের অর্থ বাঙ্গালাতে কিরূপে ব্যক্ত করা যাইবে? আমি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, "শরণ্য-সম্প্রদায়" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে কতকটা হইতে পারে। য়ুরোপের ইতিহাসে যাহাকে মধ্যযুগ বলে সেই সময়ে chivalry নামক ব্যবস্থা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মুখ্য অভিপ্রায় পরিণামে এই দাড়াইয়াছিল,—অন্ততঃ লোক ভাবিত, যে তাঁহারা দুর্ব্বলকে প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে স্ত্রীজাতির মান ও ইজ্জৎ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর থাকিবেন। ইহাই ছিল তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত, উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য। যদি বল যে, এ কার্য্য ত দেশের শাসনকর্ত্তাকেই অর্শে, তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, দেশের শাসনকর্ত্তা সকল স্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। কালিদাসের শকুন্তলাতে রাজা দুষ্যন্ত নিজেই বলিয়াছেন—

অহন্যহন্যাত্মন এব তাবৎ
জ্ঞাতুং প্রমাদ স্খলিতং ন শক্যং
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রযাতী
ত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ।

অর্থাৎ "দিন দিন নিজেরই কত ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করা ভার; তাহার উপর আবার প্রজাদিগের মধ্যে কখন কে কি করিতেছে ইহা কি জানিতে পারা যায়?" এই নিমিত্ত যে যে স্থানে Humanity কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে সেই সেই স্থানে রাজ্যশাসনকার্য্যের সহিত লিপ্ত না থাকিয়াও কতকগুলি মহাত্মা আপনা হইতেই প্রবলের অত্যাচার নিবারণ ও স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষাবিষয়ে ব্রতী হইয়া থাকেন।

য়ুরোপের chivalry ব্যবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে সার্ভান্টিস নামক স্পেনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের Don Quixote গ্রন্থপাঠে; সত্য বটে সার্ভান্টিস্ ঐ গ্রন্থে উক্ত ব্যবস্থার হাস্যাস্পদ মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। তখন chivalry'র শেষ দশা। অতিপ্রসঙ্গদোষে এবং অযোগ্য ব্যক্তিদিগের নির্বুদ্ধিভাবশতঃ ব্যবস্থাটি বাস্তবিকই হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল বলিয়া কোম্‌ৎ মনে করিতেন না যে, প্রকারান্তরে উহার পুনরুত্থাপন করা সঙ্গত নহে, কিম্বা উহা আবার কার্য্যোপযোগী করা যাইতে পারে না।

[illegible] ... দূরীভূত না হয়, তাহা সমাধা করিতে কঠিন আদালতও অক্ষম। অপর সমাজে সর্ব্বত্র ব্যতিরেকে আইন আদালতের সাহায্য লওয়া ভাল দেখায় না। এই নিমিত্ত ফলে দাঁড়ায় এই যে, যাঁহাদের শক্তি আছে তাঁহারাই আপন আপন স্বত্বরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন; যাঁহাদের সে শক্তি নাই তাঁহারা প্রায়ই কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া থাকেন এবং আপন আপন স্বত্ব হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায়েন, পরিশেষে বংশ-লোপই তাঁহাদিগের শেষ দশা। সংসারের কার্য্য আবহমানকাল অনেক স্থলে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে; ইহাকেই ডারুইন বলিয়াছেন—Natural Selection, স্পেন্সর বলিয়াছেন—Survival of the fittest কিন্তু যে ব্যক্তির মনোমধ্যে ন্যায়ান্যায়ের জ্ঞান কিঞ্চিদংশে স্ফূরিত হইয়াছে তিনি কখনই এ প্রকার অবস্থার প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইহার প্রতীকার-চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যথিত করে। ডারুইন বা স্পেন্সরের মতাবলম্বী ব্যক্তিরা বলিবেন বটে যে—ইহার আর উপায় কি? ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই এই; সে নিয়ম রোধ করিবার চেষ্টা করা আর Ecliptic কে Equator এর সঙ্গে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করা দুইই সমান। যাঁহারা এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগের করুণা নামক মনোবৃত্তি অবশ্যই স্বভাবতঃ খর্ব্ব হইবে, নহিলে তাঁহারা কখনই ঐ উপায়ে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন না।

Positivist Chivalry—যাহাকে আমি শরণ্যসম্প্রদায় বলিতেছি—উক্ত অনর্থের প্রতীকার করিবার জন্য একটি উপায়কল্পনারূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। যদি ক্ষমতাপন্ন ভদ্রসন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে পরহিতার্থব্রতী হইতে পারেন, তাহা হইলে অনেক স্থলেই সহজে প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন। তবে ইহাতে নিজের কোনও লাভের প্রত্যাশা নাই, অনেক সময়ে ঝঞ্ঝাটেও পড়িতে হয়। লাভের মধ্যে একটা সৎকার্য্য সম্পাদন করিলাম—এই আত্মপ্রসাদমাত্র। এক্ষণে নরজাতির যে অবস্থা তাহাতে উক্তপ্রকার আত্মপ্রসাদ-লাভের লোভে যে অধিক লোক ঝঞ্ঝাটে পড়িতে অগ্রসর হইবেন তাহা বোধ হয় না; তবে কালসহকারে সদ্বিবেচনার চমৎকারিতা আমার বিভাসিতরূপে অনুভূত হইলে এবং অভ্যাসবশে আত্মা-দিগের মস্তিষ্কের সর্ব্বাংশ-ব্যবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইলে আশা করা

যাইতে পারে যে, শরণ্যসম্প্রদায়ের ব্যবস্থাটি বিশিষ্টরূপে কার্য্যকরী হইবে।

শরণ্যসম্প্রদায়ের কিছু আভাস আমি বঙ্কিমবাবুর একখানি উপন্যাস হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিয়া কিঞ্চিদংশে বুঝাইয়া দিতে পারি। উপন্যাসখানির নাম আমার এখন মনে পড়িতেছে না। বঙ্কিম বাবু উহাতে লিখিয়াছেন যে, কোনও পল্লীগ্রামের এক বেলেল্লা সামান্য একটি গৃহস্থবাটীর বিধবা কন্যার প্রতি অবৈধ লালসা ধারণপূর্ব্বক কিছু কিছু অত্যাচারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। গ্রামের জমীদার একটি ভদ্রসন্তান ছিলেন, তিনি বয়সেও প্রবীণ; তিনি এ উপলক্ষে হাউচাউ করা সঙ্গত বোধ না করিয়া ছোকরাটিকে একদা আপনার বাটীতে ডাকাইলেন এবং বিলক্ষণ-রূপে তাহার দু'টি কাণ মলিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে সে আর সে প্রকার কায না করে! ছোকরা অবশ্য মনে করিলে জমিদারের নামে Penal Code করিতে পারিত এবং তাঁহাকে একটু কষ্ট দিলেও দিতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় সে দুষ্ট সরস্বতী তাহার মনে উদয় হয় নাই, সুমতির বশবর্ত্তী হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। শরণ্যব্যক্তিগণ মনে করিলে এ প্রকার সামান্য সামান্য সৎকার্য্য অনেক সম্পাদন করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা সমাজের বিস্তর দুর্ঘটনাস্রোত রোধ করিতে পারেন, কিন্তু তৎকল্পে নিজে শান্ত, সুবোধ ও চরিত্রবান হওয়া চাহি। নচেৎ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। আমার বোধ হয় Positivist Chivarly কোম্‌ৎ সেণ্ট সাইমন্ নামক একজন সমসাময়িক ফরাসী চিন্তয়িতার উপদেশ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কোম্‌তের যখন বয়স অল্প তখন সেণ্ট সাইমন বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। কোমৎও কয়েক বৎসর তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। কিন্তু তৎপরে এই ব্যক্তির প্রতি কোম্‌তের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কোমৎ আপনার গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—He was a sort of literary juggler অর্থাৎ তাঁহার অনেক কথা অসার বুজরুকি মাত্র। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, Humanity এবং Religion of Humanity ইত্যাদি অনেক নূতন ধরণের কথা সেণ্ট সাইমনই বোধ হয় প্রথম উদ্ভাবিত করেন; এবং যে সময়ে কোম্‌ৎ দর্শন শাস্ত্রকেই নরজাতির সর্ব্বকার্য্যসাধক বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে সেণ্ট সাইমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রণালীব্যতীত

নরজাতির কোনও মতেই চলিবে না ; কেবল দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ তৃপ্তিলাভ করে না। এই তত্ত্বটি কোম্‌ৎ তৎকালে Vague religiousness বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখা যাইতেছে যে, ১০।১৫ বৎসর পরে তিনি নিজেই ঐ তত্ত্বে উপনীত হইয়া বহু বিস্তাররূপে উহা ঘোষণা করিলেন, Religion of Humanity সংস্থাপিত করিলেন। আমার বোধ হয় যে, Eugene Sue (অজেন স্যু) নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাসলেখক ও ঐ সেণ্ট সাইমনের শিষ্য। তৎপ্রণীত Mysteries of Paris নামক বিস্তীর্ণ আখ্যায়িকাগ্রন্থে রুডল্‌ফ নামে একটি চরিত্র চিত্রিত আছে। রুডল্‌ফ একজন সামান্য জর্ম্মাণ নরপতি। তিনি কোনও কার্য্য-বশতঃ ছদ্মবেশে পারিসে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং শারণ্য সম্প্রদায়ের মত বিস্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে এমন অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল যাহা ধর্ম্মনীতি কখনও কোনও দিন অনুমোদন করিবে না। তবে মোটের উপর এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বস্থলে পরহিতব্রতই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। কতকগুলি সন্দিগ্ধ কার্য্য ব্যতীত তাঁহার চরিত্রকে শরণ্যসম্প্রদায়ের অতি সুন্দর আদর্শ-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। Mysteries of Paris নামক গ্রন্থ যদিচ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি এখন পর্য্যন্ত উহার নূতন নূতন সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইংরাজি ভাষাতে উহা অনেক বার মুদ্রিত হইয়াছে। উপন্যাসপুস্তকের এতাদৃশ দীর্ঘ জীবন অতি বিরল। ইহাতে বোধ হয় বহিখানা দৃঢ়রূপে লোকের চিত্তকে আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছে। *

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

---

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতিকথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে—সম্পাদক।

কৃপণ।

(১)

ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই 'পাহাড়ে কৃপণ' বলিয়া নরেশচন্দ্রের বিলক্ষণ দুর্ণাম ছিল। কোন গভর্ণমেণ্ট আফিসে পনের টাকা বেতনে বহাল হইয়া অধ্যবসায়ের গুণে এখন তিনি একশত টাকা মাহিনা পাইতেছিলেন সত্য; কিন্তু তথাপি নরেশচন্দ্র পূর্ব্বের চালচলনের এতটুকু পরিবর্ত্তন করেন নাই। বেশ, ভূষা, আহার—সকল বিষয়েই তিনি প্রাচীন অভ্যাস অনুসারে চলিতেন। এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে তিনি অম্লানবদনে বলিতেন, "গরীব মানুষ, কোনরকমে দিন গুজরাণ করি; পা'ব কোথায় মশায়?" কিন্তু শুনা যায়, প্রতিমাসেই নাকি তাহার ব্যাঙ্কের খাতায়, জমার অংশে টাকার পরিমাণ বাড়িতেছিল।

অর্থব্যয়সম্বন্ধে যেমন তিনি বিশেষ সতর্ক, সময়ের ব্যবহার সম্বন্ধেও ততোঽধিক। কেহ একমুহূর্ত্তও নরেশচন্দ্রকে বাজে গল্প করিতে দেখে নাই। কোনও দিন তিনি শুইয়া বসিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিতেছেন এ দৃশ্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। ঘড়ির কাঁটার মত নরেশচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নিয়মিতভাবে করিতেন, এক মুহূর্ত্তও এ দিক ও দিক হইবার যো ছিল না। যতক্ষণ তিনি আফিসে থাকিতেন সর্ব্বদাই কাযে ব্যস্ত; ছুটীর সময় বাড়ী বসিয়া অন্য কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কাগজ লইয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার করিতেন। সে ছেলে-খেলার ঠোঙ্গা নহে। তাহাতে নরেশচন্দ্রের বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন হইত। লোক বলিত ঠোঙ্গা বিক্রয় করিয়া যে আয় হয়, তাহাতে নরেশচন্দ্রের সংসার খরচ প্রায় নির্ব্বাহ হইত।

সঞ্চয়ের জন্য নরেশচন্দ্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হলপ্ করিয়া নরেশচন্দ্রের সঞ্চয়-বুদ্ধির অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন, দৈবাৎ কোন অতিথি অভ্যাগত অথবা আত্মীয় গৃহে উপস্থিত হইলে প্রতিদিনের নিয়মিত তণ্ডুলের একমুষ্টিও অধিক অন্ন প্রস্তুত হইত না। হইবার উপায় নাকি ছিল না। নরেশচন্দ্র প্রতিদিন স্বহস্তে চাউল মাপিয়া দিতেন, ভাণ্ডারের চাবি তিনি অন্য কাহারও হাতে দিতেন না। সুতরাং অতিথিসৎকারের পর অনেক সময় বাড়ীর

গৃহিণী অৰ্দ্ধাশনে বা অনশনে দিন যাপন করিতেন। এ সম্বন্ধে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সম্ভাবনা বা উপায়ও ছিল না। বাল্যকালে নরেশ নাকি বিলক্ষণ কোপনস্বভাব ছিলেন; বৃদ্ধবয়সের সন্তান এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া পিতামাতারও আদরের দুলাল ছিলেন।

বিলাসিতা তাঁহার যে ছিল না; এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার শত-ছিদ্রযুক্ত জামার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি কোন আফিসের বন্ধু বলিতেন, "আর কেন নরেশ বাবু, এটাকে পেন্সন দিন, ওটা ভাল দেখায় না। সেলাই করিবার আর জায়গাও ত নাই!" চিরসপ্রতিভ নরেশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিতেন, "পয়সার মাল, মশায়; ফেলে দিলে কি চলে? চৌদ্দ আনা দাম দিয়ে চেতলার হাট হইতে ছ' বৎসর আগে কিনেছিলুম। এখনও অন্ততঃ আর ছ'মাস চালাতে হবে।"

আবগারী বিভাগের কোন পদার্থের সহিতই নরেশচন্দ্রের এতটুকু পরিচয় ছিল না। এমন কি তাম্বুলরাগের সহিতও কোন দিন তাঁহার 'দন্তরুচি-কৌমদীর' মিলন ঘটে নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার গৃহে উহার প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিতে পারেন নাই; পত্নীর জন্য সপ্তাহে দুই পয়সার পানের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। এ পয়সাটা অনর্থক ব্যয় হইলেও নরেশ-চন্দ্র বাধ্য হইয়া সে ক্ষতিটুকু সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। গৃহিণীর এয়োতি বজায় রাখিবার জন্য তিনি এক দিন অন্তর এক পয়সার চিংড়িমাছ কিনিতেন। বিশ্বনিন্দুকেরা এ কথাও রটনা করিত! তবে নরেশচন্দ্র যে নিরমিষাশী সে কথা সত্য। তাঁহার কোনওরূপ ব্যসনই ছিল না। তিনি যৎসামান্য আহা-র্য্যেই পরিতুষ্ট হইলেন; তবে পচা কিংবা বাসি জিনিস কখনও স্পর্শ করিতেন না। বাজারের ঘৃত বিশুদ্ধ নহে বলিয়া তিনি টাকায় চারি সের দরে প্রত্যহ এক সের দুগ্ধ কিনিতেন। সেই দুগ্ধ জ্বাল দিয়া রাখিলে যে সর পড়িত তাহাই ক্রমশঃ সঞ্চিত হইত। এইরূপে সেই সর জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত হইত; নরেশচন্দ্র তাহাই ব্যবহার করিতেন। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তিনি এতদূর অবহিত; কিন্তু নষ্টমতি নিন্দুকদিগের তাহা সহ্য হইত না, তাহারা ইহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলিত, পাছে অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়, ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়বাহুল্য ঘটে, সেই আশঙ্কায় নরেশচন্দ্র এতটা সতর্ক। এ সব অপ্রীতিকর মন্তব্য অবশ্যই তাঁহার কাণে যাইত; কিন্তু সুবুদ্ধি নরেশ নীচজনের ঈদৃশ 'উচ্চভাব' হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

নরেশচন্দ্র অপুত্রক। জননী কমলার অযাচিত স্নেহ লাভ করিয়াও ষষ্ঠী দেবীর আশীর্ব্বাদলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ভ্রাতুষ্পুত্রটি বড় হইলে তিনি তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া লিখাপড়া শিখাইতেছিলেন। দুষ্টলোক কিন্তু তাঁহার এই উদারতায় মুগ্ধ হয় নাই। তাহারা জানিত, ভাল লিখাপড়া শিখিলে ছেলে চড়া দরে বিকাইবে, এই আশায় নরেশচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র অনিল-চন্দ্রকে নিজব্যয়ে পড়াইতেছিলেন। যে দামে ছেলে বিকাইবে, তাহার অর্দ্ধেক ত নরেশচন্দ্র পাইবেন! তাহার লিখাপড়ার অনুরাগ দেখিয়া যে তিনি তাহাকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, আত্মীয়স্বজনের মনে এমন বিশ্বাস এক দিনের নিমিত্তও হয় নাই। সকলেই জানিত, অনিলের জন্য নরেশচন্দ্রের যে অর্থব্যয় হইত, সেটা সম্পূর্ণই তাঁহার মাহিনার টাকা হইতে লাগিত না। পাঠাভ্যাসের পর অবকাশ কালে তিনি তাহাকে দিয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার করাইয়া লইতেন। শুনা যায়, প্রত্যহ সে নাকি দুই তিন আনা মুল্যের ঠোঙ্গা তৈয়ার করিত। নরেশচন্দ্র বলিতেন, বাজে খেলায় সময় নষ্ট না করিয়া কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ার করা ভাল। তাহাতে পয়সাও আইসে আনন্দও হয়। বিশেষতঃ অসৎ সংসর্গে মিশিয়া উৎসন্ন যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অতিথি অভ্যাগত এবং কদাচিৎ কোন আত্মীয় নরেশচন্দ্রের ভবনে সমাগত হইলে নানারূপ অসুবিধার কথা তুলিয়া তিনি বাজে খরচ এবং ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াইতেন। অনেকেই বলিত যে, দরিদ্র ভিক্ষুক তাঁহার গৃহ-দ্বার হইতে কখনও হাসি মুখে ফিরে নাই। অনাবশ্যক আলস্যের প্রশ্রয় দানে তিনি চিরদিনই বিমুখ। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার সহোদরকেও নাকি রেহাই দেন নাই। মধ্যমাগ্রজ কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, মেসে থাকার বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় অগত্যা তিনি কনিষ্ঠের বাসায় খরচ দিয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। নরেশচন্দ্র মাসকাবারে তাঁহার নিকট হইতে হিসাব করিয়া ছয় টাকা সাড়ে দশ আনা আদায় করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেন, "আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, কাহাকেও কোনরূপ সাহায্য করি। তা দাদাই হউন, আর বাবাই হউন।" এমন কবুল জবাবের পর আর কোন্ ভদ্রলোক এ বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহেন?

(২)

মাঘ মাস, কিন্তু সে দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। শীত্র

আকাশ ধরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। রবিবারের অবকাশ, নরেশচন্দ্র শয়নকক্ষে বসিয়া দ্রুতহস্তে কাগজ ভাঁজ করিতেছিলেন। পত্নীও গৃহকর্ম্ম সারিয়া পতির পুণ্যের সহায় হইয়াছিলেন। বাসা বাড়ী, দুইটি মাত্র ঘর। ছোট ঘরটিতে অনিলচন্দ্র থাকে। অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটি নরেশচন্দ্রের অধিকারে। কক্ষতল হইতে ছাদের কড়ি পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে নানাপ্রকার পরিত্যক্ত কাগজ সাজান রহিয়াছে।

লৌহজালমণ্ডিত বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া নরেশচন্দ্র ঠোঙ্গা তৈয়ার করিয়া চলিয়াছেন—ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই!

এমন সময়ে কে বাহিরে ডাকিল, "নরেশ, বাড়ী আছ?"

সে স্বর চির-পরিচিত। নরেশচন্দ্র বাহিরে গেলেন। দেখিলেন, তাঁহার মধ্যমাগ্রজ ব্যাগ হস্তে দণ্ডায়মান।

"তুমি কোথা থেকে, মেজদা?"

ভূপেশচন্দ্র সংক্ষেপে তাঁহার দুর্দ্দশার কথা বলিলেন; তিন শত টাকা তাঁহার এখনই প্রয়োজন। ঘোড়দৌড় খেলিয়া তিনি তিন শত টাকা হারিয়াছেন। আজই তাঁহাকে এই টাকা শোধ দিতে হইবে, নহিলে মান ইজ্জৎ কিছুই থাকিবে না; দারুণ অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইতে হইবে। হাতে একটি পয়সা নাই। এখন নরেশচন্দ্র রক্ষা না করিলে এই বিদেশে তাঁহার উপায় নাই। বরং তিনি কিছু সুদ দিতে প্রস্তুত আছেন!

নরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি ত জান মেজদা, টাকা ধার দেওয়া আমার ব্যবসা নয়। তা'ছাড়া এত টাকা পাব কোথায়? আর টাকা থাকিলেও, জুয়া খেলিয়া যাহারা টাকা হারে, তাদের দেওয়াও উচিত নয়।"

ভূপেশচন্দ্র কাতরভাবে বলিলেন, "ভাই, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর। বড়ই বিপদে পড়িয়াছি"

নরেশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে হইবে না। কি করিব বল, আমি অপারগ।"

ভূপেশ বলিলেন, "খালিহাতে আমি তোমাকে টাকা ধার দিতে বলিতেছি না। তোমার মেজবৌদি'র খানকয়েক গহনা আমার কাছে আছে। সে গহনা আর পরিবে কে বল? তিনি ত এ জগতে নাই। সেই গহনাগুলি রাখিয়া তিনশ' টাকা আমায় দাও। অন্যত্র সুদ লাগিবে; এবং এখনই বা পাই কোথায়? তোমার কাছে থাকিলে পরে ফিরিয়া পাইতে পারি।"

"গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা আমি করি না। ও সব আমি পারিব না।"

দুই হস্তে কনিষ্ঠের করযুগল গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ অনুনয়পূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "নরেশ, আমার মান ইজ্জৎ এ যাত্রা রক্ষা কর ভাই।"

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া নরেশচন্দ্র বলিলেন, "বন্ধক আমি রাখিতে পারিব না। তবে যদি তুমি গহনাগুলি একেবারে বিক্রয় কর, তাহা হইলে বরং চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। ছোটবৌ'র কিছু টাকা আছে; গহনাগুলি তাহাকে দিলেই হইতে পারে।"

ভূপেশচন্দ্রের অলঙ্কারগুলি একেবারে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল না। প্রায় হাজার টাকা দাম! কিন্তু এখন তিনি টাকাই বা পায়েন কোথায়? বিশেষতঃ অন্যত্র রাখিলে যদি পরিণামে উদ্ধার না করিতে পারেন অল্প টাকায় সবই চলিয়া যাইবে। তাহার চেয়ে যদি ভাই সে গহনাগুলি লয়, বংশেই থাকিবে। সেটা মন্দের ভাল নহে কি?

তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন।

(৩)

খুল্লতাতের ঠোঙ্গাতৈয়ার কার্য্যে সহায়তা করা সত্ত্বেও অনিলচন্দ্র যথাসময়ে এফ, এ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ পড়িতেছিল। নরেশচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন; দেশের লোক ইহাতে প্রথমে কিছু বিস্মিতই হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর তাহারা ইহার মূল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। ছেলের দর বাড়াইতে গেলে বাহিরের চাকচিক্যও থাকা চাহি!

দরও দিন দিন বাড়িতেছিল। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির ঘ্যানঘ্যানানীতে নরেশচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইল। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জনক্ষম না হইলে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিবেন না এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত তাহারা ত মানুষের সঙ্কল্প বুঝিয়া কায করিতে চাহে না। "গরজী কী নহি লাজ!" দর ক্রমশঃ চড়িয়া চলিল। নগদ মূল্য হাজার হইতে ক্রমশঃ আড়াই হাজারে উঠিল। নরেশের জ্যেষ্ঠ শচীশচন্দ্র দিন দিন পুত্রের দরবৃদ্ধির সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন। কনিষ্ঠের কল্যাণে পুত্রটি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে, এজন্য তিনি ভ্রাতার নিকট ঋণী। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অবিলম্বে

পুত্রের বিবাহ দিয়া টাকার তোড়া এবং পুত্রবধূ ঘরে আনেন। কিন্তু কনিষ্ঠের অনভিমতে এ কার্য্য করিবার সাহস ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাহাকে ক্ষুন্ন করিলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। এ জন্য কেহ তাঁহার নিকট বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে তিনি বলিতেন, "ও সব কিছুই জানি না; আপনারা ভায়ার কাছে পত্র লিখুন; কিংবা কলিকাতায় যা'ন। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে।"

দেশের অন্যতম জমীদার হরিশঙ্কর গুহ লোক মারফতে পাত্রের দর তিন হাজার, বলিয়া পাঠাইলেন। নরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অনিলের ন্যায় পাত্র কি চৌধুরীমহাশয় এত সস্তায় পা'বেন? বি, এ, পড়া পাত্র কি নগদ তিন হাজারে বিকায়?"

চৌধুরী মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন যে, দুই হাজার টাকার গহনা দিবেন?

ঈষৎ হাসিয়া নরেশচন্দ্র সংবাদ-বাহককে বলিলেন, "মোটে দুই হাজার টাকার গহনা?"

"বরাভরণ বরসজ্জা প্রভৃতিতেও তিনি আরও হাজার বার শত টাকার জিনিস দিবেন।"

নরেশচন্দ্র বলিলেন, "এত সস্তায় রামরূপ বসুঠাকুরের বি, এ, পড়া পৌত্রকে জামাতা করা তাঁহার ঘটিবে না।"

নরেশের জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের এমন বিষয়বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনিলচন্দ্রের যে এত দর উঠিতে পারে তিনি কোন দিন স্বপ্নেও তাহা অনুমান করেন নাই।

তিনি দীর্ঘ পত্রের শেষে লিখিলেন, "অতি চমৎকার চাল চালা হইয়াছে। ভাল দরে অনিলের বিবাহ দিতে পারিলে অর্দ্ধেক তোমার।"

নরেশচন্দ্র দাদার সরল ও সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া হাসিলেন। কিন্তু কন্যাপক্ষ হইতে কেহই সহজে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সকলেই বুঝিল; দর আরও না চড়িলে নরেশচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিবেন না।

(৪)

কোথাও টাকার কিনারা করিতে না পারিয়া বিপন্ন ব্রজগোপাল ঘোষ স্বগ্রামনিবাসী নরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার এমন কোন পরিচিত লোক ছিল না যে দেশের পৈত্রিক বাড়ী বন্ধক রাখিয়া

তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা ধার দেয়। অথচ টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই চাহি। ২রা আষাঢ় কন্যার বিবাহ। আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী আছে।

ধীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া নরেশচন্দ্র নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন, "টাকা পা'ব কোথায়, মশায়? আমি ত টাকার গাছ নহি! আর থাকিলেও ধার দেওয়াটা আমার মতের বিরুদ্ধ। সুতরাং মাপ করিবেন ।"

দরিদ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "আপনি মহৎ বংশের সন্তান, স্বয়ং মহাশয় ব্যক্তি; আপনি দয়া না করিলে আমার জাতি যাইবে। অতি কষ্টে পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছি; আর পাঁচ শত হইলে, কোনরূপে কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিতে পারি। অমার দেশের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া আমাকে এ কন্যাবিপদ হইতে উদ্ধার করুন।"

বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। অব্যক্ত বেদনার যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু নরেশচন্দ্রের পাষাণ হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি নিতান্ত নির্ম্মমের ন্যায় বলিলেন, "কেন অনর্থক কষ্ট করিতেছেন। আমি আমার মতের বিরুদ্ধে কখনও কোন কায করি না। যাহা আমি ভালবাসি না এমন কায জীবনে কখনও করিব না। এ বিষয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক আর আলোচনা না করিলে সুখী হইব।"

ঘোষ মহাশয় নতনেত্রে সব কথা শুনিলেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া একবার ঊর্দ্ধপানে চাহিলেন। নীল শূন্যে কোথাও আশার আলোক-রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল কি?

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর নরেশচন্দ্র মৃদু স্বরে বলিলেন, "আপনার কন্যাটি দেখিতে কেমন?"

ভগ্নস্বরে ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "দরিদ্রের কন্যা রূপের ডালি হইলেও কি লোক তাহা দেখে, নরেশ বাবু? অবস্থার অনুপাতেই লোক রূপ ও গুণের বিচার করে। আমি অতি দরিদ্র, আমার কন্যা ধনীর দৃষ্টিতে সুন্দর দেখাইবে কি না জানি না।"

"এক কায করুন। আপনি যে পাত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, সে ত মূর্খ, শুনিলাম; ঘরেও বিশেষ কিছু সংস্থান নাই। অথচ তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিতে হইবে। আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা আছে। রামচরণকে জানেন ত? সে এখনও অবিবাহিত। যদিও সে মূর্খ বটে, তবু মোটা অন্নবস্ত্রের কষ্ট কোন দিন পাইবে না। তাহার সহিত আপনার মেয়ের

বিবাহ দি'ন। আমি আদেশ করিলে সে বিবাহ করিবে। আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না। গহনা পর্য্যন্ত যাহাতে না দিতে হয় সে ব্যবস্থাও আমি করিব। শুধু গুটিদশেক বরযাত্রী আসিবেন। বলুন, তা' হলে এই ২রা আষাঢ়ই দিন স্থির করি। পাত্র ত আপনার পূর্ব্বে দেখাই আছে। রাজি আছেন?

ব্রজগোপালের নৈরাশ্যম্লান মুখমণ্ডল সহসা জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আনন্দবিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু তাঁ'রা কি বিনা অর্থে সম্মত হ'বেন?"

"সে ভার আমার উপর। তবে আপনার কন্যাকে একবার দেখিতে হইবে। বলেন ত আজ বৈকালেই দেখিয়া আসি। কন্যাটি যদি সুন্দরী হয়, কোন বাধা হইবে না।"

ঘোষ মহাশয়ের চিন্তাশীর্ণ মুখমণ্ডল সত্যই আজ আশার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যে পাত্রের জন্য তিনি দরিদ্রের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি পৈত্রিক বাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধক দিতেছিলেন, তাহার তুলনায় প্রস্তাবিত পাত্রটি উৎকৃষ্ট না হইলেও হীন নহে। বিশেষতঃ একরূপ বিনাব্যয়েই এ বিবাহ হইয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার মত অবস্থায় লোকের আর কি হইতে পারে?

ঘোষ মহাশয়ের আনন্দ দর্শনে নরেশচন্দ্রের অন্তরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল কি না বুঝা গেল না। তবে ব্রজগোপালের বিদায় গ্রহণের পরেই তিনি পুনরায় নিবিষ্ট মনে কাগজ লইয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার করিতে বসিলেন। খানিকটা সময় বৃথা গেল। নরেশচন্দ্র দ্রুততর বেগে কায করিতে লাগিলেন।

(৫)

বিনা পণে, একরূপ বিনা খরচায় এই ভয়ঙ্কর বেচাকেনায় যুগে কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিতে পারিতেছেন, সুতরাং ঘোষ মহাশয় অবস্থার অনুযায়ী একটু আয়োজনও করিয়াছিলেন। দরিদ্রেরও ত আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান আছে?

আলোকিত বিবাহবাটীর প্রাঙ্গণে কন্যাযাত্রিগণ সন্ধ্যার পর একে একে সমবেত হইলেন। তখনও বর আইসে নাই। রাত্রি ৯টায় লগ্ন। কিয়ৎ কালপরে নরেশচন্দ্র অনিলচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া সভাপ্রাঙ্গণে দেখা দিলেন; ঘোষ মহাশয়কে বলিলেন, রাত্রি সাড়ে সাতটার গাড়ীতে তাঁহার অগ্রজ-

যুগল পাত্র ও কয়েকটি আত্মীয়সহ কলিকাতা পৌঁছিবেন। কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই। এইজন্য তিনি অগ্রেই আসিয়াছেন।

ব্রজগোপাল সযত্নে নরেশচন্দ্রকে বসাইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ এত সহজে মুক্তি পাইবেন! কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধের হৃদয় ভরিয়া'উঠিয়াছিল।

এমন সময় কয়েক ব্যক্তি সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। অগ্রজদ্বয়কে দেখিয়া নরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। ঘোষ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "বর আসিতেছে!"

কথাটা তাড়িতগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; অমনই হুলুধ্বনি ও শঙ্খরোল বিবাহবাটী মুখরিত করিয়া তুলিল।

শচীশচন্দ্র নিম্নস্বরে বলিলেন, "এ কি নরেশ? টেলিগ্রামে কোন কথা খুলিয়া লেখ নাই; শুধু, 'আজ বিবাহ হইবে, চলিয়া আসিবে। ৩৫ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বিবাহ। এত ছেলে খেলা নহে?' তোমার—"

নরেশচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দাদা!"

শচীশ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন ভ্রাতার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রমাদ গণিলেন; কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন।

"আমি কি পাগল? আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয়?"

ঘোষ মহাশয় দেখিলেন, আগন্তুকদিগের কেহই বরাসন অলঙ্কৃত করিল না। তখন তিনি মনে মনে একটু অস্থির হইয়া উঠিলেন। কন্যাপক্ষীয়-গণও বিস্মিত হইলেন। ব্রজগোপাল দ্রুত গতিতে নরেশের কাছে আসিয়া বলিলেন, "নরেশ বাবু, বর কই?"

"ব্যস্ত হইবেন না। বর আসিতেছে। আপনি সমস্ত আয়োজন করুন।"

সে দৃঢ় গম্ভীর স্বরে ঘোষ মহাশয় আশ্বস্ত হইলেন।

শচীশচন্দ্র নিম্ন স্বরে বলিলেন, "শেষে মরা গরীব ব্রজবাবুর কন্যার সহিত—"

বাধা দিয়া নরেশ বলিলেন, "এত দিন বিশ্বাস রাখিয়াছ, কোন অন্যায় দেখিয়াছ কি? তবে আজ কথা বলিতেছ কেন? আমি কৃপণ হইতে পারি, কিন্তু নির্ব্বোধ ত নই!"

জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "রাগ করো, না ভাই, তোমার জন্যই ত আমাদের সব। যা' ভাল বুঝ কর।"

নরেশচন্দ্র ব্রজগোপালকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি বর সভাস্থ করুন।"

কন্যাকর্ত্তা চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু রামচরণ কই? বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তিনি নরেশচন্দ্রের পানে চাহিলেন।

গম্ভীর ভাবে নরেশ ডাকিলেন, "অনিল!"

নতমস্তকে ভ্রাতুষ্পুত্র খুল্লতাতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ব্রজ বাবু, এই আপনার কন্যার পাত্র। ভয় নাই, অশাস্ত্রীয় কোন কায হয় নাই। অনিল সারাদিন উপবাসী আছে। শাস্ত্রীয় আচার সমস্তই পালন করা হইয়াছে। আপনি উহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করুন।"

ঘোষ মহাশয় কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ কি সম্ভব, বিশ্বাসযোগ্য? তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন না ত? এ যে দরিদ্রের কোহিনুর লাভের মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ঘটনা!

"বেহাই, আর দাঁড়াইয়া কেন? লগ্ন উপস্থিত। দাদা, তুমি অনুমতি দাও।"

বরকে পট্টবস্ত্র পরাইয়া পরামাণিক বিবাহের আসরে লইয়া গেল। তখন চারি দিক হইতে দ্বিগুণ উৎসাহে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

"ব্রজ বাবু, আপনার সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যাটিকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অনিলের জন্য অনেক সম্বন্ধ আসিয়াছিল; কিন্তু এমন মেয়ে বোধ হয় কোথাও পাইতাম না। এ বিষয়ে সকলের সঙ্গেই আমি একটু লুকাচুরী করিয়াছি। সেটা আমার স্বভাব। সে অপরাধ আপনারা সকলেই অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। এই বেচাকেনার দিনে দরদস্তুর করিতে অনেকেই ভালবাসেন; কিন্তু আমি কৃপণ হইলেও, বেচাকেনার মধ্যে নাই। সেটা আমার বংশের, পিতৃপুরুষের অপমান। এজন্য এতটা গোপনে আমায় কায করিতে হইয়াছে। আগে সংবাদ পাইলে অনেক ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মা আমার স্নেহের অনিলকে কিনিবার জন্য টাকার প্রলোভন দেখাইতেন। হয়ত বা সে প্রলোভন দমন করিতে পারিতাম না। তাই এই লুকাচুরীর অভিনয়। তবে দাদা হয়'ত নিজেকে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তা' সে ব্যবস্থাও আমি করিয়াছি।"

নরেশচন্দ্র পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিলেন। তাহার পর একখানি রেজেষ্ট্রীকরা দলিল জ্যেষ্ঠের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আজীবন কষ্ট করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ অনিলের বিবাহে যৌতুক

দিলাম! দাদা, তুমি অনিলের বিবাহ দিয়া বোধ হয় কোন দিন বিশ হাজার টাকা পাইতে না?"

তাহার পর ভূপেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া নরেশচন্দ্র বসিলেন, "মেজদা, তোমার স্ত্রীর গহনাগুলা ঘোড় দৌড়ের পেছনেই যাইত। নিষ্ঠুরের মত তখন তোমার কাছ থেকে সেগুলি কিনে নিয়েছিলাম, আজ সেগুলি অনিলের স্ত্রীকে দান করিলাম! তোমারও ছেলে মেয়ে নাই, আমিও অপুত্রক। অনিল বাঁচিয়া থাক্, বংশের নাম বজায় থাকিবে। এর চেয়ে বড় কামনা আমার কোন দিন ছিল না। আমার ব্যবহারে হয়ত তোমাদিগকে বিরক্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু আজ এই শুভদিনের আনন্দে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

বিস্ময়মুগ্ধ জনতা নরেশচন্দ্রের কথা সাগ্রহে শুনিতেছিল। বিবাহের লগ্ন যে উপস্থিত, সকলেই সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। নরেশচন্দ্র বলিলেন, "বেহাই, কায আরম্ভ করিয়া দিন, শুভক্ষণ চলিয়া যাইতেছে যে!"

চারি দিক হইতে একটা বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস যেন সভাপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া দিল। শঙ্খ দ্বিগুণ রোলে ধ্বনিত হইল!

জ্যেষ্ঠ প্রাণপণ আবেগে কনিষ্ঠকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "দলিল তুমি কাছে রাখ, ভাই। অনিলের বাপের কায তুমিই করিয়াছ। আমার টাকায় প্রয়োজন নাই। আমরা কেহ তোমাকে এত দিন চিনিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়াছি। তুমিই আমাদিগকে ক্ষমা কর, ভাই।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পূর্ব্বসংস্কার।

দেহ হতে দেহান্তরে করিয়া ভ্রমণ,
লয়ে যায় জীব সাথে পূর্ব্বের সংস্কার;
কুসুমে কুসুমে ভ্রমি' যেতে সমীরণ
যেমতি গ্রহণ করে সুরভি তাহার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

সাধনা।*

'সাধনা' একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ। আজকালকার সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে সচরাচর যে শ্রেণীর সন্দর্ভগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, 'সাধনা' সে শ্রেণীর গ্রন্থ নহে। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা ও স্বদেশী-সাধনাসম্পর্কে অনেক আবশ্যক কথাই এই গ্রন্থখানিতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের অদৃষ্টবৈগুণ্যে আজকাল ইহা গ্রন্থের একটা বিশেষ গুণ বলিয়া পরিগণিত। কারণ, বহু গ্রন্থেই—প্রায় পৌনে ষোল আনা-সন্দর্ভ গ্রন্থেই—ঐ গুণটির অত্যন্ত অভাব জন্মিয়াছে। আমাদের দেশের লোক,—কি জানি কাহার অভিশাপে,—নিজে কোন বিষয় ভাবিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিবার যোগ্যতা লাভের পূর্ব্বেই গ্রন্থকার হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন; ফলে পঠদ্দশায় তেল খরচ করিয়া যে পরকীয় সিদ্ধান্তগুলি স্বতিসাৎ করেন,—পরিপাক করিবার পূর্ব্বেই সেগুলি উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলেন। ঐ উদ্গার মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় গ্রন্থাকারে পরিণত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ঐ শ্রেণীর নহে,—ইহাই অত্যন্ত সুখের বিষয়। ইহাতে লেখকের মৌলিকতার ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রন্থাকার শ্রীযুত বিনয়-কুমার সরকার এম, এ, মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র ও অধুনাতন শিক্ষিত সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। দেশের বড় বড় সমস্যাগুলির সম্বন্ধে তিনি যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে সকলে যে একমত হইবেন এরূপ আশা করা যায় না। তবে তাঁহার চিন্তা-পদ্ধতি যে পাঠকের মনে নূতন নূতন চিন্তা জাগাইয়া দেয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চিন্তাশীলতার ইহাই লক্ষণ।

মিল, স্পেন্সার, হাক্সলী, হেকেল, রুসো, হেগেল, ডার্ব্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি প্রতিভাশালী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিনয় বাবুর চিন্তাশক্তির উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছেন ইহা তাঁহার 'সাধনা' পাঠ করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, সেই চিন্তাস্রোতে

* সাধনা—শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত; কলিকাতা, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে চক্রবর্ত্তী চট্টোপাধ্যায় কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

তিনি একেবারে ভাসিয়া যায়েন নাই। পাশ্চাত্য চিন্তার খরস্রোতায় পড়িয়াও তিনি তাঁহার নিজস্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির অস্থি মজ্জায় হিন্দুভাব অনুপ্রবিষ্ট। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মার্টিনো বা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের পরামর্শ তত বেশী না ল'য়ে নিজেদের ঘরের মহাত্মাদের পথ অবলম্বন ক'রে দেখ, কোন্ পথে যাওয়া যায়।" (৭ পৃষ্ঠা) বর্ত্তমান কালে, এই পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবন-পীড়ন-সময়ে, এই কথার যে মূল্য আছে, তাহা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তিনি কেবল এই কথা কয়টি বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কেহ শুষ্ক উপদেশ শুনিতে চাহেন না। সমাজের ও দেশের উপকার করিতে হইলে তোমার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিতর্কের পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নতুবা লোক উহা উপহাসে উড়াইয়া দিবে। সেই জন্য বিনয় বাবু তাঁহার সন্দর্ভগুলিতে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, —"প্রত্যেক দেশের, জাতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সেই সেই নিয়ম মেনে চল্‌তেই হবে। সকল সমাজের প্রকৃতি এক নয়—এজন্য সকলের ব্যবস্থাও এক নয়। এক সমাজের নিয়ম আর এক সমাজের হানিকরও হতে পারে। যার যেখানে প্রাণ সেখানটা খুঁজে বের করে তবে কাজ করা উচিত। স্বাতন্ত্র্যটা কোথায়,—কোন্ বিষয়ে কোন্ কাজে লুকিয়ে আছে, এটা ঠিক না কর্‌তে পার্‌লে সকল শ্রমই পণ্ড হয়ে যায়। আমড়া গাছে আমের জন্য উৎসুক হয়ে থাক্‌লে যেরূপ হয়,—প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি ও সমাজের কাছে নিবৃত্তির নিদর্শন আশা কর্‌লেও সেইরূপ ফললাভ হয়"। (৯ পৃষ্ঠা) বিনয় বাবু এই উপলক্ষে বৈদেশিক মনীষীদিগের দোহাই দিয়াছেন সত্য,—কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্দর্ভের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই,—বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ আমরা এখন আমাদের মন ও বুদ্ধিকে য়ুরোপের কাছে একেবারে বিকাইয়া দিয়াছি। সুতরাং এখন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে হইলেও য়ুরোপীয়ানের সাহায্য আবশ্যক। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "যে ব্যক্তি শ্মশানভূমির অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে,—শ্মশানের মৃত্তিকায় পদন্যাস না করিয়া তাহার আর গৃহে ফিরিবার উপায় থাকে না।" অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে ঘরে ফিরিবার সময়

শ্মশানের অস্থি, মাংস, বসা, অঙ্গারবিকীর্ণ পূতিগন্ধময় স্থানে পদক্ষেপ করিতে করিতে তবে শ্মশানভূমি উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নতুবা সে ঘরে ফিরিতে পারিবে না। তবে তাহার মুখ যদি ঘরের দিকে ফিরে, তাহা হইলে সে ঘরে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। বিনয় বাবু আমাদের দেশের লোকের মুখ দেশের দিকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাটি মুনি ঋষির ভাষা নহে বটে,—তাঁহার যুক্তি আর্ষ যুক্তি নহে সত্য,—কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেত স্পষ্টই মুনিঋষিগণের মহিমময় পর্ণ-কুটীরের দিকে নির্দ্দিষ্ট। তাঁহার হৃদয় হিন্দুভাবে পরিপ্লুত তাই তিনি বলিয়াছেন ;—

"এখন বুঝেছি ইউরোপ ও ভারত ঠিক এক পথের পথিকও নয়—গন্তব্য স্থানও এক নয়। সুতরাং সকল বিষয়ে নকল করাতে সুফলের আশা করা বৃথা। ইউরোপের মন বাহ্য বস্তুর দিকে। ইহার সভ্যতা ও আদর্শ স্থূল জগতের অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সহিত জড়িত। অর্থ ইহার মূল—সংসারের পার্থিব উন্নতিই চরম লক্ষ্য। এজন্য প্রতিযোগিতা, জীবনসংগ্রামের প্রকোপ এত বেশী, আর শিল্প বাণিজ্য কলকারখানার এত সমাদর। তাই জড়বিজ্ঞান ইউরোপে এত উন্নত। আর টাকা কড়ির ঝনঝনানি এত বেশী ব'লে, হৃদয়ের কোমল ভাব একেবারে নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মাথা খাটিয়ে দেশের কাজে একটা অনুরাগের (public spirit) আবির্ভাব করা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তা'তে হৃদয়ের গন্ধ মাত্র থাকে না। স্বদেশ-হিতৈষিতা ওঁদের কাছে মাতৃপ্রেম নয়, মনোবিজ্ঞানের সৃষ্ট একটা কেটো নীরস ধারণামাত্র (abstract conception) আর এজন্যই ওঁদের সমাজে সমতা নাই। একদিকে যেমন ধনাঢ্য লক্ষপতি, অপরদিকে অসংখ্য ধনহীন পরিশ্রমজীবী। আবার বিজ্ঞান ইউরোপকে বাহ্য জগতের 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা' করে দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ বাহ্য জগতের 'কেনা গোলাম' হয়ে পড়েছে। তড়িৎ ও বাষ্পের শক্তি সঞ্চালন ক'রে দেশ কালকে একেবারে খর্ব্ব ক'রে ফেল্‌লেও ইহাদেরই বশে থাকায় পরমাত্মার বিষয় ভাবনা ইহাদের একেবারে লোপ পেয়েছে। 'আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির' চেষ্টা ইঁহাদের কাছে পাগলামী বলে বোধ হয়।

"ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আদর্শ ঠিক বিপরীত। সাহিত্য শিল্প সমাজ আচার ব্যবহার রীতি নীতি সকল বিষয়েই এক ভিন্ন ভাবের চিহ্ন পাওয়া

যায়। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' আর আত্মবশই যে সুখ এ ভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত। এজন্য বাহিরের জিনিষের প্রতি মন যাতে বিশেষ আকৃষ্ট ও আসক্ত না হয়, হিন্দুসমাজ সর্ব্বদাই এই চেষ্টাই ক'রে এসেছেন। ধর্ম্মই এ সভ্যতার মূলে। এখানে ইউরোপের প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় না,—সহানুভূতি, প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও একাগ্রবর্ত্তিতাই এদেশের প্রথা। ব্যবসা বাণিজ্যেও তাই। এজন্য অর্থের প্রতি এত অনাদর ব'লেই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই এবং রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের প্রয়োজন বোধ হয় নাই।"

সরকার মহাশয় প্রাচী ও প্রতীচীর যে পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে কোনও চিন্তাশীল হিন্দুই আপত্তি করিতে পারেন না। প্রতীচী হইতে ভাবসাগরের যে তরঙ্গরাশি প্রাচীর,—বিশেষতঃ ভারতের, বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হিমগিরির পাদমূলে অভিঘাত করিতেছে,—তাহাদের প্লাবনে ভারতীয় ভাব যে বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই নাই। পাশ্চাত্য ভাবের এই প্লাবন রুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব কিন্তু যাহাতে এই বিজাতীয় ভাবের বন্যায় আমাদের কৌলিক বিশেষত্বের বনিয়াদ পর্য্যন্ত ভাসিয়া না যায়,—বর্ণাশ্রমী হিন্দুদিগের এখন তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দু জাতির ধর্ম্মভাব কখনই লুপ্ত হইবে না, তবে যাহাতে উহা বিপর্য্যস্ত বা বিকৃত না হয়, তাহার ব্যবস্থা একান্তই বাঞ্ছনীয়। ইহাই হিন্দুর কথা। কিসে সেই ব্যবস্থা হইতে পারে, হিন্দু সমাজের তাহাই বিশেষ ভাবে আলোচ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদিগের বালকবালিকাদিগকে আমাদেরই ধাতুর অনুকূল ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধাতু বিগড়াইয়া দেয়, সে শিক্ষা কুশিক্ষা,—সুতরাং তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যজ্য। তাই বিনয় বাবু জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ও জাতীয় বিদ্যালয় পত্তনের অনুকূলে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুচিন্তিত সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ইহাতে বিনয় বাবুর আন্তরিকতা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ধর্ম্মই আমাদের সমাজের মূল ভিত্তি, সুতরাং ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং অত্যন্ত দৃঢ় হয়, এই ইচ্ছা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—"অর্থের প্রতি লালসা কমিয়ে স্বার্থ ত্যাগের পথ যেমন আবিষ্কার করে দিতে হবে—তেমনই চারি বর্ণের ভিতর সামাজিক কাজ কর্ম্মে যে অর্থ পৈশাচিকতার ভাব ঢুকেছে তাও নিবারণ করতে হবে। আবার

আমাদের ধর্ম্মে যে বিদেশীয় ভাব ঢুকে নৈতিক ও মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে সমাজের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে তারও প্রতিকার কর্‌তে হবে। জ্ঞান ও তর্কের কচকচানি, অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতার পরিবর্ত্তে আমাদের সনাতন ভক্তি ও প্রেমের ধ্বজা উড়াতে হবে।" "যদি সমাজের পূর্ব্ব পুরুষদের মহিমা ও কাহিনী কীর্ত্তিত হ'তে থাকে—যদি আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের অপমান ও লজ্জার ছবি না হয়ে আমাদের কাছে গৌরবের জিনিষ হয়, যদি আমরা নিজেদের মহাপুরুষগণকে যথোচিত সম্মান করতে শিখি, তবে আর কেবল নুন চিনি কেন—ক্রমশঃ সকল বিষয়ে আমরা খাঁটি স্বদেশী হতে পারব—সে আর সন্দেহ নাই।" ইহা হিন্দুর কথা। বিনয় বাবু বলিয়াছেন, "আত্মার উন্নতিই প্রত্যেক জীবের চরম লক্ষ্য।" "প্রত্যেকেই জন্মেছে—নিজের শেষ লক্ষ্য যত দিন না সাধিত হয়, ততদিন আবার জন্মাবে।" "এই পরিবারের ভার গ্রহণ ক'রে মানুষ ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতি লাভ কর্‌তে পারে বলেই পারিবারিক জীবনের দরকার। যখন দেখা গেল পরিবারই মুক্তি-পথের কণ্টক হ'য়ে পড়েছে, তখন ও বন্ধন ছিঁড়ে ফেল্‌লে কোনও দোষ হয় না।" হিন্দু না হইলে,—হৃদয় হিন্দু-ভাবে ভরপূর না থাকিলে এ কথা এমন ভাবে কেহ বলিতে পারে না। তবে বিনয় বাবু সংসার ধর্ম্ম মোক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহার উপদেষ্টা আমি কখনই হইতে পারি না। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলবার আমার অধিকার নাই।" এই অজুহতে যাঁহারা বিনয় বাবুর উপর অহিন্দুত্বের অভিযোগ আরোপিত করেন তাঁহাদের যুক্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত।

বিনয় বাবু জাতীয় শিক্ষাব্যাপারে এই কয়টি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক বলিয়াছেন,—

(১) স্বার্থ-ত্যাগ (২) বিলাস-বর্জ্জন ও অভাব-দমন (৩) সংযম-শিক্ষা (৪) স্বাবলম্বন-শিক্ষা (৫) ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উন্মেষ (৬) কষ্টসহিষ্ণুতার ও কঠোরতার অনুশীলন, এবং (৭) চরিত্রবল অর্জ্জন। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধন করা যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। "মানুষ ঠিক কোন্ পথ দিয়ে অগ্রসর হ'লে জন্ম জন্মান্তরে চরমে মুক্তি লাভ করিতে পারে—আর জন্ম-বন্ধনে বাঁধা না পড়ে, আমাদের সমাজ তা'র চেষ্টা করেছেন। আমাদের শাস্ত্রকারগণ মানুষের মনের ও শরীরের গতি অনুসারে বৃত্তি সকলের বিকাশানুযায়ী—তার কি কখন শ্রেয় ও প্রেয় হয় এই বিষয় অত্যন্ত

বিচক্ষণতার সহিত বুঝে মনুষ্য জীবনের চারি আশ্রম সৃষ্টি করেছেন।" এই শিক্ষা যে বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়, তাহা নিশ্চয়ই আদর্শ হিন্দু বিদ্যালয়। "গৃহস্থের ঘর ভোগের আড্ডা বটে—কিন্তু তার নিজের কপালে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ। যে যেস্থানে আছে—অতিথি ব্রাহ্মণ পশু পক্ষী—সকলকে দান ক'রে অবশিষ্ট যা থাকবে গৃহস্থের অধিকার কেবল সেটুকুতে।" হিন্দুর এই অমূল্য উপদেশ যে সকল শিক্ষক ছাত্রদিগের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থ তাঁহারাই আদর্শ শিক্ষক। সুতরাং বিনয় বাবুর কল্পিত বিদ্যালয় যে হিন্দুর সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিষয়ে একটা বিশেষ কথা আছে। জাতীয় বিদ্যালয় যাহাতে কোনরূপ রাজনীতিক ব্যাপারে বিজড়িত না হয়, সে দিকে প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা যে সময়ে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করেন সেই সময় দেশে রাজনীতিক বিক্ষোভ প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অর্থনীতিক স্বদেশীর সহিত রাজনীতিক বয়কট আসিয়া যোগ দিয়াছিল। সে সময় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ছিল, নেতৃবর্গ সে সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। ফলে আজ জাতীয় বিদ্যালয়গুলি রাজরোষে পতিত হইয়াছে, এ কথা অনেকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের সহিত রাজনীতিক অবস্থার কোনও সম্বন্ধ নাই,—সম্বন্ধ রাখাও সমীচীন নহে—বিনয় বাবু সে কথা তাঁহার সন্দর্ভের কোনও স্থানে বলেন নাই, ইহা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। অনুষ্ঠান বিশেষের উপর কোনও অভিযোগ আরোপিত হইলে,—সেই অভিযোগ সমূলকই হউক আর অমূলকই হউক, তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

'হিন্দু ও মুসলমান' শীর্ষক সন্দর্ভে গ্রন্থকার অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ হয় না, হইতে পারে না। স্বার্থ লইয়াই দুই সম্প্রদায়ে বিবাদ বাধে। স্বার্থ লইয়া হিন্দুর সহিত হিন্দুর এবং মুসলমানের সহিত মুসলমানেরও বিবাদ দাঙ্গা মারামারি ও কাটাকাটি হয়। মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার হইলে বিবাদ মিটিয়া যাইবে। 'নিম্ন শ্রেণীর অধিকার' সন্দর্ভটি সুন্দর, কিন্তু নাম-করণ ঠিক হয় নাই। নাম শুনিয়া পল্লবগ্রাহী লোকরা না পড়িয়াই উহা বিলাতী 'সোস্যালিস্মের' উদ্গার বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ

তাহা নহে। গ্রন্থকার নিম্ন শ্রেণী বলিতে massই বুঝিয়াছেন। যাহা হউক তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, সমাজের সর্ব্বস্তরে শক্তিসঞ্চার না হইলে,—সকল জাতি উন্নত না হইলে, দেশের উন্নতি সম্ভবে না। যাহাদিগকে তিনি শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরেজীজানা বলিয়াছেন, তাহাদের চরিত্র অনেকটা অবনত এ কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর সহানুভূতির বন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয়, তিনি কেবল তাহারই ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের অনেক গুণ বর্ত্তমান। তাহাদের সামর্থ্য-আছে, আত্মনির্ভরতা আছে, তাহাদের মধ্যেই আমাদের দেশের সনাতন আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং দেশের ও দশের কাযে তাহাদের সাহচর্য্য গ্রহণ আবশ্যক,—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এ কথা বলিলে পাশ্চাত্য সমাজ-তন্ত্রবাদের একাকার সমর্থন করা হয় না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই সন্দর্ভের বক্তব্যগুলি বিনয় বাবু আরও একটু পরিস্ফুট করিলে ভাল করিতেন। 'আমাদের কর্ত্তব্য' প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। তবে তিনি কর্ত্তব্যসম্বন্ধে যেমন বিষদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন,—কর্ত্তব্য সাধনের পথে বাধাসম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা করেন নাই। আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা কেহ কেহ বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও তাঁহারা সম্যকরূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালন-পথে কি প্রবল বাধা বর্ত্তমান, কি প্রকারে সেই বাধা সরিয়া যাইতে পারে, তাহার যথেষ্ট আলোচনা এই সন্দর্ভে নাই। কিন্তু সেই আলোচনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। 'নেতৃত্ব' সন্দর্ভে নেতাদের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য বর্ত্তমান। আমাদের দেশের এই মাটীতেই পূর্ব্বে অনেক মহাপ্রাণ লোকনায়ক জন্মিয়াছেন, এখন আর জন্মিতেছেন না,—ইহার কারণ কি তাহা না বলাতে সন্দর্ভটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি আভাসে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট, উহার বিশদ আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। 'আমাদের জাতীয় চরিত্র' সন্দর্ভটি সকলেরই বিশেষ ভাবে আলোচ্য।

সরকার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন একটি সন্দর্ভে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবে না। তাঁহার সন্দর্ভে ভাবুকতা যথেষ্ট আছে। আমরা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই উহা পড়িতে অনুরোধ করি। এই সন্দর্ভগুলির সহিত তাঁহারা যে সর্ব্বত্র

একমত হইবেন, এ কথা আমি বলি না। তবে চিন্তা চিন্তাকেই 'উস্কাইয়া' দেয়। এক বিধ চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিধ চিন্তা জাগাইয়া তুলে।

ম্যাক্সমুলারের হিবার্ট বক্তৃতা অবলম্বনে অধ্যাপক সরকার মহাশয় 'ধর্ম্মের প্রকৃতি—অসীমের উপলব্ধি' শীর্ষক একটি সন্দর্ভ লিখিয়া উহা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই সন্দর্ভটিতে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মতের ও সসীম ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অসীমের উপলব্ধি সম্ভবে কি না তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিচার আছে। এই সন্দর্ভে বৈদেশিক মত বিশেষরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে! এ সন্দর্ভে লেখকের নিজস্ব যে কিছুই নাই তাহা আমরা বলি না। তবে তাহা এত সামান্য যে, গণনার মধ্যেই আইসে না। আমরা এইরূপ সন্দর্ভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। তবে গ্রন্থকার যদি সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তের আভাস দিয়া উভয়ের তুলনায় সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে সন্দর্ভটির গৌরব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইত। এ সন্দর্ভে পাঠক বৈদেশিকদিগের ধর্ম্ম-সম্পর্কিত চিন্তা-পদ্ধতির একটু আভাস পাইবেন। বিনয়বাবু অতি সাবধানে উক্ত বক্তৃতার মর্ম্মাভাস দিয়াছেন। 'ভাষাবিজ্ঞান' রচণাতেও প্রতীচ্যভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত। ইহাতে অনেক সার কথা—ভাবিবার কথা,—আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়া সরকার মহাশয় সাহিত্যসেবীদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজস্ব কিছুই না থাকিলেও ঐ জাতীয় চিন্তার সহিত তিনি যে বাঙ্গালী পাঠককে পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন,—তাহাতেই তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সকলেই সকল বিষয়ে যে মৌলিক ভাব দিতে পারিবেন,—এরূপ আশা করাও বাতুলতা। সংসারে মৌলিকতা সুদুর্ল ভা। যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যের ভাবরাজ্যের বিস্তারসাধনে সহায়, সাহিত্যে তাঁহাদের আসনও অতি উচ্চে। তবে আমার মনে হয়, লেখক তাঁহার বক্তব্যগুলি অতিমাত্র সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া ভাবকে যেন কতকটা আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা ইংরেজের লিখিত ভাষা-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাঁহাদের এই সন্দর্ভটি বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না; কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী ভাষা-বিজ্ঞান পড়েন নাই,—তাঁহাদের পক্ষে এই সন্দর্ভের দুই একটি স্থান একটু অপরিস্ফুট মনে হইবে। অথচ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের

জন্যই এ প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। 'সাহিত্যসেবী' সন্দর্ভটিতে চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। সামান্য দুই এক স্থলে লেখকের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মতান্তর থাকিলেও আমরা মোটের উপর লেখকের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতিবিষয়ক প্রস্তাবটি আঢ্য ব্যক্তিদিগের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন এখন অসম্ভব। কালের প্রভাব ও কলির প্রভাব পুরাতনকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নূতনের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়াই সেই পুরাতন ব্যবস্থাকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। বিনয় বাবুর মতে সাহিত্যিকদিগকে অনন্যকর্ম্মা করিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ করিবার জন্য জমিদারী বা বৃত্তিদান আবশ্যক। আমাদের সমাজের এখনও সে সময় আইসে নাই। বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা হইলে ভাল হয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বিনয়বাবু তাঁহার গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন,—তাহার বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার প্রত্যেক কথাই দেশের মর্ম্মকথা। এইরূপ মর্ম্মকথার—জীবন-মরণের কথার, আলোচনায় সাহিত্যিকগণ সে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন না,—ইহা নিতান্ত দুঃখের ও বেদনার কারণ। অধ্যাপক সরকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে, ইহা মনে করা বাতুলতামাত্র। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে মতামতের ঘাতপ্রতিঘাত হইলে সত্যনির্দ্ধারণ সহজ এবং বিষয়গুলিও জনসমাজের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে। আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

লেখকের ভাষাসম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার কথোপকথনের চলিত ভাষায় সন্দর্ভগুলি লিখিয়াছেন। এই ভাষায় কোনও কোনও বিষয় লিখিলে সুবিধাও হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহা হয় না। বিশেষতঃ ইহার একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। স্থানভেদে ও সমাজের স্তরভেদে এই কথোপকথনের ভাষা ও বচনভঙ্গী অত্যন্ত বিভিন্ন হয়। শব্দের অর্থও অল্পবিস্তর বিভিন্ন হয়। এমন কি পাঁচ সাত ক্রোশের মধ্যেও ভাষার বিভিন্নতা

দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কথোপকথনের ভাষায় এরূপ সন্দর্ভ লিখিলে লোক উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিনয়বাবু লিখিয়াছেন,—"ভাব ও ধারণার বিষয়ীভূত বিশ্বের বিবিধ পদার্থ যখন চিত্তকে আঘাত করে, তখন মানবের নিকট ইহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রতীয়মান হয়"—ইত্যাদি। "আঘাত করে"—এই ক্রিয়া পদটি বিনয়বাবু যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন,—সে অর্থে বাঙ্গালার কোনও জিলায় উহা ব্যবহৃত হয় কি না জানি না। বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ কথোপকথনের ভাষায়,—উহাদ্বারা প্রহার করা বুঝায়। যে আহত হয় সে বেদনা পায় বা প্রতিকূল শক্তিদ্বারা প্রতিহত হয় ইহাই আমরা বুঝি। আমরা 'শোকাহত' বলি, কিন্তু 'আনন্দাহত' বলি না। তরঙ্গ যখন তরণীর গতি ক্ষুণ্ণ করে তখন আমরা তরণী তরঙ্গাহত হইল বলি। বিনয়বাবু সম্ভবতঃ এ স্থলে ইংরাজী strike কথার তর্জ্জামা করিয়াছেন। It strikes one's imaginaion বলিলে ইহা কল্পনা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে বুঝায়, কিন্তু ইহা কল্পনাশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে বুঝায় না। এ ক্ষেত্রে 'আহত করে' এই বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ ইংরাজী strike কথার বিপরীতার্থই প্রকাশ করিল। সেতারের তারে অঙ্গুলির আঘাত করিলে উহা ঝঙ্কার করে, সেই অজুহতে ইংরেজী strikeকে বাঙ্গালায় টানিয়া আনিলে চলিবে না। সংস্কৃতে 'আহত' শব্দ গুণদ্বারা বিখ্যাত বুঝায়, যথা 'আহতলক্ষণ'। কিন্তু সংস্কৃতের ঐ পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালার কথোপকথনের ভাষায় 'খাপ' খাইবে না। এ ক্ষেত্রে ঐ অর্থও খাটে না। 'আহত' অর্থে গুণিত বা আঘট্টিত বুঝিলে টানিয়া টুনিয়া বিনয় বাবুর ভাষা সমর্থিত করা যায় বটে;—কিন্তু ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ,—বিশেষতঃ কথোপকথনের ভাষায় ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ নিতান্তই দূষ্য। উহা ভাষাকে নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলে। বিনয় বাবুর মত চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি কথোপকথনের ভাষায় ইংরেজী শব্দের ঐরূপ তর্জ্জমা মিশাইয়া একটা 'জগাখিচুড়ী' পাকান, তবে ত তাঁহার সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইবে, আমাদেরও আপশোষের অন্ত থাকিবে না। এরূপ 'দোআঁসলা' শব্দ প্রয়োগের দোষ ছাড়িয়া দিলেও আমরা কথোপকথনের ভাষায় এরূপ সুন্দর ও উচ্চ ভাব প্রকাশের বিরোধী। উহাতে ভাষার দোষে ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। ভাষা ভাবের বাহন। ভাব যদি গম্ভীর হয়, তাহা হইলে ভাষাকেও গম্ভীর করিতে হইবে। বৈকুণ্ঠনাথকে গরুড়ের উপর বসাইতে হইবে, বায়সের উপর বসাইলে চলিবে না। বিনয় বাবুও

কতকটা তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের প্রকৃতি,' 'ভাষাবিজ্ঞান,' 'সাহিত্য-সেবী' প্রভৃতি রচনার ভাষা একেবারেই কথোপকথনের ভাষা করিতে পারেন নাই।

ইংরেজী ভাবে ভাবুক লোকের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশ করা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য তাঁহাদিগকে কখনও কখনও সংস্কৃত দর্শন হইতে শব্দ চয়ন করিতে হয়, কখনও বা নূতন শব্দ রচিতে হয়। রচিত শব্দ সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ সকল শব্দ কথোপকথনের ভাষার সহিত একেবারেই মিশিয়া যায় না। সুতরাং গুরুচণ্ডালী দোষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ভাষা কাণে বাজে। অবশ্য তাই বলিয়া আমি দার্শনিক সন্দর্ভে Martineau's Types of Ethical Theoryর ভাষার মত অলঙ্কারভারপীড়িতা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি; বিশুদ্ধ, সরল, আড়ম্বরশূন্য, ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী। সংস্কৃত দর্শনের ভাষ্য ও টীকার ভাষাই দার্শনিক ভাষার আদর্শ হওয়া উচিত।

কোনও কোনও স্থলে বিনয় বাবু ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা একটা উদাহরণ দিব—"আমরা বেষ্টনীকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধনের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছি।" (সাধনা ১৩৮ পৃঃ)। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদের ত দূরের কথা,—যাঁহারা ইংরেজী জানেন; তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই ভাষা বুঝিতে সমর্থ? তবে যাঁহারা ইংরেজী দার্শনিক তত্ত্বে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা হয় ত ঐ ভাষায় ব্যক্ত মতের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য লিখিয়া লাভ কি? সাগরে শিশিরসেক করিয়া উহার সলিল-সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভবে না। বাঙ্গলা লেখকদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গালী পাঠকদিগের জন্যই লিখিতেছেন। অবশ্য ইংরাজী environment কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। বিনয়বাবু বেষ্টনী কথাটি উহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দটি বেশ হইয়াছে। কিন্তু কথাটি তিনি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বেষ্টনী শব্দের অন্য অর্থও সম্ভবে। সেই জন্য আমাদের মতে "বেষ্টকী" শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হইত। বেষ্টকী শব্দের প্রয়োগ নাই;—পরন্তু উহার "যাহা আমাদিগকে বেড়িয়া বা ঘিরিয়া আছে",—এই অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। যাঁহারা ভাষাকে নূতন শব্দ-সম্পদে সম্পন্না

করিবেন, তাঁহাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক; লোক যাহাতে ধাতুগত অর্থের ভিতর দিয়া অর্থটা হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শব্দটিও বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে লোক ঐ শব্দের অর্থ জানিয়া লইবার একটা উপায় করিতে পারে। স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধন কাহাকে বলিব, পরতন্ত্র পুষ্টি-সাধনই বা কাহাকে বলিব? আমার মনে হয় যে "স্বতন্ত্র ভাবে নিজের পুষ্টিসাধনের" লিখিলে আরও একটু খোলাসা হইত। ইনি ইংরেজী Institution শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'প্রতিষ্ঠান' করিয়াছেন। এ স্থলে ইংরেজী শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলে,—অথবা দুরূহ শব্দের অর্থ পরিশিষ্টে প্রদান করিলে ভাল করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার ভাষার ভঙ্গীও অস্পষ্টতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অকৃতী সমালোচক তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে 'সাধনা' পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভাষাসম্বন্ধে অনুযোগ করিয়াছিলেন,—কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভাষার জন্য এমন সুন্দর পুস্তকখানি তাঁহারা পাঠ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য আমি ভাষাসম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। আশা করি, সুবিজ্ঞ সরকার মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বঙ্গভারতীকে গৌরবময়ী ও সম্পদশালিনী করিতে থাকিবেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

গ্রামের মেয়েমহলে রামতারণ ভট্টাচার্য্য খুব "নিষ্ঠাকাষ্ঠা" ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। সৌরভ ঘোষাণী; গয়া জেলেনী প্রভৃতির জন্য একটু শাস্ত্রকথা-সংস্পৃষ্ট মিষ্ট বুলি তাঁহার যোগানই থাকিত। তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত, নাভি-স্থূল দীর্ঘ শরীর ও দীর্ঘ শিখা দেখিয়া চাষামহলে "ভশ্চাযিয় ঠাকুরের" মত অমন হিন্দু—অমন পণ্ডিত আর কেহই নাই এইরূপ জনরবই রটিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার খাতকমহলে, (আর সে অঞ্চলে তাঁহার খাতক নহেই বা কে?) তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা কতকটা এইরূপ হইত:—ক্রূর তাহার হৃদয়; কঠোর তাহার ভঙ্গী, বক্র তাহার দৃষ্টি, শঠতা তাহার সাধনা, উদ্দেশ্য-সাধনে অমৃত-

বর্ষী কিন্তু তাহার পরই হলাহলের ন্যায় তীব্র ও অগ্নির ন্যায় দহনকারী তাঁহার রসনা।

রামতারণ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক; তাঁহার টোল ছাত্রে পরিপূর্ণ। যদি কখন তাঁহার চরিত্রের তীব্র সমালোচনা তাঁহার কাছে কথা-প্রসঙ্গে উঠিত তিনি একটু হাসিয়া বলিতেন "কি জান, উপকার করা আমার স্বভাব। বেটারা আমার যে এত নিন্দা করে আবার 'কারে প'ড়ে' যখন পায়ে এসে ধরে তখন আর না বল্‌তে পারি না। তবে একটু খতপত্র রেখে দিই; কি জানি পাছে আসল শুদ্ধ ফাঁকে পড়ি।"

শিষ্যরা তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাংসারিক কূটবুদ্ধি, মোকৰ্দ্দমা-মামলায় জয়লাভের ফন্দী ও অর্থোপার্জ্জন দেখিয়া দলে দলে তাঁহার টোলে আসিয়া টোল পরিপূর্ণ করিত।

গ্রামে আর একজন পণ্ডিত ছিলেন। সন্ধিক্ষণে গম্ভীর সোমনাথের গম্ভীরতর ওঙ্কার শব্দ গঙ্গাতীর মুখরিত করিয়া যখন দিগন্ত প্লাবিত করিত তখন কত নিরক্ষর কৃষকসন্তান গন্তব্য স্থানে যাইতে যাইতে রুদ্ধগতি হইয়া লুব্ধকর্ণে সেই শব্দমহিমা শ্রবণ করিত, মুগ্ধনেত্রে সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিত। স্তবাবসানে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া কেহ কেহ বা তাঁহাকে দুই একটি প্রশ্ন করিত; অপরে স্মিতমুখে চলিয়া যাইত।

কিন্তু রামতারণ পণ্ডিতমহাশয় ও তাঁহার দলের নিকট সোমনাথের প্রতিপত্তি ছিল না। সোমনাথের উচ্চকণ্ঠে ওঙ্কারধ্বনি ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্ণে প্রবেশ করায় সেই ক্ষুদ্র গ্রামে আর্য্যধর্ম্ম রাহুগ্রস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার 'অনার্য্য' ব্যবহারের নিন্দা দিকে দিকে প্রচারিত হইল। এক দিন মাধ্যাহ্নিকাস্নান সমাধা করিয়া সোমনাথ আসিতেছেন; পথিপার্শ্বে শ্বপচনারী বিসূচিকারোগে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহার বিবর্ণ মুখে মক্ষিকা উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে, তাহার বক্ষে স্তন্য-পায়ী শিশু, মাতার পীযূষ বৃথা অন্বেষণ করিতে করিতে অবসন্ন, কাঁদিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত শিশুর লুপ্তপ্রায়; মাংসলোলুপ বায়স তাহার পৃষ্ঠে কঠোর চঞ্চুর আঘাত করিতেছে; শ্মশান-কুক্কুর নিকটে দাঁড়াইয়া দংশনে উদ্যত: দ্বিধাসঙ্কোচশূন্য হইয়া সহজ প্রফুল্ল বদনে সেই সদ্যস্নাত সিক্তবাস ব্রাহ্মণ, ভগবানের আশীর্ব্বাদতুল্য বাহু যুগল বিস্তৃত করিয়া মলমূত্রপরিপ্লুত চণ্ডালশিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন; গৃহে লইয়া তপ্ত দুগ্ধে তাহার জীবন রক্ষা করিয়া পুনরায় স্নান

করা পর্য্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলেন না। চণ্ডালবালক তাঁহার গৃহে পালিত হইতে লাগিল। এই ঘটনা লইয়া রামতারণ পণ্ডিতমহাশয়ের দল তাঁহার ভ্রষ্টাচারিত্ব উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিবার সুযোগ পাইল।

গ্রামে আর এক দল লোক ছিল। তাহারা কঠোর পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জ্জন করিত, দলাদলি, কুচক্র, মামলাফন্দীর মধ্যে যাইবার তাহাদের অবসর ছিল না। তাহারা উপবাস করিলেও অপরের দ্বারস্থ হইত না; প্রপীড়িত হইলেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আদালতে যাইত না। সহজ কথায় তাহারা "বোকা" বলিয়া উপেক্ষিত হইত। ইহাদের নীরব ভক্তি ও অকপট সম্মান, নির্ম্মল প্রীতি সোমনাথের প্রাপ্য ছিল।

যাহারা অপরের এক হাত পরিমিত জমী অন্যায় করিয়া লইবার জন্য গিরিপরিমিত দলিলসৃষ্টি করিতে পশ্চাৎপদ হইত না, যাহারা উকীল মোক্তারকে নানারূপ মোকর্দ্দমা সৃষ্টি করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর; যাহারা সরকারী কর্ম্মচারীকে অন্যায়রূপে বাধ্য করিবার জন্য কোন প্রকার কায করিতে পরাঙ্মুখ নহে রামতারণ পণ্ডিতমহাশয় তাহাদের অগ্রণী ও রতিকান্ত সরকার তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

রতিকান্ত স্থানীয় জমীদারের গোমস্তা, বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডর, দলিল-লেখক, মহাজনেরর দালাল, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, স্থানীয় যাত্রাদলের অধিকারী; এক কথায় সকল বিষয়েই না শিখিয়া ওস্তাদ।

(২)

রতিকান্ত রহিম সেখকে সঙ্গে লইয়া আসিল। রহিম তাহার ত্রিশ বিঘা জমী বন্ধক রাখিয়া রামতারণের নিকট টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। সেই ত্রিশ বিঘাই রহিমের সর্ব্বস্ব। এই জমীর কিয়দংশ দখল করিবার জন্য রামতারণ পূর্ব্বে কত বুদ্ধিই আঁটিয়াছিল, কত মোকর্দ্দমাই করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারে নাই। আজ মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত রহিম রতিকান্তের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া সমুদায় জমী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে আসিয়াছে।

রামতারণের মিষ্ট কথার আজ ফোয়ারা ছুটিয়াছে; রহিমের সঙ্গে মোকর্দ্দমা করিয়াছে বলিয়া তাহার বাপ যে রামতারণকে "খুড়োঠাকুর" বলিয়া ডাকিত সে কথা কি রামতারণ ভুলিতে পারেন? রহিম যে তাঁহার নিজের

ভাইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নহে! একটা বন্ধকি খত রেজেষ্ট্রী করা রেয়াজ আছে, তাই একখানা দলিল রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে; নহিলে রহিমের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া রামতারণ অনায়াসেই দুই শত টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। আর রহিম যদি রামতারণের টাকা অমনিও খায়, তাহা হইলেও ত আর তাহা রামতারণের জলে পড়ে না।

যথাসময়ে দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল।

(৩)

তাহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। দুই একবার রহিম টাকা দিবার কথা বলিলে একমুখ হাসিয়া রামতারণ বলিত "তা'র জন্য তাড়াতাড়ি কি, ভাই-সাহেব?"

এক দিন প্রভাতে ঢুলি ঢোল সহরত দিল, আদালত হইতে পেয়াদা রহিমের ত্রিশ বিঘা জমীতে রামতারণকে খাসদখল দিতে আসিল। মহা-সমারোহে রামতারণ বাঁশগাড়ি করিয়া দখল লইতে লাগিল। রহিমের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে যখন জমীতে পৌঁছিল ও বুঝিল যে ভট্টাচার্য্য তাহাকে এতদিন স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া এদিকে গোপনে সম্পত্তি নিলাম করাইয়া দখল লইতে আসিয়াছে তখন তাহার সমস্ত শরীর বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যেমন জমীতে প্রবেশ করিয়াছে, অমনই পশ্চাৎ হইতে চৌকীদার আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; রতি-কান্ত চীৎকার করিয়া উঠিল "শালা নেড়ে খুন কল্লে'!" ভট্টাচার্য্য উচ্চ-কণ্ঠে "মা জগদম্বা, রক্ষা কর" বলিতে লাগিল ও আদালতের পেয়াদা মহামহিম ভারতেশ্বরের দোহাই দিতে লাগিল। ক্রমে স্থান কোলাহলসঙ্কুল হইয়া উঠিল। গুজব রটিল যে, রামতারণ, রতিকান্ত ও আদালতের পেয়াদাকে রহিম সেখ মারিয়া গুরুতর জখম করিয়াছে।

পেয়াদা রিটার্ণ লিখিল। রতিকান্ত নালিশ করিল, ভট্টাচার্য্যের তদ্বির চলিল। যথা সময়ে ফৌজদারি মোকর্দ্দমা রুজু হইল। হাকিমের বিচারে পেয়াদা বেদখল ও রতিকান্তকে মারপিট করার অপরাধে রহিম সেখের উভয় ধারায় তিন মাস করিয়া ছয় মাস সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইল। "হা আল্লা" বলিয়া নিঃশব্দে রহিম জেলে গেল।

(৪)

রহিমের স্ত্রী লহমা শুষ্কমুখে জেলখানার দরজা হইতে ফিরিয়া আসি-

য়াছে। স্বামীকে জেলে রাখিয়া আসিয়া তাহার দেহভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। যে পূর্ব্বে কখন দরজার বাহির হয় নাই, স্বামীর সবল বাহুর আশ্রয়ে যে এত দিন উন্নত মস্তকে অসঙ্কোচে অন্তঃপুরে রাজত্ব করিয়াছে, আজ তাহাকে বাহির হইতে হইল। স্বামীর মান আজ তাহার হস্তে, স্বামীর সংসার তাহার স্কন্ধে, স্বামীর পুত্রকন্যা তাহার ক্রোড়ে। লহমা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল না—বৃথা কাঁদিল না—দুঃখ জানাইয়া বেড়াইল না। গৃহস্থদিগের অন্তঃপুরে যখন ধান কাড়ান প্রভৃতি কাযের প্রয়োজন হইত। লহমা কর্ম্মপ্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইত। তাহার কথার ঠিক ছিল, কর্ম্মে উৎসাহ ছিল, দাবীও পরিমিত। সকলেই আগ্রহ করিয়া তাহাকে কায দিত।

(৫)

সোমনাথ তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। জিলায় লাটবাহাদুর সফরে আসিলেন; রামতারণ সদলবলে সদরে যাইয়া জিলা প্লাবিত করিলেন; রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে বহু অর্থব্যয় করিলেন; সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন কেবল খাতক ও প্রজা প্রমাদ গণিল। যথা সময়ে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে রামতারণ ভূষিত হইলেন। গ্রামে তাঁহার প্রতিপত্তি আরও বাড়িল। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—পাপস্রোত অবাধে বহিতে লাগিল। প্রবঞ্চনা মিথ্যাকথন নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া উঠিল। পদে পদে শান্ত পীড়িত ও দুষ্ট জয়ী হইতে লাগিল। কোথায় সোমনাথ তুমি, দূর তীর্থক্ষেত্রে, নিজের উন্নতিকল্পে? পল্লীভবনে কর্ম্মকেন্দ্র তোমার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে; কোথায় তুমি?

আর্ত্ত জনসংঘের হৃদয় আলোড়িত করিয়া নীরব প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, জনেশ্বর জনার্দ্দন, আর্ত্তবন্ধু তুমি কি নাই?"

(৬)

জেলে গিয়া রহিম সেখকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল না। তাহার দেহ সুস্থ—সবল—কর্ম্মঠ; তাহার মুখ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গম্ভীর; সে প্রাণপণে জেল কর্ত্তৃপক্ষগণকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল এবং তাহাতে সক্ষমও হইল। জেলের নিয়মিত পরিশ্রমে ও আহারে তাহার সুগঠিত শরীর আরও সুগঠিত হইল।

রাত্রিদিন তাহার হৃদয় হইতে একই ধ্বনি উঠিতেছে "এত অত্যাচার! খোদা নাই। উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে হইবে।" নীরব নিশীথে যখন

অন্য কয়েদীরা নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অচেতন, তখন মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে রহিম ভাবিত "খোদা নাই; খোদা নাই; খোদা নাই।"

হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি দেবতা, একটি মানবহৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ বেদনার নীরব আবেদন তোমার সিংহাসন সমীপে কি পৌঁছে না?

(৭)

সোমনাথ গ্রামে ফিরিলেন। নিদাঘার্ত্ত ধরণীতে প্রথম বারিপাতের ন্যায় আর্ত্ত গ্রামবাসীর কাছে সে সুখ-সম্মিলন কত মধুর! আজ যেন কর্ম্ম-জীবন তাঁহার জন্য বিকশিত হইতেছে; কর্ম্মপ্রবাহ শুধু যেন তাঁহারই ইঙ্গিত অপেক্ষা করিতেছে। অনাথ—আতুর—দরিদ্র শ্রমজীবী ইহারা যেন আজ সোমনাথের উপদেশে নবজীবন পাইতেছে। ভাগ্যহীনের ভাগ্য ফিরিল, অসহায় সহায় পাইল। অতি ধীরে পরিবর্ত্তন ক্রিয়া আরব্ধ হইল। সোমনাথের টোলে ছাত্রবৃন্দের বেদধ্বনি বেদগানকে মূর্ত্তিমান করিল।

(৮)

রহিম সেখের মেয়াদকাল পূর্ণ হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই সে খালাস পাইল। যে সব কয়েদী সন্তোষজনক ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা এই রূপ নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই খালাস পায়।

প্রায় ছয়মাসকাল চিন্তা করিয়া রহিম সেখ স্থির করিয়াছে খোদা নাই। খোদার বিচার সে নিজের হাতেই লইবে। রামতারণের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই ভবিষ্যতে তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে। সে ভাবিয়াছিল তাহার লহমাও নাই আর তাহার সন্তানগুলিও নাই, সব অনাহারে মরিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া দেখিল, সোমনাথের যত্নে লহমা কতকগুলি অনাথা বিধবার সঙ্গে সীবন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। সোমনাথ কলসংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; কতকগুলি গৃহস্থকন্যা শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। দুই একটি দরিদ্র ভদ্রলোক কাপড় কাটিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। আর লহমা তাহার সঙ্গিনী-দিগকে লইয়া বহুসংখ্যক জামা প্রস্তুত করিতেছে। সহরে দোকানদার-দিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। যত জামা প্রস্তুত হইবে সব তাহারা নগদ খরিদ করিয়া লইবে। যাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত হইত, আজ তাহাদের গৃহে অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা।

দেখিয়া রহিম বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহার হৃদয়ে পাষাণের রেখার

ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে "খোদা নাই। প্রতিশোধ চাহি।" সে রেখা সহজে মুছিল না। রহিম ভাল করিয়া সোমনাথের সহিত দেখা করিতেও পারিল না।

(৯)

বাসন্তী পূর্ণিমা। বকুলমূলে ব্রাহ্মণসভা বসিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় রামতারণ মহা আড়ম্বরে বসিয়া আছেন। তাঁহার প্রকৃতিতে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে; কোথাও কোন বাধা না পাওয়ায় তাঁহার ঔদ্ধত্য সকল সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথও সভায় উপস্থিত আছেন। কালের গতিও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ বহু ব্রাহ্মণ মনে মনে সোমনাথের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। রামতারণ কালের গতি বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই। চিরদিন যেরূপ ভাবে চলিয়াছেন তদ্ব্যতীত অন্যপথে আপনাকে চালিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। রামতারণ সোমনাথের কার্য্যে ইঙ্গিত করিয়া দারুণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কঠোরতা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার রসনায় অধিষ্ঠিত হইল, তাঁহার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অধ্যবসায় আজ সোমনাথকে অপদস্থ করিতে নিযুক্ত হইল। কয়েকটি লোক সোমনাথের পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইলে সোমনাথ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। মহামহোপাধ্যায় বিদ্রূপ করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন, ক্রোধের আতিশয্যে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে তাঁহার বাক্য রোধ হইল—মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে লাগিল। তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সোমনাথ ইঙ্গিত করিলেন, জনৈক শিষ্য মহামোহপাধ্যায়কে বীজন করিয়া সুস্থ করিল।

স্থির গম্ভীর সোমনাথের কমনীয় বদনে কোমল জ্যোতি সর্ব্বদাই খেলা করিত, আজ যেন তাহা কোমলতর ও সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমে গলিয়া গিয়াছে, মুখে তাহারই আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, ধীর কণ্ঠে সোমনাথ কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। সব কোলাহল থামিয়া গেল; সমগ্র সভা নিস্তব্ধ হইল। সোমনাথ বলিলেন, "মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বজীব দেহাদিতে অহংবুদ্ধি করিয়া অতি অভিমানী হইয়া উঠে। তাহা মোক্ষপথের নিতান্ত অন্তরায়। তাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এমন কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন যাহাতে সেই অভিমানের হস্ত হইতে জীব পরিত্রাণ পায়। যাহারা দুর্ব্বল, শাস্ত্রের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম, ভগবানের শাসনে তাহারা এমন কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় যাহাতে সেই কর্ম্মের পরিপাক-

সময়ে তাহাদের সমগ্র অভিমান চূর্ণ হইয়া তাহারা নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরিয়া পাইবার অবসর পায়। রামতারণের কর্ম্মফল পরিপক্ক হইয়াছে, অচিরে তাঁহার অভিমান-বুদ্ধি বিধ্বস্ত হইবে। তিনি স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত! তখনই তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে অচিরে রামতারণ ব্রহ্মণ্যদেবের সত্তা হৃদয়মধ্যে অনুভব করিবার অধিকারী হয়েন।”

মহামহোপাধ্যায় রামতারণও আজ সোমনাথের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। এই প্রথম রামতারণের অভিভব। তবে কি পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছে? অনাদিদেব কি তাহার সত্তা বুঝাইবার জন্য কর্ম্মচক্র চালিত করিতেছেন?

অগাধবোধ সোমনাথের বাক্যাবলি সকলের হৃদয় স্পর্শ করিল;

(১০)

রামতারণ কঠোর হইলেও তাঁহার হৃদয়ের একাংশ কোমল ছিল। তাহা তাঁহার অন্তঃপুরে প্রকাশ। তাঁহার ভগিনী কুমুদিনী বালবিধবা। ভ্রাতা তাঁহাকে গৃহকর্ত্ত্রী করিয়া রাখিয়াছেন। রামতারণ বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। পত্নী মোহিনী পরমা সুন্দরী। কুমুদিনীর যত্নে মোহিনীকে সংসারের কোন কার্য্য করিতে হইত না। মোহিনী নিজের বিলাস ও প্রসাধনাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিত। কুমারীকালে বিধবা মাতা ব্যতীত পিত্রালয়ে মোহিনীর আর কেহই ছিল না। মাতার অযথা আদর হইতে সে স্বামীর সংসারে অযথা আদরে পশিয়াছিল। সে কখনও প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখে নাই। রামতারণকে সে ভালবাসিতে পারিল না। জেলখানায় যখন মেঝের উপর মুখ রগড়াইতে রগড়াইতে রহিম কাঁদিত ও “খোদা নাই” বলিত, সেই সময়েই কালের কঠোর বিধানে রামতারণকে কীটাণুকীট অপেক্ষা হীন করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। যুবক জগন্নাথ মোদকের নিকট মোহিনী আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। জাত্যভিমানী কুক্রিয়ারত ব্রাহ্মণাধমের কুলস্ত্রী পাংশুলা হইল। যখন রামতারণ সোমনাথকে ভ্রষ্টাচার বলিয়া দেশে দেশে প্রচার করিত, তখন তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছিল। এমনই করিয়া বিধিলিপি অগ্নির অক্ষরে লিখিত হয়।

(১১)

রহিম শেখ স্থির করিয়াছে, সে আর খোদা মানিবে না। রামতারণকে সুপ্তাবস্থায় তাহার আদরের পত্নী ও সন্তানের সহিত পোড়াইয়া মারিবে। তবেই তাহার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।

রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত অন্ধকার ; পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। রামতারণের শয়ন-গৃহ খড়ের ছাওয়া ; তাহার বাড়ী মেটে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। দেওয়ালের পাশেই বাড়ীর পশ্চাতে দুইটি আম গাছ। আম গাছে উঠিয়া অতি সহজেই দেওয়াল বাহিয়া কিম্বা শাখা অবলম্বন করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা যায়। রহিম জ্যোৎস্না উঠিবার কিছু পূর্ব্বেই একটি আম গাছের তলে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে একখানি দা, একটি দেশলাইয়ের বাক্স ও একখানি গামছা। সে যেমন গাছে উঠিতে যাইবে অমনই তাহার বোধ হইল, অপর গাছের ডালে একটি লোক বসিয়া আছে। প্রথমে রহিম ভয় পাইল ; পরে তাহার কৌতূহল জন্মিল। সে গাছের নীচু ডালে গোপনে বসিয়া রহিল। ক্রমে জ্যোৎস্না উঠিল ; ভট্টাচার্য্যের অন্তঃপুরে সকলে শয়ন করিল। কিছু ক্ষণ পরে সেই উচ্চ ডালের লোকটি ডাল বাহিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল! রহিম একটু উপরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরের কাণ্ড সব দেখিতে পাইল। সে দেখিল, তাহাদের গ্রামের জগা ময়রার সঙ্গে মোহিনী কথা কহিতেছে। জগা বলিল, "না এমন করিয়া আর পারি না, তোমার জ্বালায় কি শেষটা আমি প্রাণ খোয়াব? কোন্ দিন কে টের পা'বে আর আমার দফা রফা হয়ে যা'বে। আমি আজ থেকে সরে পড়্‌লাম।"

মোহিনী তাহাকে অনেক অনুনয় করিল। তখন জগা বলিল, "যদি তুমি আমাকে চাও, তবে বল্‌ছি আমি আর এ বাড়ীতে এমন ক'রে আস্‌তে পার্‌বো না।"

মোহিনী বলিল, "তবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।"

ইতোমধ্যে রহিম কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে তাহাদের নিকটে আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। জগা বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে, কোলের ছেলে কি হ'বে?"

মোহিনী বলিল, "সঙ্গে করে লয়ে যা'ব।"

জগা বলিল, "সে সব হ'বে না, ছেলে ফেলে নিয়ে আমি যেতে পার্‌বো না। তবে আমি বিদায় থাক্‌লাম।"

আবার মোহিনী তাহাকে থাকিবার জন্য অনুনয় করিল, একটু কাঁদিল ; তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তখন জগা বলিল, "তোর ছেলে কেটে ফেল।"

মোহিনী চমকাইয়া উঠিল।

জগা বলিল, "তবে থাকো গো, আমি চল্লাম। আমাকে শুধু ফাঁসাইবার চেষ্টা।" এই বলিয়া জগা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

আবার মোহিনী কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। অনেক বাদানুবাদের পরে মোহিনী বলিল, "যা' কর্‌তে হয় তুমি কর।" এই বলিয়া রাক্ষসী জগাকে বঁটি দেখাইয়া দিল।

জগা তাহার হাতে বঁটি দিয়া বলিল "আমি কাট্‌ব কেন? তোর ছেলে তুই কাট।"

রহিম সেখের আর সহ্য হইল না। সে আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্যকে সবংশে নষ্ট করিতে; দেখিল, ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পত্নী হইয়া—জননী হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এ কি করিতেছে!

অব্যর্থ লক্ষ্যে রহিম হাতের দা দিয়া আঘাত করিল। জগার ছিন্ন মুণ্ড ভূতলে পড়িয়া গেল; উষ্ণ রক্তে স্থান প্লাবিত হইয়া গেল। রহিম তীর-বেগে তরুচ্ছায়ার অন্ধকারমধ্যে অদৃশ্য হইয়া ভট্টাচার্য্যের গৃহ ত্যাগ করিল। মোহিনীও তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। শিশু রক্ষা পাইল।

(১২)

পরদিন প্রভাতে গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলে জানিল, রামতারণ বাড়ীর মধ্যে জগা ময়রাকে দেখিয়া খুন করিয়াছেন। পুলিস আসিল। যথারীতি তদন্তে রামতারণ দোষী সাব্যস্ত হইয়া চালান গেলেন; ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দায়রা সোপর্দ্দ হইলেন।

(১৩)

রহিম সেখ সেই রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া একটি পুঁটুলিতে রক্তমাখা দা, গামছা, কাপড় ও দেশলাই একত্র বাঁধিয়া ছাই-গাদায় লুকাইয়া রাখিল, আর নিজে স্নান করিয়া অন্য কাপড় পরিয়া শুইয়া রহিল। তদন্তের সময় সকল সংবাদই রাখিতে লাগিল। সে কিছুই প্রকাশ করে নাই।

(১৪)

দায়রা বসিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় আসামী; তাঁহার দোষ রীতিমত প্রমাণ হইয়া গেল। জজ জুরিকে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতেছেন।

আজ রামতারণের আর সে ভাব নাই; অনবরত অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি নিঃশব্দে জগৎজননীর নাম লইতেছেন।

এমন সময়ে প্রহরীর কথা অমান্য করিয়া রহিম সেখ বিচার-গৃহে দ্রুত

প্রবেশ করিয়া যুক্তকরে জজকে বলিল, "খোদাবন্দ, এই ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষ; আমার এজেহার লইয়া বিচার করিতে আজ্ঞা হউক।" এই বলিয়া রহিম সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল; কিছুই লুকাইল না, কাহারও দোষ ছিপাইল না; নিজের অভিপ্রায়ও লুকাইল না। এজলাসে সূচি-পতনের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতে লাগিল। জজ শুনিয়া বিচার বন্ধ করিয়া পুনরায় পুলিস তদন্তের হুকুম দিলেন এবং রামতারণ ও রহিম উভয়কেই জামিনে খালাস দিলেন। তখন সর্ব্বসমক্ষে মহামহোপাধ্যায় রহিমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে তাহার অঙ্গ ভাসাইয়া উপবীত হস্তে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই দিন হইতে রহিম তাঁহার ভাই, আর তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশই রহিমের।

সেই বিষম দুর্দ্দিনে উভয়ে উভয়ের সন্মান পাইলেন। যে অভিমান উভয়কে এতদিন পরস্পরের অহিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহা আজ নষ্ট হইয়াছে। শান্ত চিত্তে দুই জন গ্রামে ফিরিলেন। সোমনাথের গৃহ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া দুই জনের ধারণা হইল। সেই স্থানে তিন জনে অশ্রুজলে সিক্ত হইতে হইতে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

(১৫)

পুনরায় তদন্তে রহিম চালান গেল। দায়রার বিচারে রহিম বেকশুর খালাস পাইল। গ্রামবাসিগণ চাঁদা করিয়া রহিমকে স্বর্ণ পদক উপহার দিল। রামতারণ নিজের অর্দ্ধেক সম্পত্তি রহিমকে লিখিয়া দিলেন আর সমস্ত সম্পত্তির অছি তাহাকে করিয়া দিয়া, নিজের ছেলেকে সোমনাথের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কাশীবাসী হইলেন।

রহিম ও সোমনাথ রামতারণকে সম্পত্তি দান করিতে বারণ করিলে রামতারণ হাসিয়া বলিলেন, "এই আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়।

অতীত।

যে দিন পড়েছে ঢলে অতীতের কোলে,
পড়ে গেছে যবনিকা তা'র;
যে দিনের মধুময় স্মৃতি মনে ভাসে
সে দিন কি ফিরিবে না আর?

সাঁজের বেলায় হেথা আপনার মনে
ভাবিতেছিলাম বসি একা,
যে দিন গিয়াছে চলে অতীতের মাঝে
আর কি পাইব তা'র দেখা?
মনে পড়ে শৈশবের সে সুখের খেলা,
তা'র মুখে স্নেহময় গান,
খেলা ঘরে সাথী মিলে লুকোচুরী খেলা
কত দিন হ'ল অবসান।
তা'র পরে এসেছিল কিশোর জীবন,
কত সুখে হয়েছিল ভোর,
কত হাসি, অশ্রুজলে, গেঁথেছিনু মালা
পরাইতে প্রিয়তমে মোর,
অতীত সে যৌবনের প্রথম প্রভাতে,
আঁখি মেলি দেখিলাম চেয়ে
আশার সোনালী রেখা হৃদয়ের পরে,
ধীরে ধীরে পড়িয়াছে ছেয়ে।
আজ সেই জীবনের দিবা অবসান,
ডাকে ওই সাধের মরণ;
"কাল নিশা আসিতেছে সুখের বাসরে
কর ও গো আমারে বরণ"।
তাই ভাবি অতীতের মধুময় কথা,
ভাবি সেই সুখময় দিন।
জীবনেতে আর সে তো ফিরে আসিবে না,
হ'য়ে গেছে আঁধারে বিলীন।

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

সবজী।

ঢ্যাঁড়শ।

ধনিগৃহে ঢ্যাঁড়শের আদর নাই সত্য; কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা ইহা আদর করিয়া খাইয়া থাকেন। "লালা"-যুক্ত বলিয়া কেহ কেহ এই সবজী পছন্দ

করেন না; কিন্তু ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। আমরা অনেক য়ুরোপীয়কে বাগান হইতে কচি ঢ্যাঁড়শ তুলিয়া খাইতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশী নামটি কর্কশ শুনায়—য়ুরোপীগণ শুভ্র নাতিদীর্ঘ ফলগুলির সহিত রমণীর চম্পকাঙ্গুলির সাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন—Lady's Finger। খাদ্যের হিসাব ছাড়িয়া দিলেও ঔষধ হিসাবে ঢ্যাঁড়শের মূল্য আছে। ইহার ফল ও বীজ হইতে যে পাতলা আটাবৎ বস্তুর (mucilage) নিঃসরণ হয় তাহা ঔষধে demulcent স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার গাছের ত্বক্ (bast) হইতে এক প্রকার চিক্কন শক্ত, সাদা সূক্ষ্ম সূতা (fibre) বাহির হয়—ইহা হইতে ব্যবসা-হিসাবে বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলিতেছে।

অনেক প্রকারের ঢ্যাঁড়শ আছে, কিন্তু শুঁয়াবিহীন্ ঢ্যাঁড়শই ভাল এবং ইহার চাষই করা উচিত।

মৃত্তিকাঃ—যদিও বিনাশ্রমে, যে কোন প্রকার মাটীতে ঢ্যাঁড়শ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি উত্তমরূপ ফসল পাইতে হইলে প্রস্তরময় ও উদ্ভিজ্জ পদার্থঘটিত মৃত্তিকাই এই সবজীর উপযোগী।

জমী প্রস্তুত—রোপণ-প্রণালী ইত্যাদিঃ—জমীতে ২।৩ বার চাষ দিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে তাহার উপর বিদা চালাইয়া ৩ ফিট্ অন্তর সারিতে ২ ফিট্ অন্তর বীজ রোপণ করিতে হয়; ইহার পরে জল-সেচন আবশ্যক এবং গাছ একটু বড় হইলেই জমীর ঘাস ইত্যাদি নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ এই সবজীর গাছ বর্ষাকালে হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তমরূপ জলসেচন করিয়া কিছু পূর্ব্বে বীজ রোপণ করিয়া গ্রীষ্মকালেও ঢ্যাঁড়শ পাওয়া যাইতে পারে। অনেকে বেগুন প্রভৃতির ন্যায় বীজ-জমীতে এই সবজীর চারাগাছ (seedling) তৈয়ার করিয়া অপর স্থানে নাড়িয়া পুতিবার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে অধিক খরচ পড়ে এবং গাছগুলি অনায়াসে বীজ জমী হইতে নাড়িয়া পোতা যায় না। সুতরাং ইহার জন্য বীজ-জমী করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। অধিক গরমের সময় ৫।৬ দিন অন্তর জমীতে জলসেচন করিতে হয়; জমীতে অধিক ঘাস বা কোন আগাছা জন্মাইতে দেওয়া কোনমতে উচিত নহে। ঢ্যাঁড়শ যখন পুষ্টিকর খাদ্য তখন যাহাতে অধিক দিন ইহার ফসল পড়িয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ আবশ্যক। কেবল বর্ষাকালে

কয়েক মাস ফসল উৎপন্ন করিলে চলিবে না। আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-ফলে যদি ইহার ত্বক্ হইতে সূক্ষ্ম সূতা নির্গত হয় তাহা হইলে অনাদৃত ঢ্যাঁড়শের চাষে আমাদের মনযোগ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য ইহার চাষের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ষান্তে ফসল লইয়া গাছ ছাঁটিয়া উহার গোড়া উস্কাইয়া আল্‌গা করিয়া তাহাতে সার প্রয়োগের পর জলসেচন করিলে একাদিক্রমে অনেক দিন ফসল পাওয়া যায়। অনেক দিন ধরিয়া ফসল পাইতে হইলে চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে ৩ সপ্তাহ অন্তর বীজ বপন করিলেও চলে। *

আয় ও ব্যয়ঃ—ঢ্যাঁড়শ চাষের আয় ও ব্যয় ঠিক করিয়া বলা যায় না; কারণ লাভকর ব্যবসা-হিসাবে ইহার চাষ কেহ করেন না—মাঠে অন্য গাছের সহিত এই সবজী লাগাইয়া থাকেন কিম্বা টুকরা জমীতে কোনও যত্ন না লইয়া ইহা পুতিয়া থাকেন এবং আয় ও ব্যয়ের কোন হিসাব রাখেন না। তবে দেখা গিয়াছে যে, একর প্রতি ১০।১২৲ টাকা খরচ করিয়া কেবল ফল বিক্রয় করিয়া ৩০।৩৫৲ টাকা বেশ লাভ থাকে।

ঢ্যাঁড়শের পোকাঃ—দুই প্রকার পোকা ঢ্যাঁড়শের অত্যন্ত ক্ষতি করে। ইহাদের চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Spotted Ball Worms কহে। এই দ্বিবিধ পোকাই একই জাতি-(Genus) ভুক্ত। ইহারা একই সময়ে ফসলের ক্ষতি করে ও ইহাদের ডিম, কীড়া ও পুত্তলি অবস্থার কাল প্রায় একই রকমের। একের প্রজাপতির সম্মুখের ডানা উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের, অপরের পোকা কতকটা কটা রঙ্গের হয়। উভয়ের বর্ণের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হয়। ইহাদের স্ত্রী প্রজাপতি গাছের ডগায়, ফুল কিম্বা ফলের উপর ডিম পাড়িয়া যায়; ৪।৫ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হয় এবং ডগা, ফুল ও ফলের ভিতর ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে। কীড়াগুলির গাত্রে শুঁয়া থাকে। ফলের ভিতরে বীজই উভয়ের প্রধান খাদ্য। ইহারা একটি ফল নষ্ট করিবার পর অপর ফলে গমন করে। বড় কীড়া ফলের মধ্যে ঢুকিলে ফলের গাত্রে একটি ছিদ্র দেখা যায় এবং প্রায় ভিতর হইতে এক প্রকার ধূসর বর্ণের আটা নির্গত হয়। ইহার সহিত এই পোকার বিষ্ঠাও মিশ্রিত থাকে। ১৫ দিনের মধ্যেই কীড়াগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় ও ৳ ইঞ্চ লম্বা হয়; ইহাদের গাত্রের বর্ণ সবুজ, সাদা ও কাল মিশ্রিত এবং কমলা রঙ্গের ছিট্‌যুক্ত, মাথার বর্ণ কাল। ইহারা গাছে কিম্বা মাটীতে ধূসর বর্ণের গুটী করিয়া তন্মধ্যে পুত্তলি করে।

গাছের ডগা শুকাইতে আরম্ভ হইলে একটু নিম্ন হইতে ডগগুলি কাটিয়া পুড়াইয়া দিলে পোকার বংশ বাড়িতে পায় না। যে ফল শুকাইয়া যাইতেছে কিম্বা যাহা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে ও যে সকল ফলের গাত্রে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ সমস্ত ঢ্যাঁড়শ ও মাঠের শুষ্ক পাতা মধ্যে মধ্যে পোড়াইয়া

* Gill's Indian Vegetable Garden.

ফেলা কর্ত্তব্য।—এইরূপ করিলে পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না এবং ক্ষতিও অনেকটা কম হয়; ফসল উঠাইয়া লইবার পর জমীতে গভীরভাবে চাষ দিলে পুত্তলিগুলি নষ্ট হইয়া যায়।*

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

কবির প্রতি।

কোন্ পুণ্য কিরণের স্নিগ্ধ জ্যোতিরেখা
কোন্ আলোকের দেশে ছিলে ও গো তুমি,
স্থানভ্রষ্ট নেমে এসে হেথা দেছ দেখা,
উজলিয়া বিমলিন দীন মর্ত্তভূমি।
নন্দনের গন্ধভরা সহাস মন্দার
সহসা পড়েছে খসি' ধরণীর বুকে
ভরিয়াছে দশ দিক সুবাসে তাহার,
দৈন্য মলিনতা হেথা গেছে সব চুকে।
কবিতার কুঞ্জমাঝে তব যে ঝঙ্কার
উঠিছে ভাসিছে, কবি, কাঁপিয়া কাঁপিয়া
মধুর সুতান লয়ে মূর্চ্ছনায় যা'র
সমস্ত নিখিল এই গিয়াছে ছাপিয়া,
নহে সেত ধরণীর! কণ্ঠে মানবের
সম্ভব নহে ত কভু এত মধু গান।
অমিয়াপূরিত এ যে সুখ স্বরগের,
দেবকণ্ঠবিনিঃসৃত সঙ্গীতের তান।
তাই এই মুগ্ধ বিশ্ব স্থির অচঞ্চল
তোমাপানে চেয়ে আছে বিস্ময়-জড়িত
মন্ত্রমুগ্ধ যেন মোহ আবেশবিহ্বল,
কর্ণে তা'র মধু মাখা কি সুধা ক্ষরিত!
আদিহীন অন্তহীন যাহা সীমাহীন,
ও গো মহা কবি! তুমি সীমা দেছ তা'রে
বাক্যহীন ভাষাহীন যাহা চিরদিন
বাণীর সাধক, তুমি ভাষা দেহ তা'রে।
এসেছ সঙ্গীতময় দেবের প্রেরণা
মলিন ধরায় তুমি বিভুদত্ত দান;
শুনি তব প্রাণহরা সঙ্গীত মূর্চ্ছনা—
মানব আপনাহারা পাগল সমান।
নিঃস্ব এই গুণমুগ্ধ ভকত তোমার,
লহ তা'র হৃদয়ের মৌন উপহার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

---

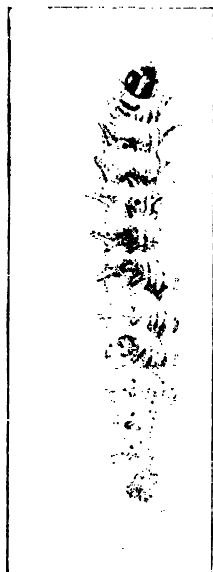
* চ্যাড়শের পোকার চিত্রগুলি Imperial Entomologistএর অনুগ্রহে পাওয়া গিয়াছে।

ঢ্যাঁড়শের দুই প্রকার পোকার চিত্র।

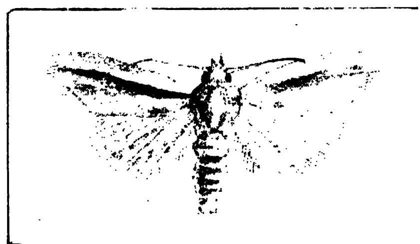
Spotted Boll Worms



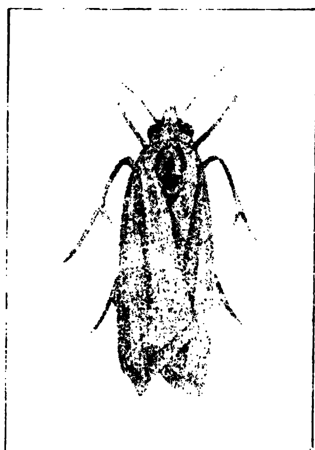
কীড়া (চারিগুণ বর্দ্ধিতাকারে)



কীড়া (চারিগুণ বর্দ্ধিতাকারে)



প্রজাপতি (দ্বিগুণ বর্দ্ধিতাকারে)



প্রজাপতি (দ্বিগুণ বর্দ্ধিতাকারে)

সংগ্রহ।

ইতিহাস।

২৪ পরগণায় ইংরাজাধিকার।

গত এপ্রিল মাসের 'কলিকাতা রিভিউ'পত্রে—২৪ পরগণা কিরূপে ইংরাজের হস্তগত হয় মিষ্টার ফার্মিঞ্জার তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের সহিত লর্ড ক্লাইবের যে সন্ধি হয় তাহাতেই ২৪ পরগণার ইংরাজাধিকার আরব্ধ হয়। সন্ধি-সর্ত্তের সারাংশ এইরূপ—

১। ফরাসীদিগের বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় উপনিবেশ-স্থাপন নিষিদ্ধ হইল।

২। দুই পক্ষ বিপদে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, স্থির হইল।

৩। স্থির হইল, নবাব হুগলির নিম্নে গঙ্গা নদীর নিকটে কোন দুর্গ প্রস্তুত করিবেন না, এই সর্ত্তদ্বারা নদীর প্রবেশ-পথ ও মোহানা ইংরাজ-রক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল।

৪। সিরাজের সহিত যুদ্ধে কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা স্থির হইল।

* * * * * *

৮। কলিকাতাবেষ্টনকারী গড়খাইর মধ্যস্থ বিভিন্ন জমীদারের অধিকারভুক্ত জমী ব্যতীত ইংরাজ কোম্পানী গড়ের বাহিরেও ৬০০ গজ জমী পাইলেন।

৯। কলিকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইংরাজ কোম্পানীর জমিদারীভুক্ত হইল। স্থির হইল, সেই স্থানের কর্ম্মচারিগণ ইংরাজের অধীন হইবেন। অপর জমিদারদিগের ন্যায় কোম্পানী কর পাইবেন।

এইরূপে নূতন জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া প্রথম ষোড়শ মাস কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হস্তেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানী রাজস্ব বিলি করিবেন স্থির করিয়া ২১শে মে তারিখে নিম্নলিখিত ইস্তাহার জারি করেন—

এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোম্পানীর নবপ্রাপ্ত জমিদারীর কোনও পরগণা ইজারা লইতে ইচ্ছুক থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ২০ দিনের মধ্যে কোম্পানীর বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন। যাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাঁহাকে নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে তিন বৎসরের জন্য পরগণা বিলি করা যাইবে— প্রজার করবৃদ্ধি করা হইবে না। যদি কোন জঙ্গল সাফ করা হয়, তবে প্রজাকে তজ্জন্য বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে হইবে। জমাবন্দী শেষ হইলেই ইজারাদারকে বর্দ্ধিত জমীর খাজনা দিতে হইবে। পাট্টার সর্ত্তানুসারে খাজনা দিলে সে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যইবে না। অনুমতি ব্যতীত গাছ কাটা চলিবে না। পূর্ব্ব ইজারাদারের প্রজার নিকট বকেয়া টাকার ভার নূতন ইজারাদারকে লইতে হইবে। বিচারের অধিকার ও জমীদারের

অধিকার কোম্পানীরই থাকিবে। বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত ইজারাদার জাতির কলহের (ঘোঁট) বিচার করিতে পারিবেন না।—বিবাহের অনুমতিও দিতে পারিবেন না। কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে ইজারাদার তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ফর্দ্দ করিয়া তাহার দ্রব্যাদি কাছারীতে পাঠাইবেন, আদেশ ব্যতীত আর কাহাকেও দিবেন না। কোম্পানীর কারবারসম্বন্ধে যখন যে আদেশ হইবে ইজারাদারকে তখন তাহা তামিল করিতে হইবে। ইজারাদার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক রাখিয়া মহলে শান্তিরক্ষা করিবেন। ইজারাদার হুকুম ব্যতীত রাস্তা বা বাঁধের জন্য জমী দিতে পারিবেন না। ইজারাদার পূর্ব্বাধিকারীর মত প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিবেন। ইজারাদার প্রচলিত প্রথানুসারে বাঁধ, নালা প্রভৃতির সংরক্ষণ করিবেন।

জুন মাসে কয়েকজন ভারতবাসী গত বৎসরের বন্দোবস্তের উপর ১,১০,০০১ টাকা অধিক দিয়া ইজারা লইবার প্রস্তাব করিল। তাহারা স্বীকার করিল যে, রাইয়তদিগের উপর তাহারা অসাধারণ কর বৃদ্ধি করিয়াছে প্রমাণিত হইলে, বর্দ্ধিত করের দিগুণ ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিবে। এই সকল সর্ত্তে তাহারা তিন বৎসরের জন্য পরগণা ইজারা লইতে চাহিল। এই প্রস্তাবসম্বন্ধে হলওয়েলের মন্তব্য ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুনের কার্য্য-বিবরণে দেখা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, জমী খাসে রাখিলে কোম্পানী কখনই তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন না। তৎপরে ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডকে প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, কোম্পানীর ক্ষতি না হয়, এরূপ ভাবে রাজস্ব পরিদর্শন করা কোন প্রতিভাশালী ও বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব। কেহই এককালে সর্ব্ববিষয়ে মন দিতে পারেন না। সুতরাং কতকগুলি লোককে বিশ্বাস করিতেই হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে সাধুতাসম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবসম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য লোকের হাতে সমগ্র জমীদারী পড়িবার সম্ভাবনা।

সেই ভয়ে তিনি স্বয়ং বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা অধিক দিবার প্রস্তাব করেন। উপসংহারে তিনি বলেন,—পরগণা পরগণা বিলি না করিলে লাভ হইবে না।

ইজারাদারগণ এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন ও বলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পুরুষানুক্রমে জমীদারীর ইজারাদার। তাঁহারা বহু কষ্টে জঙ্গল সাফ করিয়া—হিংস্র জন্তুর বাসভূমিতে বসতি বসাইয়াছেন। প্রজার সুবিধার জন্য তাঁহারা অনেকে জমীদারীতে গৃহনির্ম্মাণ করাইয়া তথায় আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন এবং বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া প্রজার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই প্রজাদিগকে তাঁহারা সন্তানবৎ ব্যবহার করিয়াছেন। ও তাহাদের সাহায্যে দেশে দস্যুতস্করের উপদ্রব নিবারিত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু দিন হইতে নবাবদিগের করবৃদ্ধিহেতু তাঁহারা উদ্বাস্ত হওয়ায় অনেক জমী পতিত রহিয়াছে। তাহাতে খাজনাও কমিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর সম্পত্তি-প্রাপ্তির সংবাদে তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছেন। তাঁহাদের আশা, কোম্পানীর অধীনে তাঁহারা জমীদারীর অসাধারণ উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

সুতরাং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের রাজস্ব-বিষয়ে যে সমস্যা উপস্থিত হয়—লর্ড কর্ণ-

ওয়ালিসের দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তাহার মিমাংসা হয় নাই। হয় কৃষকগণের প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে কি জমীদারদিগের নিকট হইতে খাজনা লইতে হয় নহে ত যে অধিক দিতে স্বীকৃত, সেই অর্থলোলুপ ইজারাদারদিগের নিকট টাকা লইতে হয়। কি করা কর্ত্তব্য ?

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব হলওয়েলের যুক্তি অখণ্ডণীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং ইংরাজগণ দ্বিতীয় পথের অনুসরণে কৃতসংকল্প হয়েন। স্থির হইল, জমীদারী ১৫টি ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিচারক্ষমতা জরিমানা, বাজেয়াপ্ত, গুপ্তধনপ্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষমতা খাসে রাখিয়া কোম্পানী অন্ততঃ তিন বৎসরের নিমিত্ত সাধারণ নিলামে সর্ব্বোচ্চহারে জমিদারী ইজারা দিবেন। নিলাম টাউন হলে হয়। তাহার ফল নিম্নে লিখিত হইল—

পরগণা	ধার্য্য দর	ক্রেতা	টাকার পরিমাণ
মগুরা	১,০২,০০০	রাধাকৃষ্ণ মল্লিক	১,২৬,১০০
মুড়াগাছা	৮৯০০০	সামুয়েল গৃফীথ	১,২০,০০০
আজীমাবাদ	৭১,০০০	সুখদেব মল্লিক	৮০,৫০০
গৌড়	১৪,০০০	চাঁদ হালদার	১৭,০০০
দেদুনমল ও একবরপুর	৫৭,০০০	জে, জেড, হলওয়েল	৭২,০০০
গয়েসপুর	১০,০০০	এডওয়ার্ড হাণ্ডেলস	১৫,০০০
হাতিয়াগড় ও জেইদা	৫০,০০০	জে, জেড, হলওয়েল	৫১,৫০০
বুরিজহাটী ও এক্তিয়ারপুর	৫০,০০০	কুন্দ ঘোষাল	৭০,০০০
মামুদানীপুর	৩০০	রামচরণ নাই	৬০০
লাপুর	১১,০০০	সাপুনিরাম বিশ্বাস	১৩,৩০০
শানগর	৭,০০০	রামচরণ নাই	১০,৩০০
দক্ষিণ সাগর	২,০০০	রাধাকৃষ্ণ মল্লিক	৩,৮০০
বালিয়াবাসন্দী	৫৩,০০০	রামসন্তোষ সরকার	৭০,০০০
কলিকাতা, মানপুর, বৈকান ও হাবদিসার	৪৫,০০০	রাধাচরণ মল্লিক	৮১,৫০০
পিকাকুলী	২১,০০০	বলরাম বিশ্বাস ও ভবাণীচরণ ঠাকুর	৩৩,৪০০

মোট.........সিক্কা তঙ্কা ৭,৬৫,৭০০

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর সভা নবপ্রাপ্ত জমীদারীর কার্য্যপরিচালনের নিমিত্ত একটি সমিতি সংগঠিত করেন। এই সমিতি দেখিলেন যে, পূর্ব্বে চারি লক্ষ মুদ্রা রাজস্বপ্রসূ একটি পরগণা হইতে মাত্র ২৯২৫ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। এইরূপ ব্যাপারে বিচলিত হইয়া কোম্পানী নিজহস্তে রাজস্বভার গ্রহণ করিলেন।

ভেরলেষ্টের হিসাবে সমুদায় খরচ বাদে কোম্পানীর জমিদারীতে নিম্নলিখিত মুনফা দাঁড়াইল।

মে হইতে এপ্রেল মাসের শেষ পর্য্যন্ত			টাকা
১৭৬০-৬১ সালে প্রাপ্ত		,,	৭৩০,৫৯১
১৭৬১-৬২	,,	,,	৫,৯৭,৩৫৫
১৭৬২-৬৩	”	”	৪৮৬,৩৫২
১৭৬৩-৬৪	”	”	৭৪০,৪৭৩
১৭৬৪-৬৫	”	”	৯৭৯,৩৪৯
১৭৬৫-৬৬	”	”	৬০২,৪৫৯
১৭৬৬-৬৭	”	”	৮০১,৫৭১
১৭৬৭-৬৮	”	”	১,১১৬,২৯৫
১৭৬৮-৬৯	”	”	১,০৩০,৪৬৪
১৭৬৯-৭০	”	’	১,০৪২,৮৪৫

ভেরলেষ্ট বলেন যে, প্রথমে নবাবের ও পরে ক্লাইবের মোট পাওনা ২,।১২, ৩৩২ সিক্কা তঙ্কা নিয়মিত ভাবে প্রাপ্তি না হওয়াই ১৭৬০ হইতে ১৭৬৬ সাল পর্য্যন্ত রাজস্ব কমবেশী হওয়ার কারণ। ১৭৬৬ সালে শেষ তিন বৎসরের রাজস্বের বৃদ্ধি হওয়া ভেরলেষ্টকৃত বন্দোবস্তের ফল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে লর্ড ক্লাইবের জয়েগীরসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ক্লাইব ওমরাহ হইলে তিনি তাঁহার নবপ্রাপ্ত পদোপযোগী ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু জায়গীর-প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরাশ হইয়া তিনি ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী ও মহাজন শেঠদিগের নিকটে তাঁহার জায়গীরপ্রাপ্তিবিষয়ে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। তদুত্তরে ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহারা লিখেন যে, তাঁহারা ক্লাইবের জায়গীরপ্রাপ্তির নিমিত্ত নবাবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। নবাব বঙ্গ ও উড়িষ্যার দারিদ্র্যহেতু এ দুই প্রদেশে জায়গীর না দিয়া বিহারে জায়গীর দিবেন। সেই বৎসরেই যুবরাজ মহম্মদ আলি গহর, যিনি পরে সম্রাট সাহ আলম নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, সৈন্য সমভিব্যবহারে মীরজাফরের উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশ্যে বিহারে আগমন করিলেন। তিনি বিহারে আসিয়া ক্লাইবকে স্বপক্ষে আনিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। ক্লাইব কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া ৫০০ য়ুরোপীয় ও ২৫০০ দেশীয় সৈন্যসহ পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পাটনা সহর পুনরুদ্ধার করতঃ মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। এক্ষণে নবাব মীরজাফর হয় কৃতজ্ঞতাব অনুরোধে অথবা ক্লাইবের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়করণোদ্দেশ্যে ২৪ পরগণা নামে বিখ্যাত ভূখণ্ড তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে যে, যখন জমীদারীরূপে কোম্পানীর হস্তে ঐ সকল পরগণা ন্যস্ত হয় তখন সনন্দে নবাবের কোষাগারে বার্ষিক ২,২২,৯৫৮ টাকা দেওয়া ধার্য্য হয়। ক্লাইব জায়গীর প্রাপ্ত হইলে ঐ টাকা নবাবকে না দিয়া ক্লাইবকে দিবার ব্যবস্থা হইল। পরে যখন ইংলণ্ডে কোম্পানীর সহিত ক্লাইবের বিবাদ হয় তখন ক্লাইবের ঐরূপে টাকা পাইবার অধিকার-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। কিন্তু যে কানও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিলেন যে, মীরজাফরের

যে অধিকারে কোম্পানীকে জমিদারী প্রদত্ত হইয়াছিল সেই অধিকারেই ক্লাইবকে জায়গীরও প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, ক্লাইব নিশ্চয়ই এ কথা জানিতেন যে, তিনি কখনই একই সময়ে কোম্পানীর কার্য্যকারক ও জমীদার হইতে পারেন না। কিন্তু ক্লাইব কখনও এ কথা ভাবেন নাই। এই বিবাদের ফলে কোম্পানী তাঁহাকে রাজস্ব দান বন্ধ করিলে তাঁহার উহা লাভের কোনও উপায় ছিল না। কারণ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন তারিখের সনন্দদ্বারা স্থির হয় যে, ক্লাইব ১০ বৎসরের জন্য জায়গীর ভোগ করিবেন। তৎপরে বা ইতোমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে উক্ত জায়গীর কোম্পানীর বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইরূপে ২৪ পরগণা প্রথমে ইংরাজের হস্তগত হয়।

প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা।

—(:০:)—

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে মোগলসেনার অধিনায়ক মহারাজ মানসিংহ শিলাময়ী যশোহরেশ্বরী দেবীকে স্বীয় রাজধানী অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন—শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পূর্ব্বাপর এই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জয়পুর রাজকীয় দপ্তরে প্রাপ্ত 'বংশাবলী' নামক পুরাতন পুঁথি-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অম্বরের শিলাদেবী যশোহরেশ্বরী নহেন—ইনি বারভুঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী আজিও ঈশ্বরীপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার পুরাতন কালের সেবাইতের বংশধরগণকর্ত্তৃক সেবিত ও পূজিত হইতেছেন। যশোহরেশ্বরী ব্যতীত প্রতাপাদিত্যের লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র ও রাজরাজেশ্বর চক্র নামক দুই গৃহদেবতা ছিলেন। কিন্তু এখন বিগ্রহদ্বয়ের একটিও যশোহরে নাই—লক্ষ্মীনারায়ণ খুলনা জিলার মূলঘর গ্রামে এবং রাজরাজেশ্বর ফরিদপুরের কাজুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। বিগ্রহ দুইটি কি সূত্রে, কোন্ সময়ে, কে যশোহর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে, কিরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন এ স্থলে আমরা সেই কথা বলিবার প্রয়াস পাইব।

সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপূর্ব্ব জমীদার বৈদ্য রায়চৌধুরী বংশের স্থাপয়িতা জানকীবল্লভ সরকার খড়রিয়া পরগণার অন্তর্গত মূলঘরে নিকট কোনও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করিতেন। তৎকালে এ অঞ্চলে বহু ব্যবসায়ী

ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত—ভদ্রলোক খুব কমই ছিলেন। এই খড়রিয়া পরগণা যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল; সুতরাং প্রজাদের অভাব অভিযোগ তাঁহার নিকটই করিতে হইত। এক সময়ে এ প্রদেশে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় পরগণার প্রজাবর্গ একযোগে তাহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া মহারাজের নিকট আবেদন করিলে মহারাজ এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার রামদাস দেওয়ান নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত করেন। রামদাস পরগণায় উপস্থিত হইয়া তদন্তে প্রজাবর্গের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া মূলঘর গ্রামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। * এই স্থানেই জানকীবল্লভের সহিত রামদাসের আলাপ পরিচয় হয়। এক দিনের আলাপেই দেওয়ান জানকীবল্লভের বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া জলাশয়-খনন-কার্য্যের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিলেন। জানকীবল্লভের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল।

জানকীবল্লভের কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া দেওয়ান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আপনি এরূপ কুৎসিতস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? আমার সহিত রাজধানীতে চলুন। আপনি যেরূপ বিচক্ষণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনি উন্নতি করিতে পারিবেন।" জানকীবল্লভ দেওয়ানের সহিত যশোহরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় রাজকীয় জরিপী সেরেস্তায় মোহরেরে কার্য্য নিযুক্ত হইয়া কার্য্যদক্ষতাগুণে কালে প্রধান কানন গুইর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন 'কল্পতরুযাগ' আরম্ভ করেন, তখন জানকীবল্লভের উপর অনেক কার্য্যের ভার ছিল। এবারও সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করেন। মহারাজা জানকীবল্লভের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোনও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলায় জানকীবল্লভ সময় বুঝিয়া সুলতানপুর খড়রিয়া এবং বেনকুলিয়া প্রভৃতি পরগণার জমীদারী প্রার্থনা করেন। মহারাজ ও

*মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খনিত সেই জলাশয় এখনও মূলঘর গ্রামে বর্ত্তমান। কয়েক বৎসর হইল খুলনা জিলা বোর্ড কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত হইয়া ইহা গ্রামের 'রিজার্ভ ট্যাঙ্ক' হইয়াছে।—লেখক

ঐ পরগণাগুলির জমীদারী-সনন্দসহ 'মজুমদার' উপাধি প্রদান করিয়া জানকীবল্লভকে সম্মানিত করেন। জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া জানকীবল্লভ মূলঘরে বাসস্থাননির্ম্মাণ করিয়া পরগণা শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর দিল্লীর সম্রাটের সহিত যশোহরশ্বরের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইল তখন তৎকালীন প্রথানুসারে মহারাজ অধীনস্থ জমীদারদিগের নিকট রসদ, সৈন্য ও নৌকা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজাদেশে জানকীবল্লভও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নৌকা ও রসদ লইয়া স্বয়ং যশোহরে উপস্থিত হইলেন। জানকী-বল্লভ কেবল যে নৌকা, সৈন্য ও রসদ যোগাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। মোগল সেনাপতি মানসিংহের সহিত শেষ যুদ্ধের সময় তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপাদিত্যের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, আর বিজয়ী মোগল বাহিনী 'আল্লা-হো-আকবর' রবে দিক্ প্রক-ম্পিত করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশোদ্যত হইল। জানকীবল্লভ দেখিলেন, রাজা গিয়াছেন; এখন বুঝি রাজার গৃহ-দেবতাও মুসলমান হস্তে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েন। তাই তিনি অতি দ্রুত দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ও 'রাজরাজেশ্বর' 'চক্র' নামক শালগ্রামশিলা দুইটি আনিয়া একেবারে স্বীয় বাসভূমি মূলঘরে প্রস্থান করিলেন। জানকী-বল্লভ বিগ্রহদ্বয়কে তথায় রীতিমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার ও পূজার ব্যয় নির্ব্বাহজন্য স্বীয় জমীদারী হইতে কতকটা জমী দেবোত্তর করিয়া দেন। ইহার পরে জানকীবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরগণমধ্যে যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায় তখন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গৃহদেবতাদ্বয়ও বিভক্ত হইয়া 'লক্ষ্মী নারায়ণ' "দশ আনী" অংশের ও 'রাজরাজেশ্বর' "ছয় আনী" অংশের হস্তে আইসেন। কিছু দিন পরে ছয় আনী অংশের প্রধান শাখা মূলঘর হইতে উঠিয়া গিয়া ফরিদপুর জিলার কাজুলিয়া গ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। মূলঘর হইতে যাইবার সময় ইঁহারা 'রাজরাজেশ্বরকে' লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতেই 'রাজরাজেশ্বর' কাজুলিয়া গ্রামে বাস করি-তেছেন। 'লক্ষ্মীনারায়ণ' এখনও মূলঘর গ্রামে থাকিয়া দশ আনী শাখার সরিকগণ কর্ত্তৃক পালাক্রমে পূজিত হইতেছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এখন বিত্তচ্যুত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও তাঁহারা সেই দেবোত্তরের উপস্বত্বে অতি ভক্তির সহিতই বিগ্রহদ্বয়ের সেবা পূজা চালাইয়া আসিতেছেন।

জানকীবল্লভের অন্যতম বংশধর শ্রীযুত বসন্তকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মূলঘরের বাটীতে আমরা 'লক্ষ্মীনারায়ণ' দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। যিনি সুশিক্ষাগুণে যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, যাঁহার নামে ফিরিঙ্গি, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণ ব্যাধভীত পশুসম দিশাহারা হইয়া পলায়ন করিয়াছিল—যাঁহার প্রবল প্রতাপে দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল সেই অমিততেজা যশোহরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ কোথায়—আর কোথায়ই বা তাঁহার সেই অতি সাধের অতি গৌরবের পবিত্র গৃহদেবতা 'লক্ষ্মীনারায়ণ ও 'রাজরাজেশ্বর' বিগ্রহদ্বয়! সকলই কালের গতি।*

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

---

* সেনহাটী 'পীতাম্বর লাইব্রেরীর' মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১—১০ ফর্ম্মা ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা ও ১১ ফর্ম্মা প্রজাপতি প্রেসে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার দ্বারা মুদ্রিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(২)

আমরা বলিয়াছি, হাসির গানে—ব্যঙ্গবিদ্রূপ-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ সাহিত্যে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ-রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরদিনই ছিল। সমাজিক অবস্থায় সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়—এ কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ রচনার উৎস স্বতঃই উৎসারিত হইত। কারণ, তখন বাঙ্গালার সমাজে আনন্দের অধিক অবকাশ ছিল; বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ ছিল—বাঙ্গালীর দুর্ভাবনা এত অধিক ছিল না। ভারতচন্দ্র হইতে দাশরথি পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কবিকুলের রচনায় হাস্য-রসের—ব্যঙ্গবিদ্রূপনিপুনতার পরিচয়ের অভাব নাই। 'অন্নদমঙ্গলে' "পাকা দাড়ি বুড়া" শিবকে বর সাজাইবার সময় সদানন্দ নারদ বলিতেছেন—

"জটাজুটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা।"

'মানসিংহে' চন্দ্রমুখী ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন—

"সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥"

'শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জনে' দাশরথি হাতুড়ে বৈদ্যের বর্ণনা করিয়াছেন—

"হাতুড়ে বলেন, ধরি হাত, এতো ঘোর সান্নিপাত!
দধির মাত শীঘ্র আনতে হয়।
আগে লয়ে দক্ষিণার কড়ি ঘর্ষণ করিয়া বড়ি,
দর্শন করান যমালয়॥
যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে,
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃৎ-প্লীহা-পাতে
ঔষধের দোষে ভুগি অন্ন থাকতে মরে রোগী,
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে।"

এ সব রসিকতা একটু মোটা। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বা বাঙ্গালীর কথায় যে মিহি রসিকতা ছিল না—এমন নহে—যথেষ্ট ছিল। চুটকী গল্পে

উদ্ভট শ্লোকে, রসসাগরের মত কবির কবিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তখন সাহিত্যে মোটা রসিকতাও চলিত। ইংরাজী সাহিত্যে যেমন সেক্সপীয়ারের নাটক হইতে ড্রাইডেনের খণ্ডকাব্য পর্য্যন্ত রচনায় মোটা রসিকতা যথেষ্ট চলিত, এ দেশেও তেমনই কবিকঙ্কণের কাব্য হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও দীনবন্ধুর নাটক পর্য্যন্ত রচনায় মোটা রসিকতা অবাধে চলিত।* ইহা সমাজের সবলতার ও সরলতার পরিচায়ক কি না বর্ত্তমান রচনা তাহার বিচারের স্থান নহে। এই বিবিধ রসিকতার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দীনবন্ধু-জীবনীতে' বলিয়াছেন, "আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গপ্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেট খানি বাহির করিয়া, কখন্ কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর,

* সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে মোটা রসিকতায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। যে সময় সমাজে মোটা রসিকতা চলিত ছিল, সে সময়ের কথায় আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ওরফে গুড়্ গুড়ে্ ভট্‌চায্যি যে, 'রসরাজ' রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপাঠ্য। কিন্তু সে সময়ে ধনীর আসরে, বিষয়ী লোকের বৈঠকখানায় এই সকল রচনা পঠিত হইত। * * অত কথায় কায কি, স্বভাব-কবি ধীরাজ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল, সে গানটি এত রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়া বলিতেন, 'ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত। সেই যে, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়াছে।' ধীরাজ তখনই সভার মধ্যে গান ধরিত—

'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,
পরাশরের * * * দিয়েছে।'

গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য।" (পুরাতন প্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত)

শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র।"

বিদ্রূপ শক্তিশালী সাহিত্যিকদিগের হস্তে ভীষণ অস্ত্র। সমালোচনার তীব্র দংশন কীট্‌সকে ভগ্নহৃদয় করিয়াছিল—কিন্তু সমালোচকের পৃষ্ঠে বায়রণের চাবুকের চিহ্ন আজও মুছে নাই। থ্যাকারে "ধোপ কাপুড়ে-দিগকে" সাহিতের চাবুকে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। ডিকেন্স কুপ্রথার নিবারণ-কল্পে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। অস্মদ্দেশে এই জাতীয় রসিকের মধ্যে দীনবন্ধুর তুলনা নাই। কিন্তু রসিকতা সর্ব্বত্র শত্রুর মাথার খুলি ফাটাইবার জন্য লাঠি চালান নহে—অনেক স্থলে কেবল নৈপুণ্যপ্রকাশ—তাহাতে কেবল "হাতকা তারিফ" দেখা যায়। লিলি বলিয়াছেন, পরিহাস-রসিক শিল্পী; তিনি হাসিতে হাসিতে সংসার ও মানবসম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।*

পরিহাসকে—ব্যঙ্গবিদ্রূপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া খেয়ালের চটুল চাঞ্চল্য প্রকাশ, দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া কল্পনার আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয় প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রথম প্রকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অপেক্ষা ব্যাপক।† বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত মন্তব্যে এ কথাটা তুলেন নাই; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যে উভয়বিধ পরিহাসে—বিশেষতঃ পরিহাসনৈপুণ্যপ্রকাশে সিদ্ধবিদ্য ছিলেন, তাহা তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বুঝাইয়াছেন—"ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউ-রোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। * * * * ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া

* Four English Humourists.

† Wit may be regarded as a play of fancy addressed to the intellect; whereas humour is a play of imagination addressed to the emotions; and just as imagination includes but transcends fancy, and emotion includes but transcends thought, so humour includes but transcends wit"—Morton Luce.

কাহকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সব-টাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। * * অন্যত্র তাও না কেবল আনন্দ।" যিনি "শক্রতা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না" তিনি মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দ্বিবিধ রসিকতাতেই পটু ছিলেন। আবার একই প্রকারের রসিকতার প্রকারভেদও ছিল। যখন তিনি গ্রন্থকারস্য পৃষ্ঠে 'বঙ্গদর্শনের' কশাঘাৎ করিতেন তখন রসিকতার এক রূপ। আর যখন তিনি সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে "গুলঞ্চের পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহু-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষস্থলে ধারণ করি"—উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—"এমন পিত্তনাসক উপমা কস্মিনকালে দেখি নাই" তখন রসিকতার অন্য রূপ।

বঙ্কিমচন্দ্র মোটা রসিকতার স্থানে মিহি রসিকতাকে বরণ করিয়া বসাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকার পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।" এ কথা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইলেও ভিত্তিহীন নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গ সাহিত্যে—বাঙ্গালীর কথায় যে নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য ছিল না, এমন নহে—তবে মোটা রসিকতার যথেষ্ট চলন ছিল। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব

হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্তিমান হইয়া উঠে; যে বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।" 'লোকরহস্যে,' 'কমলাকান্তের দপ্তরে' ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ উপন্যাসে তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপপরিহাসের ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোথাও কুপ্রথার বা ভ্রান্ত মতের বিনাশজন্য কোথাও বা কেবল আনন্দের জন্য হাস্যরসের ব্যবহার করিয়াছেন; রস যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে রস সর্ব্বত্র শুভ্র—সংযত—নির্ম্মল। কোথাও তাহা সুসঙ্গতির বা শীলতার সীমা অতিক্রম করে নাই। এমন কি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনের' কবিতার ছায়া দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় দেখা গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "তোমারি বিরহে" গানে মজলিসে হাসির তরঙ্গ বহিত—আজও বহে। 'বঙ্গদর্শন' ১ম ভাগে "বিরহিণীর দশ দশা" কবিতায় আছে, বিরহিনী প্রথম দশাদিনে আকুল রোদনের পর—

"পঞ্চম দশা দিনে বান্ধি চারু কবরী,
ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের।
ষষ্ঠম দশাদিনে পিঠা পুলি বানাওল
কাঁদিতে ২ তার গিলিল তিন সের।"

আর

অষ্টম দশা দিনে বিরহ-বিষাদিনী
মন দুঃখে কিনিল ইলিস।
তিতিয়া নয়নজলে ভাজায় ঝোলে অম্বলে
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত যুগের সাহিত্যিক—পরিহাস-রসিক। তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপে—পরিহাসে পারদর্শী;—তাঁহার সমসাময়িক কালে এ বিষয়ে তাহার সমান কেহ ছিলেন না। তাঁহার "বিলেত ফের্ত্তা ক ভাই" কোন অংশে ঈশ্বর গুপ্তের—

"যখন আসবে শমন করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে?

বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে,
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে ?"

অপেক্ষা তীব্রতায় হীন নহে। * আবার তাঁহার "যাচ্ছিল সে ঘোষেদের ঐ পুকুরপাড় দিয়ে" —কেবল ইয়ারকি। কিন্তু তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার হাসি প্রায় সর্ব্বত্র নির্ম্মল শুভ্র - সংযত। তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও রচনায় বিদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনায় রস উছলিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু হাসির কবিতা লিখিয়া তিনি যত লোককে হাসাইয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক লোককে চটাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সে বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান ছিলেন।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতায় যে বিশেষত্বের কথা বলিয়াছি, তাহাতেই তাঁহার শক্তি সপ্রকাশ। কিন্তু তাঁহার শক্তিকেন্দ্রেই তাঁহার দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত ছিল। এ বিষয়ে তিনি বিদেশী আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছিলেন।

* বহুদিনপূর্ব্বে শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইঙ্গবঙ্গকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন—

"ইংরাজী সং সাজি শিকল টুটিতে বঙ্গ চাহে।
বিলাতে পালাতে ছটফট করে অঙ্গদাহে॥
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছু হয় না॥
বিনা হ্যাটটা কোট্‌টা ধুতি পিরহণে মান রয় না॥
পিতা মাতা ভ্রাতা নব শিশু অনাথা ছুট্ করে,'
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কোর্ত্তা বুট পরে'॥
সিগারে উদ্‌গারে মুহু মুহু মহা ধূমলহরী।
সুখ-স্বপ্নে আপনে বড় চতুর মানে হরি হরি॥
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে।
কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে॥
বিহারে নীহারে বিবিজন সহ 'স্কেটিঙ্গ' করি।
বিষাদে প্রাসাদে পরিজন রহে জীবন ধরি॥
ফিরি এসে দেশে গজকলর বেশে হট হটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে॥
মহা আড়ি সাড়ি নিরখি, চুল দাড়ি সব ছিঁড়ে।
দু'টা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে॥"

এই অনুকরণের ও অনুসরণের ফলে তাঁহার কবিতার ছন্দ ও গানের সুরও সময় সময় বিদেশী হইত। আমার মনে আছে, বিলাত হইতে ফিরিবার অল্পদিন পরে তিনি এক দিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে স্বরচিত একটি হাসির গান শুনাইতেছিলেন। সুরটি নিতান্ত অপরিচিত বোধ হওয়ায় লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে সুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, সুরটা বিলাতী। যে সুর লাহিড়ী মহাশয়ের কাণেও বাজিয়াছিল সে সুর দেশের জনসাধারণের কাণে অবশ্যই বাজিবে। অপ্রিয় সুরের অন্তরায় ভেদ করিয়া কয়জন গানে হাস্যরস উপভোগ করিতে অগ্রসর হইবে?

আমাদের বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব বড় পরিস্ফুট। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'সেকাল আর একাল' পুস্তিকায় লিখিয়াছিলেন, "এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার কোন কোন কাব্যে পূর্ব্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালীর কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। * * মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। * * আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে 'পৌষপার্ব্বণে' যে একটা সুখ আছে 'বৃত্রসংহারে' তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই।" সেই জন্যই আজিকার দিনের এই অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সমাজে সসঙ্কোচে অবস্থান করে—যাহারা দেশের মেরুদণ্ড দেশের সেই জনসাধারণের উপর তাহার কোন প্রভাব নাই—সেই জনসাধারণের নিকট তাহার আদর নাই। আমরা আজ কাল শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝি সেইরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা কত? এ অবস্থা যে সাহিত্যের সমুন্নতির বিঘ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের সাহিত্যিকগণ যে এই বিষম বিঘ্নও অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত ও পারগ হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু ইহাতে

জাতীয় সাহিত্য সংগঠনে বিলম্ব অনিবার্য্য। যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিদেশী আদর্শে উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন আনন্দের উপাদান সঞ্চিত করিয়াছিলেন—যে বঙ্কিমচন্দ্র "ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে" জানিয়াও বিদেশী শিক্ষাপ্রসূত নব্য রুচির অনুরোধে গুপ্ত কবির কবিতা-সংগ্রহে উহা বাদ দিতে গিয়া তাঁহার কবিতাতে নিস্তেজ করিয়াছিলেন এবং আপনার রচনা হইতে সমসাময়িক রুচির ছাপ সর্ব্বপ্রযত্নে মুছিতে চাহিয়াছিলেন—যে বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের সমুচ্চ সিংহাসনে সমাসীন তিনিও এ কথা বুঝিয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়া ছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও বহু দূরে।

"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

'সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।'

"তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

যে সাহিত্যে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তৃপ্তি হয় নাই সে সাহিত্যে জনসাধারণের তৃপ্তির সম্ভাবনা আছে কি? নাই বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র হইতে



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



দীনবন্ধু মিত্র

রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের পাঠকসংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই।

যদি সাধারণ সাহিত্যসম্বন্ধে—উপন্যাসকাব্যনাটকসম্বন্ধে এই কথা বলিতে হয়, তবে হাসির রচনাসম্বন্ধে এ কথা আরও কত প্রযোজ্য: লোক ইচ্ছা করিয়া—চেষ্টা করিয়া—আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের জন্য সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। আমরা বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চাও করিয়া থাকি। কিন্তু রসিকতা যে রচনার প্রাণ সে রচনা-সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। যে রসিকতা আমাদের ধাতুতে নাই সে রসিকতা সাধারণের প্রীতিপ্রদ হয় না, সাধারণের প্রীতিপ্রদ না হইলে রসিকতা ব্যর্থ বলিতেই হয়। তাই বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তিকেন্দ্রেই তাঁহার দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত ছিল। "আপনার অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।" কিন্তু সে অধিকারের আয়তন কতটুকু? বিদেশী আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া খাঁটি স্বদেশী রসিকতার অবতারণা করিতে পারিলে "সোণায় সোহাগা" হয়। সে চেষ্টায় অনেকাংশে সফলতালাভ করিয়াছিলেন—'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু; আর সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন 'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল সে চেষ্টা করেন নাই। তাই ইহারই মধ্যে তাঁহার দীর্ঘ হাসির কবিতাগুলির আদর কমিয়াছে; তাই তাঁহার হাসির গানগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয় না। এ বিভাগে তাঁহার জন্যে যথেষ্ট যশোলাভ হয় নাই। এখন আমরা শিক্ষিত বলিলে যে সম্প্রদায়ের লোক বুঝি, সে সম্প্রদায়ের পরিসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নব্য বঙ্গের নূতন সাহিত্যের সমাদরও বর্দ্ধিত হইবে। আজ কাল যে সকল প্রতিভাবান বাঙ্গালী লেখক—কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক—সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ পাঠকসম্প্রদায়ের সমাদর লাভ করিয়াই ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সাহিত্যের সম্পদসম্বর্দ্ধনে সচেষ্ট তখন তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসানে শান্তিলাভ করিবেন—আর তাঁহাদের রচনায় তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইবে। তখন কালের অগ্নিপরীক্ষায় যাহা অসার—অযোগ্য তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে,—সাহিত্যাকাশে

"নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।"

তখন কেবল অমিতজ্যোতিঃ জ্যোতিষ্কের আলোকে সাহিত্যাম্বর উজ্জ্বল থাকিবে। "The great and good do not die, even in this world embalmed in books their spirits walk abroad

স্মৃতি।

১

অফিসের বৃদ্ধ দপ্তরী সিরাজুদ্দিনকে আমরা "গেজেট" বলিতাম। সহরের সকল সংবাদ সে আনিয়া দিত। বার্দ্ধক্যের বাগ্বাহুল্য বশতঃ সে কথা কহিতে পারিলেই সুখী হইত। এক দিন কিছু বিলম্বে আফিসে আসিয়া সে বলিল, "গতরাত্রিতে রাফি উদ্দীন আহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে।"

এই সংবাদ শুনিয়া আমি যেন একটু দুঃখ অনুভব করিলাম। সাত বৎসর আমি দিল্লীতে আসিয়াছি; পেন্সনভোগীদিগের বৃত্তি দেওয়া আমার কায। এই সাত বৎসর আমি রাফি উদ্দীন আহম্মদকে দেখিয়া আসিয়াছি। প্রত্যেক মাসে কত লোক বৃত্তি লইতে আসিয়াছে; কেহ বৃদ্ধ, কেহ অতি বৃদ্ধ, কেহ শিষ্ট, কেহ উগ্র—কিন্তু রাফি উদ্দীনের যে বৈশিষ্ট ছিল তাহা আর কাহারও ছিল না। রাফি উদ্দীনও বৃদ্ধ। বৃদ্ধ মোগলের বর্ণ গৌর, কেশ শুভ্র, বেশ দুগ্ধধবল। তাহার মুখে বিষণ্ণভাব; জরা তাহার নয়নের প্রদীপ্ত দীপ্তি ম্লান করিতে পারে নাই; তাহার ব্যবহারে বিনয় ও শিষ্টতা সপ্রকাশ—কিন্তু সেই বিনয়ের ও সেই শিষ্টতার মধ্যে আত্মসম্মানজ্ঞান ও আত্মনির্ভরতা ফুটিয়া ছিল। তাহাকে দেখিলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিত; সহস্র লোকের মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট চিত্ত আকৃষ্ট করিত। রাফি উদ্দীন আসিলে আমি সর্ব্বাগ্রে তাহার কায শেষ করিয়া দিতাম। মাসে এক দিন আফিসে তাহার সহিত দেখা হইত। পথে কখনও তাহার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে উচ্চ বংশসম্ভূত মুসলমানের স্বাভাবিক ভদ্রতাসূচক অভিবাদন করিত কিন্তু পথে রাফি উদ্দীনের সহিত আমার যে বহুবার সাক্ষাৎ হইত—এমন নহে; কারণ, খঞ্জ রাফি উদ্দীন নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাহির হইত না। আজ সহসা তাহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিলাম; বলিলাম, "আহা, বেচারার মৃত্যু হইল!"

সিরাজুদ্দিন বলিল, "বেচারা এত দিনে মুক্তি পাইল।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"আপনি বুঝি তাহার ইতিহাস জানেন না? সে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার আপনি অবশ্য দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের কথা শুনিয়াছেন?"

"হাঁ। ইতিহাসে বাহাদুর শাহের কথা পড়িয়াছি। তিনি—"

আমার কথায় বাধা দিয়া সিরাজুদ্দিন বলিল, "বাবু সাহেব,কেতাবের কথা বলিবেন না। বাঁশী যেমন যে বাজায় সে যাহা বলায় তাহাই বলে, কেতাব তেমনই যে লিখে সে যাহা বলায় তাহাই বলে। কোরান ব্যতীত কোন কেতাবকে বিশ্বাস করিতে নাই। আপনাদের কেতাবকে লিখে, বাহাদুর শাহ মোগলের নষ্ট প্রতাপ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ সে চেষ্টা করিলে—সে চেষ্টা করিতে জানিলে ফল কি হইত বলা যায় না। চেষ্টা করিয়াছিলেন বাহাদুর শাহের বেগম জিনাতমহল আর তাঁহার তরুণবয়স্ক আত্মীয়—বাদশাহ-বংশীয় যুবক সুজাউদ্দৌলা। এই সুজাউদ্দৌলাই রাফীউদ্দীনের জীবন ব্যাপী দুঃখের কারণ। এই সুজা উদ্দৌলার কন্যার স্মৃতি রাফি উদ্দীনের সীমাহীন সুখ—দুর্দ্দমনীয় দুঃখ। সে কথা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর ও বিমুগ্ধকর।"

বাস্তবিকই রাফি উদ্দীনের জীবনের ইতিহাস প্রেমসুরভিত উপন্যাসকেও পরাভূত করে।

২

সিপাহী-বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। যোদ্ধা বাবর তরবারি করে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ভারতে আসিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিলাসী বাহাদুর শাহ সে রাজ্য হারাইয়া সাগরপারে বন্দিদশায় জীবন শেষ করিতে নির্ব্বাসিত হইলেন। রাজনীতির সতরঞ্চ খেলায় এমন হইয়াই থাকে।

ইংরাজ ভারতবর্ষ অধিকার করিলেন, দেশে নূতন ব্যবস্থার পত্তন করি-করিলেন; লোকে মোগল বাদশাহের কথা ভুলিতে লাগিল। রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন হইল। কেবল সুজা উদ্দৌলা সে কথা ভুলিতে পারি-লেন না। ব্যর্থ চেষ্টার দারুণ দংশন তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তিনি কেবলই কি ভাবিতেন; দুই তিনজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। তিনি যেন দুনিয়ার উপর বিরক্ত; সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইতেন—রাগিলে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিতেন। তাঁহার ব্যব-হারে ব্যথিতা তাঁহার পত্নী বোধ হয় সেই ব্যথাতেই অকালে কালগ্রাসে পতিতা হইলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান পঞ্চম বর্ষীয়া দুহিতা বৃদ্ধা দাসীর যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল।

এই দাসীই মেয়েটির নাম রাখিয়াছিল—গুলবদন। লোক বলিত, যৌব-

নের লাবণ্যশ্রীসম্ভূষিতা হইলে গুলবদন সৌন্দর্য্যে সাহজাহানের প্রেয়সী মমতাজমহলকেও পরাজিত করিবে। হইলও তাহাই। বালিকার বয়স যত বাড়িতে লাগিল—তাহার সৌন্দর্য্য তত সম্পূর্ণতা লাভ করিতে লাগিল। শেষে সে সৌন্দর্য্যে যখন যৌবনের লাবণ্যশ্রীর যোগ হইল—তখন যেন বিকশিত শতদলে বসোরার গোলাপের সৌরভ সংযুক্ত হইল।

বৃদ্ধা দাসী এক দিন সুজা উদ্দৌলাকে কন্যার বিবাহের কথা বলিল। সুজা উদ্দৌলার যেন সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ভাবিলেন, তাই ত! মেয়ে এত বড় হইয়াছে? তিনি পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। বাদশাহের আত্মীয় সুজা উদ্দৌলার সঙ্গতি যত থাকুক আর না-ই থাকুক সম্মান-জ্ঞানটা অতিরিক্তই ছিল। যথেষ্ট দাসদাসীর অভাবে তাঁহার গৃহ আর পরিচ্ছন্ন থাকিত না—উদ্যানে গোলাপকুঞ্জে গাছ মরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, স্বচ্ছ-সলিলসম্পন্ন আকাশের মত শ্যামল সরোবরের সোপান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—জল শৈবালসমাচ্ছন্ন হইতেছিল, নীল বৈদূর্য্যবর্ণ কোমল তৃণমণ্ডিত প্রাঙ্গণে কণ্টকগুল্ম দেখা দিয়াছিল। বিরাট গৃহের বিজনভাব বিগত গৌরবের স্মৃতি বক্ষে লইয়া বিষণ্নতাই বিকীর্ণ করিতেছিল। আর সেই গৃহের গৃহস্বামীও গৃহেরই মত কেবল অতীত সম্পদের স্মৃতি লইয়া বিভোর ছিলেন। তিনি বাদশাহের আত্মীয় ব্যতীত কাহারও সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না—শূন্য সম্মানের জন্য কন্যার সুখ পদদলিত করিবেন। এমনই তাঁহার ভ্রান্ত সম্মানজ্ঞান।

৩

সুজা উদ্দৌলা যখন দিল্লীর হৃতসম্পদ রাজ পরিবারে কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করিতেছিলেন, যুবতী গুলবদনের হৃদয়ও তখন প্রেম প্রদানের পাত্র সন্ধান করিতেছিল। সে পাত্রও পাইয়াছিল। সে পাত্র—রাফি উদ্দীন। সুজা উদ্দৌলা যে দুই তিনজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না রাফি উদ্দীনের পিতা তাঁহাদিগের একজন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য লোক তাঁহার প্রশংসা করিত। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি—নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র—সুদর্শন ছিলেন। পিতার সহিত বালক রাফি উদ্দীন সুজা উদ্দৌলার গৃহে যাইত। তাহার পক্ষে অন্তঃপুরের দ্বারও মুক্ত ছিল। জনবিরল বৃহৎ বেগম-মহলে গুলবদনের খেলার সঙ্গীরও অভাব ছিল। পালিত হরিণ, পিঞ্জরাবদ্ধ বুলবুল, স্বচ্ছন্দবিচরণশীল ময়ূর প্রভৃতি

লইয়া খেলা করিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না। তাই রাফি উদ্দীনকে খেলার সাথী পাইয়া সে পরম পুলকিত হইল। সে তাহাদের বাল্যকালের কথা। কিন্তু সেই সময় হইতেই বয়োজ্যেষ্ঠ রাফি উদ্দীন গুলবদনের প্রতি ব্যবহারে যে সতর্ক স্নেহ দেখাইত দুর্ব্বলের প্রতি সবলের ব্যবহারে সেই স্নেহ দুর্ব্বলকে স্বতঃই সবলের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই গুলবদন রাফি উদ্দীনের প্রতি আকৃষ্ট হইত।

আর তখন সমগ্র দিল্লী সহরে রূপে গুণে রাফি উদ্দীনের সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাহার কান্ত রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়াইত—আবার নিয়মিত শারীরিক শ্রম সেই দীর্ঘ দেহ বাহুল্যবর্জ্জিত ও সামঞ্জস্যসুন্দর করিয়া মুক্তাফলে তরল ছায়ার মত তাহার রূপে অসাধারণ লাবণ্য সঞ্চারিত করিয়াছিল। তখন সম্ভ্রান্ত বংশে সকলেই তরবারি ব্যবহার করিত—তরবারির খেলায় নিপুণতা পুরুষের পক্ষে শ্লাঘার কথা ছিল। দিল্লীর কোন যুবকই তরবারি-চালনে—সন্তরণে—অশ্বারোহণে রাফি উদ্দীনকে পরাভূত করিতে পারিত না। আবার রাফি উদ্দীন পিতার বিদ্যার উত্তরাধিকারী হইয়াছিল! কবিতা-রচনায় তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। সে যখন কবিতা আবৃত্তি করিত তখন লোক মুগ্ধ হইয়া শুনিত। গুলবদনও মুগ্ধ হইয়া তাহার কবিতাপাঠ শুনিত, মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিত।

যে দিন রাফি উদ্দিন দেখিল, সে কবিতাপাঠ শেষ করিয়া গুলবদনের দিকে চাহিলেই গুলবদনের দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল—তাহার গণ্ডের গোলাপী আভা গাঢ়তর হইয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল সেই দিন হইতে সে সুজা উদ্দৌলার গৃহে যাতায়াত কমাইয়া দিল। সে সুজা উদ্দৌলার ভ্রান্ত সম্মানজ্ঞানের কথা জানিত; আর জানিত, যুবতী-হৃদয়ের বাসনাকে বিশ্বাস করিতে নাই—সে গিরিনদীর মত আপনার বেগে আপনি পথ করিয়া সেই পথে প্রবাহিত হয়।

রাফি উদ্দিনের প্রতি কন্যার এই ভাবের কথা সুজা উদ্দৌলার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। নহিলে কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রসন্ধানে সহসা তাঁহার চেষ্টা বাড়িল কেন?

৪

সুজা উদ্দৌলা কন্যার জন্য পাত্র নির্ব্বাচিত করিলেন। পাত্র দিল্লীর বাদশাহবংশীয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে বাদশাহদিগের বিলাস-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া অর্থশালী হইয়াছিলেন; পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায়

মিনা-করা মুষ্টি ধরিয়া আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণচর্ম্মাচ্ছাদিত কোশনির্গত দামাস্কাসের অসিফলক বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল। রাফি উদ্দীন বলিল, "আমার জন্য আমি ভয় করি না। তোমার কোন আশঙ্কা আছে কি?"

গুলবদন বলিল, "ক্রুদ্ধ হইলে বাবার অসাধ্য কিছুই নাই।"

রাফি উদ্দীন অসি কোশবদ্ধ করিল; মুহূর্ত্তমধ্যে আলিসার উপর উঠিয়া লম্ফ দিল।

ঠিক সেই সময় গুলবদন—"আমার যাহা হয় হউক। তুমি এ কায করিও না" বলিয়া তাহার চাপকানের প্রান্তে ধরিল। তখন রাফি উদ্দীন লাফ দিয়াছে। চাপকানের এক অংশ ছিন্ন হইয়া গুলবদনের করে রহিয়া গেল।

গুলবদনের মনে হইল, জ্যোৎস্নালোক যেন নিবিয়া গেল—জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে বাহ্যজ্ঞানাহত অবস্থায় আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিতার কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে চাপকানের ছিন্ন অংশ বক্ষের বসনাভ্যন্তরে রাখিল। সুজা উদ্দৌলা ছাতের চারিদিকে চাহিলেন; সন্দেহের কোন প্রমাণ পাইলেন না। তখন তিনি কন্যাকে বলিলেন, "রাত্রিতে একা ছাতে কেন, গুলবদন? ঘরে যাইয়া বইস।" বৃদ্ধা দাসী ছাতে ছিল। সুজাউদ্দৌলা তাহাকে বলিলেন, "ধাত্রী, আজ গুলবদনের বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিয়াছি।"

৬

সুজা উদ্দৌলা চলিয়া যাইলেই দাসী ছুটিয়া গৃহের পশ্চাতে রাজপথে গেল; দেখিল, ভূপতিত স্বর্ণশৃঙ্গের মত রাফি উদ্দীন রাজপথে পড়িয়া আছে। তাহার উঠিবার উপায় নাই—প্রাচীরে আঘাত পাইয়া তাহার একখানি পদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দাসী কাঁদিয়া ফেলিল, ছুটিয়া আসিয়া গুলবদনকে সব কথা বলিল। গুলবদন বুঝিল, রাফি উদ্দীন আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া কায করিয়াছিল। সে চাপকান আকর্ষণ করাতেই রাফি উদ্দীন প্রাচীর পার হইয়া রাজপথে যাইতে পারে নাই। তাহার দোষেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সে-ই রাফি উদ্দীনকে আনিয়াছিল; সে-ই তাহার গমনে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। যন্ত্রনায় তাহার বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

দাসী লোক লইয়া গোপনে রাফি উদ্দীনকে তাহার গৃহে রাখিয়া আসিল—পতনের সম্বন্ধে একটা "রচা কথা" বলিয়া লোককে বুঝাইল।

৭

গুলবদন বহুক্ষণ ভাবিল। তাহার দোষে তাহার প্রণয়াস্পদের জীবন-সংশয়। সত্য সত্যই তাহার প্রেম শয়তানের চাতুরী—তাহা যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহার সর্ব্বনাশই করিয়াছে। সে মরে নাই কেন? সে মরিলে সকল আপদ চুকিয়া যাইত। এই কথা মনে হইলেই তাহার মনে হইল, সে যেন কারাগৃহের মুক্ত দ্বার দেখিতে পাইল—অগ্নিশ্বাসী মরুমধ্যে স্নিগ্ধ শ্যাম বনভূমির সন্ধান লাভ করিল—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরে কূল পাইল। সে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্বাস ত্যাগ করিল।

পাপ প্রবেশ না করিলে কোন পরিবারের—কোন বংশের অধঃপতন হয় না। দিল্লীর বাদশাহবংশে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল। তাই সে বংশের অধঃপতন হয়। আবার পরিবারে পাপ প্রবেশ করিলে লোক পাপ গোপন করিবার পথ প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হয়—গুপ্তহত্যার উপায় উদ্ভাবিত হয়। শুনা যায়, বাদসাহ সাহজাহানের স্বহস্ত-প্রদত্ত তম্বুলের রস গলাধঃকরণ করিয়া তাঁহার দুহিতার পাপপ্রণয়ের প্রবঞ্চিত পাত্রগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যে বিষের বিন্দুমাত্র উদরস্থ করিলে মানুষের জীবনের অবসান হয় বাদশাহবংশে কাহারও ঘরে সে বিষের অভাব ছিল না। ছাদ হইতে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া গুলবদন একটা দেরাজ খুলিয়া কল টিপিয়া তাহার গুপ্ত কামরা মুক্ত করিল। তাহাতে কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গজদন্তের কৌটা ছিল। একটা কৌটা হইতে একটু কি চূর্ণ বাহির করিয়া লইয়া গুলবদন কৌটা যথাস্থানে রাখিয়া চোর-কামরা ও দেরাজ বন্ধ করিল, তাহার পর তাম্বূলপাত্র হইতে একটি তাম্বূল লইয়া তাহাতে সেই চূর্ণ ঢালিয়া দিল।

৮

পরদিন প্রত্যুষে বৃদ্ধা দাসীর ক্রন্দনশব্দে সুজা উদ্দৌলার গৃহে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। স্বয়ং সুজা উদ্দৌলাও ব্যস্ত হইয়া অভ্যস্ত মন্থর গতি পরিহার করিয়া দ্রুতপদে ক্রন্দনধ্বনিমুখর কন্যার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গুলবদন শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। নয়নদ্বয় মুদিত—দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি সংস্থাপিত—সে মৃত্যুকালে সেই হস্তে রাফি উদ্দীনের চাপকানের ছিন্ন অংশ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

সুজা উদ্দৌলা বজ্রাহতের মত কন্যার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা দাসী রাফি উদ্দীনের বসনাংশ দেখাইয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে সুজা উদ্দৌলাকে সব কথা বলিল। তাহার কথার তীব্র তিরস্কার সুজা উদ্দৌলার হৃদয় বিদ্ধ করিল। তিনি এত দিন যে ভ্রান্ত সম্মান-জ্ঞানের কঠোর আবরণে আপনার স্নেহকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন আজ শোক দারুণ আঘাতে সেই আবরণ চূর্ণ করিয়া দিল। স্নেহের কোমলতায় সুজা উদ্দৌলার কঠিন হৃদয় কোমল হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, তিনি স্বহস্তে তাঁহার স্নেহের একমাত্র অবলম্বনকে হত্যা করিয়াছেন।

কন্যার শব জড়াইয়া সুজা উদ্দৌলা কাঁদিতে লাগিলেন—"আমি তোকে হত্যা করিয়াছি।"

৯

গুলবদন যেমন শয়ন করিয়া ছিল—তাহাকে তেমনই ভাবে সমাধিস্থ করা হইল।

সুজা উদ্দৌলা সে দিন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না—সমস্ত দিন রাত্রি কন্যার কক্ষে ভূলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে ম্লানমুখে তিনি রাফি উদ্দীনের গৃহে উপনীত হইলেন। রাফি উদ্দীন তখনও জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে। তাহার ভগ্ন পদ কর্ত্তন করা হইয়াছে। তবে চিকিৎসক বলিয়াছেন, তাহার মত সবল শরীরে আশঙ্কার কারণ স্বভাবতঃই অল্প। জনরবের সহস্র রসনা গুলবদনের মৃত্যুবার্ত্তা দিল্লীতে রটাইয়াছিল। রাফি উদ্দীনও সে কথা শুনিয়াছিল। তাই সুজা উদ্দৌলাকে দেখিয়া তাহার মুখভাবে ক্রোধ অভিব্যক্ত হইল। কিন্তু সে আত্মসংযমে অভ্যস্ত—ক্রোধের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিল না।

সুজা উদ্দৌলা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি আমার কন্যাকে হত্যা করিয়াছি, তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমি মক্কায় যাইয়া আত্মগ্লানিতে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ধর্ম্মে শান্তির সন্ধান করিব, নহিলে আমার হৃদয়ের এ নরকানল নির্ব্বাপিত হইবে না। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দিয়া যাইতেছি।"

রাফি উদ্দীন মুহূর্ত্ত নীরব রহিল; তাহার পর বলিল, "যে গুলবদনের মৃত্যুর কারণ আমি তাহার অর্থ স্পর্শ করিতে পারিব না। আমি দরিদ্র—অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। বাদশাহের বংশের অর্থের লোভও আমার নাই।"

সুজা উদ্দৌলা সে কথা শুনিলেন। রাফি উদ্দীনের তিরস্কার কি তীব্র; কিন্তু কত সত্য! তিনি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। পাপীর অর্থ গ্রহণেও পাপ আছে।"

সেই দিনই চৌরাস্তার মসজেদে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সুজা উদ্দৌলা মক্কা যাত্রা করিলেন।

১০

এ দিকে রাফি উদ্দীন ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

দিল্লীর অবস্থা—দেশের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাফি উদ্দীন ইংরাজী শিখিল—সরকারী চাকরী পাইল। সে এই দীর্ঘকাল তাহার যৌবনের অনাবিল প্রেমের স্মৃতি লইয়া জীবনযাপন করিয়াছে।

আজ মৃত্যুতে তাহার জীবনব্যাপী যাতনার শেষ হইল।

মুমুক্ষু।

ধীবরের জালে পড়ি'
যেই মীন মুক্তি বাঞ্ছা করে,
বেড়ায় সে ছুটি' ছুটি'
খুঁজি পথ পালাবার তরে।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে
মানবের মাঝেও তেমন,
মুমুক্ষু যে, ব্যস্তচিত্তে
মুক্তিপথ করে অন্বেষণ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-চক্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্পদ-সম্ভার।

"দেখ, শরৎচন্দ্র, বিধাতার কি অবিচার; আমরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের উপায় করিতে পারি না, আর এই এতগুলা টাকা লইবার কেহ নাই!" বসুকোম্পানীর বৈঠকে বসিয়া "উকীল সাহেব" শরৎবাবুকে এই কথা বলিলেন।

এই সময় যতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "কি মহাশয়?"

"উকীল সাহেব" হস্তস্থিত সংবাদ পত্রের একাংশ দেখাইয়া সেখানা যতীশকে দিলেন। যতীশ তাহা পাঠ করিতে লাগিল। সংবাদপত্রে একটা মোকর্দ্দমার বিচার-বিবরণ বিবৃত হইয়াছিল। হুগলী জিলার প্রসিদ্ধ ধনী জগৎপ্রসন্ন দেবরায় বিপত্নীক হইয়া পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর পুত্র ছিল না; দ্বিতীয়ার গর্ভজাত তিন পুত্র পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির বাটোয়ারার মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। এই মোকর্দ্দমার বিচারকালে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার সম্পত্তির এক অংশ ও মজুদ টাকার কিয়দংশ তাঁহার প্রথম পক্ষের পত্নী পিত্রালয় হইতে পাইয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে দেবরায় মহাশয় সে সম্পত্তির মুনাফার ও সে টাকার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এখন কে সে সম্পত্তির ও সে টাকার অধিকারী হইবে? সম্পত্তির মূল্য ও মজুদ টাকার পরিমাণ এক্ষণে দুই লক্ষের অধিক। রায় মহাশয়ের পুত্রগণ এ সমস্তই পিতার সম্পত্তিভুক্ত করিয়া আপনারা পাইতে চাহেন। আবার সন্ধান পাইয়া রায় মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর স্বজনগণ তাহাতে দাবী দিয়াছেন। এ দিকে প্রকাশ পাইয়াছে, রায় মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর এক কন্যা ছিলেন। কিন্তু স্বার্থহানি-ভয়ে কোন পক্ষই তাঁহার কোন সন্ধান দিতেছেন না। তিনি জীবিতা কি না—মৃতা হইলে তাঁহার পুত্রাদি আছে কি না জানা যায় নাই। সেই জন্য জজ আদেশ করিয়াছেন, ঐ সম্পত্তি ও অর্থ স্বতন্ত্র করিয়া সরকারের জিম্মা রাখা হইবে—ইহার পর যাঁহার বা যাঁহাদের অধিকার সাব্যস্ত হইবে তিনি

বা তাঁহারা উহা পাইবেন। রায় মহাশয়ের অবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বাটোয়ারা হইবে।

যতীশ একবার বিবরণটি পড়িল—তাহারপর আবার আদ্যন্ত পাঠ করিল।

"উকিল সাহেব" হাসিয়া বলিলেন, "যতীশ বাবু, বিবরণটা মুখস্থ করিবেন না কি?

যতীশ বলিল, "জগৎপ্রসন্ন দেবরায়ের প্রথমা পত্নীর একমাত্র কন্যার যদি পুত্র থাকে, তবে সে কি এ সম্পত্তি পাইতে পারে?"

অব্যবসায়ীর অজ্ঞতায় একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া "উকীল সাহেব" বলিলেন, "সে-ই ত মালিক।"

"তবে তাহাকে সে বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে?"

"নিশ্চয়!"

"আমি জগৎপ্রসন্ন দেবরায়ের প্রথম পক্ষের কন্যার একমাত্র সন্তান।"

এ কথা এমনই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ সকলেই বিস্ময়াধিক্যে নির্ব্বাক রহিলেন। শেষে "ডাক্তার সাহেব" বিস্ময়বিমুক্ত হইয়া—তাঁহারা জাগ্রত কি সুপ্ত বুঝিবার জন্য চুরুট টানাই সঙ্গত মনে করিয়া ভৃত্য শবদারকে চুরুট আনিতে বলিলেন। তখন "উকীল সাহেব" যতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি?" "ডাক্তার সাহেব" চুরুট ধরাইয়া লইলেন; পোষ্টমাষ্টার বাবু চেয়ারে খাড়া হইয়া বসিলেন; মাষ্টার মহাশয় একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন, শ্লেষ্মাপ্রধানধাতু শরৎ বাবুর নয়নেও বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

যতীশচন্দ্র বলিল, "আমার মা অল্পবয়সেই মাতৃহীন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতা জগৎপ্রসন্ন দেবরায় পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী সপত্নী-কন্যাকে 'দেখিতে পারিতেন' না। 'সতীন কাঁটা' অনেকেই সহ্য করিতে চাহে না। বিশেষ এ ক্ষেত্রে সপত্নীর পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্য ও আপনার পিতৃগৃহের দারিদ্র্য তুলনা করিয়া তিনি সপত্নীর স্মৃতির প্রতিও অসম্মান প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মাতামহ তখন তরুণী রূপসী ভার্য্যার করতলগত। তাঁহারই চক্রে পিতার সহিত তাঁহার সপত্নী-কন্যার বিবাহ হয়; নহিলে জগৎপ্রসন্নের কন্যার দরিদ্র ঘরের বধূ হইবার অন্য কারণ ছিল না। মা'র পক্ষে পিত্রালয়বাস সুখের ছিল না; আবার শ্বশুরালয়ে তাঁহার আদর যত্ন অত্যন্ত অধিক ছিল; কারণ, আমার পিতাই

তাঁহার জননীর একমাত্র সন্তান—তাঁহার মাতামহীর একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা উভয়েই তাঁহাকে লইয়া কন্যার সাধ মিটাইয়াছিলেন। কাযেই আমার মা'র আর বড় পিত্রালয়ে যাওয়া হইত না। পিত্রালয় হইতেও কেহ আর বড় তাঁহার সংবাদ লইত না। তাহার পর মা'র মৃত্যু হইল। তিনি থাকিতেই পিতার সহিত শ্বশুরালয়ের বড় সম্বন্ধ ছিল না—এখন সম্বন্ধ শেষ হইল। আমি কখনও মাতুলালয়ে যাই নাই। পিতামহীর নিকট কেবল মাতুলালয়ের কথা শুনিয়াছি; আর গতকল্য মাতুলালয়ের কথা মনে করিতেছিলাম।"

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?"

"বাবা একখানি খাতায় তাঁহার বংশ-পরিচয়, আত্মপরিচয় ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখ ও বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। সে খাতাখানি আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি অনেক দিন সেখানি খুলি নাই। বাসাপরিবর্ত্তনের পর জিনিসগুলি গুছাইবার সময় কল্য আমি সেখানি পাইয়া আবার সব পাঠ করিয়াছি। তাহাতে আমার মাতুলালয়ের পরিচয়, পিতার বিবাহের তারিখ, বিবাহে যাঁহারা বরযাত্র গিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়জনের নাম—সব আছে। আর সেই সঙ্গে আমি মা'র কোষ্ঠীও পাইয়াছি।"

"উকীল সাহেব" বলিলেন, "বড় চমৎকার কাণ্ড দেখিতেছি। তাই কথায় বলে, 'ভগবান যখন দেন তখন চাল ফুঁড়িয়া দেন।' আপনি অবশ্যই প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, আপনি জগৎপ্রসন্ন বাবুর প্রথম পক্ষের পত্নীর একমাত্র সন্তান?"

যতীশ বলিল, "বোধ হয় পারিব।"

"'বোধ হয়'কে 'নিশ্চয়' করিতেই হইবে। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

"তাহা হইলে একবার কলিকাতায় যাওয়া প্রয়োজন।"

"নিশ্চয়। আপনি ছুটীর চেষ্টা করিয়াছিলেন—কি হইল?

"দুই দিন পরে একজন আসিয়া আমার কায বুঝিয়া লইলে আমার ছুটী।"

এ দিকে আপনি যাইবার উদ্যোগ করিয়া রাখুন যে, ছুটী পাইলেই চলিয়া যাইতে পারেন।"

যতীশচন্দ্র চলিয়া যাইবার পর "ডাক্তার সাহেব" বলিলেন, "এ কি ? লোকটা ক্ষেপিয়াছে, না আমাদের ক্ষেপাইবে ?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "না ! লোকটার স্ত্রীভাগ্য ত দেখা গেল—অভাব হইল না। এখন দেখুন, স্ত্রীভাগ্যে ধন—তাহারই বা কি হয়।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন, "স্ত্রীভাগ্য আপনারই বা মন্দ কি ? আপনারও ত অভাব হয় নাই। দেখুন, আপনারও ধনভাগ্য যদি ঐরূপ হয়। আমাদের ভাগ্যে কোনটারই বাহুল্য নাই।"

"বড় দুঃখ !"

শরৎ বাবু বলিলেন, "লোকটার জীবন আগাগোড়াই অদ্ভুত। আমরা ছোট কাকীমা'র কাছে আর তাঁহার ভ্রাতার কাছে সব শুনিয়াছি। যেন উপন্যাসের নায়ক। লোকটি শৈশবে মাতৃহীন। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান হইয়াও পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত।"

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ?

"পিতার অর্থের অভাব ছিল না। পুত্র অবাধ্য হইলে পিতা তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন, বলেন। পুত্র পিতার উপর রাগ করিয়া আবার বিবাহ করেন। পিতা তাহাতেই দেশত্যাগী হয়েন ও আপনার সমস্ত সঞ্চয় চিকিৎসালয়াদির প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। তাই পুত্রকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকরী করিতে হইতেছে। তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে সবই বিস্ময়কর ব্যাপার।"

"আর যাহা ঘটিবে বোধ হইতেছে, তাহা আরও বিস্ময়কর।"

"বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে বলিয়াই ত আমরা বলি—অদৃষ্ট।"

"সবই কপালে করে ; তবে কাহারও কপাল পাতরচাপা আর কাহারও কপাল পাতাচাপা।"

"ডাক্তার সাহেব" চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন, "তোমাদের কাহারও কপাল পাতরচাপা কাহারও কপাল পাতাচাপা। কিন্তু আমার কপাল এক দম পর্ব্বতচাপা—সেও আবার বিরাট হিমালয় পর্ব্বত।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন, "দাদা, আমাদেরই বা কোন বিন্ধ্যগিরি ? কাহারও উনিশ—কাহারও বা বিশ ; সবই সমান। সবই অন্ধকার।"

"কেবল যতীশবাবুর পূর্ণিমা।"

গৃহে ফিরিবার সময় যতীশচন্দ্রের কেবল কল্যাণীর কথা মনে পড়িতে

লাগিল। আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সংবাদে কল্যাণীর কত আনন্দ হইত! সে তাহার সম্পদ-লাভের সম্ভাবনায় কত আনন্দিতা হইত! আর সে কল্যাণীর সহিত পরামর্শ না করিয়া যে কোন কায করিত না!

* * * *

দানাপুর হইতে আসিয়া যতীশচন্দ্র কিছু দিন আপনার সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত রহিল। রাধাচরণ এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে তাহার সাহায্য করিতে লাগিল। সে উকীলের সহিত পরামর্শ করা, যতীশচন্দ্রের সঙ্গে যাইয়া সাক্ষীর সন্ধান করা প্রভৃতি কায করিতে লাগিল। তাহার পর যখন এজন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হইল তখনও সে তাহার অর্থ হইতে সে টাকা দিল। টাকাটা তখনও বামাচরণের নিকট ছিল। রাধাচরণ এইবার টাকাটা চাহিল। বামাচরণ তাহাতে বিরক্ত হইল; কিন্তু রাধাচরণের টাকা উদ্ধার হইল। যতীশেরও সম্পত্তি উদ্ধার হইল।

তাহার পর এক দিন অপরাহ্নে একখানি নৌকা ইচ্ছাপুরের ঘাট হইতে যাইয়া শ্যামনগরের ঘাটে ভিড়িল। একজন যুবতী ও একটি বালককে লইয়া একজন যুবক ঘাটে নামিয়া পরিচিত পথে ধরণীধরের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যতীশ দুইটি নূতন গৃহ দেখিল; দেখিল একটি বিদ্যালয়, অপরটি চিকিৎসালয়—তাহার পিতার পুণ্য স্মৃতি। সে সরোজাকে সেই দুইটি দেখাইল।

যতীশ গৃহদ্বারের চাবি আনিয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। আত্মপরভেদবুদ্ধিবিরহিত কোন প্রতিবেশী আমার জিনিসও আমার তোমার জিনিসও আমার, স্থির করিয়া যতীশের গৃহে প্রবেশ করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল; দ্বার মুক্তই ছিল।

সেই শূন্য গৃহে বসিয়া সরোজা কাঁদিল, শ্বশুরের জন্য কাঁদিল—কল্যাণীর জন্য কাঁদিল। তাহার পর সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বেই তাহারা আবার ইচ্ছাপুরে রওনা হইল। পথে কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল বালক মধ্যে মধ্যে তাহার 'মা'কে" নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাস।

দশম অধ্যায়।

২১শে জুন বেলা দশ ঘটিকাকালে, অকস্মাৎ মিউনীসিপালিটী-ভবনে তিনটি তোপধনি হইয়া রাজপরিবারবর্গের পলায়ন-বৃত্তান্ত প্যারিস নগরীতে প্রচারিত হইল। উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয়, উগ্রপ্রকৃতি, উষ্ণমস্তিষ্ক ইতর সাধারণ তাহা শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রাজবর্ত্মসমূহে এবং টুইলারি প্রাসাদে সংখ্যাতীত ব্যক্তি সমবেত হইল। জাতীয় সমিতি মিউনিসিপালিটী এবং রাজনীতিক সমিতিসমূহের অধিবেশন আরব্ধ হইল। প্যারিস নগরে সর্ব্বত্র হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন; বিদেশীয় শত্রুগণের সাহায্যে বর্দ্ধিতশক্তি হইয়া তিনি অনতিবিলম্বে রাজধানী আক্রমণ করিবেন; অতুল-ঐশ্বর্য্যশালিনী, হর্ম্ম্যমালিনী, মনোহারিণী নগরী অচিরে সমরানলে ভস্মীভূত হইবে—ইত্যাদি নানা প্রকার জনরব তড়িৎবেগে দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল। জাতীয় সমিতি সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছানুসরণে পলায়মান রাজপরিবার-বর্গের অনুসরণের নিমিত্ত সর্ব্ব স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। জাতীয় সৈন্যগণ প্রত্যেক স্থানে রাজপরিবারবর্গ মনে করিয়া পর্য্যাটনকারিগণকে ধৃত করিতে লাগিল। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন এককালে নিবারিত হইল। ভাগ্যহীন, বান্ধববিহীন, পরমুখাপেক্ষী নৃপতি আখ্যাধারী ভিক্ষুক অচিরে অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন হইয়া সমগ্র ফ্রান্স দেশের অস্ত্রবল তৃণজ্ঞান করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং পলায়মান রাজপরিবারবর্গের অনুসরণের নিমিত্ত জাতীয় সমিতির অপরিমিত আগ্রহ প্রদর্শনের কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক কিয়ৎকাল পরেই সংবাদ আসিল যে, রাজপরিবারবর্গ ভেরিনিছ নগরে তত্রস্থ জাতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে প্যারিস নগরে আনিবার নিমিত্ত জাতীয় সমিতি সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইটির প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। ল্যাফাইটি সমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই ভেরিনিছ নগরে দুইজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন।

এ দিকে ভেরিনিছ নগরের সেতুসন্নিধানে রাজপরিবারবর্গ ধৃত হইয়া ছিল

নামক তত্রস্থ নগরাধ্যক্ষসমীপে আনীত হইলেন। নগরাধ্যক্ষ এবং ড্রুয়েট পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের অনুমতি-পত্র পরীক্ষা করতঃ তাঁহাদিগকে অশেষবিধ কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি জ্ঞাতব্য প্রসঙ্গে কোন প্রকার নিশ্চিৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ঘটনাচক্রে মনিহোল্ড ও লৌজম্ নগরস্থিত রাজভক্ত অশ্বারোহিগণ অনতিবিলম্বে ভেরিনিছ নগরে আসিয়া রাজপরিবারবর্গের পক্ষাবলম্বন করিল। তদ্দৃষ্টে ড্রুয়েট রাজাকে বলিলেন, "বিদেশীয় লোক বলিয়া আপনারা আত্মপরিচয় দিয়াছেন; যদি প্রকৃতই আপনারা বিদেশীয় লোক হইবেন, তাহা হইলে আপনার নিকট অশ্বারোহী কোথা হইতে আসিল?" অনন্তর নগরাধ্যক্ষ রাজাকে বলিলেন, "জনরব এইরূপ যে, আপনারাই রাজপরিবারবর্গ। এই জনরব সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হইলে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইবে সুতরাং আপনারা বিপদগ্রস্ত হইবেন। সেই জন্য আমার অনুরোধ যে, আপনারা আমার বাটীতে আগমন করুন—তথায় আপনাদের কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না।"

রাজভক্ত সৈনিকগণের আগমনে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছেন। সংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত তাহারা বাহুবলে শত্রুসৈন্যগণের ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইলেও অন্ততঃ কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাহাদের অভীষ্টসাধনে বিঘ্ন প্রদান করিতে অসমর্থ নহে। কোনক্রমে কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব ঘটিলেই বীরবর বৌলি সমগ্র সৈন্য সমাভিব্যাহারে তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আগমন করিবেন। কিন্তু তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় এক স্থানে অবস্থিতির প্রয়োজন; বিশেষতঃ পরিবারবর্গ বহুদুর পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিয়াছেন; তাঁহাদেরও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা নগরাধ্যক্ষের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

রাজভক্ত অশ্বারোহিগণের সেনাপতি রাজপরিবারবর্গের বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বৌলির অবগতির জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহণে মণ্টমেডি যাত্রা করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু ক্রমে যামিনী অবসান হইবার উপক্রম হইল; তথাপি বৌলি আগমন করিলেন না। বৌলির সৈন্যগণের অশ্বপদধ্বনি শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তাঁহারা একাগ্রমনে উপবিষ্ট। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত অশ্বপদধ্বনির পরিবর্ত্তে দুর্দ্দান্ত ইতর সাধারণের ঘোর কোলাহল তাঁহাদের

কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তাহা শুনিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের শোণিত শুষ্ক হইয়া উঠিল। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

সংসারে কর্ত্তব্যের অনুরোধেও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে মানবজাতির ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। নগরাধ্যক্ষ ছুছি জাতীয় সমিতির নিযুক্ত কর্ম্মচারী; সুতরাং পলায়মান রাজপরিবারবর্গের গমন নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়া যেরূপ প্রতারণা,—যেরূপ অধর্ম্মাচরণ,—যেরূপ নীতিবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বাক্যসুধা বর্ষণে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া রাজপরিবারবর্গকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়া তিনি সেই "সর্ব্বদেবোময়ো তিথিঃ" গণের চির শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্রান্তে রাজপরিবারবর্গের প্রকোষ্ঠ জাতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইল। কিন্তু তিনি তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া ক্লারমণ্ট এবং ভার্ডন নগরের কর্ত্তৃপক্ষগণকে রাজপরিবারবর্গের পলায়ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া উক্ত নগরদ্বয়ের জাতীয় সৈন্যগণকে অবিলম্বে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এ দিকে যামিনী অবসান হইবার উপক্রম হইল, তথাপি বৌলি আসিলেন না। ফরাসিরাজ উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া নগরাধ্যক্ষসমীপে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অতি কাতরভাবে কহিলেন, "আমি যথার্থই আপনাদের রাজা। রাজধানী বিপজ্জালসংবেষ্টিত হইতে দেখিয়া আমি রাজধানী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। প্রজাগণকে শান্তি ও স্বাধীনতা প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য। বন্ধুপ্রবর, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্বাধীন। আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পিত করিবেন না। আপনি যাহাতে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইতে পারেন আমি তৎপক্ষে যত্নবান হইব।" কর্ত্তব্যপরায়ণ ছুছির হৃদয়ে করুণার লেশ মাত্র সঞ্চারিত হইল না। তিনি বলিলেন, "অন্ততঃ রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনাকে স্থানান্তর গমনের অনুমতি দিতে পারি না।"

মণ্টমেডি হইতে ভেরিনিছ নগরে আসিতে হইলে অগ্রে ষ্টীন নগরে আসিতে হয়। ষ্টীন হইতে ভেরিনিছ ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; কিন্তু পথ দুর্গম ও গিরিসঙ্কুল। রাজপরিবারবর্গের কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা না করিয়া বৌলি ভেরিনিছ নগর পর্য্যন্ত গমন অনাবশ্যক মনে করিয়া সসৈন্যে ষ্টীন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রি ৪ ঘটিকাকালে

রাজপরিবারবর্গের বিপৎবার্ত্তা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অশ্বারোহণের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের যাত্রা করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল। যাত্রাকালে সেনাপতিপ্রবর সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"বীরগণ আজ আমাদের রাজা সপরিবারে বন্দিভাবে ভেরিনিছ নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। জাতীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়াছে। তোমরা তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রসর হও। এ জগতে তোমরা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য আত্মীয় কেহ নাই।" বৌলির বাক্য শুনিয়া সৈনিকগণ সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "রাজপরিবারবর্গের উদ্ধারের নিমিত্ত আমরা প্রাণ সমর্পন করিব।" এই বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে সেনাপতিপ্রবরের সমভিব্যাহারে ভেরিনিছ নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

এ দিকে বৌলির আগমনপ্রতীক্ষা করিয়া রাজপরিবারবর্গ ভেরিনিছ নগরে উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালক্ষেপণ করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুগণের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া পরিত্রাণপথ কণ্টকাকীর্ণ করিবে। কিন্তু বৌলি না আসিলেই বা কি প্রকারে তাঁহারা জাতীয় সৈন্যগণের ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন? মনিহোল্ড এবং লোজম্ নগরীর সৈন্যগণের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে; সুতরাং তাহাদের সামর্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নহে। রাজা এইরূপ চিন্তায় ম্রিয়মান; রাজ্ঞী তৎপার্শ্বে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্টা; রাজপুত্র ও রাজকন্যা নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শ্রান্তি দূর করিতেছেন। ইতোমধ্যে অকস্মাৎ সম্ভিলি ও ক্লারমণ্ট নগরীয় রাজভক্ত সৈন্যগণ ভেরিনিছ নগরে উপস্থিত হইয়া লোজন ও মনিহোল্ড নগরীয় অশ্বারোহিগণের সহিত সম্মিলিত হইল। অতুল বিক্রমে সেই সম্মিলিত সৈনিকগণ জাতীয় সৈন্যগণের ব্যূহ ভেদ করিয়া রাজপরিবারবর্গসান্নিধ্যে সমাগত হইল। সেনাপতিপ্রবর ড্যামাছ রাজা ও রাজ্ঞীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনারা তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া যাত্রা করুন। কিন্তু সেতুপথ জাতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ; সুতরাং শকট ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে অশ্বারোহিগণপরিবেষ্টিত হইয়া নদীর অপর পারে গমন করিতে হইবে।"

সেনাপতির বাক্য শুনিয়া রাজা বিমর্ষচিত্তে বলিলেন, "যদি আমার সঙ্গে পরিবারবর্গ না থাকিত তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত!"

এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বনে রহিলেন। রাণী রাজাকে প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "এ প্রকারে যাওয়া নিতান্ত শঙ্কটজনক। তুমি অথবা পুত্র কন্যা বা ভাগিনী যাহার শরীরে শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রবেশ করিবে, তদ্দণ্ডেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং এরূপ ভাবে গমন না করিয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা বর্ত্তব্য। নগরাধ্যক্ষ আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে দিবেন না এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি আমাদিগকে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন মাত্র। বৌলি এইক্ষণে ষ্টীন নগরে আছেন। তিনি আমাদের ভেরিনিছ-সংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপার অবগত হইয়াছেন। প্রত্যুষেই সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তিনি যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বিপৎকালে যিনি ভীরুতা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহার পূর্ব্বক নির্ভয়-হৃদয়ে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। উদ্যমশীল পুরুষসিংহ বিপদের সমাগমে স্বীয় পুরুষকার-বলে বিপজ্জালমুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তিনি ভীরুর ন্যায় উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন না। দুর্ব্বল, নিরুদ্যম, পুরুষকার-বিহীন রাজা ভীরুতানিবন্ধন সেনাপতি-প্রস্তাবিত পন্থাবলম্বন করিতে সাহসী না হইয়া বৌলির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি বিপৎ সমাগমেও তাঁহার শিক্ষা হইল না যে, "ধ্রুব" পরিত্যাগ করিয়া "অধ্রুবের" অনুসরণ মূর্খতার কার্য্য। তিনি একবার চিন্তা করিলেন না যে, অজ্ঞাত কারণ পরম্পরায় বৌলির আগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিলেই সর্ব্বনাশ। তিনি নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম হইয়া ঘটনাস্রোতে তৃণবৎ আপনাকে সমর্পিত করিয়া নিয়তিসমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্ত বিষাদতিমিরাবৃতা রজনী প্রভাতা হইল। কিন্তু রাজপরিবারবর্গের অদৃষ্টগগনে সৌভাগ্যরবি পুনর্ব্বার সমুদিত হইল না। তাঁহাদিগের একমাত্র শক্তি, একমাত্র সম্বল, একমাত্র অবলম্বন বীরবর বৌলি আগমন করিলেন না। তাঁহারা যে সাহায্যপ্রাপ্তিবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া "ধ্রুব" পরিত্যাগ করিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আকাশকুসুমে পরিণত হইল। এ দিকে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারী চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া প্লাবন-

প্রবাহের ন্যায় ভেরিনিছ নগর প্লাবিত করিল। রাজভক্ত অশ্বারোহিগণ বিশাল সমুদ্রবক্ষে জলবুদ্বুদে পরিণত হইল। ক্ষণকাল পরে ল্যাফাইটির কর্ম্মচারিদ্বয় জাতীয় সমিতির অনুজ্ঞাপত্রসহ ভেরিনিছ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুরদৃষ্ট রাজপরিবারবর্গ জাতীয় সৈন্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া অচিরে প্যারিস নগরে প্রেরিত হইলেন।

বেলা ৯॥০ ঘটিকাকালে বৌলি সসৈন্যে ভেরিনিছ নগরে আসিয়া দেখিলেন, রাজপরিবারবর্গ প্যারিস নগরে প্রেরিত হইয়াছেন। দুর্গম গিরিসঙ্কুল পথে ত্রয়োদশ ক্রোশ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া অশ্বগণ এইক্ষণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং তিনি রাজপরিবারবর্গের অনুসরণে অসমর্থ হইয়া সবিষাদে মন্টমেডিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর রাজপরিবারবর্গ বন্দিভাবে প্যারিস নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শত সহস্র নরনারী রাজপথে সমাগত হইল। প্যারিসের জাতীয় সৈন্যগণ রাজশকট দর্শনে বন্দুক উত্তোলন পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিল না। জনসাধারণ আবৃত্ত মস্তকে শকটের নিকটে আসিয়া রাজপরিবারবর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল। চতুর্দ্দিক হইতে ইতর সাধারণের ভীষণ কোলাহলে গগন-মার্গ বিদীর্ণ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে রাজা ও রাণীর প্রতি অভদ্রোচিত অশ্রাব্য গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। হতভাগ্য রাজপরিবারবর্গের লঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না।

কিয়ৎকাল পরে রাজার ও রাজ্ঞীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের কথা সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। হৃদয়বিহীন ইতর সাধারণ রাজার শিরশ্ছেদন কামনা করিতে সঙ্কুচিত হইল না। জেকবিন সম্প্রদায় সাধারণতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইল। রাজ-তন্ত্র শাসনের প্রতিকূলে সংখ্যাতীত সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। রাজপরিবারবর্গের প্রতি প্যারিস নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইল। *

কিন্তু সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী কাল অদ্যাপি সমাগত হয় নাই। অদ্যাপি জেকবিন-শক্তি সমিতিগৃহে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্যাপি সভ্যমণ্ডলীর হৃদয়ে রাজভক্তির প্রবল প্রবাহ সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। মহামতি মিরাবো রাজনৈতিক গগন হইতে চিরদিনের

* Thiers—History of the French Revolution.

নিমিত্ত অনুমিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু জাতীয় সমিতির সভ্যমণ্ডলী তৎপ্রদর্শিত পন্থা ত্যাগ করেন নাই। সুতরাং জাতীয় সমিতি রাজপরিবারবর্গের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত না করিয়া, ইতর সাধারণের উত্তেজনায় তাঁহাদের প্রতি খড়্গহস্ত না হইয়া, ধীর ও প্রশান্তভাবে পলায়নের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাধারণ সভায় ঈদৃশ দুরূহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া সমিতি কয়েকটি কমিটীর হস্তে তদ্বিষয়ের ভার অর্পণ করিলেন। কমিটীগুলি রাজা, রাজ্ঞী ও রাজকুমারকে তাঁহাদের পলায়নপ্রসঙ্গে বহুসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এই মর্ম্মে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন যে, রাজা দেশত্যাগী হইবার নিমিত্ত প্যারিস নগর হইতে গমন করেন নাই—রাজধানী বিপজ্জালসংবেষ্টিত দৃষ্টি করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন মাত্র; সুতরাং কোনক্রমে তিনি অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না।

কমিটী-কয়েকটির মন্তব্য জাতীয় সমিতি-গৃহে অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরিত হইল। রাজার ও রাজ্ঞীর প্রসঙ্গে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য সমিতির সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। এই বিরাট সভা সমগ্র য়ুরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। য়ুরোপের ভূপতিমণ্ডলীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। নব যুগের আবির্ভাব মনে করিয়া সর্ব্বদেশের প্রকৃতিপুঞ্জ উৎফুল্ল হইল। ফরাসিদেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। রাজপরিবারবর্গ পরিণাম চিন্তা করিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। রাজভক্ত ব্যাক্তিগণ তাঁহাদের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাধারণতন্ত্রিগণ রাজাকে পদচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হৃদয়বিহীন উগ্রপ্রকৃতি ইতর সাধারণ রাজার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সুতরাং জাতীয় সমিতির প্রতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করা জাতীয় সমিতির সাধ্যাতীত।

অনন্তর অধিবেশনকাল সমাগত হইলে রাজভক্ত সভ্যগণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, সমিতি ইতঃপূর্ব্বে "রাজদেহ পবিত্র" এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন—এইক্ষণ সভ্যমণ্ডলী কি প্রকারে সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধাচারী হইবেন? তদুত্তরে জেকবিন্ নেতৃপ্রবর রবছপিয়র বলিলেন:—

"যে সমস্ত কার্য্য ব্যক্তিগত, তৎসম্বন্ধেও যদি রাজার নির্দ্দায়িত্ব অবধারণে তাঁহার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ধরাধামে দেবতা-প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় সমিতি যদি এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, সমিতি এরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন নাই। সমিতি ইতঃপূর্ব্বে যে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজা মন্ত্রিগণের কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী নহেন। কিন্তু যদি রাজা মিথ্যা বাক্য কহিয়া জন সাধারণের চিত্তে ঘৃণা উৎপাদিত করেন; যদি তিনি তস্করবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ-সিংহাসন কলঙ্কিত করেন; যদি তিনি পৈশাচিক বৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া নর-রক্তে ধরা কলঙ্কিত করেন;—তথাপি কি তাঁহার দেহ পবিত্র মনে করিতে হইবে? তত্রাপি কি দেবতাজ্ঞানে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে? রাজা যদি আপনাদের সমক্ষে কাহারও পুত্রের প্রাণ সংহার করেন, আপনারা কি তাঁহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ না করিয়া তাঁহার দৈহিক মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন? সুতরাং ব্যক্তিগত কার্য্যেও রাজার কোন প্রকার দায়িত্ব নাই এরূপ অবধারণ করিতে হইলে তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণ সংহারের ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়। আপনারা কি তাঁহাকে তদ্রূপ ক্ষমতা প্রদানে অভিলাষী হইয়াছেন? সমগ্র ফরাসী জাতির বিবেচনায় রাজা অপরাধী—আপনারা কি তাঁহার নির্দ্দোষতা অবধারণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন?"

সভাপ্রবর বার্ণেভ তদুত্তরে বলিলেন :—"আপনারা এযাবৎ যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, এইক্ষণও সেই নীতি অনুসরণে কার্য্য করুন। রাজশক্তির অপব্যবহার নিবারণ পূর্ব্বক আপনারা স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এইক্ষণ স্বহস্ত-গঠিত শাসন প্রণালী সংরক্ষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করুন। আপনারা এক দিকে অপরিসীম শক্তির অপর দিকে ধীর ও প্রশান্ত ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। আপনাদের কার্য্যকলাপ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। সমগ্র জগতের সমক্ষে আপনারা শান্তি ও ন্যায়পরতার অপূর্ব্ব আদর্শ সংস্থাপিত করুন। রাজা বিচারালয়ে প্রেরিত হইলে সাধারণ-তন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য। কিন্তু আপনারা কি স্বহস্ত-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী উৎপাটনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন? ফরাসী-বিপ্লবের সদৃশ সর্ব্বান্তকারী মহাপ্রলয়ের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সমগ্র জগতের ইতিহাসে আর দৃষ্ট হয় না। আপনারা

সেই মহাপ্রলয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক শান্তিসংস্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণ কি পুনর্ব্বার জনসাধারণের উত্তেজনায় অদৃষ্ট, অজ্ঞাতগর্ভ বিপ্লব-সমুদ্রে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবেন? জ্ঞান-প্রদর্শিত পন্থা এবং শান্তিমূলক নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক আপনারা এযাবৎ কার্য্য করিয়াছেন; ফরাসী জাতিকে স্বাধীনতারূপ মহার্ঘ্য রত্ন প্রদান করিয়া জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যদৃচ্ছাচার প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক শোণিত-প্রবাহে ধরা কলুষিত করিবেন না। অদ্য যাঁহারা রাজার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের নিমিত্ত অযথা ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছেন, কালক্রমে তাঁহাদের অভীষ্টসাধনে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলে তাঁহারা আপনাদের প্রতিও দণ্ডাজ্ঞাপ্রচারে পরাঙ্মুখ হইবেন না। অতএব তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া আপনারা বিপ্লবের গতিরোধ করুন; নতুবা এই মহাবিপ্লব প্রচণ্ড শক্তি ধারণ পূর্ব্বক অচিরে ফরাসিরাজ্য গ্রাস করিবে।"

রাজপরিবারবর্গের বিরুদ্ধাচারী সভ্যগণ তর্কে পরাস্ত হইলেন। সাত জন ভিন্ন সকলেই মহামতি বার্নেভের যুক্তির অনুমোদন করিলেন। সুতরাং হতভাগ্য রাজা ও রাণী কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত নিয়তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। কিন্তু জেকবিনগণ রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া ইতর সাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অচিরে রাজাকে রাজপদ হইতে অবসর প্রদানের নিমিত্ত আবেদন পত্র প্রস্তুত হইল। জেকবিন সভাসমূহ তৎপ্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। চলচ্চিত্ত ইতর সাধারণ তদ্দৃষ্টে যদৃচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ করিল। কিন্তু জাতীয় সমিতি দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইট সমিতির আদেশক্রমে জাতীয় সৈন্যগণের সাহায্যে সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিলেন।

রাজকুলের যথেচ্ছাচার নিবারণ পূর্ব্বক ফরাসী দেশের শাসনশক্তি অভিনব প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং ইতর সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ পূর্ব্বক সমগ্র দেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া—জাতীয় সমিতির সভ্যমণ্ডলী সেই বিরাট সভা ভঙ্গ করিলেন। সভাভঙ্গকালে তাঁহারা সকলেই নিঃস্বার্থভাবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কেহই পুনর্ব্বার সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিবেন না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অনিন্দ্যা।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপমান।

ভোর না হইতেই রাজা ধর্ম্মপাল মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার অসংখ্য অনুচর। অশ্বক্ষুরশব্দে নগরবাসীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যখন সকলে নগরোপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বাকাশ উষার লোহিত-রাগে রঞ্জিত হইল। বন তথা হইতেও অনেক দূরে। মহোল্লাসে শীকারিগণ রাজার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

সামন্তরাজ বীরসেনের পুত্র গিরণ মহারাজ ধর্ম্মপালের প্রাসাদে কিছু দিন হইতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নবীন যৌবন, অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি। কিন্তু বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের গুণরাশিই তাঁহাকে সমধিক অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। দয়া-দাক্ষিণ্য-বিনয়াদি গুণে তিনি যেমন একদিকে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার রণকুশলতা অপরদিকে তেমনই আবার শত্রুগণের ভীতির কারণ ছিল। হৃদয়ে তাঁহার অসীম সাহস বাহুতে তাঁহার অমিত বল। বস্তুতঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার ন্যায় যোদ্ধা তখন খুব অল্পই ছিল। পুত্র যাহাতে অন্যান্য রাজকুমার ও বীরগণের সাহায্যে সম্যক্ আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হয়েন, সেই জন্যই রাজা বীরসেন তাঁহাকে রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের সভায় কিছু দিন অবস্থানের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কুমার গিরণ এখনও অবিবাহিত।

গিরণের পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল যে, মহারাজের সহিত মৃগয়ায় যোগদান করিবেন। কিন্তু আজ যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যদেব চক্রবাল ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে, তিন চারি দণ্ড পূর্ব্বে মহারাজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা, ইহা মনে করিয়া রাজকুমার অশ্বারোহণ করিয়া প্রান্তভ্রমণে বাহির হইলেন। শীকারে যোগ দিতে পরিলেন না বলিয়া তাঁহার মনে বিলক্ষণ কষ্ট হইল। তিনি এখন আর সঙ্গে কোন অস্ত্র লওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না।

* টেনিসনের 'Geraint and Enid' অবলম্বনে লিখিত।

ফাল্গুন-প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু যখন তাঁহার চূর্ণকুন্তল ও আংরাখা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে শরীরে মধুর স্পর্শে বীজন করিতে লাগিল, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বিষাদভার দূর হইয়া গেল। অশ্বও যেন প্রভুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সহর্ষ-পাদবিক্ষেপে ছুটিতে লাগিল।

রাজা মৃগয়ার জন্য যে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তাহারই আর এক প্রান্তে গিরণের অশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তাঁহার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। তরল-কিরণ-স্নাত মুক্ত প্রকৃতির বাসন্তী শোভা দেখিয়া এবং পুলকাকুল সহস্র বিহঙ্গের কলকাকলি শ্রবণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতার উদ্রেক হইয়াছিল। আরও কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেই গভীর অরণ্যের ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণ রাজকুমারের অঙ্গে পতিত হইতেছিল। গিরণ প্রত্যাবর্ত্তনমানসে অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে কিয়দ্দূরে একজন অশ্বারোহী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজানুচর হইবে, মনে করিয়া তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সম্মুখে আসিয়া গিরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। অশ্বারোহী একজন সুন্দর যুবা পুরুষ; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্নে তাহার মুখমণ্ডল শ্রীহীন। তাহার পরিহিত পরিচ্ছদ মৃগয়াকালোচিত না হইলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলার ভাব বর্ত্তমান।

আগন্তুক গিরণের দিকে এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই বনমধ্যে এই অদ্ভুত রকমের লোকটিকে দেখিয়া গিরণ তাহার সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই তিনি অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কোনই উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইতে লাগিল। গিরণের দুর্ভাগ্য যে, তিনি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

মেঘ এইবার বজ্র নিক্ষেপ করিল। ভ্রুকুটিভীষণ মুখ হইতে বজ্রকঠোর স্বর বাহির হইল,—"আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি? ধৃষ্টতার দণ্ড গ্রহণ কর।" রূঢ়কণ্ঠে সে এই কয়টি কথা বলিয়া হস্তস্থিত কশাদ্বারা কুমারের গাত্রে সবেগে আঘাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাসন্তী-বিজয়।

ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ় থাকিয়া গিরণ যখন দেখিলেন যে, সেই কাপুরুষ দুর্ব্বৃত্ত পলায়ন করিতেছে, তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তীরবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। প্রতি পদে বৃক্ষকাণ্ডে তাঁহার অশ্বের গতি প্রতিরুদ্ধ হইতেছিল। শাখার ঘর্ষণে তাঁহার ললাট কাটিয়া রক্তধারা বাহির হইতেছিল ; কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি নিরস্ত্র ; অপমানের প্রতিশোধ লওয়া এখন তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, অশ্বারোহী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। গিরণ কিন্তু তাহাকে সমুচিত শিক্ষা না দিয়া ফিরিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এ স্থানে কোথায় এবং কিরূপে অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে ?

চিন্তিতভাবে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে পশ্চাদ্দিকে অশ্বপদের শব্দ শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন অশ্বারোহী তাঁহার দিকে আসিতেছে। এ আবার তাহারই ন্যায় কোন দুরাত্মা না কি ? অগ্নিবর্ষী নয়নে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে কাছে আসিতেই তাঁহার চক্ষু শান্তভাব ধারণ করিল, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। অশ্বারোহী তাঁহার বন্ধু কৃতীশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহেন। ইনি মহারাজের সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় তিনি একাকীই শীকারের অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন।

রাজকুমার গিরণকে তথায় তদবস্থায় দেখিয়া কৃতীশ্বর বিস্মিত হইলেন। পরে যখন তাঁহার মুখে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি পাপিষ্ঠের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গিরণের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গিরণ তাঁহার এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি একক নিজহস্তে এই অপমানের প্রতিশোধ লইব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি কেবল তোমার নিকট হইতে তোমার অস্ত্রগুলি প্রার্থনা করি।"

কৃতীশ্বর অতি আনন্দের সহিত আপনার যাবতীয় অস্ত্র গিরণকে অর্পণ করিয়া বলিলেন,—"মনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিবার অবসর পাইলাম না।"

গিরণ কৃতীশ্বরের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতির জন্য তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—"ভাই! তুমি প্রাসাদে ফিরিয়া যাও। আমি যতদিন না সেই নরাধমের সন্ধান করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ আর তাহার নিজমুখ হইতে তাহার পরিচয় লইতে পারিব, ততদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।"

কৃতীশ্বর চলিয়া গেলে গিরণ যে পথ দিয়া সেই অশ্বারোহী গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মস্তকের উপর তখন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মার্ত্তণ্ড। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার শরীর অবসন্ন। অশ্বের গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে। রাজপুত্র কিন্তু কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া তিনি যখন একটি গ্রামে আসিয়া পড়িলেন, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিয়াছেন। গ্রামটি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহা যেন একটি বৃহৎ কামারশালা বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইল। প্রায় প্রতি গৃহেই অস্ত্র-শস্ত্র শাণিত ও বর্ম্মাদি পরিস্কৃত হইতেছিল। তাহাতে যে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে গিরণের কর্ণ বধির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

গিরণ মনে করিলেন, এই রাজ্যের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র বুঝি এই স্থানে প্রস্তুত ও সংস্কৃত হয়। আততায়ীর সহিত যুদ্ধকালে শরীরাবরণের জন্য তাঁহার একটি বর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। প্রথমে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, সে একটি বর্ম্ম তাঁহাকে বিক্রয় করিবে কি না, এই প্রশ্ন করায় সে তাহার কায হইতে বিরত না হইয়া এবং মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কাল বাসন্তী-বিজয়, বিরক্ত করিবেন না।"

গিরণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া আর এক জনের নিকট যাইয়া বর্ম্মক্রয়ের ইচ্ছা জানাইলে সেও ঐরূপ উত্তর দিল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ একই উত্তর; তাহার অধিক একটি কথাও কেহ বলে না। শেষে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তিনি একজনকে বলিলেন,—"তোমাদের বাসন্তী বিজয়টা কি? আর তোমরা গ্রাম শুদ্ধ লোক অস্ত্র-শস্ত্রের এরূপ সংস্কার করিতেছ কেন, তাহা

যদি আমায় না বল, তাহা হইলে এখনই তোমার শিরশ্ছেদ করিব।" এই বলিয়া গিরণ কোশ হইতে তরবারি মুক্ত করিলেন।

সে ব্যক্তি ভীত হইয়া বলিল,—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আমার কথা কহিবার অবসর নাই। আপনি বিদেশী দেখিতেছি, তাই বাসন্তী-বিজয় কি, জানেন না। সে এক বিরাট যুদ্ধ-ক্রীড়ার অভিনয়; কালই হইবে। সেই যুদ্ধে যে সকল বীর যোগদান করিবেন, তাঁহাদেরই এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র। বর্ম্মের জন্য আপনাকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইবে। অদূরেই রাজা অনিলের প্রাসাদ দেখিতে পাইবেন। তিনি এখন এ দেশের রাজা না হইলেও তথায় আশ্রয় ও বর্ম্মাদি পাইতে পারেন।" অতি দ্রুত এই কয়টি কথা বলিয়া লোকটি পুনরায় নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

তপনদেব তখন দিগন্তকোলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। পাখীরা গাছের উপর কলরব করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রভাতে যে বিহঙ্গ-কূজন কুমারের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, এখন তাহাই তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল।

সমস্ত দিন অনাহারে ও পথ-পর্য্যটনে তাঁহার শরীর এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার আর চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তথায় তাঁহাকে কেহই আশ্রয় দিতে চাহে না দেখিয়া তিনি সেই ব্যক্তির নির্দ্দেশ অনুসারে রাজা অনিলের প্রাসাদাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

দিনের আলো মিলাইয়া আসিয়া যখন গোধূলির অল্পান্ধকারে পরিণত হইল, তখন গিরণ এক প্রাসাদবৎ প্রতীয়মান বৃহৎ জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশের পুরোভাগে বৃদ্ধ শুভ্রকেশ রাজা অনিল পদচারণা করিতেছিলেন। হস্তদ্বয় পশ্চাদ্‌ভাগে সংযুক্ত করিয়া ভূমিবিলগ্নদৃষ্টিতে তিনি যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। অশ্বের পদ-শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে তিনি সম্মুখে একজন অশ্বারোহী যুবক দেখিয়া

স্নেহকরুণস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি এখন এই সন্ধ্যাকালে কোথায় যাইতেছ? তোমাকে বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

গিরণ বলিলেন,—"মহাশয়! আমি এই রাত্রির জন্য আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছি।"

"আইস বৎস! এই দরিদ্রের গৃহে যাহা আছে, তাহাই দিয়া অতিথি-সৎকার করিয়া কৃতার্থ হইব।" এই বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া চলিলেন। অশ্বটিকে যথাস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গিরণ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

সেই প্রকাণ্ড পুরী জনমানবশূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চত্বরে ও প্রাঙ্গণে বড় বড় ঘাস ও কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে। গৃহ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীর ও স্তম্ভসমূহ অনেক স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় সেই সকল স্থান নানাবিধ গুল্মলতাদিতে সমাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্তই শ্রীহীন। প্রাসাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে কত চঞ্চল, তাহা বুঝিতে পারিয়া গিরণ মনে বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব করিলেন।

কিন্তু এ কি! এই নির্জ্জনপ্রায় পুরীমধ্যে অপ্সরোবিনিন্দিত কণ্ঠে কে গান গাহে? কি মধুর অথচ কি করুণ সুর! বিজন গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই অপূর্ব্ব স্বরলহরী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গিরিণ চলিতে চলিতে সহসা দাঁড়াইলেন; তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছেন দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"ও আমার মেয়ে অনিন্দ্যা; মা আমার বড় সুন্দর গাহে!—অনু, অনু, মা! এ ঘরে একটা আলোক দিয়া যাও।"

সঙ্গীত থামিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই দীপহস্তে এক অলোকসামান্য-রূপবতী রমণী তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বৎসর হইবে; রূপের ও লাবণ্যের বন্যায় সমস্ত অঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুখখানি এমনই সরলতামাখা, দৃষ্টি এমনই সহজ ও মধুর যে, তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত যে, বয়স তাঁহার দেহে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা আনিয়া দিয়াছে মাত্র, কিন্তু চিত্তবৃত্তির উপর আপন অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই।

পিতার সহিত একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া তরুণী ত্রস্তভাবে প্রদীপটি তথায় রাখিয়াই পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন; কিন্তু পিতা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ইনি আজ আমাদের গৃহে অতিথি; অতিথির কাছে লজ্জা কি, মা? যাও, আলোটি ঐখানে রাখিয়া ইঁহার আহারের উদ্যোগ কর।"

অনিন্দ্যা পিতার আদেশ পালন করিয়া চলিয়া গেলেন। গিরণের মুগ্ধ নয়ন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। যাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে দেখিয়া সম্পূর্ণ আত্মহারা হইলেন এ যেন স্বর্গবাসিনী কোন দেবকন্যা। এত রূপ কি মানুষের হয়! আলোকহস্তে বালিকা যখন তাঁহাদের অগ্রগামিনী হইয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন গিরণের মনে হইতেছিল, যেন প্রদীপের আলো তাঁহার রূপের কাছে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাসন্তী-বিজয় কি?

কক্ষমধ্যে উভয়ে উপবেশন করিলে বৃদ্ধ বলিলেন,—"এককালে অতিথির সমুচিত সৎকার করিবার সামর্থ্য আমার ছিল। কিন্তু এখন আর আমার কিছুই নাই; ঐ মেয়েটিই আমার সম্বল। আহা, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! মা'কে আমার অপাত্রে দিতে পারি নাই বলিয়াই ত আমাদের এই দুর্দ্দশা।"

গিরণ বলিলেন,—"কিরূপে আপনারা এইরূপ দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন জানিতে বড় কৌতুহল হইতেছে। যদি আমার সাধ্যে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমার আশ্রয়দাতার নষ্ট সৌভাগ্য পুনরুদ্ধারে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"এখনই বলিতেছি; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমার পরিচয় পাইলে বড় সুখী হইব।"

গিরণ তখন আপনার পরিচয় ও সে দিনের ঘটনা আদ্যোপান্ত সমস্ত রাজা অনিলের নিকট বলিলেন। কোশলরাজ বীরসেনর পুত্র গিরণ—যাঁহার বীরত্বের কাহিনী তিনি পূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছিলেন—তিনি যে ঘটনাচক্রে

তাহার অতিথি হইয়াছেন, ইহাতে তিনি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। অতঃপর সেই দুর্ব্বৃত্ত অশ্বারোহীর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আবেগরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার বোধ হয়, এই সেই পাপাত্মা।"

গিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ পাপাত্মা ?"

বৃদ্ধ একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—"যে আমাদের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। শুন, আমি সমস্তই বলিতেছি।"

সেই পলিতকেশ রাজা অনিল তখন একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি এই প্রদেশের রাজা ছিলাম; আর আজ আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজাও আমার অপেক্ষা ধনী, আমার চেয়ে সুখী।" বৃদ্ধের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"বৃদ্ধ সেনাপতি রুদ্রসেন যখন তাঁহার বালক পুত্রকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, তখন কি স্বপ্নেও জানিতাম যে, গৃহে কালসাপকে আশ্রয় দিলাম ? সে আজ দশ বৎসরের কথা। তখন সে চৌদ্দ বৎসরের বালক মাত্র। তখন সেই পিতৃহীন বালকের সমস্ত উপদ্রব ও অত্যাচার স্নেহের ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিতাম। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার চরিত্রের নানা দোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি সে যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ সুনিপুণ হইয়াছিল বলিয়া, সে যখন বিংশতিবর্ষে পদার্পণ করিল, তখন তাহাকেই আমার সেনাপতি-পদ প্রদান করিলাম।

"সেই সময় আমার কন্যার জন্য সুপাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম। অনিন্দ্যার রূপ-গুণের কথা শুনিয়া কত রাজকুমার তাহার পাণিপ্রার্থী হইতেছিল। আমার কিন্তু কাহাকেও আমার কন্যার উপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল না। যতদিন না সর্ব্বগুণসম্পন্ন কাহাকেও পাই, ততদিন কন্যার বিবাহ দিব না, এইরূপ আমি মনস্থ করিয়াছিলাম।

আমি যখন এইরূপ নানা স্থানে পাত্রের সন্ধান করিতেছি, তখন দুরাত্মা —আমি তাহার নাম করিব না; কারণ, তুমি তাহার নিজের মুখ হইতে তাহার নাম বাহির করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ—দুরাত্মা আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহার এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলাম যে, দ্বিতীয়বার যদি তাহার মুখে

এ কথা শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাহাকে এ রাজ্য হইতে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসিত হইতে হইবে।

"পাপিষ্ঠ তখন সৈন্যগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া গোপনে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল; তাহার পর একদিন বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাজপুরী অধিকার করিয়া আমাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিল। আমার সমস্ত ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদিগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া সে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের বশীভূত করিয়া রাখিল। তখন সে আবার আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল; এবং বলিল, যদি তাহার সহিত অনিন্দ্যার বিবাহ দিই, তাহা হইলেই রাজ্য ফিরাইয়া দিবে, না হইলে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিবে এবং বলপূর্ব্বক আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে। আমি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত এ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করিলে, সে আমাকে নানারূপে শাসাইয়া চলিয়া গেল।

"এদিকে আমার রাজভক্ত প্রজাগণ দুরাত্মার কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানারূপে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইতেছিল। নরাধম তখন এ স্থানে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া এ স্থান হইতে কিয়দ্দূরে এক স্থানে নিজের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল এবং আমাকে এই স্থানে এই অবস্থায় রাখিয়া সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া তথায় রাজধানী-স্থাপন করিল। আমি যাহাতে অন্যত্র পালাইতে না পারি কিম্বা অন্য কোন রাজার নিকট হইতে সাহায্য না পাই, তজ্জন্য সে চারিদিকে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় সে আশা করিয়াছিল যে, শীঘ্রই আমার মত পরিবর্ত্তিত হইবে; তাই সে আমায় প্রাণে বধ করে নাই। আর বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া আমার কন্যার মন পাইবে না, এটুকু জ্ঞানও বোধ হয় তাহার ছিল; তাই এ পন্থাও অনুসরণ করে নাই।"

"ইতোমধ্যে বাসন্তীনাম্নী একটি সুন্দরী পতিতা রমণীকে সে ভোগ্যা নারীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূর্ণিমার দিন এই রমণীকে উপলক্ষ্য করিয়া সে এক উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে; সে তাহারই নাম দিয়াছে 'বাসন্তী-বিজয়'। সে প্রকাশ্য ক্রীড়াঙ্গনে এই পতিতা যুবতীকে দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া ঘোষণা করে। যাঁহারা তাহার এই দম্ভপূর্ণ ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া স্ব স্ব পত্নী বা প্রণয়িনীকে অধিকতর সুন্দরী বলিয়া

প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে চাহেন, তাঁহারা তখন তাহার সহিত যুদ্ধে আহুত হন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত এরূপ বলশালী ও রণকুশল যে, সে প্রতিবারেই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিয়া বাসন্তীর গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাল বাসন্তী পূর্ণিমা; অদূরেই ক্রীড়াঙ্গন নির্ম্মিত হইয়াছে।"

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম।*

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। এই আনন্দলাভের বিবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, পুস্তকখানি সমালোচনার্থ পাইয়া আমরা কিছু বিব্রত হইয়াছিলাম। গ্রন্থকার পুরুষানুক্রমে অধ্যাপনাব্যবসায়ী—"ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,"—তাঁহার রচনার বিষয় তীর্থভ্রমণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাঙ্গলায় অনেক সময় সংস্কৃতের অত্যধিক প্রভাবে পাঠককে বিপন্ন হইতে হয়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺ প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না,—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। * * * * পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গলা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।" তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালার নমুনা—তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ। সত্য বটে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃতানুসারিণী ভাষাকে কিছু সংস্কৃত করিয়াছিলেন; জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশী-

---

* উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম—শ্রীশারদা প্রসাদ স্মৃতিতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত। কলিকাতা ৩৯ নং স্কটস্ লেন হইতে শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

রাম দাসের মহাভারত সম্পাদন (edit) করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভয় ছিল। আমাদের আর একটি আশঙ্কা ছিল, পাছে পণ্ডিত মহাশয় তীর্থমহিমাদি-বর্ণনায় উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে পাঠককে বিপন্ন করেন। কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, আমাদের উভয় আশঙ্কাই ভিত্তিহীন।

"যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত", পুস্তকখানি সেই বাঙ্গালায় সুলিখিত। পুস্তকে মধ্যে মধ্যে যে গান আছে, তাহাতে গ্রন্থকারের গীতরচনা ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

কেন করুণার তব এ বিধান!
তোমায় যে ভজে যে মজে তা'র প্রাণ অবসান!
হরি, তুয়া বিরহানল- ব্যাকুল গোকুল,
পশু পাঁখী শাখী সবই ম্লান;
শেষে কুলবতীকুল হতমান গতপ্রাণ!

আর উচ্ছ্বাসবাহুল্য ত দূরের কথা, গ্রন্থখানিতে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এমন সুশৃঙ্খলা সহকারে সজ্জিত হইয়াছে যে গ্রন্থকারের প্রতিভার "গৃহিণীপনা"য় মুগ্ধ হইতে হয়। Guide book হিসাবেও পুস্তকখানি বহুমূল্য। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অধিক নাই। ব্যয়াদির কথা, আবশ্যক দ্রব্যাদির কথা পথের কথা, তীর্থস্থানের কথা অতি মনোজ্ঞভাবে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে কাশী হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল পর্য্যন্ত সকল প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এই সকল তীর্থের পথ বিঘ্নবহুল। "হিমবৎপৃষ্ঠে কেদার অতি পবিত্র তীর্থ। কেদারনাথের মন্দির পাষাণময়। * * * * কেদারেশ্বরের পুরীতে শীত অত্যন্ত অধিক। শীতকালে সমগ্র পুরী বরফে আবৃত হইয়া যায়। ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুপার্শ্ব সমস্তই যেন ক্ষীর-সমুদ্রের ধবল প্রবাহে আপ্লুত হয়! পথ, ঘাট, মন্দির, প্রান্তর, পর্ব্বত, জল, স্থল কিছুই আর লক্ষিত হয় না। দশদিকে একমাত্র ঐ বিশদ প্রভাপুঞ্জ স্ফুরিত ও উদ্ভাসিত হইতে থাকে! নিষ্কলঙ্ক, নিত্যশুদ্ধ দেবদেবের পূর্ণ বিভূতি যেন দেশ-কাল-পাত্র বিলুপ্ত করিয়া বিদ্যোতিত হয়!" কেদারনাথ হইতে উতরাই ৯ মাইল পরে গৌরীকুণ্ড। তথা হইতে তিন মাইল আসিয়া সুবর্ণ-প্রয়াগে বাসুকীগঙ্গা পার হইতে হয়। তথা হইতে পথ বদরীনারায়ণ অভিমুখে



শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

Acme Price Calcutta.

গিয়াছে। এই পথে গ্রন্থকার যে দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পথের বিপদ্ বুঝিতে পারা যায়।—"গুজরাট-নিবাসী প্রৌঢ়বয়স্ক এক পতি-পত্নী এবার এই উত্তরাখণ্ডের তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিযুগী-নারায়ণ, কেদার প্রভৃতি কয়েক স্থানে ঐ দম্পতির সহিত আমরা এক বাসায় বাস করিয়াছি ও পরস্পর পরিচিত হইয়াছি। উহাঁদের মধ্যে স্বামীর মূর্চ্ছা-রোগ ছিল। কিন্তু বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট উত্তরাখণ্ড পরিক্রমে তাঁহার একান্ত আগ্রহ থাকায় পত্নী তাঁহাকে লইয়া এই উৎকট যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন সর্ব্বদা তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও প্রায়ই হাত ধরাধরি করিয়া চলিতেন। অদ্যও গৌরীকুণ্ড হইতে উভয়ে পূর্ব্ববৎ সাবধানে রওনা হইয়াছেন, কিন্তু নিয়তি কে অতিক্রম করিতে পারে? কিয়দ্দূর আসিয়া মন্দাকিনীর অতি উচ্চ চড়াই-পথে স্বামীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। এই সময় কি গতিকে জানি না, নিমিষের জন্য স্ত্রীটি তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইয়াছেন। এ দিকে স্বামী মূর্চ্ছাবশে পর্ব্বতের দিকে হেলিয়া পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার কিনারায় আসিয়া সুদূর গভীর খাদে পড়িয়া গেলেন। আর কি রক্ষা আছে? চক্ষুর নিমেষে প্রবলবেগে দুর্ভাগ্য স্বামী একবারে দুই মাইল আন্দাজ নীচে পতিত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ ও রুধিরাপ্লুত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। ভক্তির প্রবল উত্তেজনা ব্যতীত কেহই এরূপ দুর্গম পথে—অজস্র অসুবিধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। পণ্ডিত মহাশয়কেও এই পথে নানারূপ বিপদ্ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

গ্রন্থের ভাষা সরল, কিন্তু সর্ব্বত্র সরস। বর্ণনাগুলি হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা অরম্ভ করিয়া বিশেষ কবিত্বময় কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। "হিন্দুজাতির যাইবার বা জুড়াইবার এমন স্থান ভারতে আর দ্বিতীয় আছে কি?" সুযোগ পাইলেই গ্রন্থকার কাশী-ধামে যাইয়া থাকেন; ১৩ ৬ সালেও গিয়াছিলেন।—"কিন্তু এবার আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এখানে চিত্ত স্থির হইতেছে না কেন? স্থির না হইয়া বরং অতি অজ্ঞাত দূর-দূরান্তরেই ধাবিত হইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? বিশ্বপাবনী বারাণসি, তোমার আনন্দময় ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়াও আজি আমার চিত্তের সুস্থিতি নাই কেন মা? তুমি পবিত্র ভারতের পবিত্রতম তীর্থভূমি, সদানন্দময় দেব-দেবের নিত্যানন্দময়ী রাজধানী, তোমার প্রত্যেক কঙ্কর সর্ব্বজ্ঞানময় শঙ্কর, তোমার কিসের অভাব আছে মা, যে, তোমার ক্রোড়ে

অবস্থিতি করিয়াও চিত্তের এই অনুচিত চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়াছে! চঞ্চলতা হয় বৈ কি! অভাবজন্য না হউক, মানুষের স্বভাবজন্য চিত্তের এইরূপ চঞ্চলতা হইয়া থাকে। আরও কথা, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বেশ্বরের বিভূতি বিস্তীর্ণ-যথায় তথায় সেই শুদ্ধ বুদ্ধ-নিত্য অনন্ত-সুন্দরের সৌন্দর্য্যরাশি বিকীর্ণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে আরও আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য সমাকীর্ণ; সুতরাং ঐ সকল স্থানে গিয়া ঐ সকল বিচিত্র সৌন্দর্য্য-বিভূতি দর্শন করিব বলিয়া অদম্য লালসা আপনিই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, ইহাতে চিত্তের অপরাধ কি? নিজ-সাধনাভূমি জন্মভূমির নিভৃত-নিকেতনে নিতান্ত নিমগ্ন একনিষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদেরও যখন ঐরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—'মন কেন ধায় গো আনন্দ-কাননে। বট মনোময়ী সান্ত্বনা কর না ক্যানে।' তখন অন্যে পরে কা কথা? আমারও এই আনন্দ-কানন হইতে হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গে, পুণ্যকাননে, পবিত্র প্রস্রবণে, পূত-গিরিনদী-সঙ্গমে এবং ঐ ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বা নিত্যপ্রতিষ্ঠ দেবমূর্ত্তি ও দৈববিভূতি-দর্শনে চিত্ত ধাবিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?"

এই অস্থিরতাবশতঃই গ্রন্থকার উত্তরাখণ্ড-ভ্রমণে বাহির হয়েন এবং কাশী হইতে বাহির হইয়া নৈমিষারণ্যের পথে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন হরিদ্বারে স্নান করিয়া উত্তরাখণ্ডের তীর্থগুলি ভ্রমণ করেন।

গ্রন্থের দুই স্থান হইতে আমরা গঙ্গার বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।—ধারাসুতে আসিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"হরিদ্বারের পর আর এমন অপূর্ব্ব স্থান আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দুই তটে প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পাদতলে গঙ্গা আপন খাতে সম-বিষম উপলখণ্ডে স্খলিতগতি ও ফেনিলমূর্ত্তি হইয়া কি প্রবল কলরবেই ধাবিত হইয়াছেন! এই প্রবল নির্ম্মল ধবলধার সত্য সত্যই ভগবান্ বাল্মীকির বর্ণনার অনুরূপ 'ঝঙ্কারকারি', 'গিরিরাজ-গুহাবিদারি', 'দূরপ্রচারি', 'দুরিতাপহারি' ও 'সর্ব্বশুভকারি।" তুমুল কল্লোল-কোলাহল ঝঞ্ঝাবাতধ্বনির ন্যায় দিবারাত্রি অবিরামে কি প্রচণ্ডভাবেই উত্থিত হইতেছে! তরঙ্গাবলী অক্রমে, অব্যবস্থায়, অনপেক্ষায় কি উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যরঙ্গেই অবিরাম ধাবিত হইতেছে! যেন এ স্থানে শব্দান্তরের অবকাশ নাই! দৃশ্যান্তরের অবসর নাই! বিচার-বিবেচনার স্থল নাই। এখানে আসিয়া অনিমিষে শুদ্ধ দেখিতে হইবে, দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে!" অন্যত্র—"স্থানে স্থানে উভয় তীরে এত নিবিড় উন্নত সতেজ তরুশ্রেণী ও স্নিগ্ধ-হরিত গুল্মলতাগহন জন্মি-

য়াছে যে, অনেক সময় জাহ্নবীর প্রবাহ একেবারেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ কিরণচ্ছটা প্রবাহকে স্পর্শ করিতেও পারিতেছে না, তরঙ্গাবলীর আস্ফালনজনিত গভীর গর্জ্জনে খরপ্রবাহ অনুমিত হইতেছে মাত্র। আবার কোন স্থলে হয় ত তরু লতা অতি বিরল, বহুদূর পর্য্যন্ত জাহ্নবীর স্ফূর্ত্তিশীল ফেন-ধবল নির্ম্মল প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জননী জাহ্নবীর এই সকল অবস্থান অবলম্বনেই কবিগুরু বাল্মীকি স্বকৃত অতুল্য স্তোত্রে উক্ত প্রবাহকে 'তালতমাল শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতাচ্ছন্নং' 'সূর্য্যকর-প্রতাপরহিতং', 'শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জলং' এইরূপ বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যেই বক্রপথে সম্মুখস্থ পর্ব্বতে গঙ্গার প্রবাহ দৃষ্টির ব্যবধানে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, এই পর্য্যন্তই বুঝি প্রবাহের শেষ, সম্মুখবর্ত্তী শৈলশ্রেণী হইতেই বুঝি গঙ্গা নির্গত হইয়াছেন! স্থানে স্থানে উভয়পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতদ্বয় এরূপ নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রবাহের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে যে, একবিন্দু তটের পর্য্যন্ত স্থান নাই। * * * আবার অনেক স্থলে তটের সুন্দর অবকাশ আছে, তথায় তটদেশে এক একটা প্রকাণ্ড পাথর এরূপভাবে পড়িয়া আছে যে, গঙ্গার সেই প্রথম নির্গম কালীন তাঁহার দুর্জ্জয় প্রবাহবেগে বিজিত ইন্দ্রের ঐরাবতই যেন অদ্যাপি এরূপ বিকল ও বিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া আছে! কোথাও প্রবাহে নিমগ্নপ্রায় ঐরূপ পাষাণখণ্ড দেখিয়া জলকেলিমগ্ন মাতঙ্গযূথের উদ্ধীকৃত মস্তক বলিয়া ভ্রম হয় ”

পথে বিস্ময়কর বস্তুরও অভাব নাই। ' সহস্রধারার নিকট অনেক গাছ-পাতা পাথরে পরিণত হইতে দেখা যায়। একটি ক্ষুদ্র লতার হয় ত অর্দ্ধেক সজীব আছে, অপর অর্দ্ধ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে! পাতাগুলি পাথরের পাতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! কিন্তু প্রস্তরে পরিণত হইলেও পাতাগুলির প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক রেখা সুস্পষ্ট অনুভব হইতেছে!” যমুনোত্তরীর পথে শীত অতি প্রবল। “ঝরণার জল স্পর্শ করা যায় না।” এই স্থানে ৯টি উষ্ণ কুণ্ড আছে। এইগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। “জ্বালানি কাঠের এখানে নিতান্ত অভাব। * * যাত্রীদের পাকের উপায় কি? উপায় ঐ গরম কুণ্ড। রুটী তৈয়ার করিয়া ঐ কুণ্ডের ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে উহা সিদ্ধ হইয়া ভাসিয়া উঠে। চা'ল ডা'ল আলুও বেশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অবশ্য চা'ল ডা'ল গামছায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়।”

এই সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা লক্ষ্য

করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। পাকদাণ্ডির পথে দারুণ দুর্গতি ভোগ করিয়াও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, পাহাড়ীরা "প্রস্রবণের ধারার সুবিধা পাইয়া সেই সেই স্থলে যথাসাধ্য সমতল করিয়া, যব-গমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং [illegible] অপর্য্যাপ্ত শিলাখণ্ড সরাইয়া-নড়াইয়া ও উঁচু করিয়া দিয়া আপন আপন ক্ষেত্র বিভক্ত ও চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে এখন যব গোধূমাদি শস্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রস্রবণের আসন্ন ক্ষেত্রগুলির শস্য হরিৎ-কান্তিময়, আজিও সে সকল পাকিবার উপক্রম হয় নাই, দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের শস্য পরিপক্ক হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।" ধারাসু হইতে যমুনোত্তরীর পথে তিনি দেখিয়াছেন পথে বিশেষ কষ্ট। "কেবল পাণ্ডারগাঁও নামক একটি স্থানে সদাব্রত আছে। ঐ গ্রামে সামান্য ভিক্ষাও মিলে। কিন্তু সেখানকার নিয়ম, পুরুষেরা ছেলে পিলে লইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকেরা ক্ষেতে চাষের কাজ করে,ঐ স্ত্রীলোকেরা ঘরে না ফিরিলে ভিক্ষাও পাওয়া যায় না।" গাড়োয়ালের কথায় তিনি বলিয়াছেন—"এ অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষগণ প্রায়ই গৌরবর্ণ। হিমগিরির ঔরসে কুৎসিত পুত্রকন্যা প্রায় জন্ম-গ্রহণ করে না। তবে অঙ্গের সৌন্দর্য্যের ন্যায় বেশভূষা কাহারও সুন্দর নহে। পুরুষের যেমন কম্বলের পা-জামা, গায়েও একটা মাত্র জামা ও মাথায় একটা টুপি, স্ত্রীলোকদিগেরও তেমনি গায়ে কম্বল জড়ান, পরিধানেও সেই কম্বল, কাহার কাহার না হয় চির-মলিন একটি মাত্র ঘাঘরা। মাথায় রুক্ষ কেশের বেণী। অধিকন্তু ঘরে-বাহিরে, পোষাকে পরিচ্ছদে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র নাই। তথাপি 'গোরো, সর্ব্বদোষ হরো।' অনেক বিদেশী লোকও এখানে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে আসিয়া পার্ব্বত্য রূপসীদিগের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়,কেহ বা সেই অনুরোধে এখানকার অধিবাসীও হইয়া যায়। বিবাহের সুবিধাটা এই যে, এখানে কন্যা-বিক্রয়-প্রথা থাকায় অর্থ হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা ভিন্ন এখানে নেপালের ন্যায় বহুবিবাহ ও দাসপ্রথাও বিলক্ষণ প্রবল। অধিকাংশ কাজ-কর্ম্ম স্ত্রীলোকেরাই সম্পন্ন করে। স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় থাকায় কি ক্ষেতের কাজে, কি অরণ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহের কাজে, কোথাও স্ত্রীলোকের গতিবিধির বাধা নাই। সুতরাং গৃহস্থালির সুবিধার জন্য গৃহস্থেরা ইচ্ছামত বহু বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের ভরণ-পোষণও অবশ্য কৃষিকার্য্য হইতেই হয়। যদিও এখানে কৃষিযোগ্য ভূমি অতি অল্পমাত্র আছে, কিন্তু সেই অল্পমাত্র



কেদারনাথের মন্দির।

Mobila Press, Calcutta.

ভূমির উপরই লোকে প্রাণপণ পরিশ্রম করে। কৃষিকার্য্য ভিন্ন ছাগ-মেষ-গবাদি পশুপালনও এখানকার লোকের জীবিকার মধ্যে গণ্য। ইহারা পশু-লোম দ্বারা নিজেরা নিজেদের ব্যবহার্য্য পশমী বস্ত্র বয়ন করে, পার্ব্বত্য নদীর প্রখর স্রোতের বেগে জাঁতা ঘুরাইয়া কাঠ খোদাই ও পালিশ করিয়া কাঠের থালা, ঘটী, বাটী নির্ম্মাণ করে। অন্য শিল্পকৌশল কিছু দেখা যায় না, বাণিজ্য ত নাই বলিলেই হয়।"

এই সকল বর্ণনার মধ্যে এক একটি লোকের চিত্র যেন সমস্ত বর্ণনায় বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে। লেখক নিপুণ চিত্রকরের মত দুই চারিটি রেখাপাতে এক একটি চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। তাই এই সব চিত্রগুলি সজীব ও সুন্দর হইয়াছে। এই বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মনোরির পথে যে য়ুরোপীয়া মহিলা দারুণ দুর্য্যোগে তাঁহার বারান্দায় আশ্রয়-গ্রহণ-প্রয়াসী যাত্রীদিগকে দেখিয়া "ক্রোধে মার-মূর্ত্তি হইয়া" রুক্ষস্বরে "নিক্‌লো নিক্‌লো হিয়াছে, আভী নিক্‌লো" বলিয়া সকলকে দূর করিয়া দিয়া তবে সুস্থির হইয়াছিলেন; রামবাড়ীতে যে দোকানদার করকাপাতের সময় যে যাত্রীরা তাহার দোকানের দ্রব্য কিনিবে না, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দোকান-ভাড়া দিতে চাহিলে আহত অভিমানে বলিয়াছিল,—"ক্যা, মেহঁ মুসলমান লোগ হ্যায়? অচ্ছা দে'কে কেয়েস্না লেঙ্গে?" আর পিপুল-কুঠীতে যে পোষ্টমাষ্টার গ্রন্থকারের সঙ্গে "দেশের উন্নতির কথা, শিক্ষার কথা এবং তাহাতে বাঙ্গালীর অগ্রসরতার কথা" বলিয়া তিনি যে "সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কলিকাতা হইতে একটি ওয়াচ ঘড়ী আনাইয়া সম্পূর্ণরূপে ঠকিয়াছিলেন," "দুঃখমিশ্রিত হাস্যের সহিত" সে গল্প করিয়া-ছিলেন—এই কয়জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থখানি ৪০৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও সচিত্র। পুস্তকে উত্তরাখণ্ডের একখানি মানচিত্রও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত দুর্লভ।

জীবন-সংক্রান্তি।

১

ধীরে ধীরে নিশি চলে' যায়।
আঁধার অতীত-কোলে হের ওই পুরাতন
বরষ মিলায়
যত ছিল সুখ সাধ, শোক, দুঃখ অবসাদ—
বিতরণ করি' অকাতরে
আজি সর্ব্বরিক্ত দীন চলিয়াছে উদাসীন
নিরুদ্দেশে—চিরদিন তরে।
এমন উষার আলো— এমন পাখীর গান—
প্রভাতের বায়—
কারো পানে ফিরে' নাহি চায়।

২

আজি এই বর্ষ অবসানে
নিভৃতে বারেক শুধু চেয়ে দেখি আপনার
জীবনের পানে।
সন্ধ্যার অঞ্চলে মিশি' যায় দিবা—আসে নিশি,
নিশিশেষে আসে ফিরে দিন,
ঋতু, বর্ষ, হয় গত— ছুটে তবু অবিরত
কালচক্র - বিরাম-বিহীন।
এমনি জীবন-গতি, কোথা হ'তে ছুটিয়াছে
কিসের সন্ধানে,
কোথা শেষ—কেহ নাহি জানে।

৩

হে অতীত, বিদায় এবার
দেখিয়াছ কত ভুল— কত ভ্রান্তি কত দ্বন্দ্ব
আশা নিরাশার।
নিয়ে যাও সাথে করি' একটি বরষ ধরি'
দিয়াছিলে সুখ দুঃখ যত;
সম্মুখে রয়েছে পথ অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
আবার চলিব এই মত।
বৎসরের শেষ আজি— দিশাহারা জীবনের
সংক্রান্তি আমার
কে বলিবে—কত দূরে আর!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মিলন।

(১)

শচীশ ও বীরেন্দ্র সহপাঠী।

কলিকাতার একটা মেসের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুই জনে কথা হইতেছিল।

শচীশ উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—"না, যতীশের ব্যবহার অসহ্য,—ইহার একটা কিছু করিতেই হইবে।"

"যে বাল্যবন্ধু, তাহাকে ক্ষমা কর, শচীশ!" শান্তস্বরে বীরেন্দ্র কহিল।

"ক্ষমা!—ক্ষমা করিতে হয়, তুমি কর;—আমি ক্ষমা করিতে পারি না। সে যে আমার বাল্যবন্ধু, শুধু সেই জন্যই আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারি না,"—শচীশের মুখের ভাব কঠোর হইয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র প্রমাদ গণিল; ধীরে ধীরে কহিল,—"তাহার মতের সহিত যদি তোমার মতের মিল না হয়, তাহা হইলেই কি তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে?"

"এ কি আমার মতের সহিত তাহার মতের মিল হইতেছে না?—এ যে এক দিকে সমগ্র দেশের মত, আর এক দিকে তাহার মত! সে দেশের মতকে উপেক্ষা করিতে চাহে, তুচ্ছ করিতে চাহে, এমন সাহস তাহার! যে বন্ধু দেশকে পরিত্যাগ করিতে পারে, হউক সে বাল্যবন্ধু—তাহার সঙ্গে আমার এতটুকু সম্পর্কও নাই।"

"তবু"—কুণ্ঠিতভাবে বীরেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল।—

বাধা দিয়া শচীশ কহিল,—"ইহাতে 'তবু' 'কিন্তু' নাই, বীরেন! আমার জীবনের গতির মধ্যে আমি 'তবু', 'কিন্তু'গুলিকে আসিতে দিতে চাহি না; সহজ, সরলভাবে জীবন কাটে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

বীরেন্দ্র আর কথা কহিল না। দরজার কাছে যতীশ আসিতেছিল, শচীশের কথার শেষভাগ তাহার কাণে গেল। যতীশ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, —"সহজ, সরলভাবে মানুষের জীবন-গতি কাটিতে পারে না, শচীশ! সংসারের বৈচিত্র্যের মধ্যে শুধু ভাবপ্রবণতা লইয়া মানুষ,"—

বাধা দিয়া শচীশ কহিল,—"আমি দেশদ্রোহীর মুখ হইতে কোনও উপ-

দেশ শুনিতে চাহি না।" জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুত কর্কশ-কণ্ঠে শচীশ কথাগুলি বলিয়া গেল!

"এত দূর!—আচ্ছা, দেখা যাউক, চাকা ঘুরে কি না,"—বলিয়া যতীশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, একটা তীব্র উপেক্ষার হাসি তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বীরেন্দ্র একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া শচীশের হাত ধরিল; কহিল,—"চল শচীশ, একটু ঘুরিয়া আসি।"

"চল।"—শচীশ ও বীরেন্দ্র বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোনও কথা হইল না।

যখন তাহারা মেসে ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই জন রঙ্গালয়ে যাইবে। বীরেনের ইচ্ছা ছিল, যতীশকেও ডাকিয়া লয়; শচীশের ভয়ে পারিল না। তাহারা তিন জন এ পর্য্যন্ত বরাবরই একত্রে অভিনয় দেখিতে গিয়াছে। আজই প্রথম সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। রাস্তায় বীরেন্দ্র আস্তে আস্তে একবার কহিল, "যতীশকে ফেলিয়া আসিলাম, ভাল লাগিতেছে না!"

ভাবপ্রবণ শচীশের মুখে একটা বড় শক্ত কথা আসিতেছিল,—কথাটা চাপিয়া সে কহিল, "তাড়াতাড়ি চল, শেষে টীকেট পাওয়া যাইবে না।"

রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইতেছিল; নানা ঘটনার সমাবেশ ও অভিনয়-চাতুর্য্য দর্শকগণের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করিতেছিল। বদ্ধ-মুষ্টি শচীশ একাগ্রমনে, বিস্ফারিতনেত্রে অভিনয় দেখিতেছিল। তাহার ভাবপ্রবণ তরুণ হৃদয়ের মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছিল!

অভিনয় শেষ হইল,—নায়কের দুর্ভাগ্যে শচীশের হৃদয় বেদনাপ্লুত হইয়া উঠিল—একটি করুণ রাগিণী তাহার মর্ম্মবীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল।

(২)

সকালে বীরেন্দ্র আসিয়া শচীশকে ডাকিয়া উঠাইয়া কহিল, "যতীশ চলিয়া গিয়াছে।"

নিদ্রাভঙ্গের পরই বীরেনের দেওয়া সংবাদে শচীশ ব্যথিত হইল।

শচীশ কহিল,—"কোথায় গিয়াছে?"

"এই চিঠি পড়," বীরেন একখানি ক্ষুদ্র কাগজ শচীশের হাতে দিয়া কহিল।

চিঠিতে লিখা ছিল,—"শচীশের সঙ্গে বিবাদ করিয়া এক মেসে থাকিতে পারিব না, তাই আজই চলিয়া গেলাম।"

শচীশ চিঠি পড়িয়া ভাবিল, কতবার বিবাদ হইয়াছে, কিন্তু এমনটা ত কোনও দিনই হয় নাই। যতীশের জন্য তাহার হৃদয়টা কেমন একটু কাতর হইয়া উঠিল!

তখন কলিকাতার রাস্তায় কর্ম্ম-কোলাহল জাগিয়া উঠিয়াছে,—দিনের এই আলোক ও কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য কেমন অসমঞ্জস হইয়া উঠিল। সে বীরেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "তা আমি আর কি করিব?"

কথাটা বলিবার সময়ে প্রথম ভাগে তাহার স্বরের মধ্যে যে কোমলতা-টুকু ছিল, শেষভাগে সেটুকু আর ছিল না!

কুণ্ঠিত বীরেন চলিয়া গেল। শচীশ মনে মনে কহিল, "বীরেন! কেন তুমি আমাদের এই বিবাদের মধ্যে মিলন-সূত্র হইতে চাহিতেছ?"

পরদিন সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্য সহিত একখানি বেনামী চিঠি বাহির হইল। চিঠিখানি একটু অতিরঞ্জিত,—বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে যতীশচন্দ্রকে মেস্ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে! সম্পাদক অন্যান্য কথার মধ্যে ছাত্রগণকে উক্ত মেস্‌বাসী ছাত্রগণের সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার জ্বালাময়ী লেখনীকে বিশ্রাম দিয়াছেন।

সে স্বদেশীর প্রথমাবস্থার কথা। বাঙ্গালা দেশ তখন স্বদেশীর দুন্দুভি-নিনাদে সংক্ষুব্ধ হইতেছিল।

পরদিন 'ইংলিশম্যান' লিখিলেন,—যতীশচন্দ্রকে ছাত্রগণ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত করিয়াছে;—যতীশচন্দ্র শিক্ষিত, উচ্চবংশজাত, গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারকে উপেক্ষা করিলে ছাত্রগণের অন্যায় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে। অতএব যতীশচন্দ্র যাহাতে ভবিষ্যতে আর লাঞ্ছিত না হয়েন, গবর্ণমেণ্ট এমন উপায়-বিধান করুন।

যে নূতন মেসে যতীশচন্দ্র গিয়াছিল, তথায় প্রথমে কাণাঘুষা, তৎপরে তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর মেসের ম্যানেজার বাবু

যতীশকে আসিয়া বলিলেন,—"যতীশ বাবু! আমি আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য"—

"মুখবন্ধ নিষ্প্রয়োজন, কাযের কথাটাই বলিয়া ফেলুন।"—একটু বিরক্তিপূর্ণস্বরে যতীশ কহিল।

"তা' দেখুন, মেসের মেম্বাররা আপনার এখানে থাকা সম্বন্ধে"—

"আপত্তি তুলিয়াছেন?"

"কতকটা তাহাই-ই বটে,—তবে'—

"বেশ্, আমি অন্যত্র সীট্ খুঁজিয়া লইতেছি কিন্তু আমাকে দুই দিন সময় দিতে হইবে। বুঝিতেই পারিতেছেন, একটা হুজুগে পড়িয়া আমার কপালে আপনারা যে ছাপ্ দিলেন, তাহাতে সহজে অন্যত্র যায়গা হইবে মনে হয় না"—দ্রুতকণ্ঠে যতীশ কথাগুলি বলিয়া গেল। তাহার মাথায় তখন একটা নূতন কল্পনা আসিতেছিল।

"আমি মেম্বারদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া এখনি আপনাকে উত্তর দিব।"—গলার বোতামটা আঁটিতে আঁটিতে খোলা ছাতের উপর—যথায় ছেলের দল দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল—ম্যানেজার বাবু সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

যতীশ বুঝিয়াছিল, সময় পাওয়া যাইবে না; সে দ্রুতহস্তে তাহার ট্রাঙ্কটি গুছাইয়া লইতেছিল।

ম্যানেজার বাবু প্রায় পনের মিনিট পরে ফিরিয়া আসিলেন;—যতীশ ছোট আয়নাখানি ট্রাঙ্কের পাশ দিয়া রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল?"—

ম্যানেজার বাবু একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন,—"তা' দেখুন, যতীশ বাবু"—

"ওঃ! সময় আপনারা দিতে পারিবেন না বুঝি!—তা' বেশ—আমি এখনি যাইতেছি; আমার হিসাবটা দেখিয়া দিন।"

ম্যানেজার বাবু হিসাব দেখিতে চলিয়া গেলেন। যতীশ চাকরটাকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটা আধুলি গুঁজিয়া দিল; বলিল,—"তোকে বকশিস্ দিলুম, যা', একটা মুটে ডেকে নিয়ে আয় তো।"—চাকর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেসের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া যতীশ কহিল,—"এ দুই দিন আপনাদের কষ্ট দিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না, ম্যানেজার বাবু, নমস্কার, তবে আসা

যাউক্।"—মুটের মাথায় বাক্স তুলিয়া দিয়া যতীশ বাসা হইতে আবার বাহির হইয়া পড়িল।

যতীশ এবার আর কোনও ছাত্রাবাসের কাছ দিয়াও গেল না,—কারণ, সে জানিত, ছাত্রাবাসে তাহার স্থান হইবে না।

অনেক ঘুরিয়া সে একটা হোটেলে প্রবেশ করিল; একটি ছোট কক্ষ ভাড়া করিল।

সংবাদপত্রওয়ালাদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া আবার একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বীরেন্দ্র একটা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক হাতে করিয়া আসিয়া শচীশকে কহিল,—"এই দেখ, যতীশ সেখানেও থাকিতে পারিল না।"

"তা' কি করিব আর আমি," শচীশের স্বরে আজ আর সে রূঢ় ভাবটি ছিল না। যতীশ,—সেই আবাল্য বান্ধব যতীশ।

বীরেন্দ্র কহিল,—"সে ত এমন ছিল না, এই সংবাদপত্রগুলাই তাহাকে এমন করিয়া তুলিবে।"

শচীশ কথা কহিল না। তাহার অন্তরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান যেন তাহারই অজ্ঞাতসারে বেদনাযুক্ত হইয়া উঠিতেছিল;—বীরেনের কথাগুলি তাহার সেই বেদনাযুক্ত স্থানটিতে আঘাত প্রদান করিয়া তাহাকে চঞ্চল, সচেতন করিয়া তুলিল। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুকের মধ্য হইতে উঠিয়া আসিতেছিল, সে সেই নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফিরাইয়া দিল; কহিল,—"মনে হয়, বিধাতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতেই যেন আমাদের জীবন-গতি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, এ আমি কেমন করিয়া ঠেকাইব, বীরেন?"

বীরেন কথা কহিল না।

শচীশ ভাবিতেছিল, যতীশ দোষ করিয়াছে কতটুকু? শচীশের সঙ্গে তাহার মতের মিল ছিল না। যতীশ বলিত, বিদেশী দ্রব্যকে একেবারে বর্জ্জন করিলে আমাদিগের আর চলিতে পারে না। আমরা আমাদিগের নানা প্রয়োজন বাল্যকাল হইতেই এতটা বাড়াইয়া ফেলিয়াছি এবং অভ্যাসকে সংযত করিবার ক্ষমতা আমাদের এতই কম যে, এই অভাবগুলি পরিপূরণের জন্য সম্যক্ বন্দোবস্ত দেশ হইতে যতদিন না হইতেছে, ততদিন আমরা বিদেশী দ্রব্যকে হুজুগে পড়িয়া একেবারেই ত্যাগ করিতে পারি না। যদি ত্যাগ করিতে যাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এই সত্যটিই প্রতিপন্ন করিব যে, আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি না।

যতীশ তাহার মতের পোষকতার জন্য মধ্যে মধ্যে দুই একটি বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিত এবং তাহা প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করিত।

শচীশ চরমপন্থী;—সেই নবজাগরণোৎসাহের চঞ্চলতায় সে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া শুধু এইটুকুই প্রমাণিত করিতে চাহিতেছিল যে, দেশ একদিনেই আমাদিগের সমস্ত অভাব পরিপূরণ করিতে পারিবে না সত্য; কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমস্ত অভাব পরিপূরণের জন্য দেশের কাছেই পুনঃ পুনঃ হাত পাতি,—দেশ শীঘ্রই আমাদিগের অভাব পরিপূর্ণ করিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেশ আমাদিগকে না দিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা বিদেশের পণ্য গ্রহণ করিব না। নিষ্ঠার সহিত শক্তিকে সম্মিলিত করিয়া আমরা শীঘ্রই আমাদিগের সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পারিব।

শচীশ ও যতীশের মধ্যে এই মতপার্থক্যের সূত্র লইয়াই বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। শচীশ একদিনও মনে করে নাই যে তাহাদের এই নিজস্ব বিবাদটা এমন করিয়া পল্লবিত হইয়া উঠিবে এবং দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে!

(৩)

হোটেলে যতীশের কয়েকটা দিন নিরুদ্বেগে কাটিয়া গেল। মধ্যে একদিন 'ইংলিশম্যানে'র একজন রিপোর্টার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গেল।

যতীশ দেখিল, ব্যাপার মন্দ নহে। ইংরাজি ও বাঙ্গালা কাগজওয়ালা-দিগের প্রসাদে তাহার নাম ত দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিলই,—আর ও দিকে ছেলেদের বিদ্রূপবাণ বর্ষণের চোটে কালেজ পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার যোগাড়! সে যে কোন্ পথ ধরিবে, বুঝিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে একদিন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি একজন নামজাদা সরকারী উপাধিধারী। তিনি যতীশকে চাকরী দিবার কথা বলিয়া গেলেন।

(৪)

সোমবারের ইংরাজী কাগজে বাহির হইল,—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, যতীশ বাবু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুলিস সব্ইন্স্পেক্টর ভাবে মনোনীত হইয়াছেন; আপাততঃ তিনি কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিবেন, তৎপরে যথাস্থানে নিযুক্ত হইবেন। যতীশ বাবু শিক্ষিত, উচ্চবংশজাত এবং রাজভক্ত। গবর্ণমেণ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।" ইত্যাদি।

বাঙ্গালা কাগজওয়ালারা লিখিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট দেশদ্রোহীকে প্রশ্রয় দিতেছেন; যতীশচন্দ্র কুলাঙ্গার, সমাজ তাহাকে একঘরে করুন, তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করুন--আর তাহার পুষ্করিণীর জল ব্যবহার বন্ধ করুন," ইত্যাদি।

তাহার পর যতীশ যথারীতি শিক্ষানবিশী করিতে লাগিয়া গেল এবং ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রওয়ালারা বরিশালের কন্‌ফারেন্স ভঙ্গ ব্যাপারের সুদীর্ঘ বর্ণনায় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে লাগিল।

(৫)

বাঙ্গালা তখন ভাবের বন্যায় প্লাবিত; এক দিন সকালবেলা শচীশ একখানা 'বেঙ্গলী'পত্র হাতে করিয়া ব্যস্তভাবে বীরেনের ঘরে প্রবেশ করিল; কহিল,—"আরে শুনেছ বীরেন, 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপিত হইবে, সব ঠিক হইয়া গিয়াছে; এইবার আমরা য়ুনিভার্সিটী ভাঙ্গিয়া বাহির হইব! দেশের শিক্ষা দেশ যদি নিজের হাতে না লয়, তবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি কোন মতেই সাধিত হইতে পারে না; এইবার আমরা ঠিক পথ ধরিয়াছি।"

বীরেন তাহার শান্ত চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"সব ভাল যা'র শেষ ভাল।"

শচীশ যেন তাহার উৎসাহ তরঙ্গে একটা আঘাত পাইল; একটু রুষ্ট হইয়া কহিল,—"তার অর্থ?"

"তার অর্থ আর বেশী কিছু নহে শচীশ, আমাদের যে এতগুলি অভাব ছিল, তাহা আমরা এক বৎসর পূর্ব্বেও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। আজ হঠাৎ এই সবগুলি অভাবকে একসঙ্গে উপলব্ধ করিতে যাইয়া অনুভূতির অস্থিরতার মধ্যে, আমরা আসল কর্ত্তব্যটাকেই না হারাইয়া ফেলি; অনেক সময়ে সেই আশঙ্কা হয়। আমাদের শক্তি কতটুকু আগে স্থিরভাবে সেইটা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।"

বাধা দিয়া শচীশ কহিল, "রাখ তোমার যুক্তি, যে স্থানে অন্ধকার ছিল, তথায় প্রতি পদনিক্ষেপে সতর্কতা শোভা পায়; দিনের আলো যখন ফুটিয়া উঠে, তখন আর অত বিচারের কোনও প্রয়োজন থাকে না। আর কায করার সঙ্গে সঙ্গে কায করিবার ক্ষমতা বাড়ে। ভোরে আঙ্গিনা ঝাঁট

দেওয়া হইতেই কাযের আরম্ভ হয়; যখন বেলা বাড়িয়া উঠে, দেবসেবা, অতিথিসেবাও গৃহস্থের দৈনিক কার্য্য-তালিকার মধ্যে আসিয়া পড়ে।—সমস্ত দিনের মধ্যে কিন্তু কোন সময়েই কায হইতে বিরতি নাই, বিশ্রাম নাই।"

"তাহা হইলে, শচীশ, আঙ্গিনা ঝাঁট দেওয়াও একটা কায, এবং সেইটাই সর্ব্বপ্রথম কায।"

"সর্ব্বপ্রথম হইতে পারে, সর্ব্বপ্রধান নহে।"

"তাহা ঠিক। আমাদের এই জাতীয় জীবনের উন্মেষের দিনে, এই জীবনের নবীন উষায়, জাতীয় আঙ্গিনাটাও কি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার নহে? যে জড়তা আমাদিগকে দীর্ঘকাল আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে দূর করিতে হইবে।"

বীরেনের কথাগুলি শচীশের অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সে উগ্রকণ্ঠে বলিল, "তা' কি এই মেসের রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে বসিয়া দূর করিতে হইবে?"

বীরেন শচীশের ধৈর্য্যচ্যুতি দেখিয়া হাসিল; কহিল, "না শচীশ। আমি বলিতেছি যে, দেশ আঙ্গিনা ঝাঁটানো, দেবার্চ্চনা, অতিথিসেবা একসঙ্গে ভোরের সূর্য্য না উঠিতেই আরম্ভ করিয়াছে।"

"তাহা ত হইবেই। বড় গৃহস্থের বাড়ী, বেশী লোকজন খাটে, তাই সব কাযই একসঙ্গে আরম্ভ করিতে পারিয়াছে।"

"কাযকে একটা শৃঙ্খলা দিতে হইবে ত?"

"তুমি কি বলিতে চাহ? কাযকে চাপিয়া শুধু শৃঙ্খলাটাকেই বড় করিয়া দেখিতে গেলে, আসল কাযটা কোন কালেই হয় না।" শচীশের মুখে চক্ষুতে একটা বিপুল উৎসাহের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল!

যে এতটা উৎসাহ অন্তরে পোষণ করে, তার সঙ্গে তর্ক করাটা শোভন নহে, বীরেন এই কথা মনে করিয়া চুপ করিল।

খোলা জানালার ফাঁক দিয়া শচীশ দেখিল, রঞ্জিত পাগড়ী বাঁধা ছেলের দল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যের কোমল দীপ্তি তাহাদের উৎসাহ-চঞ্চল মুখের উপর পতিত হইয়া একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে।

শচীশ ও বীরেন উঠিয়া পড়িল। নীচে নামিয়া আসিয়া ছেলের দলকে অভিনন্দন করিল, এবং তাহাদের ছোট বাক্সটির মধ্যে দুইজনে দুইটি টাকা ফেলিয়া দিল।

ছেলের দল জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বীরেন শচীশের হাত ধরিল; কহিল, "চল, উপরে যাই—কিছু খাওয়া যাউক।"—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বীরেন শচীশকে একপ্রকার টানিয়াই লইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর শচীশ ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বীরু, কালেজ ছাড়িয়া আসিলাম। তৃপ্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তুই আমায় কিছু বলিস্‌নে, ভাই।"

এ উৎসাহ, এ তরঙ্গ, ক্রমে ক্রমে বীরেনকেও স্পর্শ করিয়াছিল,—কিন্তু শচীশ সম্পন্ন জমিদারের ছেলে, সে কালেজ ছাড়িতে পাবে,—কিন্তু বীরেন? হায়, একটা দুঃস্থ পরিবার ভবিষ্যৎ পোষণের অপেক্ষায় যে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! অভাবের কোলে উৎসাহ মরিয়া যায়, প্রতিভা নয়নের জলে ভাসিতে থাকে,—এই সত্যটি বীরেন তাহার নিজের জীবনে তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিল।

বীরেন শচীশকে অভিনন্দন করিল।

শচীশ বীরেনের অবস্থা জানিত; সুতরাং তাহাকে কালেজ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিল না।

তাহার পর দুই বন্ধুতে দেশের কথা লইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার তর্ক চলিল।

এই তর্ক বিতর্কগুলি তাহাদের কাছে একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল।

(৬)

শচীশের উৎসাহ তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না।

কালেজ ছাড়িবার পর কোনও সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের মধ্যে আপনাকে লিপ্ত করিয়া রাখিবার বলবতী ইচ্ছা তাহার অন্তরমধ্যে উন্মুখ হইয়া উঠিল।

শচীশ সেই ইচ্ছাটিকে কোন্ আকার দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবে, কিছু দিন তাহাই ভাবিতেছিল। এমন সময়ে পিতার কাছ হইতে তাহার ডাক পড়িল। সে এই ডাকের জন্য প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু পিতা ডাকিয়াছেন, দেরী করা চলে না। কলিকাতার উৎসাহস্রোত ও উদগ্র কর্ম্মতরঙ্গ পশ্চাতে রাখিয়া শচীশ একদিন বৈকালের গাড়ীতে মধুপুরের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল।

গৌরীশঙ্কর বাবু শচীশকে যে কথা বলিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। শচীশ পিতাকে চিনিত, গৌরীশঙ্কর বাবু তাঁহার কল্পনাকে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দিক দিয়া সেই কল্পনাকে নিপুণ হিসাবীর মত পরীক্ষা করিয়া লইতেন। সুতরাং শচীশ বুঝিল, পিতা তাঁহার কল্পনাকে সার্থকতা প্রদান করিবার মুহূর্ত্তেই তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। শচীশ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এতদিনপরে সে দেশের জন্য একটা কিছু করিতে পাইবে, এই কল্পনার আনন্দেই তাহার বক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

এক পার্শী ভদ্রলোকের সহিত গৌরীশঙ্কর বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। দেশের অবস্থা ইঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

দেশমাতাকে স্থায়ী সেবা প্রদানের আয়োজন করিয়া সম্পত্তির সার্থকতা সম্পাদন করিবার প্রলোভনটুকু ক্রমে ক্রমে উভয়ের নিকটই অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। কল্পনাকে সার্থকতা প্রদান করিবার পক্ষে যখন আর এত-টুকুও দ্বিধা রহিল না, শুধু তখনই গৌরীশঙ্কর বাবু শচীশকে কলিকাতা হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তিন মাসের অক্লান্ত চেষ্টার পর কলিকাতার উপকণ্ঠে গৌরীশঙ্কর বাবুর 'বস্ত্রবয়নালয়' প্রতিষ্ঠিত হইল।

কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করাই গৌরীশঙ্কর বাবুর অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু যখন শচীশ সাশ্রুনয়নে বলিল, "বাবা, দেশের তন্তুবায়দিগের উপায় ত কিছুই হইল না!"—তখন গৌরীশঙ্কর বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিব না।"

"দেশের কতকগুলি তন্তুবায় সংগ্রহ করিয়া একটি 'বস্ত্রবয়নালয়' স্থাপিত করুন; ধনীসম্প্রদায় এখনও তাঁতের কাপড়ই ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। এই আয়োজন বহু বিস্তৃত ভাবে না করিয়া, অন্ততঃ একশত তন্তুবায়ের অন্ন-সংস্থান করুন; পরে ধীরে ধীরে বিস্তৃতভাবে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

গৌরীশঙ্কর বাবু এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কল প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুসময় আবশ্যক হইবে, ধীরে ধীরে সে কার্য্য চলিবে; আপাততঃ দেশের তন্তুবায়দিগকে লইয়া 'বস্ত্রবয়নালয়' স্থাপিত করাটাই তিনি সুসঙ্গত মনে করিলেন।

তাঁতের অবিরল খট্ খট্ শব্দের মধ্য হইতে যখন প্রথম কাপড়খানি নামিয়া আসিল, তখন শচীশের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। সে এই প্রথম বস্ত্রখণ্ড মস্তকে ধারণ করিল। জননীর পুণ্য আশীর্ব্বাদ যেন তাহার আনত শিরে বর্ষিত হইয়াছে, এমনই একটি কল্পনার গৌরব ও তৃপ্তি তাহাকে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

পিতা অফিস-ঘরে হিসাব পরীক্ষা করিতেছিলেন, শচীশ সেই বস্ত্রখণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়াই তথায় উপস্থিত হইল, পুলক-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা"—গৌরীশঙ্কর বাবু হিসাবের খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন। তিন মাসব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের সার্থকতার প্রথম ফল, আজি তিনি পুত্রের মস্তকে দেখিয়া সুখী হইলেন।

তিনি দেশকে এক বিরাট পালিনী মাতৃশক্তিরূপেই দেখিয়াছেন। মাতার সেই জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিত—আত্মহারা করিত।

(৭)

প্রাতঃকাল।

যতীশ তাহার আফি-ঘরের বারাণ্ডায় অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করিতেছিল। তরুণ সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণরেখা পল্লবরাজির উপর পতিত হইয়াছে,—পল্লবগুলি শিশির-সিক্ত; সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে উজ্জ্বল, শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে। যতীশ ভাবিতেছিল।

গত রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় সে যে স্বপ্নটি দেখিয়াছিল, সেই স্বপ্নের স্মৃতি তাহার হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। স্বপ্নটাকে সে যতই ভুলিতে চাহিতেছিল,—ততই বেদনা বাড়িয়া যাইতেছিল। বহুবর্ষ পরে সে তাহার জননীকে স্বপ্নে দেখিয়াছে। সেই স্নেহে, মমতায়, করুণায় উচ্ছ্বসিত মূর্ত্তিখানি! দৃষ্টিতে স্নেহামৃতধারা বর্ষিত হইতেছে,—আর সর্ব্বাঙ্গ বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে!

স্বপ্নে যতীশ বড় ব্যাকুল হৃদয়ে সেই মাতৃ-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; আশা চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইবে। মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

শ্যামল ক্ষেত্র আলোকিত করিয়া সোণার ফসল ফলিয়াছে, সেই ক্ষেত্রের উপর দিয়া; পুষ্পাস্তৃত উপত্যকা পদ-শব্দে মুখরিত করিয়া; পিযূষ-বাহিনী স্রোতস্বিনী-তরঙ্গ গতি-ভঙ্গে উচ্ছলিত করিয়া; কত শান্ত তপোবনের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যতীশচন্দ্র ছুটিয়া চলিয়াছে। উপলখণ্ডের বাধা সে

মানে নাই; কণ্টকের আঘাত সে গ্রাহ্য করে নাই। তবুও স্বপ্নদৃষ্ট জননী-মূর্ত্তির সহিত তাহার দূরত্বটুকু সমানই রহিয়া গেল! এক শিলাখণ্ডের উপর সে হতাশ ভাবে বসিয়া পাড়ল, জননীর পুণ্যমূর্ত্তি তখনও তাহার দিকে তেমনই স্নেহস্রাবী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে!

যতীশের বক্ষ-পঞ্জর নিপীড়িত করিয়া, হৃদ্‌পিণ্ড নিষ্পিষ্ট করিয়া আহ্বান বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল—"মা—মা!"—কিন্তু সে আহ্বান ধ্বনি তাহার কণ্ঠমধ্যেই অনুচ্চারিত রহিয়া গেল! সে প্রাণপণ চেষ্টায় ডাকিতে চাহিতেছিল, "মা—মা"—

তাহার পর যতীশচন্দ্র অপলকনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, যে গিরি, উপত্যকা, বন, উপবন, শ্যামল ক্ষেত্র, দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই অঙ্গে অঙ্গে, সেই মাতৃ-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মিশাইয়া যাইতেছে।

আজ প্রভাতে স্বপ্নের কল্পনা ও মোহস্মৃতি যখন কাটিয়া গিয়াছে, তখন-যতীশের মনে হইতেছিল, প্রভাত বায়ুর মধ্যেও যেন জননীর নির্ম্মাল্য-গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, নবীন পল্লবের তরুণরাগের মধ্যে জননীর চরণালক্তের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

চিন্তা-তরঙ্গ যতীশকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল; আজিকার প্রভাতের অরুণ-দীপ্তির মধ্যে তাহার হৃদয়ের দৈন্য যেন অসম্বরণীয়রূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। হৃদয়ের অস্থিরতায় সে আরও দ্রুত বেগে পাদচারণা করিতে লাগিল।

ঠিক্ সেই সময় একটা পিয়ন আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, এবং যতীশের হাতে একটা সরকারী খাম গুঁজিয়া দিল। অন্যমনস্ক যতীশ খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল, তার পর ভিতরের কাগজ বাহির করিয়া পড়িয়া গেল।

নানা আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া সে যে কর্ম্মজীবন বরণ করিয়া লইয়াছে, এই লিপি, সেই জীবনেরই একটি কর্ত্তব্যকে তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

(৮)

সারাদিনের কর্ম্মাবসানের পর গৌরীশঙ্কর বাবু তাঁহার অনতিবিস্তৃত অফিস-কক্ষটির সম্মুখের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সহরের আকাশে গোধুলি দেখা যায় না। চিম্‌নীর মুখ হইতে উদ্গীরিত ধূমপুঞ্জ আকাশের সান্ধ্য উজ্জ্বলতাটুকু ও কোমলতাটুকু নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

তবু পশ্চিম আকাশে গৈরিক মেঘের লীলা চলিতেছে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাকাশে মেঘগুলি আরও নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে।

গৌরীশঙ্কর বাবু প্রত্যহই কর্ম্মাবসানে বাহিরে আসিয়া সূর্য্যাস্ত ও লীলা-চঞ্চল খণ্ড মেঘের ক্রীড়া দর্শন করিতেন। জীবনেরও এমনই একটা অবসান-মুহূর্ত্ত আছে। সেই অবসান-মুহূর্ত্তে, সারা জীবনের কর্ম্মগুলি ঐ রঞ্জিত খণ্ড মেঘগুলির ন্যায় ধীরে ধ'রে জীবনকে অনুসরণ করিবে কি ?

কোন্ নিবিড় বর্ণ তাহা দগকে বিচিত্র করিয়া তুলিবে ? কিন্তু ভগবান্ ত তুলিকা মানুষের হাতেই দিয়া রাখিয়াছেন ! মানুষ কেন ইচ্ছা করিয়া জীবনকে মসীলিপ্ত করিয়া তুলে ?

শচীশ ব্যস্তভাবে অফিস-কক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকিল—"বাবা !"

গৌরীশঙ্কর বাবুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল,—তিনি ফিরিয়া উত্তর দিলেন—"কি, বাবা ?"

শচীশের মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সে ব্যস্তকণ্ঠে কহিল, "বাবা, পুলিশ আসিয়া কারখানা ঘিরিয়াছে, শীঘ্র এদিকে আসুন।

"সে কি রে, শচীশ ?—" গৌরীশঙ্কর বাবু দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—দেখিলেন, পূর্ব্বদিকের সিঁড়ি দিয়া দুইজন য়ুরোপীয় উপরের দিকে উঠিয়া আসিতেছেন।

গৌরীশঙ্কর বাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন,—এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি গৌরীশঙ্কর বাবু ?"

"হাঁ, কি চাহেন আপনারা ?"

আগন্তুক পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন,—গৌরীশঙ্কর বাবু দেখিলেন, একখানি "সার্চ ওয়ারেণ্ট"। গৌরীশঙ্কর বাবুর বিস্মিত হইবার অবসরও ছিল না। তিনি ফিরিয়া শচীশকে কহিলেন,—"নীচে যাও, শচীশ, লোকজনগুলি ভয় না পায়" শচীশ চলিয়া গেল।

পুলিশের লোক যাইয়া পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোককে ডাকিয়া আনিল।

বীরেন সেদিন বৈকালে কারখানা দেখিতে ও শচীশের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। শচীশ তাহাকে উপরে পাঠাইয়া দিল।

বীরেন উপরে আসিয়াই য়ুরোপীয়দ্বয়কে কহিল, "খানাতল্লাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা আপনাদের কাপড় চোপড় পরীক্ষা করিতে চাহি।"

তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিলেন,—উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁহারা নামিয়া

আসিলেন। যে কয়জন কারখানার ভিতরে থাকিয়া অনুসন্ধান করিবে, বীরেন তাহাদিগের কাপড় চোপড় অনুসন্ধান করিয়া দিল।

সিঁড়ির পার্শ্বে আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। বীরেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; কহিল,—"আপনাকেও পরীক্ষা করিব।"

কর্ম্মচারী কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে চাহিলেন—তাহার পরই দৃষ্টি নত করিলেন; হাতে একখানি ছোট বেতের লাঠি ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহারই বাঁধানো অংশটা খুঁটিতে লাগিলেন।

বীরেন চিনিল, সে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের পরিচ্ছদভূষিত তাহাদেরই বাল্যবন্ধু – সতীর্থ যতীশ।

বীরেনের কণ্ঠ হইতে তাহার অজ্ঞাতে শব্দ বাহির হইল, "যতীশ!" কুণ্ঠায় যতীশের হৃদ্‌পিণ্ডটা তাহার বুকের মধ্যে লুণ্ঠিত হইতেছিল।

বীরেন স্তব্ধভাবে যতীশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে তাহাকে পরীক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তাহার পর যথারীতি খানাতল্লাস হইয়া গেল। যতীশ ভিতরে গেল না; বাহিরেই রহিল।

কিছু কাগজপত্র কারখানার কয়েকটা যন্ত্রের বিচ্ছিন্নাংশ, দুইখানি বাঁধানো ছবি লইয়া পুলিশের দল চলিয়া গেল। একখানা তালিকা রাখিয়া গেল।

গৌরীশঙ্কর বাবু খবর লইয়া জানিলেন, যে কর্ত্তৃপক্ষ এমন সংবাদ পাইয়াছেন যে, নিরক্ষর তন্তুবায়দিগকে জুটাইয়া তিনি এই কারখানা খুলিয়াছেন দিনে কারখানার কার্য্য চলে, আর আশু ধনবৃদ্ধির জন্য রাত্রিতে তিনি এমন কারবারও চালাইয়া থাকেন, যাহার নামের কোনও সভ্য সংস্করণ দেওয়া চলে না।

গৌরীশঙ্কর বাবু সমস্তটা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তাহার পর দুই পানি যুক্ত করিয়া নিমিলিত নয়নে মনে মনে বলিলেন,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"—

তিনি কলাকাঙ্খা কোন কালেই করেন নাই। সেই হৃদয়স্থিত যাহা করাইবেন, গৌরীশঙ্কর অম্লান বদনে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছেন।

বিপদ যদি আসিয়া পড়ে, সে বিপদ তাঁহার কাছে চিরদিনই স্বাগতঃ।

(৯)

যতীশ যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সমস্ত হৃদয়টা বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া সে ক্যাম্প্‌ খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। আজ আর সে কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না।

সেই বীরেন—সেই শচীশ।

যে দিন সে এই দুই বাল্য বন্ধুর সঙ্গ হইতে প্রথম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই দিন হইতে আজকার এই দিন পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময়টা কাটিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সে কি তাহাদের ভুলিতে পারিয়াছে? একটা বিরাট ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সে তাহার জীবনটাকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে; ঘটনার স্রোত তাহাকে যে জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, সেই জীবনের মধ্যে সে কোনও সার্থকতা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে নাই। সে কেবল কর্ত্তব্য অবশ্য করণীয় বলিয়া কর্ত্তব্যই করিয়াছে।

শচীশের জন্য তাহার অন্তরমধ্যে একটি শ্রদ্ধার উৎস ছিল; এতদিন সে উৎসমুখ ঘটনাচক্রে রুদ্ধ হইয়াই ছিল; আজ এই আঘাত পাইয়া সে বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গেল।

যতীশের হৃদয় প্লাবিত করিয়া, অন্তর মথিত করিয়া, আজ আবার সেই মুক্ত উৎস হইতে শ্রদ্ধাস্রোত বাহির হইল। এই প্লাবনের অনুভূতি যতীশকে আরাম প্রদান করিল, তৃপ্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল।

যে উৎসাহ—যে প্রাণের স্পন্দন সে হারাইতে বসিয়াছিল, আজি আবার সে তাহা নূতন করিয়া বক্ষের মধ্যে অনুভব করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, মানুষ সকল অবস্থাতেই উপকার করিতে পারে। যে সন্দেহে কারখানায় খানাতাল্লাস—সে সন্দেহ যে অসম্ভব—সে কেন তাহা তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বলে নাই? বলিলে সে তাহার মনিবের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য করিত—আপনার প্রতি কর্ত্তব্যও তেমনই সম্পন্ন করিতে পারিত।

যতীশ তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

(১০)

সে দিন সকালবেলা শচীশ তাহার কক্ষে বসিয়া একমনে একখানা ছবি দেখিতেছিল।

বীরেন আসিয়া ডাকিল, "শচীশ!"—

শচীশের তন্ময়তা কাটিয়া গেল; সে একটু চমকিয়া উঠিল, তাহার পর সে ত্রস্তহস্তে ছবিখানি টেব্‌লের উপরে একখানি বহির নীচে চাপা দিয়া

বীরেনের মুখের দিখে চাহিল; কহিল, "কি বীরেন, একটু ব্যস্ত দেখিতেছি যে?"

বীরেন জানিত, ছবি কাহার।

শচীশ শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিল; ছবিখানি তাহার মৃতা জননীর; প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সে একবার করিয়া কিছুক্ষণের জন্য ছবিখানি দেখিত, তাহারপর জননীর চিত্রিত চরণযুগল মাথায় ছোয়াইয়া তাহার কর্ত্তব্যে ব্রতী হইত।

পৃথিবীর কাহারও কাছে সে তাহার হৃদয়ের এই ঐকান্তিক শ্রদ্ধাপ্রবণতা প্রকাশ করিয়া দেখাইতে রাজি ছিল না। ভাবপ্রবণতাসম্বন্ধে মানুষের নির্ম্মম সমালোচনাকে সে সব চেয়ে ভয় করিত। বীরেন তাহা জানিত, এবং চিরদিনই সে শচীশের তরুণ হৃদয়ের এই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিটিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে।

"শুনিয়াছ, শচীশ, যতীশ নাকি"—বীরেনের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক তৃতীয় ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "হাঁ বীরেন, যতীশ আবার তাহার বাল্যবন্ধুদের কাছে স্নেহের দাবী করিতে আসিয়াছে! তোমরা যে তাহাকে অস্বীকারের দ্বারা কুণ্ঠিত করিবে না—ফিরাইয়া দিবে না এ বিশ্বাস তাহার আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে যতীশ তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। বীরেন অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "যে বাল্যবন্ধু স্নেহের দাবী করিবার জন্য হৃদয়ের এত কাছে আসিয়া পড়ে তাহাকে কোনও দিনই প্রত্যাখ্যান করা চলে না। সুপ্রভাত, আজ আয় শচীশ! তোর বাল্যবন্ধুকে অভিনন্দন কর্!"

শচীশ কথাটা কতকটা বুঝিল।

বীরেন যাহাকে হৃদয়ের কাছে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, সে যে নির্ম্মল—সে যে অভিনন্দনযোগ্য শচীশের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না!

তখন সেই উদারপ্রাণ শচীশ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যতীশকে আলিঙ্গন করিল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "যতীশ!"

"ক্ষমা কর ভাই!"

মিলনের আনন্দের মধ্যে অশ্রুজল কখন গণ্ড প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারে নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

ডালি।

পাপীর সন্তানে হরি তুলি লও কোলে।
অবোধ বালিকা সঁপি দিনু পদতলে॥
কুসুম-কলিকা বালা সহিয়ে রোগের জ্বালা
জুড়াতে গিয়েছে দাশু* চিতানলে জ্ব'লে।
রক্ষা কর তারে, হরি, পাপ সব ভুলে॥
বড় আদরের মেয়ে ছিল মোর মুখ চেয়ে
তা'র মুখচাঁদ স্মরি' হৃদয় উথলে।
রক্ষ তা'রে বিশ্বনাথ চরণ-কমলে॥
আর না হেরিব মুখ ভাবিলে বিদরে বুক
আর না শুনিব সেই আধ আধ বোলে।
আর না ভুলিব দুখ লয়ে তা'রে কোলে॥
ছিন্ন সে সম্বন্ধ-সুতা সে নহে আমার সুতা
তবুও মায়ার ঘোরে কাঁদি গো বিরলে।
তবুও এ চক্ষু ভাসে নয়ন-সলিলে॥
আষাঢ়ে আঠার দিন মনে রবে চিরদিন
কোলের সন্তানে যবে দিনু চিতানলে।
আজিও সে হুতাশন হৃদিমাঝে জ্বলে॥
দীননাথ কৃপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
স্থান দিও তনয়ারে চরণ যুগলে
অস্ফুট কলিকা ডালি দিনু পদতলে॥

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

* লেখকের মৃতা কন্যার নাম। কন্যাটি দুই বৎসর তিনমাস সতের দিন বয়সে গত ১৩২০ সালের ১৮ই আষাঢ় বুধবার প্রাণত্যাগ করে।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

প্রাচীন ভারতে মাংস-ভক্ষণ।

প্রাচীন ভারতে মাংস-ভক্ষণ চলিত ছিল কি না তাহা লইয়া লেখকদিগের মধ্যে মতান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। সংপ্রতি বিখ্যাত 'ইষ্ট আণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রে এই বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—নিম্নে তাহার সার সংগ্রহ প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ভারতে মাংস-ভক্ষণ পদ্ধতি ছিল, প্রাচীন ভারতবাসী গরু, ছাগল, মহিষ, কুক্কুট ভক্ষণ করিতেন।

শতপথ ব্রাহ্মণমধ্যে বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই লিখিত আছে, "যাহারা" সুন্দর, সুঠাম, বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বজন-প্রশংসিত দীর্ঘায়ু পুত্ররত্নের অধিকারী হইতে চাহেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের স্ত্রীরা মাংস ও মাখন-মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিবেন। অবশ্য তাঁহারা বলিষ্ঠ যণ্ড ভক্ষণ করিবেন।" উপনিষদের উল্লিখিত অংশ পাঠে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের পিতৃপিতামহেরা মাংস ভক্ষণের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং মাতাপিতা মাংস ভক্ষণ না করিলে যে, তাঁহাদের গর্ভে ও ঔরসে বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু বুদ্ধিমান মেধাবী কর্ম্মঠ বালক উৎপন্ন হয় না, এ ধারণাও তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। কেবল যে শ্রুতিই এই মাংস-ভক্ষণের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে। আমরা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শাস্ত্রাদির মতও উদ্ধৃত করিতেছি।

গোমাংস ভক্ষণ আজ আমাদের নিকট যতই ঘৃণ্য ব্যাপার হউক না কেন, আমাদের পিতৃপিতামহেরা যে সেই গোমাংস ভক্ষণ করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপনিষদ অপেক্ষা সুশ্রুত অনেক পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ। এই সুশ্রুত সংহিতায় আমরা দেখিতে পাই, তদনীন্তন সময়ের শ্রেষ্ঠ ভিষগ্‌গণ মাংসের দোষ গুণাদির বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া গোমাংসকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুত সংহিতার মাংস-ভাগ খণ্ডে ৪৬ অধ্যায়ে এই প্রকার উক্তি আছে, যথা, "গোমাংস ভক্ষণ যক্ষ্মা, জ্বর প্রভৃতির মহৌষধ। ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর। যাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন অথবা ক্ষুধার তাড়না অধিক পরিমাণে উপভোগ করেন, তাঁহাদের এই গোমাংসভক্ষণ অত্যাবশ্যক"।

অনেকে বলেন যে, গোমাংস বাত রোগ উৎপাদক। তাঁহাদের কথা যদি সত্যই হইবে তবে, সুশ্রুত সংহিতায় আমরা এরূপ উক্তি পাই কেন? যে সুশ্রুত সংহিতার প্রতি আজ প্রাচ্য পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, সেই সুশ্রুত সংহিতার ভিষগ্‌গণ নিশ্চয়ই বিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যে গোমাংসকে সুশ্রুত-প্রণেতৃগণ মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গোমাংস

বাত কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের উৎপাদক ও মস্তিষ্কের উষ্ণতা-বর্দ্ধক এ কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

প্রাচীন ভারতে অতিথিকে "গোঘ্ন" অর্থাৎ গো-খাদক এই বাক্যের দ্বারা সম্মানিত করা হইত। বশিষ্ঠ সংহিতায় অতিথি-সৎকারের সম্বন্ধে এই উক্তি আছে,—"ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্য সুন্দর একটি বৃষভ বা ছাগল রন্ধন করিবে।"

যাঁহারা মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত উত্তর-রামচরিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন স্মৃতির ব্যবস্থাপক মহামুনি বশিষ্ঠ কিরূপ গো-খাদক ছিলেন। একদিন মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে তাঁহার জনৈক চপলমতি শিষ্য একটি বলিষ্ঠ গোবৎস মড়্ মড়্ করিয়া চিবাইয়া খাইয়াছিলেন বলিয়া" ব্যাঘ্রো বা বৃকো বা" বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। আমাদের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই বড় বিস্ময়ের বিষয় যে, বাল্মিকীর ন্যায় একজন মুনি বশিষ্ঠকে গোমাংস-দ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়াছিলেন।

শুধু কি ইহাই ? মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই আর্য্যদিগের কোন্ মাংস ভক্ষণ কর্ত্তব্য তাহার নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে মনু বলিতেছেন,—"যে সকল প্রাণীর এক পংক্তি মাত্র দন্ত তাহাদের মাংসই হিন্দুজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ষণোপযোগী মাংস।"

'বঙ্গবাসী' পুস্তক বিভাগ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনূদিত মনুসংহিতায় এ অংশ নাই।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, রন্তিদেব প্রতিদিন অতিথি-সৎকারের জন্য দুই সহস্র বৃষ বলিদান করিতেন। এই জন্য তিনি তদানীন্তন সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশের ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। * মহাভারতের শৈব্য, শ্যেন ও কপোতের উপাখ্যান মহাভারতাধ্যায়ীর নিকট নূতন নহে। শ্যেন যখন কপোতকে অনুসরণ করিতে করিতে শৈব্যর নিকট উপস্থিত হইল এবং কপোত যখন শৈব্যের শরণাগত হইল, তখন তিনি শ্যেনকে বলিলেন; "গো বৃষো বা বরাহ মৃগো বা মহিষোপি বা ত্বদার্থম আদ্য ক্রিয়াতম যাচ যচ্ছেদ কাংক্ষসি" অর্থাৎ তুমি কপোতটি ভক্ষণ করিও না, আমি তোমার জন্য ষণ্ড, শূকর, মৃগ অথবা মহিষ অথবা যাহার মাংস তুমি খাইতে ইচ্ছা কর তোমাকে রন্ধন করাইয়া দিতেছি। *

অনেকেরই বিশ্বাস, রাম ও সীতা এতদুভয়ে বনবাস-জীবন যাপনকালে ফলমূলভোজী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। তাঁহারা অধিকাংশ সময় ফলমূলাদিই ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু সুযোগ পাইলেই যে মাংস ভক্ষণ করিতেন এ কথায় বহু প্রমাণ রামায়ণে দেখিতে পাই। বাল্মিকীপ্রণীত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গে দেখিতে পাই, "রাম পর্ব্বতোপরি বসিয়া সীতাকে পচিত মাংস ভক্ষণ করিতে দিয়া বলিতেছেন, এই মাংস অতি পবিত্র, এই মাংস অতি সুস্বাদু এবং এই মাংস অগ্নিতে উত্তমরূপে পচিত।"

---

* বনপর্ব্ব, অষ্টম ও নবম অধ্যায়।

* তীর্থযাত্রা, বনপর্ব্ব—সপ্তদশ অধ্যায়।

রামের উপর্য্যোক্ত কথা শুনিয়া আমাদের দেশের বালকগণের বন ভোজন বা পিক্‌নিকের কথা মনে পড়ে। আবার আমরা রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গে দেখিতে পাই, রাম ও লক্ষণ একটি প্রকাণ্ড বরাহ ও তিনটি হরিণ বধ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহার ভক্ষণোপযোগী দেহের অংশ একটি বৃক্ষতলে লইয়া যাইয়া ভক্ষণ করিলেন।

রামায়ণের দ্বাত্রিংশতি সর্গে আমরা আরও দেখিতে পাই, রামচন্দ্র বনবাসে যাইবার প্রাক্কালে এক সহস্র গোবৎস দিতে লক্ষণকে আদেশ করিতেছেন।

গোমাংস অপেক্ষা আর্য্যদিগের নিকট শূকরের মাংসই যেন অধিকতর প্রিয় ছিল। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে শূকরের মাংসদ্বারা তৃপ্ত করিতেছেন। এখনও যে শূকরের মাংস ভক্ষণ বঙ্গদেশের হিন্দু সাধারণের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। শ্রীহট্ট জিলায় এখনও শূকর-মাংস ভক্ষণ চলিত আছে।

রাজর্ষি জনকের রাজধানী বিদেহ নগরে একজন কসাই মাংস বিক্রয় করিত, পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। তাহার নাম "ধর্ম্মব্যাধ" ছিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ছাগল, মহিষ প্রভৃতি যাহা কিছু দুর্গা অথবা কালীদেবীর নিকট বলিদান করিতেন, তাহা অতি পবিত্রও মা'র প্রসাদবোধে ভক্ষণ করিতেন।

আত্রেয়ী ব্রাহ্মণও গোমাংস ভক্ষণের অনুকূলে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতে আমরা গোমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই। যজ্ঞের সময় যে সমস্ত অশ্ব, বা গো বা মনুষ্য বলি দেওয়া হইত, তাহার মাংস কি আর্য্যগণ গ্রহণ করিতেন না?

রামায়ণের পঞ্চ-পঞ্চাশৎ সর্গে দেখিতে পাই, বনে যাইবার প্রাক্কালে জানকী কালিন্দী নদী দেবীর নিকট যাইয়া প্রতিশ্রুত হইতেছেন যে, তিনি নিরাপদে দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার উদ্দেশ্যে এক সহস্র ষণ্ড বলি দিবেন।

মহাভারতে আমরা আরও দেখিতে পাই, রন্তি দেবীর নিকট অসংখ্য ষণ্ড উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলি দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। তাহাদের আশা এই যে, এইরূপে আত্মদান করিয়া তাহারা অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী হইবে।

এ সম্বন্ধে আর কত প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিব। প্রাচীন ভারতে মাংস 'ভক্ষণ' পদ্ধতি ছিল এবং প্রাচীন আর্য্যরা মাংস ভক্ষণ করিতেন, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে তাহার অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে মাংস-ভক্ষণ।

(১)

গো আজ মাতৃজ্ঞানে পূজিত হইলেও, এক কালে প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে গোমাংস-ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ করিতেন এবং তখন শবের সহিত গো-শব দগ্ধ করা হইত। তখন গোমেধ যজ্ঞে গোবধ করা হইত এবং সে মাংসে অতিথি সংকার করা হইত। যেমন 'উত্তর-রাম-চরিতে' মহামুনি বাল্মীকিকে স্মৃতির-অন্যতম-ব্যবস্থাপয়িতা বশিষ্ঠদেবকে গোমাংসদ্বারা তৃপ্ত করিবার কথা আছে, তেমনই 'মহাবীর চরিতে' বশিষ্ঠদেবের জামদগ্ন্য ঋষিকে পশুদ্বারা তৃপ্ত করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র, জনক, শতানন্দ প্রভৃতি মহাতপা ঋষিগণকে স্থূলকায় বৎসতরীমাংসদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন, এমন প্রমাণও আছে। মনু (৫,১৮) অতিথি, দেবতা, পিতৃপুরুষকে অর্পণান্তর গোমাংস পর্য্যন্তও ভক্ষণের আদেশ দিয়াছেন। প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের প্রথম আদেশ-স্তম্ভে সহস্র সহস্র গো-বধের উল্লেখ আছে। চরক সংহিতায় গো, মহিষ ও শূকরের মাংস নিত্য ভক্ষণের নিষেধ আছে ; মধ্যে মধ্যে খাইতে আপত্তি নাই। কিন্তু গর্ভিণীকে গোমাংস খাওয়াইবার সম্পূর্ণ অনুকূল মত আছে। সুশ্রুতে ও কোন্ কোন্ ব্যাধিতে গোমাংস-ভক্ষণ বাঞ্ছনীয় ও কোন্ কোন্ ব্যাধিতে উহা বর্জ্জনীয় তাহার উল্লেখ আছে। কল্প, গৃহ্য ও গোভিল সূত্রে স্পষ্ট গো-মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। গোভিল এমন কি তর্পণের কালে গো-মাংস ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের কাম্য ইষ্টির তালিকার মধ্যে (৩,৮) বিষ্ণুকে, বরুণকে, ইন্দ্রকে, অগ্নিকে, বায়ুকে, মিত্রকে, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে গো-বলি দিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। রাজসূয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ গোশব ব্যতীত হইত না (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। বর্ত্তমান দুর্গাপূজার স্থানীয় পক্ষ শারদীয় সভা নামক পঞ্চবৎসরব্যাপী উৎসবে পশু বলি দিবার প্রথা ছিল। অশ্বলায়ন সূত্রে শিক-কাবাবের কথাও আছে (৪,৬,২)। অশ্বলায়ন সূত্রে কেমন করিয়া গোমাংস শূলীকৃত করিতে হয়, তাহারও সুস্পষ্ট নিয়ম লিখিত আছে—সেরূপ নিয়ম কতকটা roast beef dress করার অনুযায়ী। গোক্ষুর ও গোশৃঙ্গ গলাইয়া পাদুকা নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা মহামুণি সামবত্য (৪,৬,২৪) দিয়াছেন। অশ্বলায়ন ২৬) ও মনু (৫,৩৫) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মধুপর্কক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মাংস-ভক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কসাইয়ের দোকান হইতেও মাংস ক্রয় করিবার অনুমতি মনুসংহিতায় পাওয়া যায়।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, পূর্ব্বাপর একই মত হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া গেলেও, আজ গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া কেন বিবেচিত হয় ? আমার মনে হয়, ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, বৌদ্ধমতের প্রভাব, দ্বিতীয় কারণ আর্য্যগণের শীতদেশ (পঞ্চনদ) হইতে গ্রীষ্মদেশে (বঙ্গে) ক্রমশঃ আগমন, এবং তৃতীয় কারণ, দেশবাসীর কৃষিপ্রধানত্ব। যতদিন হিন্দুরা এ দেশের রাজা ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের মধ্যে মাংসভক্ষণ বহুল পরিমাণে

প্রচলিত ছিল; এবং মনে হয় যে, পশুহত্যার বাহুল্যই বুদ্ধদেবের জীবহিংসার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কারণ। বুদ্ধদেবের মতানুযায়ী ভদ্ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ জীবহিংসা নিষেধ করিতে বাধ্য হয়েন। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে অবতারত্বে উন্নমিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এমন শাসনকালে হিন্দুরা বেদের গোহত্যার মতও বদলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন সেই পরিবর্ত্তিত মতই চলিতেছে।

পঞ্চনদ অতীব শীতপ্রধান দেশ। যখন আর্য্যরা ক্রমশঃ বঙ্গদেশাভিমুখী হইতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃই তাপ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন. এবং আরও দেখিলেন যে, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশে ফলমূলই সুখসেব্য ও সুখপাচ্য। এমন অবস্থায় মতপরিবর্ত্তন হইবে, আশ্চর্য্য কি?

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান স্থান। এই স্থানে অশ্বদ্বারা হলচালনা দুষ্কর। যে পশুর দ্বারা হল চালনা করা যায়, যে দেশে "গাই বলদে চষে" যথায় গোদুগ্ধে, গোময়ে, গোক্ষুরে, শৃঙ্গে নিয়তই প্রয়োজন, সে দেশে সেই গোহত্যা মহাপাতক বিবেচিত হইবে না ত কি? Social economy হিসাবে এ ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

আর একটি কথা। যত প্রকারের মাংস আছে, তন্মধ্যে গোমাংস ভক্ষণে যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ছাগমাংস-ভক্ষণে সে রোগের কোনও সম্ভাবনাই নাই। এমত অবস্থায়, গোমাংস বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দূরদর্শী হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞরা গোমাংসের এই দোষ জ্ঞাত ছিলেন না। অথবা, তৎকালে এই ব্যাধির অস্তিত্বও ছিল না বলিয়া বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকাররা তদ্বিষয়ের উল্লেখও করেন নাই—পরন্তু যক্ষ্মারোগে উহার ব্যবহারেরই অনুমোদন করিয়াছেন.

গোমাংস-ভক্ষণে বাত বা কুষ্ঠরোগ হয় বলিয়া যে অখ্যাতি আছে তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

শূকরের মাংস ভক্ষণ যেমন শ্রীহট্ট দেশে অদ্যাপিও প্রচলিত আছে, তেমনই শুনিতে পাই, হিন্দু-প্রধান জয়পুরেও প্রচলিত আছে। বন্য কুক্কুট, বন্য বরাহ প্রভৃতি যে খাইবার ব্যবস্থা আছে তাহার অর্থ আর কিছুই নহে: শুধু এই যে, বন্য জাতিরা এখনও সকল মাংস ব্যবহার করে। বন্য পশুপক্ষীরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবলদেহ এবং ঐরূপ একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে যথেচ্ছ প্রাণীহিংসার রোধ হয়।

চিকিৎসক

বুরহান শা'র দরগা।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে খাঁ জাহান আলি নামক একজন মুশলমান প্যয়গম্বর পশ্চিমদেশ, সম্ভবতঃ দিল্লী হইতে যশোহরে আগমন করেন। (১)

যশোহরের ঐতিহাসিক ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন, "He (খাঁ জাহান আলি) obtained from the emperor, or from of the king Gour, a jaghir of these lands, (বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান) and in accordance with it established in them." (২) খাঁ জাহান দিল্লী হইতে আসিয়াছিলেন, কি গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অশেষ কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাগেরহাটে তাঁহার সৌধাবলীর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত হইতে হয় এবং তাহাদের বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে কখনই তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না।

কথিত আছে, "খাঁ জাহান্ আলিই প্রথমে সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া তাহাকে বৃহৎ জনপদে পরিণত করিয়াছিলেন।" (৩) তিনি যে স্থান আবাদ করেন, তাহা এক্ষণে খলিফাতাবাদ পরগণা নামে পরিচিত। রিয়াজ গ্রন্থে লিখিত আছে, খলিফ খাঁ জাহান এই প্রদেশ আবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা উক্ত নামে আখ্যাত হইয়াছে। হাণ্টার বলিয়াছেন, "I am inclined to think that the old name of the place Khalifatabad, or the Khalifat's clearance is connected with this now canonized Khan, whilst the syllable abad clearly refers to land reclaimed" (৪) ব্লকম্যানও এই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন। (৫) ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন যে খাঁ জাহানের কোনও বংশধর ছিল না। বিভারিজ তাঁহার বংশধর চাঁদ খাঁ'র উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal (1862).

(২) Westland's Repor on the District of Jessore.

(৩) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

(৪) Hunter's statistical Account of the Sunderbans.

(৫) Blochman's Contributions to the History and Geography of Bengal.

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের একশত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তদীয় রাজ্য খাঁ জাহান আলির অধিকারভুক্ত ছিল। কালক্রমে খাঁ জাহানের বংশে চাঁদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় জেস্যুটগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। চাঁদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য প্রতাপাদিত্য অধিকৃত করেন। (৬)

খাঁ জাহান বাগেরহাটে "সাতগম্বুজ" নামে এক বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (৭) তিনি বাগেরহাট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজ পথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে এই রাজপথের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, খাঁ জাহান্ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ফকির বায়েজিদ্ বস্তামীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই পথ দিয়াই তাঁহার অনুচরগণ চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে প্রস্তর আনয়ন করিয়া বাগেরহাট এবং অন্যান্য স্থানে হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বায়েজিদ্ বস্তামী কে, তাহা অনুমান করা যায় না। তাঁহার জীবন-কাহিনীও কালের মহিমায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। হাণ্টার তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Statistical Account of Bengalএ বলিয়াছেন যে, নবাবিষ্কৃত চট্টগ্রামের ইতিহাস নামধেয় পুথিতে এই সাধুর ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু উক্ত পুথি এক্ষণে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না। তেজকত্ আওলিয়র নামক পারশ্য গ্রন্থে এই বায়েজিদ্ বস্তামীর মধুর ও পবিত্র উপদেশমালা সংগৃহীত রহিয়াছে।

বৈষ্ণবশিরোমণি জীব গোস্বামীর চরিতে লিখিত আছে যে, তিনি খলিফাতাবাদে পীর আলি খাঁ'র সমাধি দর্শন করিয়াছিলেন। পীর আলি খাঁ জাহান্ আলির একজন বিশিষ্ট অনুচর। তাঁহার সমাধি এখনও বাগেরহাটে দেখিতে পাওয়া যায়। জীব গোস্বামী চৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য। তাঁহার আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ, সুতরাং খাঁ জাহান্ আলির মৃত্যুর (১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) (৮) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি বাগেরহাটে গমন করেন।

---

(৬) Beveridge's Backergunge.

(৭) ১৯০৬ সালে গবর্ণমেণ্ট এই প্রাসাদের জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন।

Archaeological Report—1906-7.

(৮) The Bagerhat inscripsion of Khan Jahan Ali. J. A. S. B. (1867)

ওয়েষ্টল্যাণ্ড্ খাঁ জাহান্ আলির যে জীবনী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বুরহান শা ও গরাফ্ শা নামধেয় দুই জন সাধুপুরুষ খাঁ জাহানের সহিত যশোহরে আসিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সময় প্রবলপ্রতাপান্বিত পাঠান রাজগণ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে বাইশ জন আউলিয়া বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি বিবিধ স্থান পর্য্যটন করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশ জন যশোহরে আগমন করেন। খাঁ জাহান্ ও তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাদেরই অন্যতম। সে সময় গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে যশোহরে আসিতে হইলে ঝিনাইদহের মধ্য দিয়া কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক আসিতে হইত। তাহার বহুপূর্ব্বেও এই পথ দিয়াই গৌড়ে সম্রাটের রাজস্ব প্রেরিত হইত। (৯)

উল্লিখিত বার জন ফকির যশোহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে ঝিনাইদহ হইতে যে রাজপথ যশোহর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত বর্ত্তমান বারবাজার নামক স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়া তৎপরে বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। প্রবাদ, তাঁহারা উক্ত স্থানে এক বাজার-স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা তদবধি "বারবাজার" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বারবাজারে বার ফকিরের দরগা প্রভৃতির অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। বার-বাজারে যে বিশাল দীর্ঘিকাসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের কোন কোনটির নামের সহিত "পীর" এই শব্দ যুক্ত আছে, সুতরাং সে সকল দীর্ঘিকা যে তাঁহারাই খনন করাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড ইহার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। (১০) কিন্তু ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

কথিত আছে, খাঁ জাহান্ বাগেরহাট যাইবার কালে পূর্ব্বাহ্ণে বুরহান্ শা ও গরাফ্ শাকে যশোহরে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু খাঁ জাহান্ যখন যশোহরে পৌঁছিলেন, তখনও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ হইয়া উঠে নাই, এই জন্য তিনি তাঁহার অনুচরদ্বয়ের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বাগেরহাট যাত্রা করিলেন। বুরহান শা ও গরাফ্ শা যশোহরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(৯) Cunningham's Ancient Georaphy of India, Vol. 1.

(১০) "These (tanks) are all put down to Khanja Ally and this place (Barabazar) was one stage of his journey to Bagahat. This, however, is very doubtful."

বুরহান্ শা বর্ত্তমান গোরস্থানের (Cemetry) সন্নিকটে এক বিশাল দরগা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ঈশ্বরোপাসনায় মনোবিবেশ করিলেন। (১১) তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া দেশদেশান্তর হইতে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত লোক আসিতে লাগিল। মৃত্যুর পর তিনি উক্ত দরগার পার্শ্বেই সমাহিত হইয়াছিলেন। (১২)।

গোরস্থানের পার্শ্ব দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দক্ষিণাভিমুখে গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে বামপার্শ্বে একটা সুবৃহৎ দীর্ঘিকার তটদেশে উপনীত হওয়া যায়। কথিত আছে, এই দীর্ঘিকা বুরহান্ শা খনন করাইয়াছিলেন। উক্ত দীর্ঘিকার দক্ষিণদিকে একটি ভূপ্রোথিত কারুকার্য্য-খচিত তোরণদ্বারের অংশ দৃষ্ট হয়। ইহার উপরিভাগস্থ কারুকার্য্য প্রাচীন পাঠান স্থপতিবিদ্যার পরিচায়ক। তাহার উপর কয়েকটি অস্পষ্ট অক্ষর ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু আমরা তাহা পড়িতে পারি নাই। এই প্রস্তরখণ্ডের সহিত একটি অপূর্ব্ব কিম্বদন্তী রহিয়াছে। কথিত আছে, যশোহরের কোনও ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট্ হস্তি সাহায্যে ও ঐ প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত করিতে পারেন নাই। বোধ হয় ইহার মূলদেশ মৃত্তিকার গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট হইয়া আছে। তোরণদ্বারের ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ যে স্থানে পতিত রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বেই বুরহান শা'র দরগার অবশেষ। একটি অনতিবৃহৎ বেদীর উপর দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দরগাটি দৈর্ঘ্যে অনুমান বার হস্ত, প্রস্থে ছয় সাত হস্ত এবং উচ্চেও সাত আট হস্ত হইবে; ইহার ছাত বহুপূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়াছিল। এই দরগা একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত, ইষ্টকের উপর কোনও ক্ষোদিত কার্য্য নাই। শুনিতে পাই, বহুদিন পূর্ব্বে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয় এই দরগা হইতে দুইখানি ক্ষোদিত ইষ্টক লইয়া গিয়াছিলেন।

---

(১১) List of Ancient Monuments of Bengal. (1895)

(১২) খাঁ জাহানের অপর অনুচর গরাফ্ শা কোনও দরগা-প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহুবর্ষ পরে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে একজন দয়ালু ইংরাজ শাসনকর্ত্তা তাঁহার সমাধির উপর এক ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ফৌজদারী আদালতের সম্মুখভাগে এই সমাধি-মন্দির অবস্থিত। ইহা যশোহরে "গরীব পীর সাহেবের দরগা" নামে পরিচিত। লেখক।

প্রতিবৎসর মহরমের দিনে এই স্থানে এক বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। মুসলমানগণের সেই পবিত্র দিবস উপলক্ষে দরগার সম্মুখভাগে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। হিন্দু, মুসলমান উভয়শ্রেণীর লোক এই স্থানটিকে বিশেষ পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং ঐ দিবস পীর বুরহানের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে বস্ত্র, পয়সা, চাউল প্রভৃতি অর্পণ করে।

পূর্ব্বে যে দীর্ঘিকার কথা বলিয়াছি, সেই দীর্ঘিকার তীরে দরগার সম্মুখে একটি বিশাল আম্রতরু শীতল ছায়াদানে সৌরকিরণের প্রখরবেগ প্রশমিত করিতেছে। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় ইহাকেও বুরহান শা'র সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে দীর্ঘিকা হইতে দরগা পর্য্যন্ত সোপানাবলী বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ভূমিকম্পে তাহা মৃত্তিকানিম্নে বসিয়া গিয়াছে। দরগার সন্নিকটেই বুরহান-শা'র সমাধি দৃষ্ট হয়। সমাধির উপরিভাগে পাষাণের উপর একখানি ক্ষোদিতলিপি আছে। কোন বিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিলে হয় ত বুরহান্ শা'র মৃত্যুর তারিখ অবগত হওয়া যাইতে পারে।

উপরে যে সকল ধ্বংসাবশেষের কথা বলা হইল, তাহা হইতে যশোহরের এই স্থানের প্রাচীনত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। খাঁ জাহান্ ও তাঁহার অনুচর-বর্গের কীর্ত্তিকলাপের কোন ভাস্বর চিত্র বর্ত্তমান নাই, বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে তাঁহাদের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন নিপতিত রহিয়াছে, তাহা দর্শকের হৃদয়ে যথার্থই একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভাব উদ্রিক্ত করাইয়া দেয়। যশোহরে বুরহান্ শা'র দরগার অধ্যক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম, বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের গৃহে বুরহান্ শা'র জীবনীসম্বলিত একখানি হস্তলিখিত পুথি সংরক্ষিত ছিল; কিন্তু তাহা কিরূপে হারাইয়া যায়। যশোহরের অধিবাসিগণ তাঁহার জীবন-কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে, আজ তাহার অধিকাংশ তত্ত্বই "নিহিতং গুহায়াম্।"

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

অধিকার।

(১)

টুকটুকে ফুটফুটে মেয়ে প্রভা। প্রভা দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কন্যা; সংসারে তাহার পিতা রামশরণ, মাতা উমাতারা এবং ভ্রাতা রমেশ। রমেশ প্রভার বড়। সে বিদেশে থাকিয়া ইংরাজি বিদ্যাশিক্ষা করে। আজকাল দেশের যেরূপ দশা, তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্য্যাদা কিছুই নাই। ইহা বুঝিয়া প্রভার পিতা তাহার ভ্রাতা রমেশকে ইংরাজি শিখিতে বিদেশে পাঠাইয়াছেন।

প্রভাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে যাহা কিছু আয় হয়, তাহা হইতে রমেশকে খরচ পাঠাইতে হয়; আর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই কোনমতে চলিয়া যায়।

অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করতঃ প্রভা ঠাকুর-পূজার জন্য ফুল তুলিতে যায়; ফুলতুলা তাহার একটা নিত্যকর্ম্ম। লাল চেলীর ভিতর দিয়া যখন তাহার বর্ণের গোলাপী আভা ফুটিয়া বাহির হয় এবং একাগ্রমনে ফুল তুলিতে তুলিতে শ্রমে যখন তাহার মুখমণ্ডল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে—কেশপাশ বিস্রস্ত হইয়া বায়ুবেগে দুলিতে থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রভার বিবাহের বয়স হইয়া গিয়াছে; কিন্তু টাকার অভাবেই এ যাবৎ তাহার বিবাহের কোন সুবিধা হয় নাই। গ্রামসম্পর্কীয়া ঠানদিদিগণ যখন তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন, তখন লজ্জায় তাহার স্বভাবতঃ গোলাপী গণ্ডস্থল অধিকতর আরক্তিম হইয়া উঠিত এবং সে তাঁহাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইত।

প্রভা এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ষার বারিপাতে কূলপ্লাবিনী, বীচিবিক্ষোভশালিনী পরিপূর্ণা স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাহার সুবিমল সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত। আভরণহীন হইলেও তাহার অঙ্গ শ্রীহীন নহে। তাহার দেহের স্বাভাবিক শ্রী, পরিপূর্ণ দেহের সুগোল গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপূর্ব্ব সমতা দেখিলে তাহাকে কবির কল্পনারাজ্যের সৌন্দর্য্যের রাণী বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রভার বয়স যতই বাড়িতেছে, তাহার পিতামাতার চিন্তাও ততই বাড়ি-

তেছে। এখন আর তাঁহারা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। প্রভা আপনাকে পিতামাতার এই দুশ্চিন্তার কারণ জানিয়া শুক্তিমধ্যে মুক্তার ন্যায় আপনাতে আপনি কুণ্ঠিত হইতেছে।

উমাতারা আজ আর রামশরণকে কিছুতেই ছাড়িতেছেন না; যেমন করিয়া হউক, শীঘ্রই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। "এখনও যে কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতেছ না! ইহার পর যখন সমাজের নিন্দা সহিবে, তখন কি হইবে?" ইহাই বলিয়া উমাতারা মুখ ভার করিলেন। তিনি মনে করিতেন, রামশরণ প্রভার বিবাহসম্বন্ধে তত মনোযোগী নহেন। উমাতারার কথা শুনিয়া রামশরণ কহিলেন, "নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। তিনি যাহা করেন, তাহাই হইবে"

"কিন্তু ভগবান্ ত আর নিজে আসিয়া সব করিবেন না। তোমাকেই ত চেষ্টা করিতে হইবে!"

"আমি কি আর চেষ্টা করিতেছি না? আমাকে বাহিরে যেরূপ দেখ, ভিতরেও কি আমি সেইরূপ? এই সোনার পুতুল লক্ষ্মীটিকে ত আর যাহার তাহার হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায় না! তাহাতে আবার আজকাল সুপাত্র পাওয়া যেরূপ কঠিন এবং তাহার যে দর, তাহাই ভাবিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু দুশ্চিন্তার লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইলে পাছে প্রভার আরও কষ্ট হয়, তাই আমি সে ভাব গোপন করি।" বলিতে বলিতে রামশরণের চক্ষুর্দ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। স্বামীর মনে ব্যথা দিয়াছেন ভাবিয়া উমাতারা লজ্জিত হইলেন। রামশরণ কহিলেন. "তুমি কোন অন্যায় কায কর নাই। তুমি তোমার স্বামীকে তাহার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ মাত্র।" ইহা শুনিয়া উমাতারার বুক হইতে একটা বিষম ভার নামিয়া গেল।

"সম্মুখে পূজার ছুটী. সে সময় রমেশ বাড়ী আসিবে। সেও এখন বড় হইয়াছে। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে।"

রমেশের কথা শুনিয়া উমাতারা অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। মাতৃস্নেহ তাঁহার বক্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

(২)

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। মা আনন্দময়ীর আগমনে শোকতাপ-ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর ম্লান মুখে আবার হাসি ফুটিল। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন ম্লান সূর্য্য

আবার প্রসন্নমুখে দেখা দিয়াছে; স্রোতস্বিনীর তরঙ্গভঙ্গে আর সে বিপুল গর্জ্জন নাই; অবিরত বর্ষণলঘু শুভ্র মেঘের দল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চলিয়া যাইতেছে; সরসীর নীল জলে প্রস্ফুটিত কমলের মধুর সৌরভে আকৃষ্ট অলিকুলের মধুর গুঞ্জনে দিগ্‌বধূর শ্রবণ পুলকিত হইতেছে, নিশিশেষে ঝরিত শেফালীর স্নিগ্ধ গন্ধে দিক্‌সমুদায় আমোদিত হইয়াছে; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পক্ক ধান্যের শীষ কাঁপাইয়া বায়ু যেন স্বর্ণ-সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে।

পূজার ছুটীতে রমেশ বাড়ী আসিয়াছে পূজা চলিয়া গেলে এক দিন বৈকালে পিতাপুত্রে কথা হইতেছে। কথা আর কিছুই নহে, কেমন করিয়া কোথায় প্রভার বিবাহ দেওয়া যায়, কোথায় সুপাত্র পাওয়া যায়।

রমেশ বলিল,—"ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রভার বিবাহ একরূপ স্থির হইয়াছে; এখন আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা।"

পিতা কহিলেন, "তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং প্রাপ্তবয়স্ক; তোমার যাহাতে মত হইবে, আমার তাহাতে অমত হইবার কোনও কারণ নাই"

"তবুও এ বিষয়ে আপনার মতই প্রধান।"

"পাত্র কিরূপ?"

"পাত্রের নাম প্রবোধ, দেখিতে ভাল। পাত্র তরুণবয়স্ক এবং তাঁহার অর্থও যথেষ্ট আছে। সে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত।"

"বুঝিলাম', সম্বন্ধ ভাল, কিন্তু আমরা এত টাকা কোথা হইতে দিব?"

"সে সুন্দরী সুশীলা পাত্রী চাহে। সে একবার আমাদের গ্রামের পার্শ্বের গ্রামে আইসে; তথায় প্রভার কথা শুনিয়া নিজেই তাহাকে দেখিয়া গিয়াছে; খুব পছন্দও করিয়াছে। সে তাহার এক বন্ধুদ্বারা আমাকে তাহার অভিপ্রায় জানাইয়াছে। এখন আপনার এবং মাতাঠাকুরাণীর মত হইলে এই অগ্রহায়ণেই বিবাহ হইতে পারে।"

"এ অতি অসাধারণ সুযোগ। ইহাকে জামাতা করিতে আপত্তি কি? তোমার মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক; তোমার এবং আমার যাহা মত, তাহাতে তাঁহার অমত হইবে না। শুভকার্য্যে বাধা অনেক, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ দেওয়াই আমার মত।"

এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ-সংবাদে অধীর হইয়া উমাতারাকে ইহা জানাবার জন্য রামশরণ তাঁহার অনুসন্ধানে গেলেন।

(৩)

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে। জগৎ-সংসারে কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

প্রভার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সে এখন তাহার স্বামিগৃহে। এই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বী উচ্চ অট্টালিকা, এই আজ্ঞাপালনেচ্ছু অসংখ্য দাসদাসী, এই নয়ন-রঞ্জন মনোহর সুসজ্জিত কক্ষাবলী, এই সমুদায় কি তাহার চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইয়াছে? কে তাহা বলিতে পারে? কিন্তু তাহাকে দেখিলে যেন অসুখী বলিয়াই বোধ হয়। তাহার চক্ষু কোটরে বসিয়াছে,বর্ণ মলিন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে এবং মুখে বিষাদের মলিনতা সদাই লাগিয়া আছে।

প্রবোধের লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্ব বিবাহের পর হইতেই সুযোগপ্রাপ্ত বিদ্রোহী সেনানায়কের মত আপন অস্তিত্ব প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। সে মনে করিয়াছে যে, প্রভাকে বিবাহ করিয়া সে একটা মহান্ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে; প্রভার পিতামাতাকে একটা অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছে।

বিবাহের পর প্রবোধ দুই একবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে; কিন্তু সেখানেও যে মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, পিতার আদর এবং ভ্রাতার সহানুভূতি পাওয়া যায়, সেখানেও যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহার গর্ব্বান্ধ হৃদয় তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে কেবল দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। ধনিদরিদ্রে প্রভেদ দেখিয়া তাহার প্রেমের রোমান্স ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

প্রভা কতবার পিতামাতাকে দেখিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছে; কিন্তু প্রবোধ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণশরে তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছে।

এক দিন প্রভা যখন মাতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়া প্রবোধের পা জড়াইয়া ধরিল, তখন প্রবোধ বলিল, "আমার স্ত্রী আমার স্ত্রীর মতই থাকিবে। আমি তাহাকে দীন পল্লীগৃহে যাইতে দিতে ইচ্ছা করি না।" প্রভার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল। সে নীরবে চক্ষু মুছিয়া শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ইহার পর সে আর এক দিনও বাপের বাড়ী যাইবার কথা মুখে আনে নাই।

মাঝে মাঝে এইরূপ হইত। প্রভা যত নির্ব্বাক্‌ভাবে স্বামীর সেবা করিয়া তাহার চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করিত, প্রবোধও তত তাহার অর্থ না বুঝিয়া তাহার উপর অন্যায় ব্যবহার করিত। এইরূপে ক্রমে তাহাদের মধ্যে যে

একটি ক্ষুদ্র ব্যবধান রচিত হইল, তাহা প্রবোধের ভ্রমে, গর্ব্বে এবং অভিমানে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের সুখশান্তির প্রবাহপথ বন্ধ করিয়া দিল। প্রবোধ যদি প্রথম হইতে একটু বুঝিয়া চলিত, প্রভার ভালবাসার গভীরতা বুঝিয়া ব্যবহার করিত, তাহা হইলে এরূপ হইত না। কিন্তু গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সে তাহা করিল না।

প্রভার সলজ্জ নম্র ব্যবহার, দাসদাসীগণের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সরল আচরণ, সকলই যেন সে ধনীর পরিবারে তাহার দৈন্যের পরিচায়ক হইয়া উঠিল। কিছুতেই সে এ সংসারে "খাপখাইতে" পারিল না। তাহার প্রত্যেক আচরণ যেন শরতের শুভ্র আকাশে কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের মত ভাসিয়া ভাসিয়া সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিল। প্রবোধও নিজের স্ত্রীকে তাচ্ছিল্য দেখাইতে লাগিল। বিনা কারণে এরূপ লাঞ্ছিত হওয়ায় প্রভারও আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিল। সেও এখন প্রবোধের কাছে বড় একটা আসিত না—অথবা ভাল করিয়া কথা কহিত না। সে কেবল যুক্তকরে সিক্তনয়নে কিসে প্রবোধের সুমতি হইবে, ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ অবস্থায় ত বেশী দিন থাকা যায় না—একটা প্রকাশ্য বুঝাপড়া না হওয়া পর্য্যন্ত প্রভা আর স্থির থাকিতে পারিল না। কতদিন সে কত অছিলায় প্রবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে, কত রকমে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু প্রবোধ যখন কোন ক্রমেই তাহার কায হইতে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে নাই, তখনই সে আর্দ্র নয়নে ম্লান-মুখে সরিয়া গিয়াছে!

কিন্তু প্রভার এ অভিমান বেশী দিন থাকিল না। সে সকলই নিজের দোষ মনে করিল। তাই সে এক দিন স্বামীর ক্ষমা পাইবার জন্য, পূর্ব্বের ন্যায় সরল স্নেহবন্ধন স্থাপনের জন্য সংশয়-কম্পিতহৃদয়ে কত কি বলিবে মনে করিয়া খাবারের থালা লইয়া প্রবোধের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু বলি বলি করিয়া লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিল না। সে মনে করিল, প্রবোধ অবশ্যই তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবে; তখন সে সব বলিবে। কিন্তু প্রবোধ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না এবং তাহার গম্ভীর উদাস দৃষ্টি দেখিয়া প্রভাও কিছু বলিতে সাহস করিল না। প্রভা মনে করিয়াছিল, স্বামী স্নেহ-সম্ভাষণে তাহার হৃদয়ের ক্ষত দূর করিয়া দিবেন, সেও তাহার নয়নজলে স্বামীর

মনের সমস্ত কালিমা ধৌত করিয়া দিবে। বহুক্ষণ পরে প্রবোধ বলিল, "সংএর মত দাঁড়াইয়া কেন?"

অদৃষ্টের কি মর্ম্মভেদী কঠোর উপহাস!

শুধু ইহাই নহে। প্রভা আরও শুনিল যে, তাহার পিতা তাহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা ত তাহাকে পাঠাইলেনই না, অধিকন্তু পিতা যখন কন্যার সহিত দেখা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন প্রবোধ বলিয়াছিলেন, "আপনাদেরই কুশিক্ষায় এবং কুপরামর্শে আপনার কন্যার পরকাল নষ্ট হইয়াছে। আমরা এতদিন চেষ্টা করিয়া যাহা একটু শোধরাইয়াছি, তাহা আর এখন আপনার সহিত দেখা করিয়া নষ্ট করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।" প্রবোধের মাতাও তাঁহাকে তাঁহার দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন। প্রভার চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল; স্বামিগৃহ যেন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। তাহার পিতার অপরাধ কি? তাহার পিতার অপমানের কথায় তাহার সমস্ত রুদ্ধ অভিমান জাগিয়া উঠিল। এখন হইতে সেও পিতার অবমাননাকারী পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না, স্থির করিল।

(৪)

উমাতারার আজ আর বিরাম নাই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে গৃহের এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ সন্ধ্যাকালে প্রভার আসিবার কথা। তিনি কত জিনিষ গুছাইয়া রাখিয়াছেন, প্রভা যে যে ব্যঞ্জন ভালবাসে, সেই সকল রাঁধিয়া অপরাহ্লেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। সে আসিলে তাহাকে কেমন দেখিবেন—কতক্ষণ তাহার সহিত কি আলাপ করিবেন, রুদ্ধমাতৃস্নেহ কেমন করিয়া শতধারে উছলিয়া পড়িবে, এই সব ভাবনায় অধীর হইয়া তিনি কেবল ঘন ঘন আকাশের দিকে চাহিতেছেন। বেলা আর যায় না! প্রভার সমবয়স্ক সঙ্গিনীরা আসিয়া প্রভার রূপ, স্বামি-সৌভাগ্য এবং মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের আলোচনা করিতেছে। কিন্তু কই, প্রভা ত এখনও আসিল না! উমাতারা নিতান্ত অস্থির হইয়া একবার এ দিক্ একবার ও দিক্, একবার পথ, একবার বাড়ী দেখিতেছেন। ক্রমে গোধূলির লোহিত আভায় পশ্চিমগগন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। গাভী-গণের ক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে ধূসর হইয়া ধরণী সান্ধ্যবাসে আপনার মুখ

ঢাকিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া প্রভার সখীরা একে একে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। উমাতারা এতক্ষণ তবু কতকটা অন্যমনস্কা ছিলেন, এখন এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় একা থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বৃক্ষপত্রের পতনশব্দে অথবা পলায়িত কোন শৃগালের পদশব্দে চমকিত হইয়া প্রভার পদশব্দ মনে করিয়া প্রাঙ্গণ পার হইয়া যাইতে লাগিলেন এবং কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে অবসন্ন হইয়া হতাশহৃদয়ে অপেক্ষা করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে বৃদ্ধ রামশরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ম্লানমুখ ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হতাশার পরিচায়ক। ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহাকে একাকী দেখিয়া প্রভার অমঙ্গল আশঙ্কায় উমাতারা একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। "বল, আমার প্রভার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? সে ভাল আছে ত?" বলিতে বলিতে উমাতারা পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। রামশরণ তাঁহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, "প্রভা ভালই আছে। বড় পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি। বড় যন্ত্রণা পাইয়াছি। একটু বসিতে দাও। সব বলিতেছি। শুন।" তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি একে একে সব বলিলেন; কেবল প্রভার সহিত দেখা হয় নাই, সেইটি বলিলেন না। উভয়ের নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল।

রামশরণ ও উমাতারা সে রাত্রিতে কিছুই আহার করিলেন না। রামশরণ বড় ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এত কাল কঠোর সাধনা করিয়া, দীর্ঘ প্রবাসক্লেশ সহ্য করিয়া রমেশ আমার পরীক্ষা শেষ করিয়া বাড়ী আসিতেছে। সে প্রভাকে আনিবার জন্য পূর্ব্বেই ২।৩ খানা পত্র দিয়াছে। রমেশ আসিয়া যখন প্রভাকে না দেখিবে, তখন সে কত ব্যথা পাইবে। কোন্ মুখেই বা তাহাকে এ সব বলিব? না বলিয়াই বা কেমন করিয়া থাকিব? মাতা-পিতার অপমান, ভগিনীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা, এ সব সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? হা ঈশ্বর, আমার কি মৃত্যু নাই?"

রামশরণকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া পাড়ার অনেক প্রাচীনা বলিলেন, "আগেই ত বলেছিলুম, বড়লোক দেখে দিচ্ছ; শেষে তাল সামলাতে পাল্লে হয়? গরীবের গরীব কুটুম্বই ভাল।"

(৫)

বাড়ী আসিয়া রমেশের মন প্রভার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাহাকে না পাঠাইবার কারণ যদিও রামশরণ বা উমাতারা সব খুলিয়া বলেন নাই, তবুও সে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রভাকে না দেখিলে তাহার মন আর স্থির হইতেছে না। তাই সে ২।৩ দিন পরেই প্রভাকে আনিবার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

রমেশ সকালে প্রবোধের বাড়ী পৌঁছিয়াছে; এখনও প্রবোধের সহিত তাহার দেখা হয় নাই। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর রমেশ একটি সুসজ্জিত কক্ষে সুকোমল শয্যায় শুইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে রমেশ দেখিল, প্রবোধ তাহারই কক্ষে আসিতেছে। আসিয়াই প্রবোধ বলিয়া উঠিল, "কি, রমেশ বাবু যে? ভাল আছেন ত? পরীক্ষা কেমন দিলেন? এবার পরীক্ষায় বড় পরিশ্রম হইয়াছে। না?" প্রবোধের এইরূপ আলাপে রমেশ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কিন্তু ক্ষণ পরেই সে বুঝিল, আলাপে ও ব্যবহারে প্রভেদ অনেক।

রমেশ বলিল,—"খাটুনি ত আছেই, তবে পরীক্ষা ভালই দিয়াছি।"

প্রবোধ বলিল,—"বোধ হয় আপনার ভগিনীকে লইতে আসিয়াছেন, তাহাই কি?"

"হাঁ! আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন!"

"কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে আমাদের মত লওয়া কি উচিত ছিল না?"

"মতের জন্য ত অনেক দিন হইতেই লিখা হইতেছে। কিন্তু কোন ক্রমেই মত হয় নাই, তাই আমি আসিয়াছি।"

পিতার দুঃখে রমেশের মন পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত ছিল। প্রবোধ বলিল, "আপনি কি মনে করেন, আপনি আসিলেই লইয়া যাইতে পারেন?"

"আশা ত করিতে পারি।"

"সে কিন্তু আপনার নিতান্ত ভুল।"

"ভুল বোধ হয় আপনারও হইতে পারে।"

"আমার ভুল! আমি ছাড়িয়া না দিলে তাহাকে লইয়া যাইতে আপনার কি অধিকার আছে? আর আমার অমতে তাহার যাইবারও কোন অধিকার নাই। না পাঠাইবার কারণ ত আপনার পিতাকেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে আপনি কেন অনর্থক আসিয়াছেন?"

এই কথায় রমেশের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমার কি অধিকার

নাই? যে স্থানে পিতা অপমানিত, ভ্রাতা লাঞ্ছিত এবং বংশ-গৌরব অপমানের বিষয় ইচ্ছা করিলে সে স্থান ত্যাগ করিতে আমার ভগিনীর কি অধিকার নাই?"

এই কথায় প্রবোধচন্দ্র ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া "আচ্ছা, দেখা যাউক" বলিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। রমেশ আবার একাকী বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রমেশ আসিয়াছে শুনিয়া প্রভার ম্লান মুখে আবার হাসি ফুটিয়াছে। সে মনে করিল, যখন দাদা আসিয়াছেন, তখন অবশ্যই লইয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তখনই আবার স্বামী প্রভৃতির ব্যবহারের কথা মনে করিয়া সে ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া গেল।

আজ প্রভা সাহস পাইয়াছে। পাছে ইহাঁরা ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে না দেন, এই ভয়ে সে আপনি একটি ঝিকে দিয়া রমেশকে ডাকাইল।

রমেশ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই প্রভা কাঁদিয়া ফেলিল; কিছুই বলিতে পারিল না। রমেশের নয়নেও জল ঝরিতেছিল। অশ্রু মুছিয়া রমেশ কহিল, "প্রভা, তোর পবিত্র স্নেহাশ্রু আমার হৃদয়ের সমস্ত অপমানের ক্ষত দূর করিয়াছে আমার আর কোন দুঃখ নাই।"

"দাদা, দাদা!" বলিতে বলিতে প্রভার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

রমেশ বলিল,—"প্রভা, ইহাঁরা তোকে পাঠাইবেন না।"

প্রভা, বলিল, "আমি যাইব।"

"না। যাইলে বোধ হয় আর আসিতে পাইবি না।"

এই কথায় প্রভার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "যাহা হয় হউক, আমি যাইব। যে স্থানে পিতার অপমান, তোমার অপমান, আমার পদে পদে নির্য্যাতন, সে স্থান আমি ত্যাগ করিবই।"

"প্রভা, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ—"

"কাল সকালে যাওয়াই ঠিক। দাদা, তুমি প্রস্তুত থাক!" ভগিনীর দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া রমেশ ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল।

রমেশ বহির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই প্রবোধ প্রভার কক্ষে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিয়াই উচ্চকণ্ঠে ব্যঙ্গস্বরে কহিয়া উঠিল, "ভ্রাতার সঙ্গে যাইবার পরামর্শ হইল? আমার বিনানুমতিতে আমার বাড়ী ছাড়িতে তোমার কোন অধিকার নাই, তাহা তুমি জান?"

প্রভার আজ সে সলজ্জ সভয় ভাব আর নাই। আজ যেন সে মরণ-সাহসে বুক বাঁধিয়াছে। আজ আর তাহার একটি কথাও কাঁপিতেছে না। সে স্পষ্টস্বরে উত্তর করিল, "তোমার অমর্য্যাদা করিতে,তোমার অবাধ্য হইতে আমার কোন অধিকার নাই; আর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণশরে একটি শান্তিময় সোনার সংসারের মর্ম্মস্থল ভিন্ন করিতে, একটি নিরীহ শান্ত পরিবারকে অপমানের একমাত্র লক্ষ্যস্থল করিতে, তোমার স্ত্রীকে তাহার মধুর শৈশব-

স্মৃতি হইতে চিরবিচ্যুত করিতে, একটি অসহায়া রমণীকে পিতামাতার স্নেহবন্ধন হইতে চির-বিচ্ছিন্ন করিতে, স্বতঃ উৎসর্গীকৃত পবিত্র কোমল হৃদয়কে গর্ব্বভরে পদদলিত করিতে তোমার খুব অধিকার আছে!"

এরূপ উত্তর প্রবোধ আর কখনও শুনে নাই; সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল, "যাও; তবে উৎসন্ন যাও।"

(৬)

প্রবোধ চলিয়া গেলে প্রভার মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। সে আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। সে অন্য উপায় না দেখিয়া ছাতে গেল।

তখন সূর্য্যাস্ত-সময়। আকাশে অল্প অল্প মেঘ আসিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর মাঝে মাঝে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভা এবং চকিত বিদ্যুতের চঞ্চল প্রভা প্রভার বড় ভাল লাগিল। সে এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখে নাই। প্রাণ ভরিয়া সে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া আসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার ব্যর্থ জীবনে কি লাভ?

কতক্ষণ পরে একজন দাসী মেঘ দেখিয়া ছাতের দরজা বন্ধ করিতে আসিল। তাহার ডাকে প্রভার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া নীচে গেল।

বোধ হয় বহিস্থ জড় প্রকৃতির সহিত মানবের অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ আছে। আজ প্রভার হৃদয়-আকাশে যে কাল মেঘের উদয় হইয়াছে, তাহার সহিত আকাশের মেঘেরও বোধ হয় কতকটা সম্বন্ধ আছে।

আজ আর প্রভার নয়নে অশ্রু নাই। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। প্রবোধ পার্শ্বে শুইয়া আছে। আজ রমেশের এবং প্রভার কথায় সে যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। তাহার অভিমান এখন আর ততটা নাই। শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হইল? সম্পূর্ণ দোষই কি তাহার? না প্রভাও ত তাহার কথা শুনে না! অবাধ্য স্ত্রীকে সে কেমন করিয়া আপনার ভাবিবে? সে অনেকবার প্রভার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া সাহস করিল না। লজ্জা ও রোষও তাহাতে কতকটা বাধা দিল। এক একবার ইচ্ছা হইলেও প্রথমে কথা কহিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সমস্ত রাত্রি এইরূপে জাগরণের পর ভোর না হইতেই সে বাহিরে গেল। এ দিকে প্রভাও যে বিষের কৌটাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহার আবরণ উন্মোচন করতঃ গর্ভস্থ পদার্থের অতিরিক্ত মাত্রায় সদ্ব্যবহার করিল।

বেলা হইল। প্রভা যে রমেশকে আর ডাকায় না! তবে কি সে যাইবে না? রমেশ বহুক্ষণ হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। এ বাড়ীতে সে আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। প্রভা যদি না যায়, তবে সে এখনই চলিয়া

যাইবে; কিন্তু তাহার সহিত একবার দেখা ত করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া রমেশ একজন ঝির দ্বারা প্রভার নিকট সংবাদ পাঠাইল। ঝি আসিয়া প্রভার অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঝির চীৎকারে রমেশ এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে প্রভার কক্ষে ছুটিয়া গেল। প্রবোধও প্রাতর্ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দে আসিয়া সকলের পশ্চাতে এক কোণে দাঁড়াইল।

রমেশকে দেখিয়া প্রভা অতি কষ্টে বলিতে লাগিল, "দাদা, আমি তোমার অভাগিনী ভগিনী। আমায় ক্ষমা কর। আমার জন্য তোমরা কত-না অপমান সহ্য করিয়াছ! আর কেহ তোমাদের অপমান করিতে পারিবে না। সকালে যাইতে চাহিয়াছিলাম। অপরের অধিকার নষ্ট করি নাই, আমার যাহাতে অধিকার আছে, আমি তাহাই করিলাম।" বলিতে বলিতে প্রভার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল। অতি কষ্টে সে এক একবার চক্ষু মেলিয়া ব্যাকুল ভাবে এ দিক্ ও দিক্ চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া রমেশ প্রবোধকে আনাইয়া প্রভার শয্যায় বসাইল। প্রবোধের আর জ্ঞান নাই। সে কি করিতেছে, কিছুই বুঝিল না। সে যেন কলের পুতুলের মত রমেশের হাতে চলিতে লাগিল। তাহার সে গর্ব্ব, সে অভিমান চূর্ণ হইয়াছে। সে কখনও মনে করে নাই যে, এত দূর হইবে। এতদিন সে তাহার নিজের ভালবাসার পরিমাণ বুঝিতে পারে নাই। কাল হইতে সে কেবল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই বিধাতার এই দারুণ অভিশাপ! সে কিছু বলিতে পারিল না। অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

প্রভা অতি কষ্টে প্রবোধকে কহিল, "আমায় ক্ষমা কর। আমার জন্য দুঃখ করিও না। আমি একদিনও তোমায় সুখী করিতে পারি নাই। আমি চলিলাম। তোমার সুখের পথের কণ্টক হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না, তাই চলিলাম। এখন হইতে যাহাতে সুখী হইতে পার, ইহাই আমার মরণ-প্রার্থনা। আমি তোমার কোন অমর্য্যাদা করি নাই। যাইতে চাহিয়াছিলাম, যাইতেছি। কিন্তু এ ভাবে যে এত শীঘ্র যাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। তোমার স্ত্রীতে তোমার অধিকার, কিন্তু আমার জীবনে ত আমার অধিকার! সে অধিকার আজ আমি পাইলাম।"

দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল। যে লোক ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, সে ডাক্তার লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। ডাক্তার শুধু হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পনঘাটে



পণ্ডিত বুঢ়ন মিশ্রের উপাখ্যান।

(সেক শুভোদয়া অবলম্বনে)

মহাত্মা শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেন দেব গৌড়দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় শ্রীমান্ জয়দেব সরস্বতী সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রতিদিন 'গীত-গোবিন্দ' গীত হইত। এক দিন এক ব্রাহ্মণ রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সেনকে বলিলেন, "মহারাজ, জয়যুক্ত হউন। আমি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক, অধিকন্তু পণ্ডিত। আমার নাম, বুঢ়ন মিশ্র। আমি ওড্র দেশ জয় করিয়া গৌড়নগরে আগমন করিয়াছি। ওড্রপতি কপিলেশ্বর আমাকে জয়পত্র প্রদান করিয়াছেন, দর্শন করুন। এক্ষণে আপনার সভায় যদি কোন গায়ক থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার সঙ্গীতালাপের পরিচয় হউক এবং উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার হউক। অধিকন্তু শাস্ত্রীয় তর্কদ্বারা আমি রাজ-সভা পরাজয় করিব বলিয়াই এ স্থানে আগমন করিয়াছি।"

সঙ্গীতাচার্য্য বুঢ়নের গৌড়-রাজ-সভায় আগমন।

ওড্রপতি কপিলেশ্বরের নিকট প্রাপ্ত জয়পত্র।

রাজা লক্ষ্মণ সেন বুঢ়ন মিশ্রের সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। এই সময়ে জয়দেব সরস্বতী অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজ-সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। মহারাজ সভাভঙ্গ করিয়া সুশীতল ছায়াযুক্ত গঙ্গাতীরস্থ অশ্বত্থতরুতলে অমাত্যগণসহ উপবেশন করিয়া পণ্ডিত বুঢ়ন মিশ্রকে সঙ্গীত আলাপ করিতে বলিলেন। মিশ্র 'পঠমঞ্জরী' রাগের আলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পিপ্পলী বৃক্ষের পত্রনিচয় পতিত হইতে আরম্ভ হইল। রাগালাপ শেষ হইলে বৃক্ষ নিষ্পত্র হইয়া গেল। সমাগত জনগণ পণ্ডিতের বিদ্যাবলদর্শনে ধন্য ধন্য করিতে আরম্ভ করিল। সপার্ষদ রাজা মোহিত হইলেন এবং বুঢ়ন মিশ্রকে জয়পত্র প্রদান করিবেন, মনস্থ করিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। বিবিধ বাদ্য বাদিত হইল। এমত সময়ে পণ্ডিত জয়দেব মিশ্রের পত্নী পদ্মাবতী গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে নিজ গৃহে আগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাদ্যভাণ্ডের হেতু কি, এক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অবগত

বুঢ়ন মিশ্রের সঙ্গীতালাপহেতু বৃক্ষের পত্রচ্যুতি।

বুঢ়ন মিশ্রকে জয়পত্র প্রদানের চেষ্টা।

হইলেন যে, বুঢ়ন মিশ্রনামক এক সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতের অলৌকিক কার্য্যদর্শনে মহারাজ তাঁহাকে জয়পত্র প্রদান করিবেন বলিয়া এই বাদ্যোদ্যম হইতেছে।

পদ্মাবতী নিজ গৃহে গমন না করিয়া রাজভবনে গমন করিলেন এবং যে স্থানে বুঢ়ন মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ও অমাত্যগণসহ রাজা উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিয়া রাজসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমার স্বামী গৃহে উপস্থিত নাই। এক্ষণে নবাগত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতের বিদ্যাবল পরীক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে? ইনি গীতরসের দ্বারা বা শাস্ত্রালোচনার দ্বারা আমার স্বামীকে পরাজিত করিতে না পারিলে, আপনি এই মিশ্র পণ্ডিতকে যথাবিধি জয়পত্র প্রদান করিতে পারেন না। অগ্রে আমার স্বামীর শক্তির পরিচয় হউক, তৎপরে যাহা হয় করিবেন। অথবা আমার সহিত উক্ত মিশ্রের সঙ্গীত-রসের পরীক্ষা হউক। তৎপরে জয়পরাজয় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক যাহার প্রাপ্য আপনি তাঁহাকে জয়পত্র প্রদান করিবেন। সেই সঙ্গীত-সভায় শ্রীমৎ সাহ জালাল তব্‌রেজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি পদ্মাবতীর বাক্য শ্রবণে বলিলেন, "সাক্ষাৎ কবীন্দ্র-পত্নী যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক—অতএব আপনি সঙ্গীত আলাপ করুন।" "ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধার নাম ধ্বনিরুদ্গীরিতাচ।" * গঙ্গাতীরস্থ উপবনে এই সঙ্গীতালাপ হইতেছিল। জয়দেব-পত্নীর গান্ধার রাগ আলাপন-কালে গঙ্গাবক্ষস্থ নৌকানিচয় আপনা আপনি সেই গীতালাপস্থানসন্নিকটে উপস্থিত হইল। ধ্বনির আকর্ষণে কাষ্ঠময় নৌকা আকৃষ্ট হইল দেখিয়া সকল জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এ প্রকার কথা কখন শ্রবণ করি নাই বা দেখি নাই। পদ্মাবতী ধন্যা। "এতয়োর্মধ্যে ব্রাহ্মণী গরীয়সী যথা নির্জীবা নৌকাঃ শ্রুত্বা সমায়াতা।" †

জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর রাজসভায় আগমন।

পদ্মাবতীর গান্ধার রাগালাপ।

পদ্মাবতীর খ্যাতি-লাভ।

হজরৎ সাহ জালাল বুঢ়নমিশ্রকে বলিলেন, "ওহে মিশ্র! উভয়ের মধ্যে কে জয়লাভ করিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। আপনি শ্রীমতী পদ্মাবতীর সহিত উপযুক্ত শাস্ত্রীয় বিচার করুন।" মিশ্র বলিলেন, "স্ত্রীলোকের সহিত তর্কবিতর্কে

হজরত সাহ জালাল কর্ত্তৃক বুঢ়ন মিশ্রের প্রতি আদেশ।

* সেক শুভোদয়া হইতে উদ্ধৃত।

† ঐ

নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। ইহাতে বহুগুণবিশিষ্ট পুরুষ নিগু'ণ প্রাপ্ত হয়েন।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়দেব-পত্নী বলিলেন, "সম্ভবতঃ এতক্ষণ আমার স্বামী গৃহে আগমন করিয়া থাকিবেন—তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া বিচার নিষ্পন্ন করিলে ভাল হয়।" পদ্মাবতী-প্রেরিত সেবক জয়দেব-গৃহে গমন করিয়া কবীন্দ্র জয়দেব সরস্বতীকে আনয়ন করিল। হজরৎ সেক জয়দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কবীন্দ্র! এই সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ বুঢ়ন মিশ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়পরাজয় নির্দ্ধারণার্থ সঙ্গীতবিষয়ক আলাপ করুন।" যথা-সুখে উপবিষ্ট জয়দেব বলিলেন—"অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রনিচয় মিশ্রের সঙ্গীত আলাপে পতিত হইয়াছে; তিনিই অন্য কোন প্রকার রাগালাপ-দ্বারা নিঃপত্র বৃক্ষকে পত্রবান্ করুন।" বুঢ়ন মিশ্র বলিলেন, "আমার শক্তিতে এ কার্য্য সম্পাদিত হইবে না।" হজরৎ সেক পুনরপি বলিলেন, "জয়দেব সরস্বতী, আপনি যদি পারগ হয়েন, তবে বৃক্ষ পত্রদ্বারা পরিশোভিত করিয়া দিউন।" জয়দেব সেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি।" সেক বলিলেন,—"যিনি সঙ্গীতে পত্রোদ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারই জয় হইবে।" "ততো জয়দেবমিশ্র বসন্ত রাগ মুদ্গীরিতবান্।"* বসন্ত রাগের আলাপ সহ অশ্বত্থতরুগাত্রে নবপত্র উদ্গত হইল। বুঢ়ন মিশ্র পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-লব্ধ জয়পত্রনিচয় শ্রীমান্ জয়দেব সরস্বতীকে প্রদান করিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

বুঢ়ন মিশ্রের পদ্মাবতীর সহিত শাস্ত্রালাপে অনিচ্ছা।

জয়দেব কর্ত্তৃক বসন্ত রাগ আলাপ ও বৃক্ষের পত্রোদ্গম।

জয়দেবের জয় লাভ।

রাজা জয়দেব সরস্বতীর সম্মান করিলেন, জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও সম্মানীতা হইলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বুঢ়ন মিশ্রকে যথেষ্ট ধন প্রদান করিয়া গৌড় নগরে বাস করাইলেন। কবি বুঢ়ন মিশ্রের শেষজীবন গৌড়দেশে অতিবাহিত হইয়াছিল। জয়দেব ও তৎপত্নীর যশোগানে গৌড়মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বুঢ়ন মিশ্রকে ধনদান ও সম্মান প্রদর্শন।

পরিশিষ্ট।

যে সময়ে কবি জয়দেব সরস্বতী মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়ে সেকাবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ

* সেক শুভোদয়া হইতে উদ্ধৃত।

নাই। তবে এক নামের দুই জন সিদ্ধপীর যে গৌড়দেশে বিদ্যমান ছিলেন না, তাহা অদ্যাপি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। এক সেকের কাহিনী পরবর্ত্তী সেকেও বর্ত্তিতে পারে। জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতীসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা বলিয়া বিবেচনার কোন কারণ নাই; স্ত্রী স্বামীর নিকট সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। দেশের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে সেক শুভোদয়ার বহু অংশ রচিত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বুঢ়ন মিশ্র নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়-কাহিনী নিতান্ত অমূলক নহে। এ প্রকার ঘটনা এতদ্দেশে বিরল নহে। বুঢ়ন মিশ্রের আদি নিবাস কোথায় ছিল, তাঁহার রচিত কোন পুস্তক আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। বুঢ়ন মিশ্রসম্বন্ধে অনেক কথা স্বতন্ত্র স্থানে আলোচিত হইবে। মালদহের ইতিহাসে বুঢ়ন মিশ্রের জীবনী লিপিবদ্ধ হইতেছে। বুঢ়ন মিশ্র এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার।

শ্রীহরিদাস পালিত।

স্মরণ।

আজ মনে পড়ে, তা'র কাতর মু'খানি,
ছল ছল আঁখি দু'টি সকরুণ বাণী।
মনে পড়ে, কোন্ দিন কহি নাই কথা,
কোন্ দিন আনমনে দিয়েছিনু ব্যথা।
আজিকে প্রবাসে বসি' হেরি' মেঘবারি
আকুল বেদনা আর নিবারিতে নারি!
মনে হয়, সেও যেন আমারি মতন
কতদিন অযতনে করেছে রোদন।
বরষের সেই অশ্রু সঞ্চিত গোপনে
আজিকে ঝরিছে বুঝি মেঘের নয়নে।

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য।

বসন্তে।

(১)

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে পর্ব্বতশ্রেণী ভারতের বিজয়-লালসা ও শত্রুর আক্রমণ উভয়েরই গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান, সেই পর্ব্বতশ্রেণী কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। ইহারা সভ্যতার সহিত সম্পর্কশূন্য, শিক্ষা ইহাদিগের চঞ্চল হিংস্রস্বভাব শান্ত করিতে পারে নাই। ইহারা কারণে অকারণে উত্তেজিত হয়—উত্তেজিত হইলে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া ছোরা ও বন্দুক ব্যবহার করে। বন্দুকে ইহারা অব্যর্থলক্ষ্য—কারণ, ইহারা সহজে বন্দুক পায় না—প্রাণপণ করিয়া ইংরাজ শিবির হইতে চুরি করিয়া বন্দুক সংগ্রহ করে। ইহারা যেরূপ কৌশলে বন্দুক চুরি করে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা ইংরাজের প্রজা—কিন্তু সুযোগ পাইলেই ইংরাজ-অধিকারে প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করে। সময় সময় ইহাদিগের শাসনজন্য ইংরাজকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। এ যুদ্ধে অসুবিধা সবটাই ইংরাজের। দুরারোহ পর্ব্বতে কামান লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য—সৈন্য-চালনা করাও কষ্টকর; শত্রু পর্ব্বতের উপরে পাথরের অন্তরাল হইতে গুলি বর্ষণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলে। জিতিলে ইংরাজের কোন লাভ নাই; হারিলে শত্রুর সিকি পয়সা লোকসান নাই। তবে সাধারণতঃ ইংরাজ ইহাদিগের বাজার বন্ধ করিয়া দিলেই ইহারা শান্ত হয়। ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গুম্‌টি আছে। গুম্‌টির প্রহরীরা প্রয়োজন বোধ করিলে থানায় সংবাদ দেয়। থানায় ইংরাজ-কর্ম্মচারী সংবাদ অনুসারে কায করেন। সময় সময় ইহারা গুম্‌টির প্রহরীদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। নরহত্যা ইহাদের নিকট অতি তুচ্ছ কায।

এক দিন রাত্রিকালে একটা গুম্‌টিতে প্রহরীরা চিন্তিত ভাবে কি পরামর্শ করিতেছিল—আর মধ্যে মধ্যে এক এক জন গুম্‌টির দ্বারের বাহিরে যাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। তখনও আকাশের এক প্রান্তে শীর্ণ চন্দ্র দেখা যাইতেছিল—চন্দ্রালোকে পর্ব্বতের বন্ধুর অঙ্গ কোথাও উজ্জ্বল—কোথাও অন্ধকার দেখাইতেছিল।

অল্পকাল পরে চন্দ্র অস্ত গেল। যে ক্ষীণ আলোক পর্ব্বতের দৃশ্য নয়ন-

গোচর করাইতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। তখন এক জন প্রহরী কাল কম্বলে অঙ্গ আবৃত করিয়া গুম্‌টি হইতে বাহির হইল; মেঘলেশহীন গগনে প্রদীপ্ত তারকার আলোকে পথ দেখিয়া দুই ক্রোশ দূরে থানায় চলিল। সে পথ তাহার পরিচিত, নহিলে—অপরিচিতের পক্ষে পথভ্রম অনিবার্য্য।

প্রহরী থানায় আসিয়া সংবাদ দিল, এক গ্রামের একজন যুবক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন যুবতীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছিল; তাহা লইয়া দুই গ্রামে হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিতেছে। ব্যাপার গুরুতর।

(২)

সংবাদ পাইয়া থানার প্রধান কর্ম্মচারী চিন্তিত হইলেন—তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। তিনি এই হিংস্র-প্রকৃতি জাতির স্বভাব জানিতেন; তিনি বুঝিলেন, এরূপ ব্যাপারে যে হাঙ্গামা বাধিবে, তাহা নিবারণ করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তিনি সৈনিক প্রেরণের জন্য নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসে সংবাদ পাঠাইলেন; তাহার পর সশস্ত্র প্রহরিদল লইয়া বিবাদী গ্রামের দিকে রওনা হইলেন।

গুম্‌টির প্রহরী কম্বল মুড়ি দিয়া অন্ধকারে গোপনে থানায় আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চতুর গ্রামবাসিগণের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। চুরি করা যাহাদের পেশার মধ্যে পরিগণিত, তাহারাও পাহারা রাখিয়া কায করে। প্রহরী চলিয়া যাইবার পরই গ্রামের লোক পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে বসে। সেই পরামর্শের ফলে তাহারা যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া—মাম্‌লা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়,—যে পথ তাহাদের নিকট সরল ও সহজ, সে পথ ত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন করিবে স্থির করে। তাহারাও রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে থানায় সংবাদ দিতে চলিল।

দারোগার সহিত পথে গ্রামবাসীদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিল, তাহারা এজাহার করিতে থানায় যাইতেছিল। দারোগার হৃদয় হইতে ভার নামিয়া গেল; তিনি বুঝিলেন, আর হাঙ্গামার সম্ভাবনা নাই। তিনি এজাহার লিখিয়া লইলেন। যুবতীর পিতা এজাহার করিল। প্রহরী যে সংবাদ দিয়াছিল, এজাহারের মর্ম্ম তাহাই—কেবল রং একটু ঘোরাল—মাম্‌লাটা একটু পাকাইয়া তুলিবার মত।

এজাহার লিখিয়া লইয়া দারোগা গ্রামে চলিলেন। তিনি গ্রামে পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই একদল সৈনিক আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দারোগা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। আসামী ধরা পড়িল।

আসামীকে লইয়া দারোগা যুবতীর পিতার গৃহে আসিলেন। যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবকের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

যুবতী বলিল, "না।"

আবার প্রশ্ন হইল, "গত কল্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এই যুবক গ্রামের সীমাস্থ বৃক্ষমূলে তোমাকে ধরিয়া তোমার মুখচুম্বন করিয়াছিল?"

যুবতী উত্তর দিল, "হাঁ।"

দারোগা আসামীকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

যুবতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

দুই গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা রহিল।

যুবকের বিরুদ্ধে যুবতীকে বেইজ্জত করিবার অপরাধে মোকর্দ্দমা দায়ের হইল।

(৩)

যথাকালে মোকর্দ্দমার বিচার আরব্ধ হইল। সাক্ষীর পর সাক্ষী যুবতীর পিতার বর্ণিত ঘটনার বিষয় বলিয়া গেল। প্রমাণে কোথাও ছিদ্র দেখা গেল না। যুবকের দণ্ডভোগ অনিবার্য্য বোধ হইতে লাগিল।

গারদে বসিয়া যুবক এ কয় দিন কেবল ভাবিয়াছে। ভাবিবার এমন অবসর সে আর কখনও পায় নাই। যে সমস্ত দিন—সময় সময় সমস্ত রাত্রিও ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার পক্ষে গারদে আবদ্ধ থাকা বিশেষ কষ্টের কারণ। সেই কষ্টের মধ্যে তাহার বিশেষ কষ্টের কারণ ঘটিয়াছে। এই রমণী!—এই হামিদার জন্য সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল! সে-ই তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে!

সে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কথাই বলে নাই।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিয়া বিচারক আসামীর দিকে ফিরিলেন। সে নত-নেত্রে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল। বিচারক তাহাকে বলিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে? তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তুমি গাজীউদ্দীনের কন্যাকে নিভৃতে পাইয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে চুম্বন করিয়াছ?"

যুবক মুখ তুলিয়া বলিল, "কে বলিয়াছে?"

"গাজীউদ্দীন ও সাক্ষীরা বলিয়াছে।"

"সে কি বলিয়াছে?"

যুবক "সে" কথাটার উপর জোর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে বিচারকের

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—যেন তাঁহার উত্তরের উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

তাহার এই প্রশ্নে বিচারকের মনে নূতন সন্দেহের উদয় হইল। স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য-প্রদেশে যুবক-যুবতীর একটি মিলনদৃশ্য তাঁহার স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে একটি গান মনে পড়িল——

"ভুট্টার ক্ষেতে যেতে যেতে দেখা হলে দু'জনার;
কান্‌তে আছে কারো কাছে, যদি তোমা চুমা খায় ?"

মোকর্দ্দমা মুলতুবি রাখিয়া বিচারক আদেশ দিলেন, তিনি সরজমিনে তদন্ত করিয়া—ওকুস্থানে যাইয়া বিচার করিবেন।

(৪)

ঘটনাস্থানে—যে বৃক্ষতলে যুবতীর সহিত সাক্ষাতের অভিযোগে যুবক অভিযুক্ত হইয়াছিল, সেই তরুতলের পার্শ্বেই বিচারকের তাম্বু পড়িয়াছে। দুই গ্রামের লোক তাম্বুর নিকট জমিয়াছে। যুবকগণ এদিক-ওদিক ঘুরিতেছে; প্রহরীদিগের করধৃত বন্দুকের দিকে লোলুপদৃষ্টিপাত করিতেছে। যুবতীরা জটলা করিয়া গল্প করিতেছে—হাসিতেছে—ছেলেকে আদর করিতেছে। বৃদ্ধদল গ্রামের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছে। বৃদ্ধারা বিলম্বে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে।

বিচার আরম্ভ হইল। বিচারকের আদেশে যুবতী তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দেহ নাতিদীর্ঘ–মাংসল, নয়ন উজ্জ্বল—কোমল, ওষ্ঠাধর পরিপুষ্ট—যেন চুম্বনপিয়াসী। যুবতী তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া বিচারককে সেলাম করিল; তাহার পর সতৃষ্ণদৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিল; তাহার পর আবার বিচারকের দিকে চাহিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে তোমাকে নিভৃতে পাইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে চুম্বন করিয়াছিল। এ কথা কি সত্য ?"

যুবতী দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

যুবতীর স্বজনগণের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে ?"

যুবতী বলিল,—"আসামীর সহিত আমার বহুদিনের পরিচয়। বাল্যকালে আমরা কত দিন একসঙ্গে খেলা করিয়াছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছিল। ক্রমে বাল্য যখন যৌবনে উপনীত হইল, বাল্যের ভালবাসা তখন যৌবনের প্রেমে পরিণত হইল। আমি আসামীকে ভালবাসিতাম। আমি জানিতাম, আসামী আমাকে ভালবাসে। কয় গ্রামের আর কোন যুবক আমার ভালবাসা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। আমি জানিতাম, আর কোন যুবতী আসামীর হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

"দুই বৎসর গেল। তৃতীয় বৎসর এক দিন—সেও এমনই বসন্ত কাল, এই তরুতলে আমাদের দুই জনে সাক্ষাৎ হইল। আসামী একাকী তরুতলে বসিয়া ছিল। আমি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ফিরিতেছিলাম। তখন অপরাহ্নে রবিকর কোমল হইয়া আসিয়াছে—দূরে গিরিনির্ঝরের জল রবিকরে জ্বলিতেছিল—বাতাসে ফুলের গন্ধ—ফুলে মধুপের ঝঙ্কার—বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গের কূজন। আসামী আমাকে ডাকিল। আমি আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলাম। আমরা স্থির করিলাম, আসামী পরদিন আমার পিতার নিকট আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে। গল্প করিতে করিতে আমরা জানিতে পারি নাই, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া আর সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দূরে শৃগালের চীৎকারে আমি চমকিয়া চাহিলাম। আমি উঠিলাম। আমরা পরস্পরের মুখচুম্বন করিলাম। যাইতে যাইতে আমি যতবার ফিরিয়া চাহিলাম, ততবারই দেখিলাম, আসামী আমার দিকে চাহিয়া আছে।

"সেই রাত্রিতে লুটের ভাগ লইয়া দুই গ্রামে ঝগড়া বাধিল। সে ঝগড়া আজও মিটে নাই। সেই ঝগড়ায় আমাদের বিবাহের সম্ভাবনা দূর হইয়া গেল। আমি প্রতিদিন আশা করিতাম, ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। হতাশার বেদনা আমাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কত যুবক আমার বিবাহপ্রার্থী হইল। আমি বিবাহ করিলাম না। আমি সংবাদ রাখিতাম, আমার প্রণয়ীও বিবাহ করে নাই।

"চার বৎসর কাটিতে চলিল, পাপ বিরোধ মিটিল না। আবার বসন্ত আসিল। সে দিন আমি এই পথে মেষ লইয়া যাইতেছিলাম। এই বৃক্ষের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। এই তরুতল—আমাদের মিলন-তীর্থ—যেন অনতিক্রমণীয় আকর্ষণে আমাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে তরুতলে আসিলাম—বসিলাম। অদূরে নির্ঝরের জল রবিকরে গলিত রজতের মত জ্বলিতেছিল;

আর দূরে অদূরে গিরির গাত্রে সকল বৃক্ষে সকল লতায় কুসুম। সেই ফুলের গন্ধ—সেই মধুপের ঝঙ্কার—সেই বিহগের কূজন আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। সেই আর এক দিনের কথা আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমার বক্ষের বেদনা অশ্রুরূপে নয়নে দেখা দিল। হৃদয়ের বসন্ত না ফুরাইতে এ দেহের বসন্ত ত ফুরাইতে চলিল! হায়—আমার মত দুর্ভাগ্য কাহার? রমণী যৌবনের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া প্রণয়াস্পদকে নিকটে রাখে—তাহার পর সে বন্ধন শিথিল হইতে না হইতে সে তাহাকে অঙ্কস্থ শিশুর স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া চিরদিনের মত আপনার করিয়া লয়। আমার নারীজন্ম কি ব্যর্থ হইবে?

"আমার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝড়িতে লাগিল। তাহার পর আমার মেষ-গুলির কথা আমার মনে পড়িল। আমি নির্ঝরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—তাহারা সে দিকে নাই। আমি ফিরিয়া পশ্চিম দিকে চাহিলাম। এ কি?—যাহার পথ চাহিয়া আমি জীবন যাপন করিতেছিলাম সে কখন্ আমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে আসিল? এ যে বিশ্বাস করিবার নহে! আমি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ সে-ই! অস্তগামী রবি তাহার মুখে আপনার দীপ্তি মাখাইয়া দিয়াছে। সে আমাকে দেখিতে পাইল। সে দ্রুতপদে আমার নিকটে আসিল; ডাকিল—"হামিদা!" সে আহ্বানে আমার হৃদয়ে কত সুখ কত দুঃখ, কত আশা কত আশঙ্কা, কত আকুলতা কত বেদনা উথলিয়া উঠিল। আমার নয়নে আবার অশ্রু ঝরিতে লাগিল; আমার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। আমি তরুকাণ্ড ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিল করিলাম। সে আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল—আমার ওষ্ঠাধরে—অশ্রুসজল নয়নপল্লবে—অশ্রুসিক্ত গণ্ডে তপ্ত চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

"সহসা দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল। আমাদের পার্শ্ব দিয়া গুলি চলিয়া গেল। আমার কোন আত্মীয় আসামীকে দেখিতে পাইয়াছে। আমি আপনাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া দ্বিতীয় গুলি আসিবার পূর্ব্বে যে দিক হইতে গুলি আসিয়াছিল সেই দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। অল্প দূরে একখানা পাত-রের উপর ধূম তখনও বাতাসে ভাসিতেছিল; বন্দুকধারী পাতরের আড়ালে গেল; আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। আমি আসামীকে চলিয়া যাইতে বলিলাম।

"তাহার পর এই মোকর্দ্দমা।"

(৫)

বিচারক মুগ্ধ হইয়া যুবতীর কথা শুনিতেছিলেন। তিনি ইংরাজ কবির কবিতার আবৃত্তি করিলেন—

"যুদ্ধের প্রলয়-বাত্যা গরজে যখন
তখনো ইহার স্থান—রাজ-সিংহাসন।"

তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি এই যুবককে বিবাহ করিতে চাহ?"

যুবতী দৃষ্টি নত করিল; কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ।"

তাহার স্বজনগণ যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল সেই স্থান হইতে অস্ফুট—অধীর শব্দ শুনা গেল।

বিচারক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যুবতীকে বিবাহ করিবে?"

যুবক বিচারককে সেলাম করিয়া বলিল, "হাঁ।"

বিচারক আদেশ দিলেন. চারি জন সশস্ত্র প্রহরী তাহাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া সহরে পোঁছাইয়া দিবে।

তাহারা রওনা হইবার সময় বিচারক তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবক ও যুবতী পরস্পরের বাহুবদ্ধ হইয়া চলিল। প্রহরীরা পশ্চাতে চলিল।

যুবকের গ্রামবাসীরা আনন্দধ্বনি করিল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের সম্মুখ দিয়া হরিণ পলাইলে তাহার নয়নে যে হিংস্রদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে যুবতীর গ্রামবাসিগণের নয়নে সেই দৃষ্টি দেখা দিল।

বিচারক দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, যুবক ও যুবতী হাসিতে হাসিতে—গল্প করিতে করিতে যেন আনন্দালোক বিকীর্ণ করিতে করিতে যেন বসন্তী প্রকৃতির শোভা সুন্দরতর করিয়া চলিয়া গেল।

তিনি তাম্বু তুলিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে বলিলেন। তিনি ঘড়ীর চেনে বিলম্বিত লকেট তুলিয়া দেখিলেন। তাহাতেও একজন যুবতীর হাস্য-প্রফুল্ল মুখের ছবি ছিল। বিচারকের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

আনন্দ-বিদায়।*

(দ্বিজেন্দ্র-বিয়োগে)

প্রথম যৌবনে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে 'নন্দ-বিদায়ে'র করুণ অভিনয় দেখিয়া কাঁদিয়াছি, আর আজ প্রৌঢ় বয়সে বাঙ্গালার জাতীয় জীবন হইতে আনন্দ-বিদায়ের —অলীক অভিনয় নহে—কঠোর বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া কাঁদিতেছি। বাস্তবিকই কান্তকবি ও দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ আমাদের জাতীয় জীবন হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। গুপ্তকবি হুতোম টেকচাঁদ দীনবন্ধু অনেক দিন গিয়াছেন; 'লোকরহস্যে'র বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বাজীমাতে'র হেমচন্দ্র আমাদিগকে ছাড়িয়াছেন; ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ আর 'গোড়ায় গলদ.' 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' ও হেঁয়ালি-নাট্য লিখিয়া "শুভ্র সংযত কৌতুক-হাস্যের"সঞ্চার করেন না, তিনি জীবন-সন্ধ্যায় সাধন-পথের যাত্রী হইয়াছেন, ও 'গীতাঞ্জলি' ভরিয়া ক্ষুধিত তৃষিত য়ুরোপ- আমেরিকাবাসীকে ধর্ম্মসুধা পান করাইতেছেন। তাঁহার কথায় তাঁহাকেই বলি—

"বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী॥'

যে দুইজন সমসাময়িক কবি হাসির গান গাহিয়া"অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ" বাঙ্গালী-জীবনে সরসতা আনিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে পরপারের অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। কান্তকবি অভয়ার চরণে অভয় পাইয়াছেন, আনন্দময়ীর কোলে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর ভিতরে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন। আর দ্বিজেন্দ্রলাল? তিনি আজ, তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি শান্তার ন্যায়, মরণের পরপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। "জীবনের দীপ নিভে গিয়েছে, বেদনার স্পন্দন থেমে গিয়েছে, স্নেহের মোম পুড়ে গিয়েছে, কৃষ্ণ-মেঘের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জন্মের উপর মৃত্যু গর্জ্জে উঠ্‌ছে।" †

"গাঢ় হয়ে আসে রাত্রি; অন্ধকারের আবরণ
পড়ে গেছে। ছেয়ে গেছে উপত্যকা গিরি বন;

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সভায় পঠিত (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২০)।

† 'পরপারে', শেষদৃশ্য।

উপরে অনন্ত শূন্যে কোটি কোটি জ্যোতিষ্মান,
ঋষিবৃন্দ সমস্বরে ধরেছেন ঐ সামগান—
এত গাঢ়! সে সঙ্গীতে ডুবে গেছে শব্দ তা'র
জ্যোতিতে সে কেঁপে উঠে হয়ে গেছে একাকার।
স্তব্ধ ধরা; শিওরেতে কাঁদে শুধু ঝিল্লীরব;
ধরার বক্ষে দুরুদুরু করি মাত্র অনুভব।
শুধু মহামৃত্যুসম কৃষ্ণ নভ ঘন স্থির;
পক্ষ দিয়ে ঘিরে আছে এ রহস্য পৃথিবীর।
গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসে অন্ধকার;
এই বিশ্বে আমি একা,কেহ যেন নাহি আর।
গভীর রাত্রি! সহযাত্রী—কোথা তারা? কেহ নাই,
শ্রান্তপদে অন্ধকারে একা বাড়ী ফিরে যাই॥" *

পত্নী-বিয়োগ-বিধুর হইয়া কবি গভীর মর্ম্মবেদনায় গায়িয়াছিলেন—

"চলেছি ত এইরূপেই এ জীবন-পথে
শান্তি-সুপ্তি-হীন;
জানিনাও কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা
হবে কোন দিন;

*   *   *   *

এই সে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হবে আবার
কিম্বা এ চির-বিচ্ছেদ?
আমি পারলাম না ক; তবে তুমি করে দেও হে প্রভু
এ রহস্য-ভেদ॥" †

বিপত্নীক কবি আজ "বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দারকুসুম" দুইটিকে সংসার-পাথারে ভাসাইয়া দিয়া, তারা ব'লে পাড়ি দিয়াছেন, মর্ত্তের সুরধাম ছাড়িয়া উর্দ্ধলোকের সুরধামে সুরবালার সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে, পত্নী-শোকের সান্ত্বনা হইয়াছে,'রহস্যভেদ' হইয়াছে, 'চিরবিচ্ছেদ' ঘুচিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি দেখেছি যেন দূরে, দূরত্বে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান;—
যেখানে সৌন্দর্য্য উৎস উঠ্‌ছে, ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।

* 'প্রবাসে' কবিতা, 'ত্রি'বেণী'তে মুদ্রিত।
† 'আলেখ্য'।

গড়্ ছি মনে মনে একটি উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতে ব'সে আমরা কবি ;
(যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটি গড়ে মুখচ্ছবি—)
যেখানে ওই পৃথিবীর এ দুঃখজ্বালা বিষাদ বিরাগ র'বে না এ ভাবে ;
যেখানে এই বর্ত্তমানের অভাব,ত্রুটি, অপূর্ণতা, পূর্ণ হয়ে যাবে।"

আজ তাঁহার হৃদয়ে আর "এই পৃথিবীর দুঃখ-জ্বালা বিষাদ-বিরাগ" নাই, সকল "অভাব ত্রুটি অপূর্ণতা পূর্ণ" হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অকাল-মরণে আমাদের জীবনে যে অভাব, যে অপূর্ণতা ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে না, আমাদের হৃদয়ে যে "দুঃখজ্বালা বিষাদ" আসিয়াছে, তাহা দূর হইবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্দ্ধানে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ শোকার্ত্ত। শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে—কেন না তাঁহার বহু কবিতা ও গান ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সান্ধ্য-সমিতির (Evening Club এর) ললাটের তারারত্ন আজ খসিয়া পড়িয়াছে, পূর্ণিমা-মিলনের পূর্ণচন্দ্র আজ অস্তমিত হইয়াছে, নদীয়ার ষোলকলায় পরিপূর্ণ চাঁদ আজ অনন্তে বিলীন হইয়াছে, মাতৃমন্ত্রের সাধক আজ রঙ্গলাল-বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

শুধু হাসির গানের বিমল আলোক বিচ্ছুরিত করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-বর্ত্তি নিঃশেষ হয় নাই। তিনি স্বদেশভক্ত চারণদেব, কলা-কুশল নাটককার, সূক্ষ্ম সমালোচক ও ধর্ম্মপ্রাণ সাধক ছিলেন। তাঁহার তিরোভাবে হাসির ফোয়ারা, আনন্দের নির্ঝর, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তাল তরঙ্গ, স্বদেশ-প্রেমের একটানা প্রবাহ, উদ্দীপনার উষ্ণ-প্রস্রবণ বিশুষ্ক হইয়াছে। তিনি দেশভক্তির মরা গাঙ্গে বান ছুটাইয়াছিলেন, তিনি দেশের লোককে 'জাগিয়ে, লাগিয়ে, নাচিয়ে, মাতিয়ে,' দিয়াছিলেন। তাঁহার' বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ,' তাঁহার 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি,' তাঁহার 'জয় মা জগন্মোহিনী, জগজ্জননী, ভারতবর্ষ,' ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীত চিরদিন বাঙ্গালী জাতির কাণে বাজিবে—শুধু কাণে বাজিবে কেন, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম সেদিনকার স্বদেশী আন্দোলনের ফল নহে। তাঁহার কৈশোরে রচিত 'আর্য্য-গাথা', প্রথম ভাগে ইহার অঙ্কুর, তাঁহার 'রাণা প্রতাপ,' 'তারাবাই' 'দুর্গাদাস,' 'মেবার-পতনে' ইহার

বিকাশ, তাঁহার 'সিংহল-বিজয়ে' ইহার চরম পরিণতি। জীবনের প্রভাতে যে সুর বাজিয়াছিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই সুর রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইয়াছিল। তাই তিনি বড় গলা করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

"এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতে মরি!"

আবার, তিনি যে কেবল 'জননী জন্মভূমি'কে ভাল বাসিতেন তাহা নহে, 'জননী বঙ্গভাষা'কেও তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবনির্ম্মিত মন্দিরে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে যে মহতী সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভায় গীত তাঁহার নব-রচিত গান 'জননী বঙ্গভাষা' তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও সাহিত্য-সাধনার একনিষ্ঠতার পূর্ণ পরিচয় দেয়। আমরা কয়জন তাঁহার মত অকপটচিত্তে বলিতে পারি?—

"চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার এই জানি, কিছু নাহি জানি আর;
তুমি গো জননী হৃদয় আমার, তুমি গো জননী আমার প্রাণ।
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান॥"

আর এক কথা। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম 'বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে'র অন্ধকূপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ তাঁহার উদ্দিষ্ট ছিল। প্রমাণ তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় বহু গান। শুধু দু' দণ্ডের তরে লোককে হাসাইতে, আনন্দের তুফানে ভাসাইতে, তিনি হাস্য-রসের অবতারণা করিতেন না। তাঁহার হাসি শূন্যগর্ভ হৃদয়ের উচ্চ অট্টহাস (The loud laugh that speaks the vacant mind) ছিল না। কৃষ্ণনগরের রসিক কবি হইলেও তিনি গোপাল ভাঁড় ছিলেন না, ইংরাজীনবীশ হইলেও তিনি টমাস হুড্ বা মার্ক টোয়েনের অনুবাদ বা অনুকরণ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ, অতি মহৎ, অতি বিশুদ্ধ ছিল। গুপ্তকবির ন্যায়, তিনি হাসিতে হাসিতে শিক্ষা দিতে, সমাজ-শাসনের জন্য ঠাট্টার চাবুক চালাইতে, সুদক্ষ ছিলেন। সে হাসির বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গে সঙ্গে করুণার বারিধারা ছিল, আর ছিল কঠোর বজ্র, তাহা কপটাচারীর মস্তকে পাতিত হইত ও মিথ্যা, কপটতা ও ভণ্ডামি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"'ব্যঙ্গ-কবি আমি?—ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু—সকলে?

কভু না। আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ—নকলে।"†

হাসিতে যত শীঘ্র কায হাসিল হয়, আসর জমে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, গম্ভীর বক্তৃতায় তত হয় না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল লোকশিক্ষার জন্য হাসির আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন এক দিন আসে, যখন আর হাসিতে মন উঠে না, প্রাণ পূরে না, আত্মার আকুলতা ঘুচে না। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও সে দিন আসিয়াছিল। বিহারে বদলী হইয়া তিনি 'প্রবাসে' নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন; তাহাই তাঁহার Immortality Ode এবং একাধারে Locksley Hall ও Locksley Hall Sixty Years After। তাঁহার মানসিক বিকাশের ক্রমিক ইতিহাস এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

"চ'লে যা সব চ'লে যা রে—শূন্য হাসির অট্টরব;
তাতে শান্তি?—মনের ভ্রান্তি—নিতান্তই অসম্ভব।
বাল্যক্রীড়া, প্রেমের স্বপ্ন, যশের বাদ্য, ডুবে যায়—
মহাশোকের অশ্রুজলে, মহাগভীর সমস্যায়।

* * * * *

অশ্রুর রাজ্য নিয়ে আয় রে, হাসির রাজ্য মুছে যাক্;
অনুকম্পায় কেঁদে আমার সকল দুঃখ ঘুচে যাক্।

* * * *

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে' অর্দ্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চ'লে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়!
গলা ধরে' কাঁদতে শিখি গভীর সমবেদনায়
সুখের সঙ্গ ছেড়ে, করি, দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।"*

অনেক দিন পূর্ব্বে নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, ভারতীয় কবির চরম পরিণতি ধর্ম্মে। বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র-গিরিশচন্দ্রে এই ধ্রুব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ ও বড়াল-কবিতে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি; কান্তকবি-দ্বিজেন্দ্রলালেও ইহার ব্যত্যয় হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ

† 'আলেখ্য'।
* 'প্রবাসে' কবিতা 'ত্রিবেণী'তে মুদ্রিত।

বয়সে রচিত 'গঙ্গাস্তব' ও 'পরপারে'র সাধক ভবানীপ্রসাদের কয়েকটি রামপ্রসাদী গান ইহার সাক্ষী। শিশু যেমন প্রথম জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মা' 'মা' বলিতে শিখে, কবিও তেমনই প্রথম তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মা' 'মা' বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতে শিখেন। আর করুণা-প্রস্রবিণী জগজ্জননী শোকার্ত্ত ভয়ার্ত্ত সন্তানের সেই আকুল আহ্বান, সেই আবদারের কান্না, শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন না; পথ-হারা সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয়েন। তাই ভক্ত কবির কণ্ঠের আকুল ক্রন্দন—

"পরিহরি ভব-সুখ-দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি, কল-কল্লোলিনী গঙ্গে!"

শুনিয়া মা ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনী, কলকল্লোলিনী গঙ্গা তাঁহার শোক-তাপিত প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়া দিয়াছেন। আর 'ভবার্ণবে দিশেহারা' হইয়া তিনি যখন 'কূলকিনারা' পাইতেছিলেন না, তখন তারা মা 'ধ্রুবতারা' হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন, তিনি 'তারা বলে পাড়ি' দিয়াছেন আর আকুলকণ্ঠে ডাকিয়াছেন——

"তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা,
অভয়া অভয় দে, মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা।"

তাহার পর তাঁহার কথায়ই উপসংহার করি——

"(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি
(ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল মায়ের নাড়ী।
হাতে ধরে নিলি মোরে
(আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চখের বারি মুছিয়ে দিয়ে
(তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে।"

আর মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠিয়া আনন্দগদ্গদস্বরে গায়িতেছে—

"আর কেন মা ডাকছ আমায়,
এই যে এইছি তোমার কাছে,

নাও মা কোলে, দাও মা চুমা,
এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হলো ধুলা-খেলা, হয়ে এলো সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা,
এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে,
বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—
মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা,
আর ত তোমায় ছাড়্ব না মা
ওমা—ঘরের ছেলে, পরের কাছে,
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।" *

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।



* 'পরপারে।'

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

একাদশ অধ্যায়।

রাজপরিবারবর্গের কারাবাস।

জাতীয়-সমিতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে তৎপ্রবর্ত্তিত শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া "ব্যবস্থাপকসমিতি" নাম ধারণ করিয়াছে। ব্যবস্থাপক-সমিতির সভ্যমণ্ডলী ফিউলাণ্ট, গিরন্দিষ্ট এবং জেকবিন এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ফিউলাণ্টগণ প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরুদ্ধাচারী নহেন। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সম্মিলনে সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য-শাসিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু প্ররোচনা-শক্তির অভাবে তাঁহারা রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে গিরন্দিষ্ট অথবা জেকবিন সম্প্রদায়ের ন্যায় শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। গিরন্দিষ্টগণ সাধারণ-তন্ত্র শাসনের পৃষ্ঠপোষক। প্রাচীন গ্রীস ও রোম ইঁহাদের আদর্শ, মানবজাতির কল্যাণ ইঁহাদের কামনা; সাম্য ও স্বাধীনতা ইঁহাদের মূলমন্ত্র। ভার্ণিয়ড, গথে, ব্রিছট, জেনসন প্রভৃতি গিরন্দিষ্ট নেতৃগণ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। জেকবিনগণ সাধারণ-তন্ত্র শাসনের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু ইঁহাদের নীতি গিরন্দিষ্টগণের নীতি হইতে পৃথক। ইঁহাদের মতে মহদুদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম অপকর্ম্ম নহে। ইঁহারা শান্তি-পথে কণ্টক রোপণপূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত ইতর সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া বৃথা রক্তপাতে ধরা কলঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা ও রাজ্ঞীর শিরশ্ছেদন, বৈপ্লবিক বিচারালয়-সংস্থাপন, গিরন্দিষ্ট নেতৃগণের প্রাণসংহার, কারাগারসমূহে হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় পৈশাচিক অনুষ্ঠানের ইঁহারাই মূলীভূত কারণ। রবসপিয়র, ডাণ্টন, ম্যারাট, বিলিয়ড, ভেরিনিস্, সেণ্টজাষ্ট প্রভৃতি সংহার-নীতির পৃষ্ঠপোষকগণ ইঁহাদের নেতা। মিউনিসিপালটী ভবনে, প্যারিসের রাজনীতিক সভাসমূহে এবং ব্যবস্থাপক-সমিতি-গৃহে ইঁহাদের একাধিপত্য।

রাজপরিবারবর্গ জাতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ভেরিনিস্ হইতে প্যারিস নগরে প্রেরিত হইয়া জাতীয়-সমিতির আনুকূল্যে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ

করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা কিয়ৎকাল যাবৎ শান্তি ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু অত্যল্পকালমধ্যেই ব্যবস্থাপক-সমিতির সহিত রাজার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে জাতীয়-সমিতি অভিনব প্রকারে শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎসংরক্ষণকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। বিপ্লব নিবারণপূর্ব্বক অচিরে শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত ফরাসী দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সমিতির আদেশ তৎকালেই প্রতিপালন করিয়াছিল; কিন্তু কতকগুলি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক শত্রুতাসাধনমানসে অনভিজ্ঞ কৃষকগণকে শান্তিভঙ্গকল্পে কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন। বিচারশক্তিবিহীন কৃষকমণ্ডলী এইরূপে প্ররোচিত হইয়া নানা স্থানে নানা প্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করিল। আবার অপর দিকে দেশ-ত্যাগী ভূস্বামিগণ ব্যবস্থাপক সমিতির আশঙ্কার ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বিপ্লব-সমাগমে দেশত্যাগী হইয়া সুইটজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছিলেন। এইক্ষণ বিদেশীয় ভূপতিগণের সাহায্য-গ্রহণে প্রতিষ্ঠিত শাসনের ধ্বংস-সাধন পূর্ব্বক যদৃচ্ছ-শাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

উভয়বিধ শত্রুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণমানসে ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্যগণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, সমিতি-গৃহে অচিরে দুইটি ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া ফরাসিরাজের অনুমোদনের নিমিত্ত রাজভবনে প্রেরিত হইল। প্রথমটির মর্ম্ম এই যে, বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্মযাজকগণ অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত শাসন-সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব রাজকোশভুক্ত হইবে। দ্বিতীয়টি প্রবাসী ভূস্বামিগণের সম্বন্ধে। ইহার মর্ম্ম এই যে, ভূস্বামিগণ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে স্বদেশে প্রত্যাগত না হইলে, তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া তাঁহাদের প্রাণদণ্ড এবং তাঁহাদের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি রাজ-কোশভুক্ত হইবে।

বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্মযাজক ও প্রবাসী ভূস্বামিগণের মনোরথ পূর্ণ হইলে মৃতকল্প রাজশক্তি পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইয়া ফরাসিরাজের অদৃষ্ট-গগনে সৌভাগ্যরবি সমুদিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারিগণের কার্য্য-কলাপের অন্তরালে রাজহস্ত প্রচ্ছন্নভাবে সংসৃষ্ট না থাকিলেও তাঁহাদের প্রতি রাজার আন্তরিক সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। সেই জন্যই

হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, রাজা প্রাগুক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের অনুমোদন করিলেন না। সচিববৃন্দের কুমন্ত্রণাপরিচালিত হইয়া রাজা প্রতিষ্ঠিত শাসনসংরক্ষণকল্পে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিলেন মনে করিয়া জেকবিনগণ মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অহোর্নিশি প্যারিসের রাজনীতিক সভাসমূহের অধিবেশন হইতে লাগিল। অহোর্নিশি জেকবিন বক্তৃগণ জলদগম্ভীরস্বরে মন্ত্রিগণের অযোগ্যতা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। প্যারিসের ইতর সাধারণ পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। পুনর্ব্বার যদৃচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সামর্থ্যবিহীন রাজা মন্ত্রিদলকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন।

সচিববৃন্দ পদচ্যুত হইলে তাঁহাদের স্থলে গিরন্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ডুমুরিয়র, রেনল্ড, ল্যাকাষ্টি, ডুরাস্থল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এ দিকে রাজা ধর্ম্মযাজক ও প্রবাসী ভূস্বামিসম্পর্কিত ব্যবস্থাবলীর অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হইলে সমিতির গৃহে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। সভ্যগণ রাজার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থাত্রয় প্রণয়ন পূর্ব্বক অনুমোদনের নিমিত্ত রাজসকাশে প্রেরণ করিলেন ঃ—

(১) রাজার বর্ত্তমান শরীররক্ষকগণ পদচ্যুত হইবে।

(২) বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্মযাজকগণ নির্ব্বাসিত হইবেন।

(৩) প্যারিস নগরের সন্নিকটে বিংশতি সহস্র সৈন্য সংস্থাপনের নিমিত্ত সেনানিবাস নির্ম্মিত হইবে।

অকস্মাৎ বিশ্বস্ত শরীররক্ষকগণের পদচ্যুতির প্রস্তাব শুনিয়া ফরাসিরাজ সাতিশয় চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভমানসে সমিতির সভ্যগণকে স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে রাজলিপি রাজমন্ত্রিদল কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই উহাতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া রাজা সমিতি-গৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সভ্যমণ্ডলিসমক্ষে শরীররক্ষকগণের পদচ্যুতিপ্রসঙ্গে আপত্তি উত্থাপন করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন; কিন্তু তাহাতেও পদ্ধতি-বিভ্রাট উপস্থিত হইল।

প্রচলিত নিয়মানুসারে রাজা মন্ত্রিদল সমভিব্যাহারে ভিন্ন একাকী সমিতি-গৃহে গমন করিতে পারেন না। মন্ত্রিগণ তৎসমভিব্যাহারে যাইতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, বর্ত্তমান শরীররক্ষকগণ প্যারিসের সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান না করিলে রাজপরিবারবর্গের বিপদ অপরিহার্য্য। তখন অনন্যোপায় হইয়া ফরাসিরাজ শরীররক্ষকগণের পদচ্যুতিপ্রসঙ্গীয় ব্যবস্থাটিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। পদচ্যুত শরীররক্ষকগণের স্থলে ব্যবস্থাপকসমিতি রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষার নিমিত্ত কয়েকটি শান্ত্রিদল নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু অভিনব দলসমূহে রাজভক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক থাকিল না।

ফরাসিরাজের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি সর্ব্বশক্তিশূন্য কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট। ব্যবস্থাপক-সমিতির সভ্যগণ তৎপ্রতি খড়্গহস্ত; জেকবিনগণ রাজসিংহাসন উৎপাটনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প। এতাদৃশ সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কিরীট ধারণ অপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ অন্নে দেহ ধারণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

রাজা বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্মযাজকসম্পর্কিত এবং সেনানিবাস-নির্ম্মাণ-বিষয়ক প্রস্তাব-দ্বয়ের অনুমোদন করিতে সম্মত হইলেন না। সে সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সমগ্র প্যারিসের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইল। গিরন্দিষ্ট ও জেকবিনগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। গিরন্দিষ্ট মন্ত্রিদল তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করতঃ সর্ব্বসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাজপথে এবং প্রতি গৃহে, প্রতি স্থানে ঘোরতর আন্দোলন চলিল। প্রতিদিন সংখ্যাতীত সংবাদ-পত্র রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নিয়োজিত হইল। প্রতিদিন সহস্রাধিক কণ্ঠ বজ্রনিনাদে রাজার পদচ্যুতির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিল। ইতর-সাধারণ প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীর প্রতি যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল। দুরদৃষ্ট রাজপরিবারবর্গের লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজা ও রাজ্ঞী নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? তাঁহারা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন; কাহার সহিত যুক্তি করিবেন? কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে এই অনন্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন? গিরন্দিষ্ট মন্ত্রিদল পদ-

ত্যাগ করিলে ফিউলাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় মহাত্মা মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা, প্রতিপত্তি এবং কার্য্যদক্ষতার সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং এরূপ বিপত্তিকালে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবে? আবার এদিকে বিশ্বস্ত, রাজভক্ত শরীররক্ষকগণ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজপরিবারবর্গের আত্মরক্ষারই বা উপায় কি? রাজা ও রাজ্ঞী অহোরহ দুশ্চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন। রাজা একদা জনৈক বন্ধুকে বলিলেন "মিত্রবর, মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক, আমি মৃত্যু কামনা করি। আমার মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গের পরিত্রাণ-পথ কণ্টকবিমুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে, আমি যদি পলায়নের অথবা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করি, তাহা হইলে পরিবারবর্গের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।" রাণী বলিলেন, "আমি বিদেশীয় লোক, বিপ্লবকারিগণ নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবে। মৃত্যু আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ; দারুণ যন্ত্রণাময় জীবন ধারণ অপেক্ষা মানবের মৃত্যুই মঙ্গল। কিন্তু নিঃসহায় পুত্রকন্যার কি উপায় হইবে?" এই বলিয়া তিনি অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাত শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হইতে রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞী স্বহস্তে একটি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পরিধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা সেই পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার গুপ্ত শত্রুর অস্ত্রাঘাতের আশঙ্কা নাই—আমার মৃত্যু অন্য প্রকারে ঘটিবে।" খাদ্যসামগ্রীর সহিত হলাহল মিশ্রিত করিয়া শত্রুগণ তাহাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিতে না পারে এই নিমিত্ত রাজপরিবারবর্গ পাচকগণকৃত খাদ্য উদরস্থ করেন না। পাচকগণ আহারীয় সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেলে ম্যাডাম ক্যাম্পেন নাম্নী রাজ্ঞীর সহচরী পুনর্ব্বার তাঁহাদের নিমিত্ত রন্ধন করেন। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা কি প্রকারে নিরুদ্বেগ হইবেন?

রাজ-পরিবারবর্গের তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাদৃষ্টে রাজভক্তব্যক্তিগণ প্রাসাদে সমাগত হইয়া উপস্থিত শঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র যুক্তি প্রদান পূর্ব্বক বিভ্রাট উৎপাদন করিলেন। কেহ কেহ রাজাকে রাইন নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে পরামর্শ দিলেন। ল্যাফাইট প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বলিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় সৈন্যগণের আশ্রয় গ্রহণই রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য। বার্ট্রাণ্ড স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, নরম্যাণ্ডি দেশে পলায়নই

সুব্যবস্থা। এইরূপে বহুসংখ্যক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি শুনিয়া রাজা দিশাহারা হইলেন। সুতরাং সব যুক্তি শৃগালের যুক্তিতে পরিণত হইল।

মানব দুঃখের প্রবল পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া সহিষ্ণুতার চরম সীমায় উপনীত হইলে, কুহকিনী আশা কুহকজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহার দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়কে শান্তি প্রদান করে। আশা আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত না করিলে নিরবচ্ছিন্ন নিরাশাসাগরে নিমগ্ন হইয়া সংসারে কোন ব্যক্তিই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। রাজার ও রাজ্ঞীর হৃদয় নৈরাশ্য-তিমিরাবৃত হইলেও মায়াবিনী আশার প্রাসাদাৎ তাঁহাদের জীবনীশক্তি অদ্যাপি অন্তর্হিত হয় নাই। বিপদসাগরে নিমজ্জিত হইয়া ইতঃপূর্ব্বে ফরাসিরাজ প্রুসিয়ার সম্রাটের সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসন্নিধানে একখানি গুপ্তলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারিয়া য়ুরোপের অন্যান্য নৃপতিগণের সাহায্যে ১৩৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রান্সউইকের ডিউক প্রবরকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া সেই বিপুল বাহিনী ফ্রান্স রাজ্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা ও রাজ্ঞী সেই সৈন্যগণের আগমনপ্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালক্ষেপণ করিতেছেন। ডিউকপ্রবর সসৈন্যে ফরাসি-রাজ্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে তদীয় আগমনের উদ্দেশ্য ফরাসিদেশে প্রচার করিলেন ঃ——

"যাহারা ফরাসিদেশের রাজশক্তি অপহরণ পূর্ব্বক সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছে; রাজা ও রাজ্ঞীকে অহরহঃ অশেষপ্রকারে নির্য্যাতিত করিতেছে, য়ুরোপের সম্মিলিত ভূপতিমণ্ডলী তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক রাজা ও ধর্ম্মযাজকগণকে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণকল্পে কৃতসঙ্কল্প। সম্মিলিত সৈন্যগণের আগমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, দায়িত্ব ফরাসীদেশের জাতীয় সৈন্যগণের উপর বর্ত্তিবে। যাহারা বলপ্রয়োগে অথবা বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, যুদ্ধবিষয়ক কঠোর নিয়মাবলীর অনুসরণে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। ব্যবস্থাপক সমিতি, মিউনিসিপালিটী অথবা প্যারিসের জনসাধারণ যদি অবিলম্বে রাজাকে মুক্তি প্রদান না করেন, তবে এই বিদ্রোহিতার ফলে কোন ব্যক্তির স্কন্ধে মস্তক থাকিবে না। রাজভবন আক্রমণ অথবা রাজ-পরিবারবর্গের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলে, প্যারিস নগর বিধ্বস্ত এবং ফরাসী জাতিকে চিরস্মরণীয় শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

য়ুরোপীয় ভূপতিবর্গের সহিত এই সময় হইতে ফরাসী জাতি যে ঘোর

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, সেই সংগ্রামে পরিশেষে বীরেন্দ্রকেশরী নেপোলিয়নের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। সে সংগ্রামের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি হয়। সুতরাং এই স্থলে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, ডিউক-প্রবরের সর্ব্ব চেষ্টাই বিফল হইল।

বীরপ্রসবিনী ফ্রান্স সম্মিলিত ভূপতিমণ্ডলীর ভ্রূকুটিদর্শনে ভীত হইয়া বীরধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক অবনতমস্তকে অবজ্ঞাসূচক আজ্ঞা পালন করিবে, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং ডিউক-প্রবর ফরাসীরাজ্যে বিদেশীয় ভূপতি-গণের আজ্ঞা প্রচার করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। অচিরে সমগ্র ফ্রান্স প্রস্রবণশীল আগ্নেয় গিরির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সমগ্র দেশ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল। ফরাসী জাতির শক্তি, উদ্যম ও অধ্যবসায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রতি পল্লী, গ্রাম ও নগরে বিপুল আয়োজন আরব্ধ হইল। মার্শেলিস হইতে প্যারিস নগরে দলে দলে সৈন্য উপস্থিত হইয়া অচিরে মহাশক্তির আবির্ভাব করিল।

ডিউকপ্রবর ফরাসিরাজের সাহায্যার্থ আসিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করি-লেন। জাতীয় সৈন্যগণের কার্য্যতৎপরতানিবন্ধন তিনি ফরাসিরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। অথচ ভূপতিগণের সেই প্রগল্‌ভতাময় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হওয়ায় রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ৯ই আগষ্ট (১৭৯২ খৃঃ) প্যারিস নগরে ভীষণ নাটকের অভিনয় আরব্ধ হইল। মুহুর্ম্মুহু বজ্রনিনাদে* তোপধ্বনি, দুন্দুভি দামামার ঘোর রোল, সংখ্যাতীত মানবের কোলাহল রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে গগনমার্গ বিদীর্ণ করিল। বিপদ্‌ঘোষণাসূচক ঘণ্টাধ্বনি অবিশ্রান্ত দিগন্ত নিনাদিত করিল। নগরের ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনস্থানে অস্ত্রধারণকল্পে লক্ষ লক্ষ মানব সমবেত হইল। রাজ-পথের স্থানে স্থানে কামান ও বারুদপূর্ণ শকটাবলী, স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্র-ধারিগণের পাদবিক্ষেপ, উন্মাদপ্রকৃতি ইতর সাধারণের জয়োল্লাস আসন্ন প্রল-য়ের আভাস প্রদান করিল। জেকবিন সভা, কর্দ্দেলি প্রাঙ্গণ এবং কুইনডিন এই তিনটি বিপ্লবকারিগণের সম্মিলনস্থান। কর্দ্দেলি প্রাঙ্গণে মার্শেলিস সৈন্য-গণ অবস্থিতি করিতেছিল। জেকবিন নেতৃবর ড্যাণ্টন তাহাদিগকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন :——

"আইন এবং আইনকর্ত্তাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আর সময় নাই। যে

সমস্ত দুষ্ক্রিয়া আরব্ধ হইতে চলিয়াছে, আইন তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম, আইনকর্ত্তারা সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত মানবগণের সহায়। * * * আজ রাত্রিতেই লুই (ফরাসিরাজ) প্যারিসবাসিগণের সংহার পূর্ব্বক প্যারিস নগরী ভস্মীভূত করিবেন। অবিলম্বে অস্ত্রধারণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

হাসি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)।

প্রথমে যে রূপ দেখে ভুলেছিনু সব,
সেই রূপ দেখাইতে পার কি আবার?
তখন হিয়ার মাঝে উচিত যে রব,
জাগাতে পার কি আর কণামাত্র তা'র?

সুদূরেতে পরাহত যে আশা-তরণী,
নিদ্রায় কাতর এবে যে সুখ-তপন,
উঠিবে জাগিয়া যদি পার গো তেমনি
হাসিতে যেমন তুমি হাসিতে যখন।

পারিলে না তাহা তুমি, পারিবে না কভু।
অশ্রুজল বিনা মোর নাহি কোনো গতি;
গভীর সে প্রেমরাশি দেন নাই বিভু,
থাকিতে অধিক কাল প্রণয়-পিরীতি।

জীবন আঁধার মম, জড়তার ভার,
হাসিতে পার না তুমি সে হাসি আবার।

শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ

অদৃষ্ট-চক্র।

—:*:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গৃহে।

—:*:—

যতীশচন্দ্রের গৃহের আবশ্যক সংস্কার আরব্ধ হইল। সরোজা যতীশকে বলিল, ধরণীধর যাইবার সময় তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। সেই টাকায় সে শা'নগরে একটি ঘাট বাঁধাইবে ও ঘাটের উপর একটি মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিবে।

জ্যৈষ্ঠের শেষে যখন যতীশচন্দ্রের পুরাতন গৃহ সংস্কৃত হইয়া তাহার পুরাতন অধিকারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তখন ঘাট বাঁধানও শেষ হইল—মন্দিরও নির্ম্মিত হইল। ঘাট ও মন্দির-নির্ম্মাণে সরোজার পাঁচ হাজার টাকার উপর যতীশ আরও পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিল। গ্রামের যে সব লোক যতীশের অবস্থাপরিবর্ত্তনে ঈর্ষ্যায় তাহার অসাক্ষাতে বলিত, "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ। এখন শেষ রক্ষা হইলেই বাঁচি," তাহারাও সাক্ষাতে বলিত, ''না হইবে কেন? ধরণীবাবুর কৃপায় আমরা রোগে ঔষধ পাইতেছি, ছেলেরা বাড়ী থাকিয়া লিখাপড়া করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র।" গ্রামের বিধবারা বলিলেন, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, আমাদের মাথায় যত চুল, তত বৎসর পরমায়ু ভোগ কর। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও। বৌমার হাতের 'লোহা' অক্ষয় হউক। তোমাদের জন্য আমরা গঙ্গাস্নানের—দেবতাদর্শনের সুবিধা পাইলাম।" যতীশকে পাইয়া হরিনাথের আনন্দ আর ধরে না। তিনি দন্তহীন মুখে এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমি পথ চাহিয়াই ছিলাম—

'ভাগ্যে দেহে প্রাণ ছিল
তাই ত আবার দেখা হল।'

দুঃখ এই, আমার পরমায়ু লইয়া ধরণীধর ভায়া কেন বাঁচিয়া থাকে নাই?

সারা জীবন দুঃখেই কাটাইয়াছে—পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র লইয়া দুই দিন সুখ-ভোগ করিতে পায় নাই।”

হরিনাথের কথা শুনিয়া যতীশ কাঁদিয়া ফেলিল। পিতার সহিত আপনার ব্যবহারের কথা মনে করিয়া আজ সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া হরিনাথ বলিলেন,“দুঃখ করিও না। তিনি তোমাকে এখনও আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদেই আজ তোমার সৌভাগ্যোদয়—সম্পদ্‌লাভ।”

যতীশের মনে হইল, সত্যই ধরণীধর তাহার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদই করিয়াছেন—সেই আশীর্ব্বাদেই সে সংসারে সুখ লাভ করিয়াছে। নহিলে এ সংসারে সুখ বা শান্তিলাভে তাহার কিসের অধিকার? হয় ত ধরণীধর জীবনে যে যাতনা—ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, মরণে সে সব বিস্মৃত হইয়া স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন; হয় ত তিনি তাঁহার সন্তানের সকল অপরাধ ভুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। কে বলিবে?

ঘাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিয়া যতীশ সপরিবারে শা'নগরে আসিল। এবার ইচ্ছাপুর হইতে সকলে তাহার গৃহে আসিলেন। বামাচরণও এক দিনের জন্য সপরিবারে কলিকাতা হইতে আসিল। কারণ, সে কাঞ্চন-কৌলীন্যের অসম্মান করিতে অসম্মত; আর যতীশচন্দ্র অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে এক্ষণে সেই কুলীনসম্প্রদায়ভুক্ত।

শৈলজা পুত্রকন্যা লইয়া পূর্ব্বেই ভগিনী-ভগিনীপতিকে দেখিতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল; স্বামীকেও ছাড়ে নাই—সঙ্গে আনিয়াছিল। সে-ও শা'নগরে আসিল। তাহার আনন্দে সমস্ত গৃহ যেন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু শরতের রবিকরোজ্জ্বল গগনের এক প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র মেঘের মত তাহার হৃদয়ের এক কোণে একটু বিষণ্নতা লাগিয়া ছিল—সে বিরজার জন্য। বিরজা ইচ্ছাপুর হইতে কাশী যাইবার পথে শা'নগরে আসিয়াছিল। সে যখন সরোজার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইল, তখন তাহার মনে হইল, যেন সে কর্ত্তব্যকারাগার হইতে সহসা মুক্তি পাইয়া স্বাধীন হইয়াছে। সে বুঝিল—দেবতা সরোজার মত তাহার দিকেও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সরোজার প্রতি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, তাহাকে আপনার স্নেহসতর্ক যত্নে ঘিরিয়া রাখিয়া সে ইচ্ছাপুরে ছিল। আজ তাহার সে কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। আজ সরোজা তাহার ঈপ্সিত আশ্রয় পাইয়া

জীবন সার্থক করিবার সুযোগ পাইয়াছে; আজ সরোজার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে সরোজার প্রতি কর্ত্তব্যে সে আর যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে নাই, বিরজা সেই কর্ত্তব্যপালন করিতে ব্যস্ত হইল। কর্ত্তব্য-পালন ব্যতীত তাহার ব্যর্থ জীবনের আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? সে শ্বাশুড়ীকে সকল কথা লিখিয়া শেষে লিখিল—"মা, ভগবান্ আমার আর সব বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বাবার মৃত্যুর পর আমি আপনার আদেশ-মত সরোজাকে আগ্‌লাইয়া ছিলাম। আপনি বলিয়াছিলেন, তাহার শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখাই আমার কর্ত্তব্য। আমার সে কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। কিন্তু মা, সেই কর্ত্তব্যের জন্য আপনি আমাকে যে কর্ত্তব্যপালন করিতে দেন নাই, আমি এবার সেই কর্ত্তব্যপালন করিব। এখন আপনি ছাড়া আমার অন্য আশ্রয় নাই, আপনার পদসেবা ব্যতীত আমার অন্য কর্ত্তব্য নাই। আমি আপনার কাছে যাইব। আর আমাকে বারণ করিবেন না।" যথাকালে শ্বাশুড়ীর পত্র আসিল—"মা আমার—সর্ব্বস্ব আমার, তুমি এস—আমার বেদনাবিক্ষত শোকসন্তপ্ত—তৃষ্ণাতুরহৃদয়ে এস। তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া আমি তোমাকে সঙ্গে আসিতে বারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া আমি যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, মা, বিশ্বেশ্বর ব্যতীত আর কেহ তাহা জানেন না। তুমি ব্যতীত আমার আর কে আছে, মা? তুমি ছাড়া এ হৃদয় জুড়াইবার যে আর কেহ নাই। তোমার কষ্ট দেখিতে পারিব না বলিয়া তোমাকে সঙ্গে আনি নাই; ভুল করিয়াছিলাম; কষ্ট যে, মা, মনে। কই ভুলিতে ত পারি নাই—তোমার মলিন মুখ যে মন হইতে মুছিতে পারি না। বিধাতা যে কষ্ট দেন, সে কষ্ট সহিবার শক্তিও দেন। তিনি একই বজ্রাঘাতে আমাদের উভয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছেন—সে বেদনা উভয়ে এক সঙ্গে সহিব। তবে তোমাকে দিয়া তাঁহার আরও কায করাইবার ছিল। তুমি বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছ—ভগিনীকে বক্ষে রাখিয়াছ। আজ তোমার সে সব কায শেষ হইয়াছে। তবে, মা, আমারই বক্ষে এস।" এই পত্র পাইয়াই বিরজা যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিল। কেবল শৈলজার ও সরোজার অনুরোধে সে এত দিন যাইতে পারে নাই। এবার সে যাত্রার আয়োজন করিয়া শা'নগরে আসিয়াছিল; তথা হইতে কাশী যাইবে।

শৈলজাও এই পথে শ্বশুরালয়ে যাইবে স্থির ছিল; কারণ, তাহার স্বামীর ছুটীর প্রায় অর্দ্ধাংশ ইচ্ছাপুরেই শেষ হইয়াছিল—এখনও তাঁহার গৃহে যাওয়াই

ঘটে নাই। সে পিত্রালয়ে আসিয়া বামাচরণকে অনেক বুঝাইয়াছিল—বলিয়াছিল, "তুমি বাড়ীর কর্ত্তা। তুমি বাড়ী ছাড়িও না।" সে কথা বামাচরণ বুঝিলেও বড়বধূ বুঝেন নাই। তবে বাড়ীর সঙ্গে বামাচরণের যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল—এবার তাহা দূর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।

কল্যাণীর জননী তাহার পুত্রকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সরোজার অনুরোধে তিনি সে বিষয়ে আর জিদ্ করেন নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া সরোজা যথারীতি ঘাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিল। সেই দিন সকলে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিল। সে ঘাট ও ঘাটের উপরিস্থিত হরগৌরীর মন্দির সতী—সাধ্বী—কল্যাণীর নাম করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল। সেই ঘাটে ও মন্দিরে পতিগতপ্রাণা কল্যাণীর পুণ্যস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সরোজার স্নেহস্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিল। উভয়ের আদর্শই স্মরণীয়।

কল্যাণীর পুণ্য-স্মৃতি স্মরণীয় করিয়া—দুঃখের শিক্ষায় শিক্ষিতা—সংযমের দীক্ষায় দীক্ষিতা—কল্যাণীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা সরোজা প্রশান্ত ও প্রসন্ন-হৃদয়ে আপনার সংসারে আপনার কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্তা হইল।

পরদিন গৃহে মিলনানন্দরব থামিয়া গেল—আগন্তুকগণ বিদায় লইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর যতীশ একাকী মুক্ত ছাতে যাইয়া বসিল। মেঘহীন—নক্ষত্র-খচিত আকাশে চন্দ্রকর—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে রমণীয় স্নিগ্ধতা। যতীশ ভাবিতে লাগিল, কোন্ পুণ্যে সে সুখলাভ করিল—কে তাহার জীবনে এ অঘটন ঘটাইল? সে এ প্রশ্নের উত্তর পাইল না। সহসা তাহার মনে হইল, যেন পশ্চাতে পবনে কাহার বসন কম্পিত হইল। সে ফিরিয়া দেখিল—সরোজা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রেমপ্রফুল্ল দৃষ্টি তাহারই মুখে ন্যস্ত। তখন তাহার মনে হইল, তাহার হৃদয়ে তাহার প্রশ্নের উত্তর মিলিল, প্রেম-পুণ্যে সে সুখের অধিকারী—প্রেম তাহার জীবনে অঘটন ঘটাইয়াছে।

যতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বাহুপাশবদ্ধা পত্নীকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মিলন-মুদিত নয়নপল্লব ও প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল।

সম্পূর্ণ।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

—ঃ*ঃ—

আজ কাল বাঙ্গালীর নিকট 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাম সুপরিচিত না হইলেও অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার নাম সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল। কেবল সংবাদ-পত্র-পরিচালনের নহে; পরন্তু তৎকালীন সকল সাধারণ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই গিরীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সংপ্রতি তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ-সম্পাদিত গিরীশচন্দ্রের জীবনী বাঙ্গালীকে তাঁহার জীবনকথার সহিত পরিচিত করিয়াছে। পুস্তকের অপ্রকাশিতনাম গ্রন্থকার গিরীশচন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং সমসাময়িক ঘটনাদির বিবরণ দিয়া গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য করিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ঋণী—কারণ, এইরূপ পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত পরবর্ত্তী কালে আমরা আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের বিবর্ত্তন বুঝিতে পারিব না—এ দেশে সংবাদপত্র-প্রবর্ত্তনের বিবরণ জানিতে পারিব না। আমাদের দুঃখ এই যে, সম্পাদক মহাশয় পুস্তকের ভাষা সংশো-ধনে ও পুস্তকে গৃহবিচ্ছেদাদির বিবরণ বর্জ্জনে যথেষ্ট মনোযোগী হয়েন নাই।

সন ১২৩৬ সালের ১৫ই আষাঢ় (২৭ শে জুন, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতার শিমলা পল্লীতে পৈত্রিক গৃহে গিরীশচন্দ্রের জন্ম হয়। সে কালের বাঙ্গালী-পাড়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী বিদ্যালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে গিরীশচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়। তিনি একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তাই বিদ্যালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কোন আত্মীয়ের চেষ্টায় তিনি রাজস্ববিভাগে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনের একটি চাকরীতে বহাল হয়েন। কিছু দিন পরে —১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে—ঐ পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মিলিটারী অডিটার জেনারলের আফিসে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনের একটি চাকরী পায়েন। স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তখন ঐ আফিসে সামান্য বেতনে চাকরী করিতে-ছিলেন। যখন হরিশচন্দ্রের বেতন বর্দ্ধিত হইয়া ১০০৲ টাকা দাঁড়াইল, তখন গিরীশচন্দ্রেরও বেতনবৃদ্ধি হইল। মৃত্যুকালে হরিশচন্দ্র মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন ভোগ করিতেছিলেন। গিরীশচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বেতন কখনও মাসিক ৩৫০৲ টাকার অধিক হয় নাই। আফিসে বহু য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত গিরীশচন্দ্রের পরিচয় হয়। সকলেই বিদ্যা ও কার্য্যকুশলতার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল অসবোর্ণ, মেজর হ্যারিসন প্রভৃতি বহু উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্য তাঁহাদের প্রীতির ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

পাঠ্যাবস্থায় গিরীশচন্দ্র তদীয় বন্ধু কৈলাশচন্দ্র বসুর হস্তলিখিত সংবাদপত্রে লিখিয়া "হাত পাকাইয়াছিলেন।" তৎপরে তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষ-প্রবর্ত্তিত Hindu Intelligencer নামক সাপ্তাহিক পত্রে ও কৈলাশচন্দ্র ঘোষের Literary Chronicle নামক মাসিক পত্রে লিখিতে থাকেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বা তৎকালে তাঁহার মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ Bengal Recorder নামক সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করিলে গিরীশচন্দ্র ভ্রাতার সহকারিরূপে কার্য্য করেন। এই পত্র পাঠ করিয়া কলিকাতার কালেক্টার মিষ্টার গ্রোট এমনই প্রীত হয়েন যে, শ্রীনাথের কোন চাকরী নাই জানিয়া তাঁহাকে স্বীয় আফিসে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনের একটি চাকরী দেন। শ্রীনাথ পরে ডেপুটী কালেক্টার হয়েন ও শেষে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়াম্যানের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রচন্দ্র প্রথমে শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়া শেষে কনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্রের আফিসে মাসিক ৪০০৲টাকা বেতনের চাকরী করিয়া পেন্সন লইয়াছিলেন। ইহাঁরা তিন ভ্রাতাই সুলেখক ছিলেন; তাই কৃষ্ণদাস পাল একবার ভ্রাতৃত্রয়কে সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ (Literary Triumvirate) বলিয়াছিলেন। শ্রীনাথের চাকরী গ্রহণের কিছু দিন পরেই কোন কারণে Bengal Recorder উঠিয়া যায়।

যতদূর জানা যায়, বড়বাজারের মধুসূদন রায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া সংবাদপত্র প্রকাশপ্রয়াসী হইয়া ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্থির হয়, Bengal Recorder এর গ্রাহকদিগকে লইয়া একখানি নূতন পত্র প্রকাশিত হইবে। নামকরণের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে গিরিশচন্দ্র Hindoo Standard, শ্রীনাথ Hindoo Gentleman ও ক্ষেত্রচন্দ্র Hindoo Patriot নাম রাখিতে চাহেন। নূতন পত্র Hindoo Patriot নামে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবারে প্রথম প্রকাশিত হইল। গিরিশচন্দ্র তখন সম্পাদক—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী। এই পত্রে লোকসান



গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ।

Mohila Press, Calcutta.



সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ইহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে হরিশচন্দ্র ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স্বীয় ভ্রাতার নামে উহা ক্রয় করিয়া সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন। কিন্তু গিরীশচন্দ্রের সহিত 'পেট্রিয়টের' ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তদীয় জননীর ও পত্নীর সাহায্যকল্পে গিরিশচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় পুনরায় 'পেট্রিয়ট' সম্পাদন করেন। প্রায় পাঁচ মাস পরে তিনি এই ভার ত্যাগ করিলে নূতন স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় শম্ভুচন্দ্রকে সেই ভার দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি ভারতবাসীর কুৎসা-কথায় কলেবর পূর্ণ করিয়া সরকারকে প্রতিহিংসা লইতে পরামর্শ দিতে লাগিল। সেই সময় কয়জন দেশহিতৈষী বাঙ্গালীর চেষ্টায় Calcutta Monthly Review পত্র প্রকাশিত হইল। গিরিশচন্দ্র ইহার লেখক হইলেন। এই পত্রে জাতিগত বিদ্বেষসম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া কোন ইংরাজ পত্রসম্পাদক তাঁহাকে প্রহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, বিশালবপু, শক্তিধর গিরিশচন্দ্রকে প্রহার করা সহজসাধ্য নহে।

একত্র কায করায় ও একই ভাবে অনুপ্রাণিত থাকায় বয়সের অনৈক্য সত্বেও হরিশচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র উভয়ে গাঢ় ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই স্বাধীনচেতা দেশহিতৈষী ও অত্যাচার অনাচার নিবারণকল্পে বদ্ধপরিকর ছিলেন। উভয়েই সুলেখক ছিলেন; কিন্তু হরিশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের মত সুবক্তা ছিলেন না। তৎকালীন সমস্ত সভাসমিতির সহিত গিরিশচন্দ্রের সংস্রব ছিল। তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক সভা। এই সভা সংস্থাপনের দুই বৎসর পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র ইহাতে যোগ দেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হয়েন ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। এই সভার সংস্রবে তিনি বহুবার প্রতিনিধিমণ্ডলীমধ্যে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তখন রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান ভারতবাসী রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রথম প্রবর্ত্তক গিরীশচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র উভয়েই রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তখন মিলিটারী অডিট আফিসের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা সংবাদপত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া যশোলাভ করিলে প্রধান কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট হইতেন। ডেপুটী মিলিটারী অডিটার জেনারল কর্ণেল শ্যাম্পনিজ বিলাতী

টেলিগ্রাম প্রকাশ করিতে দিয়া হরিশচন্দ্রকে সাহায্য করিতেন; সহকারী মিলিটারী অডিটার জেনারল কর্ণেল ম্যালিসন সময় সময় 'পেট্রিয়টে' লিখিতেন। গিরীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিলিটারী পে-একজামিনার আফিসে কার্য্যে প্রবেশ করিলে দ্বিতীয় পে-মাষ্টার জেনারল কর্ণেল অসবোর্ণ প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি সংবাদপত্রে লিখিয়া থাক?" তিনি সংবাদপত্রে লিখেন না জানিয়া কর্ণেল তাঁহাকে বলেন, পিতৃপদবীর অনুসরণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডালহাউসী ইনষ্টিটিউট সংস্থাপিত হইলে সংস্থাপনকার্য্যের প্রধান উদ্যোগী কর্ণেল ম্যালিসনের চেষ্টায় গিরীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্র উহার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। ভারতবাসীর পক্ষে ইহার সভ্যপদলাভ এই প্রথম। গিরীশ তথায় সভাধিবেশনে তর্কবিতর্কে যোগ দিতেন—সময় সময় তিনিই প্রধান বক্তা হইতেন। এই সভায় ডাক্তার ডাফ ও সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বক্তৃগণের মধ্যেও গিরীশচন্দ্র সুবক্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিটন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি উহার সহিত সংসৃষ্ট ও আমরণ উহার সাহিত্য ও দর্শন বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল সোসাল-সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য মনোনীত হয়েন। এতদ্ব্যতীত তিনি উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। পারিবারিক কারণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বেলুড়ে বাস করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হাওড়া ক্যানিং ইনষ্টিটিউটের ও বেলুড় বিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট হয়েন এবং হাওড়া জিলা স্কুল কমিটীর সভ্য ও মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হয়েন। কালিপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকূল্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ Mookerjee's Magazine প্রতিষ্ঠিত করিলে গিরীশচন্দ্র তাহার লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তাঁহার ইংরাজী রচনা-নিপুণতার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—ডালহাউসি ইনিষ্টিটিউট একটি খৃষ্টমাস গল্পের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলে গল্পলেখকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন প্রথম ও গিরীশচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন।

কালিপ্রসন্ন সিংহের অর্থে চালিত ও শম্ভুচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভূম্যধিকারী-সম্প্রদায়ের মুখপত্রে পরিণত হইলে গিরীশচন্দ্র প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে উদ্যোগী

হয়েন এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও উত্তরকালে ডবলিউ, সি, বোনার্জ্জি নামে সুপরিচিত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। প্রধানতঃ গিরীশচন্দ্রের সাহায্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাতে গমন করেন। তখন হইতে তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার আমাদের নিকট গিরীশচন্দ্রের নিকট ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার ঋণের কথা বলিয়াছিলেন। গিরীশচন্দ্র যখন বেলুড়ে গমন করেন তখনও 'বেঙ্গলী' মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় ছিল। কাযের সুবিধার জন্য পরে—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে—মুদ্রাযন্ত্র বেলুড়ে স্থানান্তরিত করা হয়। গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বেচারামবাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে কিছু দিন 'বেঙ্গলী' চালাইয়া শেষে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উহা 'বেঙ্গলীর' বর্ত্তমান সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয় করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার বেলুড়ে জ্বরবিকারে গিরীশ-চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর মাত্র।

গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু ও গুণানুরক্ত ব্যক্তিরা টাউন হলে সভা করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব করেন। কলিকাতায় হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব সে সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সংগৃহীত অর্থ তাঁহার প্রথম শিক্ষালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রদত্ত হয়। ঐ অর্থের সুদ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে এক বৎসর মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। গিরীশচন্দ্রের স্মৃতি-ভাণ্ডারে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না দেখিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অসবোর্ণ 'বেঙ্গলী' পত্রে এক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন—প্রাচ্য দেশবাসীরা বাক্‌পটু কিন্তু কার্য্যবিষয়ে তৎপর নহেন এই ব্যাপারে তাঁহাদের মতই সমর্থিত হইতেছে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার কথা নহে। কর্ণেল স্বয়ং ভাণ্ডারে ২০০৲ টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, গিরীশ-চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ ব্যতীত আর কেহই গিরীশের মৃত্যুতে তাঁহার মত দুঃখিত নহেন। কর্ণেল ম্যালিসন উত্তরপাড়া সাহিত্য সভায় বলিয়া-ছিলেন, তিনি ইটালী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া-ছেন; কিন্তু কোথায় গিরীশচন্দ্রের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনচেতা ও

আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন লোক দেখেন নাই। তাঁহার উপরিস্থ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যনিপুণতাসম্বন্ধে যে সকল প্রশংসার কথা বলিয়াছেন, সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আকারে তিনি সাধারণ দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মত ছিলেন না; পরন্তু গৌরবর্ণ শালপ্রাংশু মহাভুজ ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে মিতাচারী ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে প্রচলিত পানদোষ তাঁহার ছিল না। তিনি মিষ্টভাষী, সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। বন্ধুবৎসল গিরীশচন্দ্রের বন্ধু-বাহুল্য সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু কৈলাসচন্দ্র বলিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে পথে চলাই দায় ছিল। আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সাহায্যবিষয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—এ বিষয়ে তিনি অনেক সময় মিতাচারসীমা লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহার আয়ের পরিমাণে তাঁহার দান অতিরিক্তই বলিতে হয়। বেশভূষা-বিষয়ে তিনি একান্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। অতি সাধারণ ঢিলা ইজার ও ঢিলা-আস্তিন চাপকান পরিয়া তিনি আফিসে যাইতেন। তাঁহার কোন ব্যয়সাধ্য সখ ছিল না। তবে তিনি উদ্যানপ্রিয় ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। অধ্যাপক লবের সহিত পরিচয়ফলে কোম্‌তের ধর্ম্মমত তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রথমোক্ত পত্র এখন পূর্ব্বগৌরব ভ্রষ্ট হইয়া ভিন্ন পথের পথিক হইয়াছে; আশা করি, শেষোক্ত পত্র দীর্ঘকাল দেশের কল্যাণকর কার্য্য করিয়া গিরীশচন্দ্রের স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মিত্রতা।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

নীর ও কর্দ্দম যথা প্রীতিতে জড়িত
মিত্রসহ সেই মত হ'বে সম্মিলিত।
রবিকরে শুকাইয়া যায় যবে নীর
বিষাদে কর্দ্দম করে বিদীর্ণ শরীর!

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র।

(১)

সুদূর দ্বাপর যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ ভারতের সম্প্রদায়বিশেষের নিকট ভগবানের পূর্ণাবতাররূপে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-গণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীর চিত্তহরণ, বসনহরণ প্রভৃতি যে সকল কার্য্যের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের দেশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত সমাজ কৃষ্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন বলিয়া মনে হয় না। ভক্ত লেখকগণ কৃষ্ণকে নারায়ণ মনে করিয়া কৃষ্ণের রাসলীলা, দোললীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন; যিনি ভক্ত, যিনি ভাবুক তিনি বুঝিতে পারেন যে, ভক্ত-বর্ণিত সেই সকল লীলার মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের ভাব, ভক্তি ও আত্মবিস্মৃতির কি মহান্ গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের কৃষ্ণের প্রতি সেই অশ্রদ্ধা এখন আর নাই। এখন তাঁহারা কৃষ্ণকে ভগবানের পূর্ণাবতাররূপে পূজা না করিলেও—আত্মত্যাগী, পরার্থপর লোকাতীত শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস, নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' কাব্যই প্রথমে আমাদের দেশীয় লোকের কৃষ্ণের সম্বন্ধে ভ্রম ও অশ্রদ্ধা দূরীভূত করিয়াছে। মহাভারত ও ভাগবত লইয়া নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' রচিত। নবীনচন্দ্র মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করিয়া কৃষ্ণ-চরিত্র কিরূপ বুঝিয়াছেন এবং আমাদিগকে কিরূপ বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে।

'রৈবতকে' কৃষ্ণের আদ্যলীলা, 'কুরুক্ষেত্রে' মধ্যলীলা এবং 'প্রভাসে' অন্তলীলা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব 'রৈবতক' আমাদের প্রথম আলোচ্য।

'রৈবতকের' সপ্তম সর্গে কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গে আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ নন্দযশোদার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্ররূপে বৃন্দাবনের শ্যামল ক্ষেত্রে গোপবালকসহ গোচারণে রত। এক দিন দশমবর্ষীয় বালক কৃষ্ণ ভ্রাতা বলরামসহ বকুলমূলে উপবেশন করিয়া যমুনার "শান্ত নীল নীরে" স্তব্ধ মধ্যাহ্নের "কিরণ খেলা" দেখিতেছিলেন। এমন

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পদক পুরস্কার প্রাপ্ত।

সময় যদুকুল-পুরোহিত গর্গ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, “বৎস কৃষ্ণ, যে সকল গ্রহ তোমার অদৃষ্টাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া আছে, তাহাদের ফল এই ক্ষুদ্র গোচারণ নহে।”

“জন্মি আর্য্য-হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শেখরে
দুই কীর্ত্তিস্রোতস্বতী দুইটি নির্ঝরে,
উড়াইয়া বিঘ্নরূপী শত ঐরাবত,—
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত,
গঙ্গা যমুনার মত তটিনী যুগল
মিলিবেক অৰ্দ্ধপথে ;—সেই সম্মিলন
মানবের মহাতীর্থ! স্রোত সম্মিলিত
ছুটিবে অপ্রতিহত, করিয়া বিলীন
শত শত কীৰ্ত্তিস্রোত, করিয়া মোচন;
দলিত ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহা পারাবারে—
অনন্ত অতলস্পর্শ! ব্যাপি ভবিষ্যৎ
ঢালিবেক শত মুখে অজস্র ধরায়
পতিত-পাবন সুধা অনন্ত অমৃত।
তব গোচারণ ক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা ;
সমগ্র মানব জাতি গোপাল তোমার ;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর [illegible],
স্থির ভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া মিলিত—
নর-নারায়ণ-মূৰ্ত্তি!—রহিবে সতত
সৰ্ব্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।
গ্রহগণ মিথ্যাবাদী নহে কদাচন।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি! আইস গোপাল,
আজি শুভক্ষণে আমি করিব দীক্ষিত
পূত যমুনার জলে নিভৃতে দুজনে।
শস্ত্রে, শাস্ত্রে, যথাবিধি করিব শিক্ষিত
উভয়ে নিভৃতে ; বৎস! গোপেরকুমার
তোমাদের অধ্যয়নে নাহি অধিকার।”

পূত যমুনাজলে স্নাত ভ্রাতৃদ্বয় গর্গের নিকট দীক্ষিত হইয়া নব জীবন লাভ করিলেন। গোচারণের অবসরে কৃষ্ণ ও বলরাম গর্গের নিভৃত আশ্রমে

বসিয়া নানা শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই শিক্ষাপ্রভাবেই অঘ, বক, প্রলম্ব, পুতনা প্রভৃতি হিংসাকারী এবং মহাপরাক্রমশালী অত্যাচারী অনার্য্য কালীয় নিধন প্রাপ্ত হইল।

একদা যখন বর্ষাধারাপাতে কাতর ক্ষুধার্ত্ত গোপবালকগণ ঋষি আশ্রমে অন্ন ভিক্ষা করিতে যাইয়া রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল;—ঋষিগণ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বোধে নীচ গোপ জাতিকে যজ্ঞের অন্ন প্রদান করিলেন না—তখন বালক কৃষ্ণের হৃদয়ে ভাবনার প্রথম ছায়াপাত হইল। "নীচ জাতীয় ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন না দেওয়াই কি ধর্ম্ম? সকল জাতির ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি কি সমান নহে?"

"একই মানব সব, একই শরীর,
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল;
জন্ম মৃত্যু একরূপ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?"

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ তন্দ্রাভিভূত হইলেন। তিনি তন্দ্রা-ঘোরে অনন্তসৌন্দর্য্যময়, অনন্তশক্তিময় বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বাম্বুজে অধিষ্ঠিত দেখিলেন। সে বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু। তিনি তন্দ্রাঘোরেই যেন শুনিলেন, "একমেবা-দ্বিতীয়ম্।" তিনি বৃন্দাবনে স্বপ্নদৃষ্ট বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর পূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন। অবশ্য এই পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে তাঁহাকে বহু বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ইন্দ্রপূজকগণ ইহাতে প্রবল বাধা দিয়াছিল। কৃষ্ণ অমিতশক্তি-দ্বারা সমস্ত বাধা বিঘ্নই দলিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই কৃষ্ণ-প্রচারিত নব ধর্ম্মমতের অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্কুর। এই ধর্ম্মের পূর্ণ-পরিণতি আমরা 'প্রভাসে' দেখিতে পাই। ইহার পরেই কৃষ্ণের প্রকৃত কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। এই স্থান হইতে বৃন্দাবনবাসীর আদরের ধন কৃষ্ণ পাঁচনি, পীযুষবর্ষা বেণু এবং তৃণশ্যামল গো-চারণ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া দুষ্কৃত দমনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুষ্ট কংসের অত্যাচার উৎপীড়নে নরনারী দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। অত্যাচারী প্রবলের হুঙ্কার অত্যাচরিত দুর্ব্বলের হাহাকার কৃষ্ণের মর্ম্ম স্পর্শ করিল; তিনি কংসকে বধ করিলেন।

কংসবধ করিয়া তিনি মথুরারাজ্য উগ্রসেনকে দান করিলেন। দুষ্কৃত-দমনই তাঁহার উদ্দিষ্ট, রাজ্যাধিকার নহে। ইহাই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মের

সূচনা। জামাতা-নিধনে শোকার্ত্ত ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিল। কৃষ্ণের সহিত তাহার কয়েকবার যুদ্ধও হইল। অবশেষে কৃষ্ণ এই অকারণ লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এই স্থানেই তাঁহার জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকাপাত হইল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট স্বীয় জীবন-কাহিনী বিবৃত করিবার সময় বলিয়াছিলেন,

"—সত্য পার্থ! অদ্ভুত-কাহিনী
আমার জীবন। মিলি শত্রু মিত্র সব
করেছে অদ্ভুততর; পার্থ, সর্ব্বশেষ
করেছে অদ্ভুততম অন্ধ জনরব।"

কথাগুলি যথার্থ। কৃষ্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যে এবং অতুলনীয় গুণরাশিতে বৃন্দাবনের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহবা তাঁহাকে দেবতাবোধে ভক্তি কুসুমে তাঁহার অর্চ্চনা করিত, কেহবা তাঁহাকে সখা জ্ঞানে অনাবিল প্রীতি-ধারায় অভিষিক্ত করিত, কেহবা স্নেহরসে বিগলিত হইয়া পুত্র বোধে তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইত।

'রৈবতকে' কৃষ্ণ লোকশিক্ষার্থ মানবের ন্যায়ই কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন; অতিলৌকিক ভাবে কিছুই করেন নাই; তবে তিনি আদর্শ মানব, তাঁহাতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

তখন ভারতবর্ষের জাতিভেদ, রাজ্যভেদ, নীতিভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিয়া কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইল। বিচ্ছিন্ন ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিয়া এক ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন এবং তৎকালপ্রচলিত যাগযজ্ঞবহুল কামনাপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড ও জড়োপসনা রহিত করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ভাস্বরজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার জন্য কৃষ্ণ বদ্ধপরিকর হইলেন। ভারতের তৎকালীন অবস্থা এমনই হইয়াছিল যে, সমাজ "কর্ণ তুল্য শূদ্রে" ক্ষত্রিয়ত্ব এবং মহর্ষিব্যাসকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতে একান্ত অসম্মত। প্রথমতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ গুণানুসারে কর্ম্মবিভাগ করিয়াছিলেন; যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহার হস্তে সেই কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই কর্ম্ম বিভাগ জাতিভেদে পরিণত হইল এবং জাতিভেদ হইতে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্ভব হইল। দ্রোণাচার্য্য যদি ভক্ত

প্রতিভাশালী একলব্যকে নীচজাতীয় বলিয়া উপেক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা ভারতের ইতিহাসে অর্জ্জুনের ন্যায় আর একটি বীরের কীর্ত্তি-পূর্ণ জীবন-কাহিনী পাঠ করিতে পারিতাম; সেই জীবন-চিত্র হয় ত অনেক বিষয়ে মানবের আদর্শ হইতে পারিত।

'রৈবতকের' প্রথম সর্গেই আমরা কৃষ্ণকে জড়োপসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান দেখিতে পাই।

"প্রভাসের তীরে বসি কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
শিলাসনে ধ্যানমগ্ন। স্থানে স্থানে স্থানে
দুই পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বসি ঋষিগণ—
স্থির অচঞ্চল;"

যখন কণক কিরণলহরে সমুদ্রের পূর্ব্বপ্রান্ত প্রদীপ্ত করিয়া নবীন তপন "উঠিলেন নীলাকাশে ঝলসি নয়ন" তখন ঋষিগণ সেই নবোদিত সূর্য্যকে বিশ্বের আলোকের কারণ, "জগত পালন," "জগত ধ্বংসন" মনে করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তব শেষ হইতে না না হইতেই কৃষ্ণকণ্ঠে অপার মহিমাময় বিশ্বপতির বন্দনাগীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বন্দনাশেষ করিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

"অন্ধ জড় উপাসক! হেন মহাশক্তি
নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে,
সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর—
জ্ঞানহীন, ইচ্ছাহীন, নিয়মের দাস!
যাহার উদয়, অস্ত, শূন্য-পর্য্যটন
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন; হেন প্রভাকরে
কেন পূজিবেক পার্থ, চেতন মানবে!"

তখন অনেকে আসল ভুলিয়া মেকির আদর করিত, সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া সৃষ্ট পদার্থের পূজা করিত। একেবারেই মানুষের অনন্তের ধারণা, অনন্তের প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না। তাই মানুষ সান্ত জড় ও চেতনে অনন্ত দেবের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া, সেই সান্ত ও জড়কে পূজা করিতে, ভাল-বাসিতে শিখিয়া, সেই বিশ্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরকে ভালবাসিতে ও পূজা করিতে শিখে। কিন্তু অনেকেই আবার প্রেম ভক্তি অসীমে বিস্তৃত করিবার নীতি বিস্মৃত হইয়া জড়কেই আপনাদের উপাস্য মানিয়া লয়েন।

কেহ কেহ হয়ত মনে করেন, নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। যাহারা আত্ম-প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য দয়া ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বর্জ্জিত, তাহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও কৃষ্ণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি ক্রোধসর্ব্বস্ব দুর্ব্বাসার ক্রোধে একটুও বিচলিত হইলেন না, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ—যাঁহারা প্রকৃত ঋষি—যাঁহারা স্বীয় ভোগ-কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া, কেবল লোকহিতার্থ সাধনা ও জ্ঞানার্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধা নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে সুপরিস্ফুট—

ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি! কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে; জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা আঁধারে। নীরব, নির্জ্জন
এই তপোবন হ'তে যখন যে জ্যোতিঃ,
পার্থ, হয় বিনির্গত; সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হ'তেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ সকলি—সকলি—
নীরব, নির্জ্জন হেন আশ্রমপ্রসূত।
ভারত সমাজদেহ; আশ্রমনিচয়
তাহার হৃদয়যন্ত্র, মস্তক তাহার
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম।"

কৃষ্ণ প্রজ্ঞা চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, সুভদ্রাদ্বারা যাদব ও কৌরব শক্তির সম্মিলনে যে মহাশক্তির উদ্ভব হইবে, তদ্দ্বারা ভারতের অনেক অশান্তি দূরীভূত হইতে পারিবে। তাই তিনি প্রিয় শিষ্যা প্রাণ-প্রতিমা ভগিনীকে অর্জ্জুনের করে সমর্পিত করিলেন, অর্জ্জুনের প্রতি সুভদ্রার অনুরাগও তাহার অন্যতম কারণ। তিনি ভদ্রা অর্জ্জুনের পরিণয়ের পূর্ব্বক্ষণে বলিয়াছিলেন,—

"আজি শুভক্ষণে, নাথ!
তোমার করুণা বলে
যে অঙ্কুর হইল রোপিত,

দেও শক্তি, সে অঙ্কুরে
করিব শান্তির ছায়া
নাথ! 'মহাভারত' স্থাপিত।"

তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যমূলেই পরার্থপরতা বিদ্যমান। কিসে সকলের কল্যাণ হইবে তিনি কেবল তাহাই খুঁজিতেন।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

প্রার্থনা।

দিবস কেটেছে অবসর নিয়ে
দীর্ঘ কর্ম্ম-ভারে,
ক্লান্ত অতিথি শান্তি মাগিছে
রজনী তোমার দ্বারে।
দাও দাও কোল আঁধার আঁচল
বিছায়ে নিশীথ-রাণী,
যদি যাই ভুলে ও কোলে ঘুমায়ে
জগতের যত গ্লানি!
ভগ্ন হৃদয় ছিন্ন দু'বাহু
দুর্ব্বল দেহ-চিত্ত,
কোথা, পরমেশ, অনাথ-শরণ
চিৎ অনন্ত নিত্য।
কতদিন আর কর্ম্ম-বাঁধনে
জগতের সুখ দুখে,
আঁধার মাঝারে খুঁজিব তোমায়
বেদনা-কাতর বুকে?

শ্রীমতী সুকেশী দেবী।

অনিন্দ্যা।

—:*:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আনন্দাশ্রু।

—:*:—

বৃদ্ধ আরও কথা বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু এই সময় অনিন্দ্যা উভয়ের আহার্য্য আনিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিল তখন কন্যাকে বলিলেন,—"মা, ইনি কোশলরাজপুত্র গিরণ। ইঁহার কথা আগে অনেকবার তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ।"

বিস্ময়ে ও লজ্জায় অনিন্দ্যার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। এই সেই কুমার গিরণ—যাঁহার লোকাতীত বীরত্বের কাহিনী তাঁহার বালিকা-হৃদয়ে কতবার বিস্ময় ও পুলকের তরঙ্গ তুলিয়াছে! কিন্তু সেই বিস্ময়-বিজড়িত পুলকের অন্তরালে যে আর কোন ভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে লুক্কায়িত ছিল; তাহা ত তিনি কখনও সন্দেহ করেন নাই! আজ সহসা সেই গিরণকে দেখিয়া তাঁহার এ কি ভাবান্তর হইল? কোথা হইতে এক নূতন ভাবের বন্যা আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তোলপাড় করিয়া তুলিল?

অনিন্দ্যা কক্ষের এক ক্ষীণালোকিত পার্শ্বে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি তখন কি করিবেন, দাঁড়াইয়াই থাকিবেন কি চলিয়া যাইবেন. তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পিতা শীঘ্রই তাঁহাকে এই সমস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—"মা, কুমারের ঘোড়াটিকে কিছু আহার্য্য দিয়া আইস।"

গিরণ তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিলেন,—"না, না, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ঘোড়াটাকে যে স্থানে বাঁধিয়া আসিয়াছি, সে স্থানে প্রচুর তৃণ আছে। তাহাকে আর কিছু দিতে হইবে না।" এই বলিয়া তিনি একবার আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে অনিন্দ্যার দিকে চাহিলেন। আর তিনি যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন তখন অনিন্দ্যারও দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ ছিল। চারি-

চক্ষুর যখন মিলন হইল, তখন অনিন্দ্যা আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না।

আহারান্তে উভয়ে উপবেশন করিলে অনিল কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, তখন তুমি যে গানটি গাহিতেছিলে, কুমারকে সেইটি শুনাইয়া দাও। যাঁহার কথা শুনিতে এত ভালবাসিতে আজ তিনি স্বয়ং উপস্থিত। তাঁহার কাছে আর লজ্জা কি, মা?"

এইবার তাঁহার বিষম পরীক্ষা! লজ্জা, ভয়, ও আনন্দ যুগপৎ তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিতেছে; কণ্ঠ দিয়া কিরূপে স্বর বাহির হইবে? কিন্তু পিতার আদেশপালন করিতেই হইবে। ত্রস্ত চরণে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে যাইয়া কম্পিত হস্তে তিনি বীণাটি গ্রহণ করিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বীণার ঝঙ্কারে স্বর মিলাইয়া গাহিলেন—

কাহারে কখন্ ঠেলে চ'লে যাও
ফেলে চ'লে যাও আঁধারে;
আবার কাহার অনুরাগ-পাশে—
থাক অনায়াসে বাঁধা রে!
অয়ি চঞ্চলা কমলা! কেমন গো তব এ ছলা,
সুখের কুঞ্জ হ'তে সে অতুল—
এনেছ অকূল পাথারে!
যাও তবে দূরে চলিয়া, আসিও না পুনঃ ছলিয়া
হাসির বিজুলী হানিয়া তোমার—
বাড়ায়ো না আর ব্যথারে।

গীত থামিল; কিন্তু তখনও যেন গিরণের কর্ণকুহরে সেই বিষাদমাখা মধুর স্বর ধ্বনিত হইতেছিল। এই শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কি কোন প্রতীকার তিনি করিতে পারিতেন না? তাহা হইলে তিনি কি জন্য অস্ত্র ধারণ করেন। তখনই তাঁহার সেই অপমানের কথা, সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। এখনও পর্য্যন্ত সেই নরকের কীট জীবিত আছে! তিনি অতি কষ্টে মনের আবেগ দমন করিয়া রাজাকে বলিলেন,—"উপযুক্ত অবসর পাইয়াছি। কাল আমিই তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া এই অত্যাচারের ও আমার অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"বৎস তোমার যদি বিবাহ না হইয়া

থাকে, কিম্বা বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী না থাকে, তাহা হইলে এই যুদ্ধ-ক্রীড়ায় তোমার যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে না। ইহাই তাহার নিয়ম।"

গিরণের মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। তখনই এক প্রবল চেষ্টায় লজ্জা ও সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—"আমি এখনও অকৃতদার। কিন্তু—"

"কিন্তু কি, বৎস ?" বলিয়া অনিল উৎসুক ভাবে কুমারের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"কিন্তু আপনার কন্যাকে কি আমি পত্নীরূপে পাইবার আশা করিতে পারি না ?" ধীরে ধীরে নতমুখে গিরণ এই কয়টি কথা বলিলেন।

বৃদ্ধের নিকট এই প্রস্তাব যেন অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। কোশলের যুবরাজ গিরণকে যে তিনি জামাতৃরূপে পাইবেন এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন নাই। আর এখনও ত তিনি কপর্দ্দকহীন। তিনি বলিলেন—"একি বলিতেছে, কুমার ? আমার ন্যায় রাজ্যহীন দরিদ্রের সহিত তোমার পিতা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইবেন কেন ? তুমি কি তোমার পিতার অমতে বিবাহ করিতে চাহ ?"

গিরণ এবার একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"কাল আর আপনি রাজ্যহীন থাকিবেন না। হয় আমি দুরাত্মাকে বধ করিয়া আপনার রাজ্য উদ্ধার করিব, নহে ত আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

বৃদ্ধ তখন গদগদ স্বরে কহিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, বৎস, তুমি সফলকাম হও। তোমার ন্যায় পাত্রে আমি কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিব, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল! এই সুখ আমার কপালে ছিল বলিয়াই বুঝি ভগবান আমাকে দুরবস্থায় ফেলিয়াছেন। হায়! এ সময় অনিন্দ্যার মাতা কোথায় ?" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন,—"তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই দৈন্যক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার সহধর্ম্মিণী আজ দুই বৎসর হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজ এখন তাঁহার কথা মনে পড়িতেছে।"

অনিল উঠিলেন এবং গিরণকে শয়নগৃহ দেখাইয়া দিয়া নিজে শুইতে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পণ-রক্ষা।

আজ বাসন্তী বিজয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ক্ষুদ্র শ্রীপুর নগরটি জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতেই ক্রীড়া আরব্ধ হইবে। রাজপথ সকল জনকোলাহলে মুখরিত। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই এই যুদ্ধাভিনয় দর্শন করিবার জন্য চলিয়াছে। সকলেরই মুখে ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্যের চিহ্ন।

নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উত্তর দক্ষিণে ক্রোশার্দ্ধ স্থান জুড়িয়া যুদ্ধাঙ্গন প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তর প্রান্তে এক বহুমূল্য সিংহাসন, অপর সীমায় যোদ্ধগণের প্রবেশপথ; আর চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে দর্শকগণের বসিবার মঞ্চ। দূরদেশ হইতে আগত রাজা ও রাজকুমারগণের শিবির চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

পূর্ব্বাকাশ যখন নবোদিত রবির কিরণজালে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকের মঞ্চগুলিতে আর তিল ধারণের স্থান রহিল না। অগণিত লোক এই দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রমণী-কুলকলঙ্ক বাসন্তীর গর্ব্ব চূর্ণ করিতে এবার কোন্ কোন্ বীর অগ্রসর হয়েন, সতী নারীগণের মর্য্যাদা এবার প্রতিষ্ঠিত হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য অসংখ্য পুরাঙ্গনা সমবেত হইয়াছেন।

তূর্য্যনিনাদ হইল। লোক-সঙ্ঘের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত এক যুবক দৃপ্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া অঙ্গন-মধ্যে প্রবেশ করিল। পার্শ্বে ভিন্ন অশ্বে আরূঢ়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিতা এক সুন্দরী রমণী। এই রমণীই বাসন্তী আর যুবকই এই প্রদেশের বর্ত্তমান অত্যাচারী রাজা।

আর কোথাও কোনরূপ শব্দ নাই। অঙ্গন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই জনই অশ্ব হইতে অবতরণ করিল; এবং যুবক রমণীকে লইয়া গিয়া সিংহাসনে বসাইল; অতঃপর পুনরায় অশ্বারোহণপূর্ব্বক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "আমি এই সিংহাসনোপবিষ্টা বাসন্তীকে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলিয়া

ঘোষণা করিতেছি। যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত থাকেন, আমি তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

তাহার কথা শেষ না হইতে না হইতেই দ্বার সন্নিকট হইতে গর্ব্বিতকণ্ঠে উত্তর হইল—"দুর্ম্মতে, আমার নিকট দণ্ডায়মানা এই নারী বাসন্তী অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠা!" সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল দ্বারের পার্শ্বে অশ্বের বল্গা ধরিয়া দণ্ডায়মান রণসাজে সজ্জিত এক যুবকের মুখ হইতে এই নির্ভীক উত্তর বাহির হইল; তাঁহার পার্শ্বে বৃদ্ধ রাজা অনিল কন্যা অনিন্দ্যার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গিরণ আর কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া উন্মুক্ত তরবারি করে অরাতির প্রতি ধাবিত হইলেন। ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরব্ধ হইল। উভয়েই সমান যোদ্ধা; কিছুক্ষণ কেহই অপরকে পরাজিত করিতে পারিল না। অবশেষে এক বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পাপিষ্ঠ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। গিরণও সেই মুহূর্ত্তে এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং তাহার বক্ষের উপর বসিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"কাপুরুষ! এইবার তোর পরিচয় বল। তাহার পর এই তরবারি তোর বক্ষে বিদ্ধ করিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

ঊর্দ্ধোত্থিত কৃপাণহস্তে গিরণ যখন শত্রুর বক্ষের উপর আরূঢ়, কোমলহৃদয়া অনিন্দ্যাকে তখন পাপিষ্ঠের প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করিতে দেখিয়া রাজা অনিল কহিলেন—"সে কি, মা। পাপাত্মা আমাদের কি পর্য্যন্ত না দুর্গতি করিয়াছে! তাহার প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ!"

কম্পিতকণ্ঠে কন্যা বলিলেন, "পাপীর শাস্তি ভগবান দিবেন; আপনি উহাকে রক্ষা করুন।" তাঁহার মুখে চক্ষুতে একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

অনিল কন্যাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন; তিনি তাঁহার কন্যার আব্দার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে গিয়া কুমারকে কন্যার অভিলাষ জানাইলেন।

গিরণ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই তাঁহার করতলগত শত্রু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "না, না, আর আমি বাঁচিতে চাহি না। আমায় বধ কর। আমি আমার আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আরও অনেক মহাপাপ করিয়াছি, আর আমার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। আমার পরিচয় জানিতে

চাহ ? এই যে ঋষির ন্যায় রাজা অনিল, যাঁহার পক্ষ লইয়া তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে, আমি ইহাঁরই সেনাপতি রুদ্রসেনের পুত্র অদীরণ ; ইঁহারই অন্নে পালিত, ইহাঁরই যত্নে লালিত হইয়া আমি ইহাঁকেই রাজ্যচ্যুত করিয়াছি ; আর ইহাঁর দেবীস্বরূপিণী কন্যা, যাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই আমি এই অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আর যিনি আজ তাঁহার পরমশত্রুর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছেন, তাঁহাকে এত দিন বলপূর্ব্বক বিবাহ করি নাই কেন জান ? বলপ্রকাশে আমি তাঁহার হৃদয় পাইব না, তাই প্রতি বৎসর এইরূপ একটা কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয়ে নিজের বীরত্ব দেখাইয়া তাঁহার হৃদয় আমার দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতাম। যদি কৃতকার্য্য না হইতাম, উনি যদি আর কাহারও প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলেও আমার আশা ছিল যে, আমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী নিশ্চয়ই আমার এই আহ্বানে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে ; আর আমি তখন অনিন্দ্যার সম্মুখে তাহাকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিব। তাই আজ যখন তুমি তাঁহার পক্ষ হইতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলে, তখন আমার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত, যে তুমি ভগবানের বিচারদণ্ড আমার উপর নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছ ? আজ আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। হায়! আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ?" অনুতপ্ত পাতকীর নয়ন বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল ; সে আর কথা কহিতে পারিল না।

গিরণ ইতঃপূর্ব্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে চুপ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"তুমি যাঁহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলে, আজ তাঁহাদেরই কৃপায় তোমার প্রাণ-রক্ষা হইল। আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হইয়াছে। এখন তুমি রাজা অনিলকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দাও আর তাঁহার ও অনিন্দ্যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন পরিহিতব্রতে উৎসর্গ কর। এ রাজ্যে আর তুমি থাকিতে পাইবে না। তুমি রাজা ধর্ম্মপালের রাজ্যে আশ্রয় ভিক্ষা কর। তাঁহাকে তোমার জীবনের ইতিহাস বলিবে, আর তোমার এই অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহার অধীনে অত্যাচারীর দমনে আপনাকে নিয়োজিত করিবে।"

অদীরণ স্বীকৃত হইল। সে জানু পাতিয়া অনিল ও অনিন্দ্যার নিকট

ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন সেই বিপুল জনসংঘ হইতে সহস্র-কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া উত্থিত হইল—"জয় রাজা অনিলের জয়!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সন্দেহ।

অধর্ম্মের পতন হইল। রাজা অনিল স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। শুভ-দিনে শুভলগ্নে অনিন্দ্যার সহিত কুমার গিরণের বিবাহ হইয়া গেল। দূতমুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া এবং যথোপযুক্তভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া গিরণের পিতা বীরসেন ও মহারাজ ধর্ম্মপাল বিবাহের সময় শ্রীপুর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। প্রজাগণের আনন্দের অবধি রহিল না। ক্ষুদ্র নগরটি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ রাজা অনিল অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কন্যাকে বিদায় দিলেন।

রাজা বীরসেন পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নববধূ দেখিয়া গিরণের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই আনন্দিত হইল। শ্বশুরালয়ে সকলেই তাঁহার গুণের বশীভূত হইয়া পড়িল। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন,—গিরণ নিজে। অনিন্দ্যা তাঁহার নয়নের মণিস্বরূপা হইলেন; পত্নী একদণ্ড চক্ষুর আড়াল হইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। অবশেষে তিনি এতদূর স্ত্রৈণ হইয়া পড়িলেন যে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপালনে তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ রহিল না। বীরোচিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহাকে এইরূপ পরাঙ্মুখ দেখিয়া এখন অনেকেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। গিরণ এই সকল নিন্দা গ্রাহ্যই করিতেন না। কিন্তু ইহা যখন তাঁহার পত্নীর কর্ণে গেল, তখন অনিন্দ্যা ইহাতে বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব করিলেন। ক্ষত্রিয় বীর গিরণ যে তাঁহার জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া সকলের নিন্দা-ভাজন হইতেছেন, পতিহিতাকাঙ্ক্ষিণী অনিন্দ্যা তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? কিন্তু পতিকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন, তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। গিরণ ত তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্! তিনি কি নিজের অবস্থা বুঝেন না? তাহাই বা তিনি বুঝিতেছেন কই? তিনি দিন দিন সমস্ত

ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রৈণ নাম কিনিতেছেন। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী ইহা দেখিয়া কিরূপে সুখী হইতে পারেন? এইরূপ নানা ভাব অনিন্দ্যার ক্ষুদ্র হৃদয়টি আলোড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতেন না। মনের মধ্যে নিরন্তর এক গুরুভার বহন করাতে তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নষ্ট হইতে লাগিল।

ইহার ফলে গিরণ অত্যন্ত অসুখী হইলেন। যাহাকে পাইয়া তিনি আর সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহার মুখশ্রী তাঁহার জীবনের একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রিয়তমা পত্নী অনিন্দ্যার মুখে যখন তিনি বিষাদের ছায়া দেখিলেন, তখন অতি দারুণ যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তখন তিনি পত্নীর মনোরঞ্জনে আরও চেষ্টিত হইলেন। কর্ম্ম-জগতের সঙ্গে তাঁহার তখন পর্য্যন্ত যে একটা ক্ষীণ বন্ধন ছিল, এখন তাহাও সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল। অনিন্দ্যা ইহাতে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বিষাদ আরও বর্দ্ধিত হইল। গিরণ পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে নানারূপ অমূলক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তবে কি অনিন্দ্যা আমাকে ভালবাসে না? আমাকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইতে পারিতেছে না? তবে কি? তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। দুর্ব্বিষহ সন্দেহ-বিষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

তবে কি সন্দেহ সত্য?

এইরূপে কিছুদিন যায়! উভয়ের অজ্ঞাতসারে ক্রমেই স্বামিস্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সুখের নন্দন ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইতেছিল।

মন যখন সন্দেহজালে আচ্ছন্ন থাকে, তখন বিচার-শক্তি চলিয়া যায়। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটী, সামান্য কথা, অর্থহীন আকার ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত তখন

সন্দেহের অনুকূল বলিয়া মনে হয়। সহসা এক দিন এই ধূমায়িত অশান্তি প্রজ্জলিত হইয়া মহান্ অনর্থ সংঘটিত করে।

চৈত্রের নিশি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখনও জগৎ সুপ্তিমগ্ন। দুই একটি পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুক্ত বাতায়ন দিয়া তখন বাসন্তী ঊষার স্নিগ্ধ বায়ু গিরণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। রাজকুমার তখনও নিদ্রিত। কিন্তু অনিন্দ্যার ঘুম পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয়ে চিন্তা-কীট প্রবেশ করিয়াছে। স্বামী যে তাঁহার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সকলের নিন্দাভাজন হইতে বসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার ও কষ্টের কারণ; তিনি যে স্ত্রীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সরলা অনিন্দ্যার ধারণায় তাহা কখনও আইসে নাই। কিরূপে তাঁহাকে পুনরায় কর্ত্তব্যের পথে আনিতে পারা যায়, প্রভাতকল্প রজনীতে নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাধ্বী স্ত্রী তাহাই ভাবিতেছিলেন।

ঊষার ক্ষীণ আলোক যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, দুঃখভারাক্রান্তা অনিন্দ্যা তখন স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তম, আমার জন্য সকলে তোমার নিন্দা করে। আমার বুকে যে তাহা শেলসম বিঁধিতেছে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আর আমি এতই পাপিষ্ঠা যে, আমিই পতির কলঙ্কের কারণ হইতেছি! হায়! আমার সতীত্বের গৌরব এখন কোথায়?"

তখন তাঁহার মনের মধ্যে এমন এক প্রবল আবেগের বন্যা আসিয়াছিল যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার চিন্তার শেষাংশ বাক্যে ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে গিরণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। 'পাপিষ্ঠা' 'কলঙ্ক' প্রভৃতি কয়েকটি কথা এবং শেষের সমগ্র বাক্যটি তাঁহার কর্ণে গিয়াছিল। সন্দিগ্ধচিত্ত গিরণ যখন তন্দ্রাঘোরে এই কয়টি কথা শুনিলেন, তখন পত্নী যে অপরের প্রতি আসক্তা এবং পাপের অবশ্যম্ভাবী ফলে অনুতাপ আসিয়া মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য পাপীয়সীর হৃদয় অধিকার করে বলিয়াই যে তাঁহার মুখ হইতে অনবধানে এই সকল কথা বাহির হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল। তিনি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এক ভীষণ সঙ্কল্প তাঁহার মনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গিরণ কোন কথা না কহিয়া পত্নীর প্রতি এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ

করিলেন। তিনি পরক্ষণেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু কি মনে করিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "অশ্বারোহণে আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অনিন্দ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু স্বামীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

গিরণ যখন প্রত্যুষে স্ত্রীকে লইয়া অশ্বারোহণে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তাহাতে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। এমন তখন প্রায়ই হইত। দুই জন পাশা-পাশি দুইটি অশ্বে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন। কাহারও মুখে একটিও কথা নাই। ক্রমে নগর ছাড়াইয়া তাঁহারা একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরণ তখন পত্নীকে অগ্রগামিনী হইতে আদেশ করিলেন এবং অতঃপর তাঁহাকে আর কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

কিছু দূর এইরূপে অগ্রসর হইলে অনিন্দ্যা দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে, কয়েকটি বৃক্ষের অন্তরালে, তিন জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহাদের ভীষণ আকার ও সন্দেহজনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনিন্দ্যা শঙ্কিতা হইলেন। তাহারা যে দুষ্ট লোক এবং দস্যুতাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়া গিরণকে সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। কারণ, তিন জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী দস্যু যদি অতর্কিতভাবে একজনকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংশয়। এ দিকে আবার স্বামীর কঠিন আদেশ। "না হয় তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। তাই বলিয়া কি তাঁহাকে আসন্ন বিপদের কথা জানাইব না?" এই ভাবিয়া অনিন্দ্যা দাঁড়াইলেন এবং স্বামী নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাকে সম্মুখের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন। দস্যুরা তখন ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কথা কহিতেছিল।

গিরণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তোমাকে কি আমি আমার সঙ্গে কথা কহিতে বারণ করি নাই? তোমাকে এই অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তিনটা কেন, এ রকম দশটা দস্যুও আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। আমার বাহুতে যে এখনও বল আছে, তাহার প্রমাণ এখনই পাইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইলেন। বিমূঢ়া সাধ্বীর গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া, তখন যে অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল ক্রোধান্ধ গিরণ তাহা দেখিতে পাইলেন না।

নিমেষমধ্যে সেই তিনজন দস্যু ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু ধন্য গিরণের শিক্ষা! তাঁহার ভীম বর্ষাঘাতে দুই জন অবিলম্বে ধরাশায়ী হইল। তৃতীয় দস্যু প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

শত্রু নিহত হইল। গিরণ তখন তাহাদের অশ্বগুলি ধৃত করিলেন এবং তাহাদের পৃষ্ঠে দস্যুগণের অস্ত্র-শস্ত্র স্থাপিত করিয়া দুইটিকে একসঙ্গে পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া দিলেন।

অনিন্দ্যা স্বামীর কৃতকার্য্যতায় অন্তরে যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেও সাহস করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার রূঢ় ব্যবহারে তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সে সমস্ত ভুলিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিলেন। তিনি অতি সঙ্কোচের সহিত কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে গিরণ পূর্ব্ববৎ স্নেহশূন্যস্বরে পত্নীকে বলিলেন,—"এই অশ্বদ্বয়কে চালাইয়া অগ্রে অগ্রে চল। আবার বারণ করিতেছি, আমার সহিত কথা কহিও না।"

———

শিশুর প্রতি। *

শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদ সোনার বরণ,
মন্দাকিনী-নীরে ভাসি' আয় হেলি' দুলি';
দেব-শিশুদের স্বর্ণ-তরণী শোভন,
ছায়াপথে নেমে আয় সুধা-ঢেউ তুলি'।
শিশু অনঙ্গের রাঙাচরণ-পরশে।
কবে তুই হ'লি সোণা? সবিতার চুমে
জ্যোতিঃপুঞ্জ অঙ্গে তুই জাগিলি হরষে;
কোন্ কাল-সিন্ধু-নীরে ছিলি তুই ঘুমে?
নন্দনের আশীর্ব্বাদ, বৈকুণ্ঠ-বারতা,
আজি বহি আন' তুই রে আঁখি-তর্পণ,
অনিমিত্ত হাসিরাশি দেববোধ্য কথা,
কর্ণপুটে আঁখিপাত্রে করি রে সেবন।
পূর্ণচন্দ্র হয়ে তুই জাগিবি কখন,
তা'র লাগি' চেয়ে আছে অযুত নয়ন।
বিধাতার শিশু দূত, কোন্ গুরুভার,
লয়ে তুমি মর্ত্ত্যধামে এসেছ নামিয়া?
ধাতার নিকটতম! গাত্রগন্ধ তাঁ'র
পাই যেন তব মুখ চুমিয়া চুমিয়া।
কোন্ মহাপুরুষের শিশুমূর্ত্তি তুমি,
জানি না, আশীষ দিতে শিহরি যে ডরে,
যশোদার হৃদিমস্থ ধন যেন নামি'
আসিয়াছে ছলিবারে গোপালের ঘরে।
যদি এলে সুখে দুখে তবে ভাগ লও,
মানুষের গৃহে আজি লভি অন্ন পান,
শিরে লয়ে ধান্য দূর্ব্বা মানুষের হও
অবতীর্ণ হয়ে তা'র পূর্ণ কর প্রাণ।
তব স্বরগের জাতি করিয়া হরণ
জগতের অন্নসত্রে করিনু বরণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

---

* অন্নপ্রাশনদিনে রচিত।

সমালোচনা।

বাঙ্গলার বেগম।*

উর্ব্বর ক্ষেত্রে আজি যে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, কালে যে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণই দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার বেগমে'— তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানিতে—যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যেরূপ অনুসন্ধিৎসা দেখাইয়াছেন, সেরূপ কৃতিত্ব ও অনুসন্ধিৎসা যদি তিনি বজায় রাখিতে পারেন, তবে তিনি যে কালে বঙ্গীয় পাঠকগণের একান্ত প্রীতিভাজন হইবেন, মুষ্টিমেয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যে তিনি গৌরবান্বিত হইবেন, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

'বাঙ্গলার বেগম' ছোট বই—৬৭ পৃষ্ঠায় শেষ। কিন্তু ছোট হইলেও ইহাতে অনেক নূতন জিনিষ আছে—অনেক শিখিবার কথা আছে। বিশেষতঃ 'বাঙ্গলার বেগম' পড়িয়া আমাদের একটি কথা স্বতঃই হৃদয়পটে উদ্রিক্ত হয়। এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের ইতিহাসের এই দিকটা বড় কেহ নাড়েন চাড়েন নাই। অন্যান্য সভ্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সেই দেশীয় রাণীদিগের সম্বন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অবশ্য আমি ইংলণ্ডের এলিজাবেথ বা ভিক্টোরিয়ার কথা ধরিতেছি না। এই দুই গরীয়সী সম্রাজ্ঞীর ন্যায় খুব কম সম্রাজ্ঞীই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ "ভলুম" প্রকাশে কিছুই বিশেষত্ব নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের অন্য সকল রাণীর কথাই ধরুন। সিডনী উইলমট নামক পাশ্চাত্য লেখক ইংলণ্ডীয় কতকগুলি রাণীর সম্বন্ধে দুইখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন, ছোটখাটো বহির ত কথাই নাই। উইলমট যে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে যে কি পরিমাণ ব্যয় পড়িয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করাই আমাদের ন্যায় (বঙ্গীয় লেখক বা পাঠকগণের) ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য। সে ভাবে আমাদের দেশে বহি লিখার কল্পনাও করা যায় না সে যাহা হউক, এ দিক্‌টা কেহ বিশেষ নাড়াচাড়া করেন নাই; সুতরাং

* বাঙ্গলার বেগম—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাণী প্রেস। মূল্য ৷৷০ আনা।

যিনি যবনিকার অন্তরালে লইয়া এই গোপনীয় দৃশ্যগুলি দেখাইয়াছেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

'বাঙ্গলার বেগমে' মোট ছয়জন বেগমের আলেখ্য প্রদত্ত হইয়াছে—লুৎফুন্নিসা, আমিনা, আলিবর্দ্দী-বেগম, মণিবেগম, ঘসিটি ও জিন্নতুন্নিসা। অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার সুবিধা নাই। মুসলমানগণ স্বভাবতঃ ঐতিহাসিক হইলেও তাঁহারা পর্দ্দার অন্তরালস্থিতা তাঁহাদের বেগমদিগের সম্বন্ধে যৎসামান্য উপাদানই আমাদের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। যে সামান্য উপাদান পাওয়া যায়, তাহাও এক স্থানে পাওয়া যায় না। ছত্রভঙ্গভাবে কিছু মালমসলা পাওয়া যায়—কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা বড় কষ্টকর, প্রায় অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ইংরাজ লেখকের গ্রন্থে বেগমদিগের সম্বন্ধে সামান্য সামান্য উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু শেষোক্ত উপাদানে আস্থাস্থাপন করা সমীচীন নহে। যে মোগল-অন্তঃপুরে মক্ষিকার প্রবেশও সুদূরপরাহত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাকার ব্যাপার ইংরাজরা কি করিয়া জানিবেন? শ্রুতিপরম্পরায় তিল তালে পরিণত হইয়া "হারামের" বহির্দ্দেশে যাহা পৌঁছাইয়াছিল, তাহাই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন—অনেক সময়ে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং বেগমসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তসংগ্রহকে আমরা প্রায় অসাধ্য বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে যিনি এই সকল "রাই কুড়াইয়া বেল" করিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসার্হ।

লুৎফুন্নিসা হতভাগ্য সিরাজের পত্নী। পলাসীক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া যখন মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া আশা-ভরসাহীন সিরাজ একাকী পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন, যখন তাঁহার সুদিনের সকল বন্ধু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'বাঙ্গলার বেগমে' যতগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে লুৎফুন্নিসার চিত্রই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। "মন্থরগতি কলনাদিনী ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী কুসুমিত-তরুলতা-সমাকীর্ণ ছায়াস্নিগ্ধ শোকমৌন খোসবাগে স্বামীর সমাধিবক্ষে লুণ্ঠিত হইয়া" অশ্রু-বিসর্জ্জনের চিত্র প্রকৃতই মনোহর। গ্রন্থকার লুৎফুন্নিসার চিত্রাঙ্কণে অভিনব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আমিনা ও ঘসিটি সহোদরা—উভয়েই নবাব আলিবর্দ্দীর কন্যা।

উভয়েই একই ভাবে একই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়েন। সিরাজের শোচনীয় মৃত্যুর পর নীচমনা মীরণ তাঁহার একজন বন্ধুর উপর আমিনা ও ঘসিটীকে নৃশংসরূপে হত্যা করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার ছলে তাঁহাদিগকে একখানা নৌকায় চড়াইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে নৌকাখানি ডুবাইয়া দিতে আদেশ প্রেরণ করেন। আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইল। কিন্তু সেই আদেশ প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বে উভয় ভগিনীই বলিয়াছিলেন,—"O God, we have done no harm to Miran, who,having brought ruin on our family, and deprived our brothers of their rights, is now about to put us to death. We pray, that he may soon be struck dead by lightning for his cruel deeds." সকল দেশের সকল ইতিহাসেই নৃশংস হত্যার বৃত্তান্ত আছে; কিন্তু এরূপ নিঃসহায়া দুইটি স্ত্রীলোক—মীরণের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার যাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাঁহাদের হত্যার ন্যায় দৃষ্টান্ত জগতের কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক নূতন ধরণের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়—ইহা তাহাদেরই একটি। ব্রজেন্দ্র বাবু এই চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে আমিনার জীবনের শেষ কয়েক দিন, বিশেষতঃ শেষ কয়েক মুহূর্ত্তের যে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

উল্লিখিত তিনটি চিত্র ব্যতীত মণিবেগমের চিত্রটিও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে, মণিবেগম মীরজাফরের অন্যতমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন এবং মীরজাফরের উপর তিনি যথেষ্ট আধিপত্য করিতেন। সামান্য নর্ত্তকী হইতে যিনি মুরশিদাবাদের নবাবের প্রিয়তমা বেগম হইতে পারেন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বীয় স্বাধীন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে কেমন করিয়া একজন অবলা রমণী আপনার চতুঃপার্শ্বে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন, মীরজাফর-বনিতা মণিবেগম তাহার প্রকৃষ্ট ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মণিবেগম প্রভুত্ব ও বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া, দানাদি পুণ্যকার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া, আত্মীয় স্বজন এবং অধীন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গলায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের মণিবেগম-চিত্রাঙ্কনও সফল হইয়াছে।

উপরের চারিটি বেগম ব্যতীত গ্রন্থে আলিবর্দ্দীবেগম ও নবাব মুর্শিদকুলীর একমাত্র কন্যা জিন্নতুন্নিসার ক্ষুদ্র চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয়বর্ণনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাষা যথেষ্ট লালিত্যপূর্ণ অথচ গ্রাম্যতা-দুষ্ট নহে। গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদও খুব কম। গ্রন্থে ঘসেটি বেগমের ত্রিবর্ণে চিত্রিত ছবি ব্যতীত আরও ছয় খানি হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে। অথচ গ্রন্থের মূল্য ॥০ আনা।

গ্রন্থে সামান্য কয়েকটি ত্রুটি রহিয়াছে। বেগমগুলির বিবরণ সময়ানুযায়ী (Chronologically) স্থাপিত করা হয় নাই। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে যাহাতে এ ত্রুটি সংশোধিত হয়, তজ্জন্যই আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। ঘসিটী না ঘোসেটি? পরিশিষ্টে যে কয়েকখানি পত্রাদি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই কেন?

কিন্তু এ সকল সামান্য ত্রুটি। গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমে যিনি এই প্রকার উপাদেয় পুস্তক লিখিতে পারেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান যে উচ্চে নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমরা সাগ্রহে ব্রজেন্দ্রবাবুর 'ভারতীয় বেগমে'র প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

অবিচার।

ছিদ্রযুত, কুটিল-অন্তর,
কর্ণ হ'ল স্বর্ণের ভাজন!
ধিক্ দৈব! নির্ম্মল নয়ন—
তাহে শুধু কজ্জল লেপন!

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

সবজী।

—ঃ০ঃ—

রাঙ্গা-আলু।

এই সবজী আমাদের দৈনিক আহারে খুবই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তথাপি ইহার চাষে কেহ অধিক মনযোগ দেন না। ইহার গাছ লতানে, একবার লাগিয়া গিয়া লতাইতে থাকিলে পরে আর অধিক পাইটের আবশ্যক হয় না; এবং অন্যান্য মূল ফসল (Root crop) অপেক্ষা ইহা অধিক গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। সুতরাং অল্প আয়াসেই ইহার উত্তম আবাদ হইতে পারে। কাটা ডাল হইতে ইহার গাছ হয়।

সাধারণতঃ দুই রকমের রাঙ্গা-আলু দৃষ্ট হয়—লাল ও সাদা; সাদা আলু দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের দেশীয় নাম "রাঙ্গা-আলু" নামকরণ অযথা।

মৃত্তিকা—প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই এই সবজী জন্মাইতে পারা যায়—তবে বালুকামিশ্রিত জমীতে অধিক ফসল হয় এবং আলুর মিটতাও বেশী হইয়া থাকে।

জমী প্রস্তুত, গাছ রোপণ ও অন্যান্য কার্য্যঃ—শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ক্ষেত্রে ৪।৫ বার লাঙ্গল ও "মই" দিয়া দুই ফিট্ অন্তর জমীতে জুলি প্রস্তুত করিতে হয়; এই সবজীর জন্য একটু গভীর চাষ (Deep cultivation) দরকার। ভাদ্র মাসে জুলির ভিতরে লতার গাঁইট্ সমেত ৩।৪ ইঞ্চ দীর্ঘ কলম (Cutting) পুঁতিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক গাছের আগার ও গোড়ার দিক্ বাদ দিয়া মাঝের অংশ হইতে কলম সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে অন্ততঃ দুইটি গাঁইট থাকা প্রয়োজন। কলম লাগাইবার সময় গাঁইট হইতে সমস্ত শিকড় ছিঁড়িয়া দিতে হয়। বৃষ্টিপাতের পর কলম পুঁতিলে গাছ শীঘ্র শীঘ্র লাগিয়া যায় এবং শিকড়ও শীঘ্র বাহির হয়; গাছ ভালরূপে লাগিলেও শিকড় বাহির হইলে গাছের গোড়ায় একবার মাটী দেওয়া আবশ্যক। সমস্ত জমীতে গাছ ভালরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জমী হইতে ঘাস ও অন্যান্য আগাছা উঠান কর্ত্তব্য—গাছগুলি

বেশ বড় হইয়া সমস্ত জমীকে ঢাকিয়া ফেলিলে ঘাস উঠাইবার আর দরকার হয় না। গাছ বেশী "ঝাপড়া" হইলে গাছের ক্ষতি না হয়, এইরূপ ভাবে ডাল ও পাতা ছাঁটিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে; কোন কোন দেশে ইহার শাক্ খাইবার প্রথাও আছে। রাঙ্গা-আলুর চাষে অধিক জলসেচনের প্রয়োজন হয় না; বেশী সার প্রয়োগেরও কোন প্রয়োজন নাই। হাড়ের গুঁড়া সারের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে ফসল ভাল পাওয়া যায়; গোবর-সারেও মন্দ ফল হয় না—বিঘা প্রতি ৬।৭ গাড়ী গোবর দিলেই যথেষ্ট হয়। ছাই সারেও খুব ভাল ফসল হইয়া থাকে এবং এই ছাই প্রয়োগে ব্যয়ও খুব কম পড়ে। যে সকল শিকড় গাছের ডালের গাঁইট (node) হইতে বাহির হইয়া মাটীতে প্রবেশ করে, তাহা হইতে ছোট এবং অল্প মূল্যের আলু পাওয়া যায় এবং ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রধান মূল (Main root) হইতে বড় এবং অধিক দামের ফসল পাওয়া যায় না; সুতরাং গাঁইট হইতে এইরূপ শিকড় যাহাতে বাহির না হয় তাহার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। সাধারণতঃ মাঘ ফাল্গুন মাসে এই ফসল সংগ্রহ করা হয়।

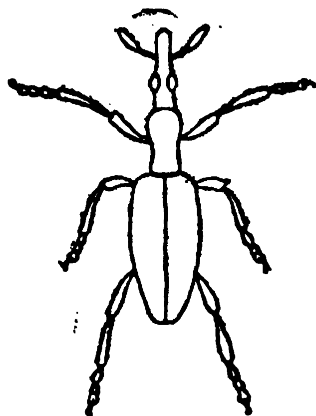
আয় ও ব্যয়ঃ—বিঘা প্রতি ২০।২৫৲ টাকা খরচ করিয়া ৩৫।৪০ মণ রাঙ্গা-আলু খুবই পাওয়া যাইবার আশা করা যায়। গড়ে ইহার ১॥০ টাকা মণ ধরিলে ৫২॥০।৬০৲ টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং খরচ বাদে বিঘা-প্রতি লাভ মন্দ থাকে না।

রাঙ্গা-আলুর পোকাঃ—নিম্নে যে পোকার চিত্র দেওয়া হইল ইহা রাঙ্গা-আলুর অত্যন্ত ক্ষতি করে। ইহার ইংরাজী নাম Sweet Potato Weevil। আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

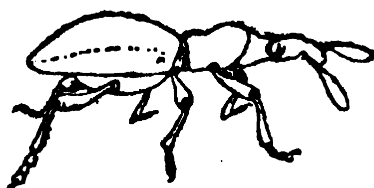
এই পোকা মাটীর উপরে, উন্মুক্ত আলুর উপর কিম্বা ডাঁটার উপর ডিম পাড়ে। ৩।৪ দিন পরে ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা পদশূন্য কীড়া বাহির হয় ও ডাঁটা এবং আলুর ভিতর ফুকর করিয়া প্রবেশ করে। কখন কখন এই কীড়াগুলি ডাঁটার ভিতর দিয়া খাইতে খাইতে মাটীর নীচে আলুর মধ্যে প্রবেশ করে। ১৮।২০ দিন খাইয়া কীড়া বড় হইলে আলুর ভিতরে পুত্তলি হয় এবং ৫।৬ দিন এই অবস্থায় থাকিয়া পতঙ্গ হইয়া বাহির হয় ও পুনরায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। আক্রান্ত আলুগুলির ভিতর কাল হইয়া যায় এবং কোন কোন স্থলে আলু একেবারেই পচিয়া যায়। যে গাছগুলিতে

রাঙ্গা-আলুর পোকা।

(Sweet Potato Weevil)



(চারিগুণ বৰ্দ্ধিতাকারে)



(চারিগুণ বৰ্দ্ধিতাকারে)

বেশী পোকা লাগে, সে গাছগুলির ডাঁটা স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠে, পাতা ছোট হইয়া যায় ও অত্যন্ত গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ক্ষেতে একেবারেই পোকা লাগিলে উহা নিবারণ করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। আলু মাটীর উপরে উন্মুক্ত থাকিলে এই পোকার ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়—অতএব যাহাতে আলু উন্মুক্ত না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আক্রান্ত আলু পুড়াইয়া বা অন্য কোন প্রকারে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা বিশেষ আবশ্যক। যে ক্ষেত্রে এই পোকা একবার লাগিয়াছে, সেখানে ২।৩ বৎসর ইহার চাষ না করিলেই ভাল হয়। এইরূপ পোকাধরা আলু ভাল আলুর সহিত রাখিলে তাহাতেও পোকা লাগিয়া থাকে। যে আলুগুলিতে অল্প পোকা লাগিয়াছে, তাহা সিদ্ধ করিয়া গরু বাছুর প্রভৃতিকে খাওয়ান যাইতে পারে।*

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

* রাঙ্গা-আলুর পোকার চিত্রগুলি Imperial Entomologist মহাশয়ের অনুগ্রহে পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লীর লাড্ডু।

(১)

অধিকাংশ জিনিসেরই তিনটি শ্রেণী দেখা যায়। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুলমর্য্যাদায় কুলীন। আমরাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যে কুলীনের ঘরে চঞ্চলা অচলা, বীণাপাণির কৃপাও যাহার প্রতি আছে, তিনি প্রথম শ্রেণীর কুলীন। যাঁহার সংসারে লক্ষ্মী বা সরস্বতী একজনের পূর্ণদৃষ্টি বিদ্যমান, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলীন। আর সাতপুরুষ ধরিয়া যাঁহার ঘরে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান নাই, কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়ের তাড়নায় সরস্বতী একেবারে যাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই, অথচ 'যাই যাই' ডাক ধরিয়াছেন, অথবা যাঁহাদের বংশের সংস্কার 'কালীর আঁচড় দিলে ধার হয়', তাঁহারাই তৃতীয় শ্রেণীর কুলীন বলিয়া গণ্য। আরও একটা শ্রেণী আছে——মধ্যম শ্রেণী। আমাদিগকে মধ্যম শ্রেণীর কুলীন ধরিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না।

শ্রোত্রীয় বংশীয় একজনের যেমন অবস্থা মন্দ হইলে বিবাহের জন্য তাঁহাকে গালে হাত দিয়া বসিতে হয়, কুললক্ষ্মীলাভের জন্য একজন তৃতীয় শ্রেণীর কুলীনকেও ততটা ভাবনায় পড়িতে হয় না। তবে শ্রেণীভেদে দরের তারতম্য সকল বিষয়েই আছে। একজন প্রথম শ্রেণীর কুলীন বিবাহে তিন হাজার বা ততোঽধিক টাকার ফর্দ্দ দিয়া বসিবেন, কিন্তু আমার মত একজন মধ্যম শ্রেণীর কুলীনের পক্ষে বিবাহে সর্ব্বসাকল্যে পাঁচশত রজতমুদ্রালাভই যথেষ্ট।

আমার বয়স যখন বিশ বৎসর, তখনও আমি গ্রামের মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। তিন বৎসর ধরিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিতে পারিলাম না। এ দিকে সাংসারিক অভাব অনাটন যথেষ্ট। সুতরাং বিদ্যালয়ে যাতায়াত একরূপ বন্ধ করিয়া যদু ঘোষের তাসের আড্ডায় নিয়মিতরূপে হাজিরা দিতেছি, এমন সময়ে কন্যাদায়গ্রস্থ এক ব্রাহ্মণ এক দিন সকালে বাবার পা জড়াইয়া ধরিলেন। যৎসামান্য কিছু লইয়া তাঁহার কন্যাকে আমি বিবাহ করি ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। বাবা নিতান্ত সেকালের লোক, ভাল মন্দ বুঝেন না, মা'র মতামতের উপর নির্ভর করিলেন। মা বড়

আশা করিয়া আছেন, আমার বিবাহে তিনি তাঁহার খালি কাঠের বাক্সটির কতক অংশ রজত মুদ্রায় পূর্ণ করিবেন, আর তাঁহার সেই রূপার পৈঁছাগাছটি অনেক দিন হইতে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে, তাহারও যাহা হয় কিছু সদ্গতি করিতেই হইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া মা হাঁকিলেন, পাঁচ শত টাকার কম পণে বিপন্ন ব্রাহ্মণের কন্যাটিকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বাবারও সেই মত। ব্রাহ্মণ দুই শত ছিয়াত্তর টাকা পর্য্যন্ত উঠিলেন। অনেক কথা কাটাকাটির পরে চারিশত ছত্রিশ টাকায় রফা হইল। সেই দিনই বিবাহের দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়া গেল।

বিবাহের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এ দিকে মহাজনের লোক একে একে শুভাগমন করিতে লাগিলেন। বাবা সকলকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দিলেন, এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাকে এই বিবাহের পণের টাকা হইতে মহাজনদিগকে দিতে হইবে তিনশত বাহান্ন টাকা সাড়ে তের আনা।

(২)

আমার বিবাহ। শুধু বিবাহ নহে তাহার সঙ্গে অর্থলাভ! সুখের উপর সুখ। তবু একটু অসুখের কারণ ছিল। আমার জ্ঞাতিভ্রাতারা যে দরে বিক্রীত হইয়াছেন, সে দর ত আমার হইল না! ধনে ও বিদ্যায় তাঁহারা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন; কিন্তু আমি দুঃখ করিতে ছাড়িব না, কেন না তাঁহাদের সহিত আমি একদরে বিকাইলাম না।

যে ব্যক্তি দুঃখের চিরপরিচিত, বাল্যে অশেষবিধ দুঃখ সহ্য করিয়া পরিণীত জীবনে 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করিয়া সংসারময় ছুটিয়াছে, যাহার মুখের ভাব সর্ব্বদা বিষাদভরা, সেও বোধ হয় এক দিন ঈষৎ হাসিয়াছিল, তাহার হৃদয়ও বোধ হয় একদিন আনন্দে নাচিয়াছিল। সেটি বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার পরে এবং বিবাহ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে কোন দিন।

অনুপযুক্ততার জন্যই হউক অথবা দুরদৃষ্টক্রমে অধিক অর্থ না পাইলেও বিবাহের যে আনন্দ সেটুকু আমার হৃদয়ে ফুটিয়াছিল। কল্পনায় সব আসে। মনগড়া একটি অনিন্দ্যসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, কেমন সেই ঘোমটাটানা মুখখানি, কেমন সেই রূপ, কেমন সেই মিষ্টকথা! অদৃষ্ট সেই ছবি, তাহার ভিতরে যে প্রাণ, তাহারই দিকে যে অন্য একটি প্রাণের ব্যাকুল আকর্ষণ,

সেই মহাশক্তির চিরন্তনতাই বিবাহের সার্থকতা নহে কি? কিন্তু এখন যাহা আছে, কালে যে আর তাহা থাকে না!

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল এবং আমি পাল্কীতে চড়িয়া বিবাহ করিতে গেলাম। সঙ্গে গেলেন আমার পিতা, নাপিত, পুরোহিত ও আমাদের গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তি। মশালধারী যে একজন গিয়াছিল তাহাকে অসঙ্কোচে বরযাত্রিশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। দুই ক্রোশমাত্র পথ চলিয়া আমরা বিবাহবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বিবাহবাড়ী বলিলে লোক কল্পনা করিয়া লয় যে, সে বাড়ীতে লোকজনের অধিক বা অল্প ভিড় এবং দুই চারিটি উজ্জ্বল আলোক থাকিবেই থাকিবে। তবে ফলাহারের ব্যবস্থাটি সকল স্থানে উল্লেখযোগ্য হয় না। কিন্তু আমরা যে বিবাহবাড়ীতে আসিলাম তথায় লোকজনের সোরগোল কিছুমাত্র ছিল না। একটিমাত্র লোক বাড়ীর বাহিরে পথের ধারে একটি কেরোসিনের ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তিনিই আমার ভাবী শ্বশুর। মুখের কথা যতদূর মিষ্ট হইতে পারে, এবং বাহ্যিক ব্যবহারে যতদূর সরলতা দেখান যাইতে পারে, তাহার সহিত তিনি আমাদিগকে বসাইয়া ব্যস্তভাবে কোথায় গেলেন, এবং অনতিবিলম্বে চারি জন লোক সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন নাপিত, একজন পুরোহিত, এবং অবশিষ্ট দুইজন ভদ্রলোক—কন্যাযাত্রী।

কন্যাযাত্রীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি আমাদের সম্মুখে আসিয়াই তাঁহার হস্তস্থিত কলিকাসংলগ্ন হুঁকা দুই হস্তে মস্তকদেশে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" তাঁহার সঙ্গীটিও তাঁহার অনুকরণ করিলেন। আমাদের পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং আমার পিতা হস্ত উত্তোলিত করিয়া নিঃশব্দে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তাহার পর কথাবার্ত্তা আরব্ধ হইল।

"কখন আসা হল আপনাদের? পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত?——"

"কিছু না! কষ্ট কিসের?......"

"আহা! ব্রাহ্মণ বড় গরীব, আপনি যে দয়া করিয়া এ ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেছেন, ইহাতে আমরা সকলেই সুখী।..."

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুই তিনটি সংস্কৃত শ্লোক না আওড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, এবং ভদ্রলোকদ্বয় যে শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ঈষৎ

হাসির সহিত মস্তকসঞ্চালনের দ্বারা তাহাই বুঝাইলেন। পিতাঠাকুর মহাশয়ের কিন্তু সে বিষয়ে মন আদৌ নাই। তাঁহার ভাবনা, দেনাপাওনার কোন কথাই হইতেছে না কেন?

অল্পক্ষণ পরেই আমার ভাবী শ্বশুর সেই ব্রাহ্মণ যুক্তকরে পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট আমাকে সভাস্থ করিবার অনুমতি চাহিলেন। পিতা-ঠাকুর মহাশয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিবাহ ত আমরা দিতেই আসিয়াছি; পণের টাকাটা এই সময় মিটাইয়া দেওয়া হউক।'

ভদ্রলোকদ্বয় সমস্বরে বলিলেন, "লগ্ন অতীত হইয়া যায়, বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক্, তাহার পর সকালে আপনাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি মিটাইয়া লইবেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'তা—বেশ, তবে—স্মরণ রাখিবেন, পাত্রপক্ষের পুরোহিত দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন, সেটা কিন্তু বিবাহের সময়েই দেয়।"

আর অধিক কথা হইল না; আমার বিবাহ হইয়া গেল।

(৩)

এইবার বাসরের কথা। আমার বাসরে তৃতীয় ব্যক্তি কেহই ছিল না। হুলুধ্বনি শুনিয়া যে দুই একটি পাড়ার মেয়ে অযাচিত ভাবে বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বিবাহ সমাধা হওয়ার অব্যবহিত পরেই চলিয়া গিয়া-ছিল। বাসরের রঙ্গতামাসা অবস্থার উপর নির্ভর করে। তেমন অবস্থা না থাকাই ভাল! চিমটি কাটিয়া, কাণ মলিয়া, যে আমোদ সে আমোদ আমার মত কোন পাত্রই অনুমোদন করে না।

যদিও আজ চারি বৎসর কাল লোক শুনিয়া আসিতেছে যে, সে সবে এই দশ বৎসরে পড়িয়াছে তথাপি আমার স্ত্রীর বয়স চৌদ্দ বৎসর। রূপসৌন্দর্য্য ক্লিওপেট্রা, নুরজাহান বা পদ্মিনীর সহিত তুলনীয়া না হইলেও আমার দৃষ্টিতে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

মুখখানি নামাইয়া সে যেন কি ভাবিয়া নম্রতার সহিত উত্তর দিল, "হরিদাসী।"

হরিদাসী! কেন, প্রভা, সুধা, সুষমা, অনুপমা আরও কত ভাল ভাল নাম থাকিতে এ নাম হইল কেন? তবে সুনীলকুমারের কন্যার নাম

বিদ্যুল্লতা, এবং ষোড়শীমোহনের ভগিনীর নাম সরোজিনী বলিয়া কি হরিচরণের কন্যার নাম লবঙ্গলতা হইবে? যাহার যেমন রুচি। একটা কথা, দেখা যায় লোক একজনকে ডাকে 'পটু,' 'গাবু' বা আর কিছু বলিয়া, কিন্তু হয় ত তাহার নাম নিশানাথ বা অনঙ্গমোহন। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও দেখা যায় পুঁটির আসল নাম শতদলবাসিনী এবং টেবির নাম বেদানা। দুইটি নামও অনেকের থাকে, ভাল জিজ্ঞাসা করা যাউক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার আর কোন নাম আছে কি?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলাম, "না।"

আমি আরও দুই চারিটি কথা বলিলাম, উত্তরও পাইলাম চাপা-চাপা। তখন রাত্রি অনেকখানি হইয়াছিল, নিদ্রার সহিত আর লড়াই করিতে পারিলাম না। কত সুখের কল্পনা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৪)

সকালে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছিল। জাগিয়া শুনিলাম, বাহিরে কি সব কথা কাটাকাটি চলিতেছে এবং দেখিলাম হরিদাসী অশ্রুসিক্ত নয়নে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। অনুমানে বুঝিলাম, দেনা-পাওনা লইয়া কিছু গোলমাল হইয়াছে। হরিদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?" সে ঢিপ করিয়া আমাকে একটা প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কোন উত্তর না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, পিতাঠাকুর মহাশয় পথে দাঁড়াইয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, আমার শ্বশুর একজন প্রথমশ্রেণীর জুয়াচোর, সে চারিশত ছত্রিশ টাকার মধ্যে মাত্র একশত তের টাকা দিয়াছে, এবং বলে যে, বহু চেষ্টায় সে আর টাকার জোগাড় করিতে পারে নাই।

সর্ব্বনাশ! তিনশত বায়ান্ন টাকা সাড়ে তের আনা যে আমাদের ঋণ, মহাজনের লোক নিশ্চয়ই এতক্ষণ আমাদের বাড়ীতে খাতা লইয়া বসিয়া আছে। শ্বশুরের অবস্থা মন্দ বলিয়া ত মহাজন তাঁহার প্রাপ্য টাকার মধ্যে এক পয়সাও ছাড়িবে না! দূর হউক ছাই, এমন বিবাহ আবার মানুষ করে! আমি পাল্কীতে চড়িয়া বসিলাম, এবং চিন্তার সীমায় না আসিতেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

বাড়ী আসিয়া পিতাঠাকুর মহাশয় উঠিতে বসিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করেন, এবং বাহিরে মহাজনের লোক ডাকিলে কৃত্রিম সুরে উত্তর দেন, "বাড়ীতে নাই।" মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, আমি নাকি অকালকুষ্মাণ্ড! মাতাঠাকুরাণী দিবারাত্রি চটিয়া থাকেন, তাঁহাকে কি ভাল, কি মন্দ কোন কথাই বলিবার সাধ্য আমার ত দূরের কথা আমার বাবারও নাই।

কয়েক দিন পরে পরস্পর শুনিলাম, আমার আবার একটি বিবাহ দিবার জন্য আমার পিতামাতা সচেষ্ট হইয়াছেন। সুখের বা দুঃখের বিষয় পিতামাতার বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও কেহই এই পাত্রকে অর্থসহ কন্যাদান করিতে চাহিল না। তাহার কারণ, আমার একবার বিবাহ হইয়াছে,—স্ত্রী বর্ত্তমান, এবং আমাদের অবস্থা শোচনীয়!

(৫)

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। একদিন মধ্যাহ্নে আপন মনে পথের ধারে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি. এমন সময়ে পিতাঠাকুর মহাশয় কোথা হইতে বাড়ী আসিলেন,—সঙ্গে একজন লোক। কথাবার্ত্তার আভাসে বুঝিলাম, সে আদালতের একজন পদাতিক; আমার শ্বশুর মহাশয়ের নামীয় অস্থাবর পরওয়ানা জারি করিতে আসিয়াছে। পিতাঠাকুর মহাশয় ভিতরে ভিতরে পাঁচশত টাকা দাবীর এক মোকর্দ্দমা করিয়া একতরফাসূত্রে ডিক্রী পাইয়াছিলেন, এ সংবাদ আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না।

আহারাদির পর আদালতের পদাতিক ও আমাদের গ্রামের ইতর শ্রেণীর একজন লোক সঙ্গে লইয়া, পিতাঠাকুর মহাশয় আমার শ্বশুরবাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে তিনি আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না।

অভাব এমন জিনিস যে, তাহা সংকীর্ণতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিবার চেষ্টা করে, কালাকাল দেখে না, এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না।

হতভাগ্য ব্রাহ্মণ! তুমি কি দেশের মধ্যে আর পাত্র খুজিয়া পাও নাই? বংশের গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া তোমাকে যে কিরূপ লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইবে, তাহা কি তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পার নাই? তুমি দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, তুমি ঋণভারগ্রস্ত কিন্তু লোক ত তোমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিবে না,—এ সংসারে সকলেই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। তুমি অর্থ চাহ মানরক্ষার জন্য, অন্যের অর্থের প্রয়োজন তাহার হাজার টাকার থলিটির কিয়দংশ খালি আছে বলিয়া! অভাব সকলেরই সমান।

কত কথাই ভাবিলাম। আমিই এ ব্যাপারের মূল। না! আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। পিতাঠাকুর মহাশয়কে ফিরাইব, ফিরাইতে না পারি, ফিরাইবার চেষ্টা করাও এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য! ইহা ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া পরিলাম।

আমার সেই শ্বশুরবাড়ী,—যথায় একদিন পাল্কীতে চড়িয়া আসিয়াছি আসিবার সময়ে কত সুখের কথা ভাবিয়াছি,—আজ যথাসাধ্য দৌড়িয়া শ্রান্ত দেহ ও ক্ষুব্ধ মন লইয়া সেই গৃহে চলিলাম। দূর হইতে দেখিলাম, দুই তিনখানি অপরিষ্কৃত কাঁথা, এবং দুই চারিটি পাতরের বাসন ও আরও দুই একটি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া পদাতিক হাঁকিতেছে, "দুই পয়সা—এক, দুই পয়সা—দুই, দুই পয়সা—এক, দুই,—তিন।" এবং সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুক্তকরে দুইখানি কাঁথা ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুপ্লাবিত! ক্রোকী মালের অবস্থা দেখিয়া পিতাঠাকুর মহাশয় যে ভাবিতেছিলেন, "জাতি গেল, কিন্তু পেট ভরিল না," তাহা তাঁহার মুখের ভাবেই স্পষ্ট বুঝিলাম।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাম ও সীতা।

(শয়ন-মন্দিরে।)

আজি প্রিয়ে! সুকোমল রাঙ্কব শয্যায়
সুবর্ণ-পালঙ্কে করি কেমনে শয়ন?
সুকোমল উপাধানে শিরে ব্যথা পায়,
পরিচিত নহে যেন কেমন কেমন!
প্রমোদ-কানন হ'তে সদ্য ভাঙ্গি আনো
তমাল অশোক শাখা শয্যায় বিছাও
আস্তরণ চন্দ্রাতপ ঝালর-লাগান
চামর ব্যজন পত্র দূরে ফেলে দাও!
উপাধান-স্থলে আনো অসি আর তূণ
মৃগাজিন আসি'নিক আস্তরণ-স্থান
এ কঠোর বাহু তব হ'ক উপাধান।
সুবেষ্টিত কারাগৃহ লাগে এ দারুণ।
চাহি না রাজার শয্যা, সব গিয়ে ভুলি—
চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রিয় দ্রব্যগুলি।

শ্রীকালীদাস রায়।

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয়-বিপ্লবে প্রাধান্য-প্রয়াসী ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীনগরের জমীদারবংশের স্থাপয়িতা লালা কীর্ত্তিনারায়ণ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীনগরের লালাবাবুদিগের উর্দ্ধতন অষ্টমপুরুষ ৺কৃষ্ণজীবন বসু তদীয় আবাসস্থান ইদিলপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক সপুরোহিত বিক্রমপুরস্থ বেজগ্রামে আসিয়া বাস করেন। যে স্থানে ৺কৃষ্ণজীবন বসুর ভদ্রাসন ছিল তাহা অদ্যাপি "বসুর বাড়ী" বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণজীবন চন্দ্রদ্বীপ কুলীন-সমাজের অন্তর্গত বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ ছিলেন। কুলভ্রষ্টগ্রামে বসবাসহেতু এবং তৎকালীন সমাজ-নিয়ামক ঘটকদিগের সহিত মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায় কৃষ্ণজীবন বসুকে কুলীন হইতে কুলজে নামিতে হইয়াছিল। বেজগ্রাম কুলভ্রষ্ট কেন হইল তদ্বিষয়ের আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য রাজা আদিশূরের অনন্তরবংশ বিশ্বম্ভর শূরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই আদিশূর মৈথিল ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-স্থাপয়িতা মহারাজ আদিশূর হইতে পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বম্ভরের তিন কি চারি পুরুষ অন্তর রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। বঙ্গদেশে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত আদান-প্রদান-সম্প্রদান সুকঠিন বিবেচনায়, লক্ষ্মণ কায়স্থ সমাজের সহিত সম্মিলন লাভের প্রয়াস পায়েন। এই সময়ে তিনি গাভার ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক নিজালয়ে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকগণ তাঁহার সহিত সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া নবপরিণীতা বনিতাসহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভুলুয়াতে প্রস্থান করিলেন। এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লক্ষ্মণমাণিক্য তৎপ্রতীকার-মানসে বদ্ধপরিকর হয়েন এবং তাৎকালীন বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থ-সমাজের দলপতিগণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে চারিজন দলপতি ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প-নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রম-পুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায় স্ব স্ব সমাজের অধিপতি

বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারি জনের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের গৃহে কোন এক বিবাহ-ব্যাপারে, এই সকল দলপতি নিমন্ত্রিত হইয়া স্ব স্ব দলবলসহ ভুলুয়াতে আগমন করিলেন। কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করিলেন না। এই নিমিত্ত রাজগণের আদেশে ঘটকগণ উক্ত সামাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি রচিত করিলেন—

"বেজ গ্রামে স্থিতাঃ সর্ব্বে যে চতুর্ম্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনী চাকুলীমেব নাস্তি তেষাং কুলংবুধাঃ॥"

এইরূপে বিক্রমপুর বেজগাঁ, চতুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী, চাকুলী গ্রামবাসীরা কুলভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। আবার অপরদিকে ভূষণা-সমাজের অন্তর্গত উজানীর রাজবংশও এইরূপ জাত্যন্তর হইতে কায়স্থ-সমাজে প্রবেশ লাভ করেন।

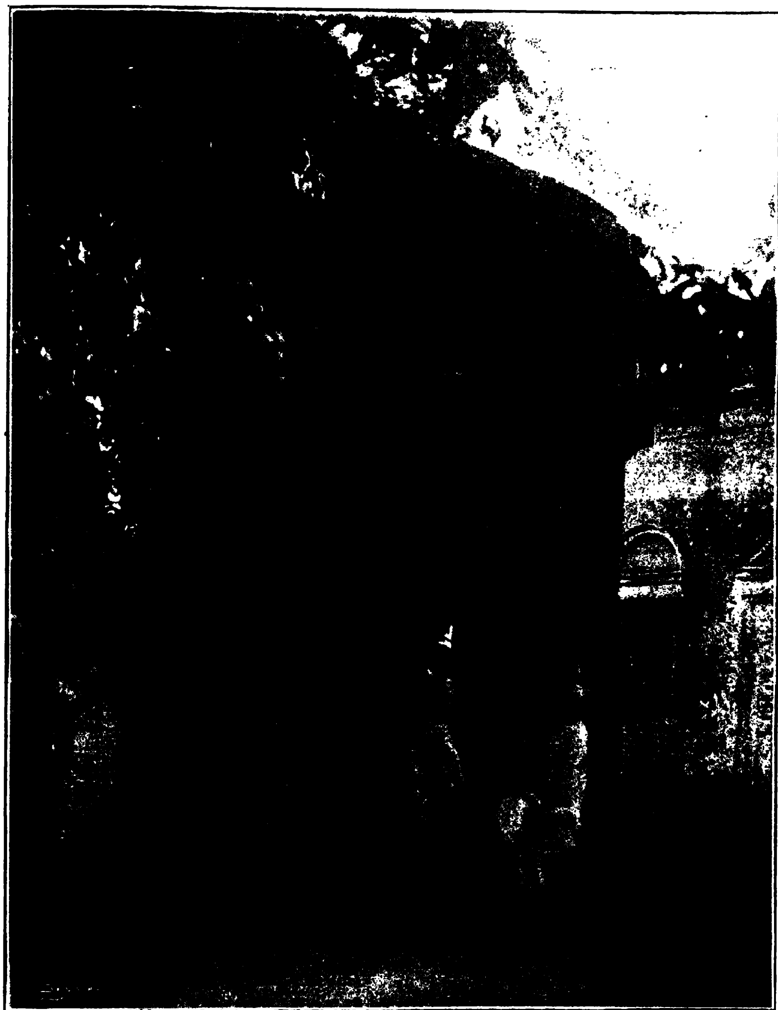
৺কৃষ্ণজীবন যদিও এই সময়ের বহু পরেই বেজগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন তথাপি তাহাকে কুলভ্রষ্ট গ্রামে আগমন ও বসবাসহেতু কুলীন হইতে কুলজে নামিতে হইয়াছিল।

৺কৃষ্ণজীবন বসুর পুত্র ৺কংশনারায়ণ বসু রায়েসবর (বর্ত্তমান শ্রীনগর) নিবাসী ৺রামচন্দ্র গুহের কন্যা বিবাহ করিয়া রায়েসবরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। কালক্রমে এই স্ত্রীর গর্ভে কংসনারায়ণের তিন পুত্র ও তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। লালা কীর্ত্তিনারায়ণ কংশনারায়ণের প্রথম পুত্র। কীর্ত্তিনারায়ণ কায়স্থ হইয়াও আলস্যে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যবিমুখ পুত্রকে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য কংশনারায়ণ চেষ্টার ক্রটী করেন নাই; কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। এক দিন একান্ত বিরক্ত হইয়া কংশনারায়ণ তদীয় স্ত্রীকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে ভাতের পরিবর্ত্তে ছাই বাড়িয়া দাও।" স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; সুতরাং মা হইয়াও পতির আজ্ঞা পালন জন্য পুত্রের ভাতের পার্শ্বে যৎকিঞ্চিৎ ছাই রাখিয়া দিলেন। যথা সময়ে কীর্ত্তিনারায়ণ ভোজন করিতে আসিয়া উহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি সেই দিনই বাটী পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা নগরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মহারাজা রাজবল্লভ ঢাকার একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ রাজবল্লভের শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। পরে রাজবল্লভের অনুগ্রহে সামান্য মোহরের-পদ হইতে নিজ বুদ্ধিমত্তায় ও কার্য্য-

কুশলতায় অচিরকালমধ্যে উচ্চপদে উন্নীত হইলেন। অবশেষে তিনি নবাব আলিবর্দ্দির মন্ত্রণাসভার একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে হইতে "লালা" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর তাঁহার বংশধরমধ্যে এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন তাহা "জমা কামেল তুমারী" নামে পরিচিত। এই বন্দোবস্তে সমুদায় বঙ্গদেশ ত্রয়োদশটি চাকলায় এবং ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হয়। এই ১৩টি চাকলাকে ২৫ জন বড় বড় জমীদারের অধীনে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে "জালালপুরদিগর" অন্যতম। এই জালালপুরদিগর চাকলা, ঢাকা, ভূষণা ও ঘোড়াঘাটের কতকাংশ লইয়া গঠিত।

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ বাঙ্গালা ১১৭৫ সনে ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জালালপুরের তৎকালীন জমীদার মতিউল্লা ও পানাউল্লার নিকট হইতে ৬৪৮।৴১॥ টাকায় জালালপুর পরগণার "বদরাসন" ও "বরহানগঞ্জ" নামক চাকলাদ্বয়ের মিরাশ-পাট্টা গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি ৺অনন্ত দেবকে তদীয় কূলদেবতা রূপে শ্রীনগর গ্রামে স্থাপিত করেন; এবং এই কুলদেবতার নামে বহু সম্পত্তি ক্রয় করেন। একদা মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারের হিসাবসম্বন্ধে মহারাজ রাজবল্লভ অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলে কীর্ত্তিনারায়ণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও ক্ষিপ্রতায় অচিরে সমুদায় গোলযোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহাতে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। কিন্তু মহারাজার পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনের বসত বাড়ী এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাঁহারা ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত করেন। এ দিকে কীর্ত্তিনারায়ণ ইহা লইয়া রাজপরিবারের সহিত বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। সুতরাং বাঙ্গালা ১১৮০ সালের ১লা পৌষ তারিখে ৩৫০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে এবং কীর্ত্তিনারায়ণ স্বাধীন জমিদার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবার সর্ত্তে তিনি উহার দাবী পরিত্যাগ করেন। ফলে ঐ সম্পত্তির প্রায় ৵০ আনা কীর্ত্তিনারায়ণের হস্তচ্যুত হয়। মহারাজার বংশধরগণ অদ্যাপি বৈকুণ্ঠপুর পরগণার ৵০ আনা অংশ পৃথক জমীদারীর মালিক বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে বৈকুণ্ঠপুর পরগণার ৵০ আনা অংশ হস্তান্তরিত হইয়া ভিন্ন জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং বক্রী ৸৵ আনাই বৈকুণ্ঠপুর পরগণার



শ্রীনগরের বুরুজ।

Mohila Press, Calcutta

উড়িষ্যা।

—*•*—

উড়িষ্যা হিন্দুর দেবক্ষেত্র। এই দেবক্ষেত্রে শৈব ও বৈষ্ণব উভয়বিধ ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে—উভয় মতাবলম্বীদিগের মন্দিরচূড়া গগন ভেদ করিয়া দেবতার বৈজয়ন্তীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথ উড়িষ্যার উদার বক্ষে উভয়েরই স্থান হইয়াছে। দেখিয়া ভারতচন্দ্রের কথা মনে মড়ে—

"হরি হর দুই মোরা অভেদ-শরীর।
অভেদে যেজন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

আবার এই উড়িষ্যায় যে সূর্য্যমন্দির ছিল, সমস্ত ভারতে তাহার তুলনা নাই। ভারতের সকল স্থান হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু দেবদর্শনের জন্য উড়িষ্যায় গমন করিয়া থাকে।

কিন্তু উড়িষ্যা কেবল হিন্দুর নিকট দেবক্ষেত্র। বিশ্ববাসীর নিকট উড়িষ্যা শিল্পক্ষেত্র। এই শিল্পক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসের অক্ষয় উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিনা,যে জাতি অল্পকালস্থায়ী বৃক্ষপত্রে বা বৃক্ষত্বকে আপনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে, ঐতিহাসিক হিসাবে সে জাতি দুর্ভাগ্য; আর যে জাতি পর্ব্বতে প্রস্তরে সে বিবরণ বিবৃত করে সে জাতি ভাগ্যবান্। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবাসীরা ভাগ্যবান। উড়িষ্যার গিরিগুহায় ও মন্দিরে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হইবে।

গ্রাণউইডেল তাঁহার ভারতে বৌদ্ধশিল্পবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষের বিস্তারের তুলনায় শিল্পকীর্ত্তির সংখ্যা অল্প। অনেক স্থানে মন্দিরাদি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঔদাস্য বা বর্ব্বরতাহেতু বিনষ্ট হইয়াছে। যে সব স্থান জনহীন হওয়াতে মন্দিরাদি বিস্মৃত হওয়ায় বিলুপ্ত হয় নাই, আর যে সব স্থানে প্রাচীন ধর্ম্মমতের প্রাধান্যলোপ হয় নাই—কেবল সেই সব স্থানেই আজিও মন্দিরাদি সুরক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

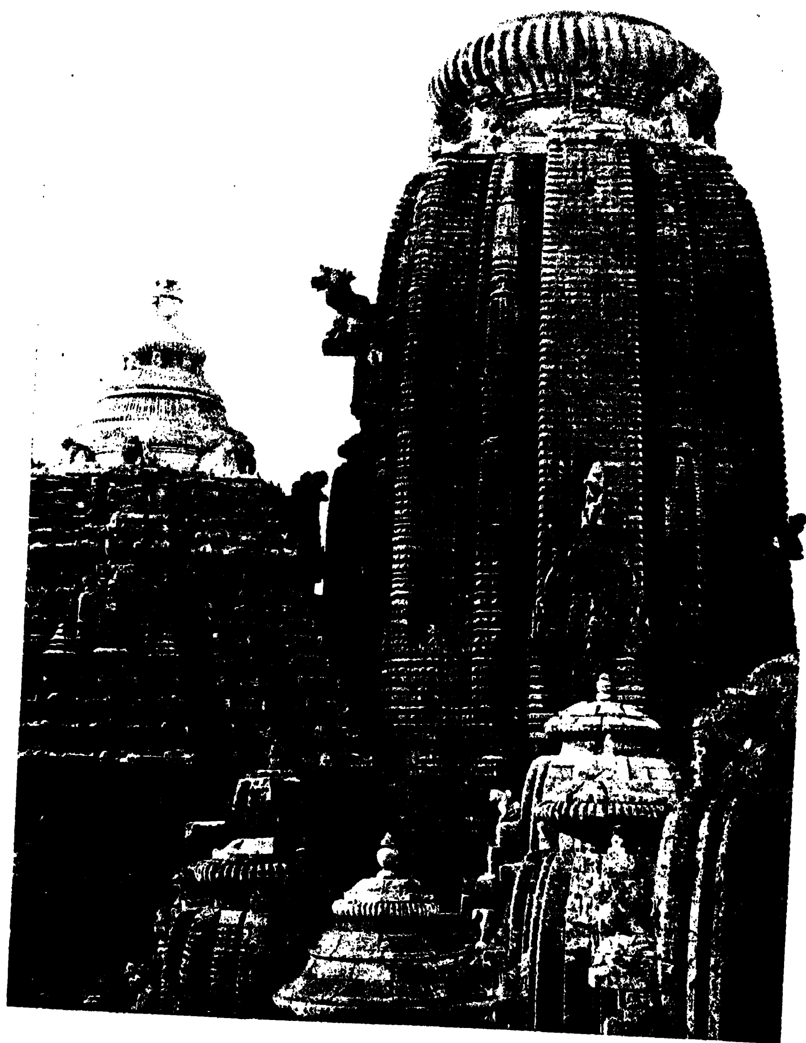
গ্রাণউইডেলের কথার যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতে মঠ ভাঙ্গিয়া মন্দির এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজেদগঠনের দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

শশাঙ্কপ্রমুখ বৌদ্ধবিদ্বেষী হিন্দু নৃপতিবৃন্দ বৌদ্ধবিহার বিনষ্ট করিয়া হিন্দু-মন্দির গঠিত করিয়াছিলেন; আর আওরঙ্গজেবপ্রমুখ মুসলমান বাদশাহ হিন্দু-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লইয়া মসজেদ গঠনে-প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার শিল্পকীর্ত্তির চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। তাই উড়িষ্যার শিল্পক্ষেত্র বিশেষভাবে পরীক্ষার ও অধ্যয়নের উপযুক্ত।

মুসলমানগণ যে উড়িষ্যার মন্দিরের কথা জানিতেন না, তাহা নহে। পরন্তু আবুল ফজল তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে জগন্নাথের ও কোনার্কের মন্দিরসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, তাঁহারা এই সকল মন্দিরের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। মুসলমানের মন্দিরবিধ্বংসী বাহু যে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। কিন্তু তথাপি উড়িষ্যার মন্দিরচূড়া ভূমিলুণ্ঠিত হয় নাই—উড়িষ্যার দেব-দেউলের উপাদানে মসজেদ নির্ম্মিত হয় নাই। বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পর্ব্বতসম্ভবা স্রোতস্বতীর বেগ যেমন মন্দীভূত হয়—বাঙ্গালার প্রাচুর্য্যপ্রহৃষ্ট প্রান্তরে আসিয়া বিজয়লালসাদৃপ্ত মুসলমানের জিগীষা ও জিগমিষাও তেমনই মন্দীভূত হইত। তাই নদীবহুল, কাননসঙ্কুল, পর্ব্বতপরিবেষ্টিত উড়িষ্যার বক্ষে বিজয়ী মুসলমানের আঘাতচিহ্ন ধ্বংসস্তূপে চিরস্মরণীয় হয় নাই। আবার উড়িষ্যার মন্দিরসমূহ যে ধর্ম্মের পরিচায়ক, সেই ধর্ম্মই উড়িষ্যার জনসাধারণের ধর্ম্ম থাকায় মন্দিরগুলি সুসংস্কৃত থাকিয়াছে। তাহা না হইলে তরুলতাগুল্ম অল্পকালমধ্যেই পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত মন্দিরের বিনাশকার্য্যসম্পন্ন করিত। তাই ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ বুঝিতে হইলে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অধ্যয়ন করিতে হয়।

উড়িষ্যার কমিশনার মিঃ ষ্টার্লিং প্রথম এই অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "এসিয়াটিক রিসার্চেসে" উড়িষ্যাসম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাঁহার প্রবন্ধে যে ত্রুটি ছিল না, এমন নহে; পরন্তু যথেষ্ট অসম্পূর্ণতার প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনিই প্রথমে এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এবং বহুবিধ অসুবিধা অতিক্রম করিয়া পণ্ডিতসমাজে উড়িষ্যায় শিল্পবিবরণ বিবৃত করেন। পথিপ্রদর্শকের প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তাঁহার প্রবন্ধই উড়িষ্যাসম্বন্ধে একমাত্র বিশদ ও প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল!

প্রায় ৪০ বৎসর পরে দুই জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উড়িষ্যার বিবরণ বিবৃত



ভুবনেশ্বর-মন্দির

Mohila Press., Calcutta.

করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সার উইলিয়ম হাণ্টার ও রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র উড়িষ্যাসম্বন্ধে বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে যশস্বী প্রিন্সেপ ও কিটো উড়িষ্যার কয়খানি লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।

সার উইলিয়ম হাণ্টার সরকারের জন্য উড়িষ্যার বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিষয়ের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি উড়িষ্যার জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব-সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্থানে কেন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে, কোন কঠোর শৈবমতের পার্শ্বে মধুময় বৈষ্ণবমত স্থান লাভ করিয়াছে, কেন নীলাম্বুবেলায় তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত এক ধর্ম্মমতের পর অন্য ধর্ম্মমত দেখা দিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে। সে বিশেষত্ব না বুঝিলে ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ-নির্ণয়-চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই হইবে। এই উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রেই ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথ—উভয়েই পূজিত কেন, তাহা বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবপ্রযুক্ত সার উইলিয়ম সর্ব্বত্র ভারতের জাতীয় জীবনের এই বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন নাই। তিনি সহানুভূতির স্নিগ্ধধারায় সঞ্চিত সংস্কার বিধৌত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে সফলকাম হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—বাঙ্গালার মধ্যে উড়িষ্যাই ঐতিহাসিক ও কোবিদগণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনাদৃত। যে সকল বিজয়বাত্যা ও বিভিন্ন জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ সমগ্র ভারতের উপর প্রবাহিত হইয়াছে, সে সকল উড়িষ্যার উপকূলস্থ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের গতি উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। বৈদিক সাহিত্যে উড়িষ্যার স্থান নাই। মহাভারতের আলোক ভারতের সকল দিকে বিকীর্ণ, কেবল উড়িষ্যার বক্ষে সে আলোক পতিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি উড়িষ্যাসম্বন্ধে যে উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উড়িষ্যা ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে স্থানলাভের সম্মান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, মহাভারতে উড়িষ্যা কলিঙ্গ নামে পরিচিত। দীর্ঘতমা ঋষির অনুগ্রহে বলির বনিতা সুদেষ্ণার পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা যে যে দেশ শাসন করিতেন সেই সেই দেশ তাঁহাদিগের নামাঙ্ক-

সারে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পরিচিত। দীর্ঘতমার নাম ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিককালে উড়িষ্যা অজ্ঞাত ছিল না। দুর্য্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে বিবাহ করেন (মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব)। তাঁহার রাজধানী রাজপুরে অবস্থিত ছিল। আবার বনপর্ব্বে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির যখন গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম হইতে সিন্ধুতীরে অগ্রসর হইয়া কলিঙ্গে উপনীত হইলেন, তখন লোমশ মুনি তাঁহাকে বলিলেন, বৈতরণীপ্রবাহবিভক্ত এই কলিঙ্গে ধর্ম্ম দেবগণের সহায়তায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। বর্ত্তমান যাজপুরই সেই যজ্ঞপুর। মহাভারতের বিবরণ হইতে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যার নিম্নলিখিত সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—উত্তরে বৈতরণী, দক্ষিণে গোদাবরী, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে উড়িষ্যার করদ রাজ্য।

সার উইলিয়মের যে অসুবিধা ছিল রাজা রাজেন্দ্রলালের সে অসুবিধা ছিল না। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমস্ত জীবন ভারতের শিল্পসম্বন্ধে ভ্রান্তমতের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্যে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ভারতবাসী প্রত্নতত্ত্বালোচনা-কারীদিগের মধ্যে তিনি অভ্রংলিহ গিরিচূড়ার মত জ্ঞানকিরণোজ্জ্বলশিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ প্রধানতঃ য়ুরোপীয়। তাঁহারা গ্রীকো-রোমান সভ্যতাকেই বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেন। সেই বিশ্বাস-বশেই গেটে বলিয়াছিলেন, চীন, ভারত ও মিশর—এ সকল দেশের সভ্যতা বিস্ময়কর বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে মত এক্ষণে পরিত্যক্ত। প্রাচীর সহিত প্রতীচ্যের সম্বন্ধ যে স্মরণাতীত কাল হইতে আগত এ কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতীচ্যের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন যে ভারতের সহিত বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ সে কথা আজ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল যখন প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সে কথা কেহ সহজে স্বীকার করিতেন না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভারতীয় শিল্পে যাহা কিছু প্রশংসার্হ তাহাই গ্রীকপ্রভাবসম্ভূত বলিতেন। রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদিগকে যুক্তিতর্কে পরাভূত করিয়া তবে আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাই উড়িষ্যার শিল্পবিবরণ বিবৃত করিবার জন্য তাঁহাকে ভিত্তিরূপে ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল—বুঝাইতে হইয়াছিল, আলেক্-

জাণ্ডার ভারতবাসীকে প্রস্তর স্থাপত্য শিক্ষা দেন নাই,—ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য ভারতজাত—ভারতেই উৎপন্ন হইয়া তাহা ভারতেই পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল বিবরণের পর—ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বুঝাইবার পর রাজা রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার শিল্পকথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

রাজার মত যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত ছিল এমন নহে। প্রত্নতত্ত্বে শেষ কথা স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে ও আবিষ্কারে পূর্ব্ববর্ত্তী মত পরিবর্ত্তিত হয়। বিকাশে ও বৃদ্ধিতেই জ্ঞানের সার্থকতা। অতীতের ভ্রমময় ভিত্তির উপর বর্ত্তমানের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। রাজেন্দ্রলাল যখন ভারতীয় শিল্পের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তিনি যখন ভারতীয় শিল্প অবলম্বন করিয়া ভারতীয় সভ্যতার ও সমাজের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন দেশে রেলপথ অধিক ছিল না—দেশ দুর্গম। আবার তখনও সরকারী পুরাবস্তু বিভাগের বিরাট চেষ্টায় প্রকাশিত পুস্তক-পুঞ্জে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানফল—ইতিহাসের উপাদান সঞ্চিত হয় নাই। এই ইতিহাস রাষ্ট্রনৈতিক-বিপ্লবের বিবরণ নহে—সম্রাটের ও সংগ্রামের তালিকা নহে; পরন্তু দেশের লোকের কথা—প্রকৃত ইতিহাস। দেশের লোকের কথাই যে প্রকৃত ইতিহাস ভল্‌-টেয়ার তাহা বুঝাইয়াছেন। রাজার পুস্তক বিরাট গ্রন্থ—বাঙ্গালীর গর্ব্বের বস্তু।

সার ইউলিয়ম হাণ্টারের ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুস্তক প্রকাশের পর প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চল্লিশ বৎসরে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়নে যুগান্তর হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বহু নূতন উপাদান আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে, নূতন নূতন শিলালিপি, নূতন নূতন তাম্রফলক, নূতন নূতন মূর্ত্তি, নূতন নূতন গৃহের ও নগরের অবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর সেই সকল আবিষ্কারসম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতও হইয়াছে। এই সকল নূতন আবিষ্কারের আলোকে উড়িষ্যার ইতিহাস আবার পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত।

সুখের বিষয় শ্রীযুত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সেই –
করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে কার্য্যে প্রবৃত্ত
তাঁহার যোগ্যতারও অভাব নাই; বরং এক হিসাবে ি
দিগের অপেক্ষাও এ কার্য্যের উপযুক্ত। তিনি স্বয়ং ৫

স্থাপত্যসম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্য্যবেক্ষণসকারে পরীক্ষা করিতে সমর্থ। তাঁহার এই পুস্তকে তাঁহার সেই লব্ধশিক্ষার পরিচয় প্রস্ফুট। তিনি মন্দিরাদির গঠন-বিশেষত্ব বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য সে সকলের পরিমাণাদির যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন—তাহাতেই উড়িষ্যার মন্দিরের বিশেষত্ব বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যেও সুপণ্ডিত। অধ্যাপক রিজ ডেভিড তাঁহার 'বৌদ্ধ ভারত' পুস্তকে বলিয়াছেন, ফার্গুসন ভারতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের অভাবেই ভারতীয় শিল্পের স্বরূপনির্ণয়ে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের অভাবে সার ইউলিয়ম হাণ্টার কিরূপ ভ্রম করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে স্থাপত্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল প্রাচীন মন্দিরাদিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্যে স্থাপত্য-সম্বন্ধে যেমন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, প্রাচীন ভারতে তেমনই শিল্প-সম্বন্ধে বহু পুস্তক ছিল। সেই সকল শিল্প শাস্ত্রের সন্ধান আমরা ক্রমে পাইতেছি। রামরাজ সর্ব্বপ্রথম হিন্দু স্থাপত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন, হিন্দুদিগের শিল্প-সম্বন্ধে যে বহু পুস্তক ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে সে সকলের সন্ধানই পাওয়া না। কেহ বলেন, ৩২ খানি, কেহ বলেন, ৬৪ খানি শিল্পশাস্ত্র ছিল। এক্ষণে সে সকলের নাম মাত্র জানিতে পারা যায়। সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছিলেন, এই শিল্পশাস্ত্রে ৬৪ প্রকার শিল্পের বিবরণ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি প্রধানতঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যসম্বন্ধীয়। এই ৬৪ খানি পুস্তকের ৩২ খানি মুখ্য শাস্ত্র আর ৩২ খানি উপশাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিলে উড়িষ্যার মন্দিরের বিশেষত্বগুলি বুঝিতে আর কষ্ট হয় না। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিয়া শিল্পশাস্ত্রের নিয়মের আলোচনা করিয়া সে সকল বিশেষত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি উড়িষ্যার মন্দিরের উপাদানের কথা বলিয়াছেন। প্রস্তর, কাষ্ঠ, ইষ্টক, লৌহ—এই সকল উপাদানের পরীক্ষা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সকল গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

উড়িষ্যার মন্দিরে লৌহের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। লৌহের কড়ি তখন কিরূপে

নির্ম্মিত হইয়াছিল অনেক লেখক তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে বহুকাল পূর্ব্বে লৌহের দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইত দিল্লীর বৃহৎ লৌহ-স্তম্ভই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। * য়ুরোপ যখন অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন ভারতের যেরূপ লৌহস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল য়ুরোপে অল্পকাল পূর্ব্বেও সেরূপ লৌহস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত না। উড়িষ্যার কনার্ক মন্দিরের লৌহের কড়ির বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন গ্রন্থের ভূমিকায় মিষ্টার উডরফ তাহারই উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন—সেই প্রাচীন কালে উড়িষ্যায় যেরূপ লৌহের কড়ি নির্ম্মিত হইত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও য়ুরোপে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লৌহের কড়ি নির্ম্মিত হইত না।

উড়িষ্যার স্থাপত্যে ইষ্টকের অধিক ব্যবহার নাই। তাহার এক কারণ, উড়িষ্যার মৃত্তিকা ইষ্টক নির্ম্মাণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। মৃত্তিকার দোষে ইষ্টক কঠিন হয় না; পরন্তু কোমলই হইয়া থাকে। কনার্কমন্দিরে প্রাপ্ত ইষ্টক অঙ্গুলীর চাপেই ভাঙ্গিয়া যায়। আবার ইষ্টকগুলি উত্তমরূপে দগ্ধও নহে, কতকটা "আমা"। বোধ হয় ক্ষোদিত করিতে হইবে বলিয়াই ইষ্টক উত্তমরূপে দগ্ধ করা হইত না। ইষ্টকগুলিকে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় করিবার জন্য মৃত্তিকার সঙ্গে তুষ মিশান হইত। মিশরে, আসিরিয়ায় ও কালডিয়ায়ও এই জন্যই ইষ্টকের মৃত্তিকায় খণ্ডিত বা চূর্ণীত খড় ব্যবহৃত হইত। উড়িষ্যার ইষ্টক আকারে বৃহৎ—প্রায় ১৪০ বর্গ ইঞ্চ। বুদ্ধ গয়ার ইষ্টকের আকারও এই রূপ। কর্দ্দমই ইষ্টকের গাঁথনিতে প্রেলেপরূপে ব্যবহৃত হইত।

এই সকল মন্দিরে প্রস্তরগুলি এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে কোন্ মশল্লায় শিল্পীরা পাতর এমন করিয়া গাঁথিয়াছিল তাহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, উড়িষ্যার শিল্পীরা কোন রূপ মশল্লার ব্যবহার করে নাই। প্রস্তরগুলি অতি যত্ন সহকারে কাটিয়া যথা-স্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ভারকেন্দ্র স্থিররাখিয়া প্রস্তরগুলি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে সেগুলি সহজে স্থানচ্যুত হয় না। প্রস্তরগুলি অতি যত্নসহকারে কাটিয়া মসৃণ করার দুইখানি প্রস্তরের মধ্যবর্ত্তী অংশ কেশের মত সূক্ষ্ম দেখায়। উড়িষ্যার শিল্পীদিগের এই কৌশল বিশেষ প্রশংসার্হ।

কোন কোন মন্দিরের রক্তাভ বর্ণ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, সে সকল মন্দির রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল

* আষাঢ়ের 'আর্য্যাবর্ত্ত' দ্রষ্টব্য।

মন্দির প্রলেপাস্তৃত। বহুবিধ উপাদান মিশাইয়া এই প্রলেপ প্রস্তুত করা হইত। বৃহৎ সংহিতায় এইরূপ প্রলেপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অপক্ক তিন্দুক ফল, কপিত্থ, শাল্মলীকুসুম প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করিয়া এই প্রলেপ প্রস্তুত করা হইত। প্রস্তর এই প্রলেপাস্তৃত হইলে জলবায়ুর ধ্বংশকর প্রভাবে সহজে নষ্ট হয় না। উড়িষ্যার কোন কোন মন্দিরের বহির্ভাগে চুণের প্রলেপও বোধ হয় এইরূপ কারণেই প্রদত্ত হইয়াছিল। জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির বিকৃতির প্রমাণ মন্দিরগাত্রে যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকার কনার্ক-মন্দিরের বহির্ভাগে ক্ষোদিত মূর্ত্তির দুর্গতির কথা বলিয়াছেন। আর গ্রন্থের ভূমিকায় মিষ্টার উডরফ বলিয়াছেন, তিনি প্রথম বার কনার্কে যাইয়া ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি যেরূপ দেখিয়া ছিলেন, দ্বিতীয় বার যাইয়া আর সেরূপ দেখিতে পায়েন নাই। সেগুলিকে আর চিনাই যায় না! বায়ুবাহিত বালুকার আঘাতে ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির বিকৃতি নিবারণের জন্য পুরাবস্তু বিভাগ মন্দির-প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করিয়াছেন।—যদি বালুকার বেগ বৃক্ষে প্রহত হইয়া নিবৃত্ত হয়।

যখন জল বায়ুর প্রভাবে ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির এইরূপ বিকৃতি ঘটে তখন কনার্কের শিল্পকীর্ত্তি নবগ্রহমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা যে সুবুদ্ধির কার্য্য হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আনিবার জন্য ইহা স্থানচ্যুত করিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হয়। কিন্তু এই গুরুভার শিলাখণ্ড কলিকাতায় লওয়া হয় নাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উড়িষ্যার লোক যে শিলা-খণ্ড বহু দূর হইতে আনিয়াছিল, আজ ইংরাজ এঞ্জিনিয়ারগণ সেই শিলাখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়াও স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না! অকাল-নির্ব্বাপিত-জীবন-দীপ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যই লিখিয়াছিলেন,—"সেই অতুল্য শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহ মূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারি শত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহ রথো-পরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দুর লেপন পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।"

কবির গান।

—:০:—

(টেনিসন)

চলিল বর্ষণ-শেষে ত্যজি' কবি কুটীর-আবাস
নগরের কোল দিয়া, পিছে ফেলি' রাজপথ খান্ ;
তপন-তোরণ-পথে ভেসে এল বাদল-বাতাস,
যবের শীষের কোলে খেলে গেল ছায়ার তুফান ;

বসিয়া বিরাম-রম্য মনোমত স্থান-নিরজনে
উচ্চ সুধাকণ্ঠে শেষে ঢালিল সে রাগিণী তরল,
বলাকা উড়িতে ভুলি' থমকিল জলদের তল,
চাতক পুলকবিদ্ধ লুটাইয়া পড়িল চরণে !
শূন্যে গাঁথা রয়ে গেল বাবুই সে মধুপ-শিকারী,
নতফণ বিষধর লুকাইল পল্লবের ছায়,
সরমে আনতচঞ্চু হিংস্র শ্যেন, প্রণয়-ভিখারী,
শিকার-নিবদ্ধ-নখে দাঁড়াইল চিত্রিতের প্রায় !

অবাক পাপিয়া ভাবে "গীতিজালে বুনি বায়ুপথ,
একটিও তবু তা'র নহে হেন হরষ-সরস,
এ গানে গড়িয়া উঠে, জগতের মহা ভবিষ্যৎ
কালের অতলে যবে একে একে মিলাবে বরষ।"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

———

কল্পনা।

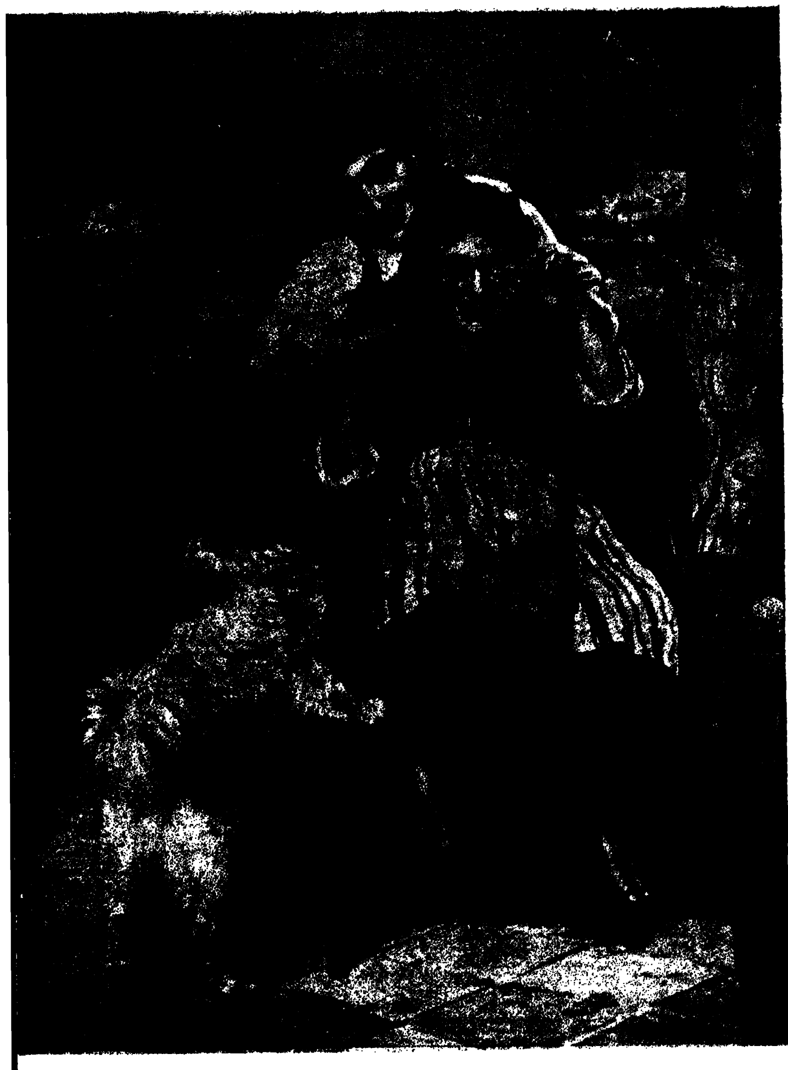
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরে পুলকে পুষ্প-বীথিকা দলি'
চরণ-পীড়নে নবীন জীবনে ফুটে উঠে ফুল-কলি!
সেথা মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জরে
নৃত্যে পুলকে তটিনী
নিত্য আদরে মুঞ্জরে—
কুসুমোৎসবে ধরণী!
চির-শোভাশ্যাম হরিৎশষ্প, পুষ্প আলোকে উজলি'
বিরাজে সুখের কল্পনালোক! কল্পনা সুর বিজলী।

চিরনীলঘন উর্দ্ধে নীলিম অন্ত-বিহীন মেঘ
চাতক কত সে সলিল-বিন্দু পেতে সহে উদ্বেগ
কত লক্ষ প্রদীপ সাজায়ে
দিতেছে আরতি চরণে—
আলোক যেতেছে হারায়ে
সুন্দরী-রূপ-বরণে!
হৃদয়লগ্ন সাধনে মগ্ন দলিয়া বিঘ্ন চরণে—
তব পদতলে শত শত কবি—কল্পনে সুরললনে!

তরু-মর্ম্মরে গিরি-নির্ঝরে পিক-গুঞ্জিত গহনে
রাগরোমাঞ্চে মঞ্জুরাগিণী নামে মন্থর চরণে—
যায় চরণ চিহ্নে আঁকিয়া
কুসুম-সজীব-মূর্ত্তি
গমক মূর্চ্ছা অঙ্গুলি দিয়া
সুরলয়ে পায় স্ফূর্ত্তি!
অই পদরেণু কুসুম পরাগে গন্ধ জগত ভরি',
সুন্দর ধরা সে শ্রীছটায়—কল্পনা সুর সুন্দরী।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

Printed by J. N. Kumar, at the Projapati Press,
63 Nimtola Ghat Street, Calcutta.



বল দেখি কে?

K. V. SEYNE & BROS

শারদ-লক্ষ্মী।

তুমি চরণ ফেলিতে প্রাঙ্গণে জাগে স্বর্ণের আলিপনা
আলো করে দীপ তুলসী-কুঞ্জ,
কূজন-ব্যাকুল কপোত-পুঞ্জ
শঙ্খ-স্বননে ভবন-অঙ্কে উঠে নব মুরছনা।
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি বরাভয় দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ!

তুমি নীলাকাশে নীল নয়ন মেলিলে আলোকে ভূলোক ভায়,
শিথিল করিলে কোরকের মুঠি
কনক-কমল উঠিল যে ফুটি'
তব কণ্ঠ কাঁপিলে তেয়াগি কুঞ্জ লাখ লাখ পাখী গায়!
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি বরাভয় দান
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তব হাসিতে ভাসিল আকাশ বাতাস রজত সুষমাধারে
ছাতিমের শাখা, শেফালির তল,
কাশের লহর, মরালের দল।
ঐ অভ্র-উজল অভ্র শোভিল শুভ্র জোছনাসারে।
এস মা, সারদা শারদ-লক্ষ্মী করি' বরাভয় দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তব অধর-পরশে ফুটিল বাঁধুলী, কানন-শিশুর মুখে,
থল-কমলেরা চরণ পরশে,
চমকি ফুটিয়া চাহিল হরষে
ও কর-পরশে অচলা তরণী ছুটিল পণ্যবুকে !
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি' বরাভয় দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ !

তব আঁচল লুটিলে কনক-কিরণে নীহারে মাণিক জ্বলে।
টুটিলে চিকণ চিকুরবন্ধ
দিকে দিকে ছুটে শ্যামলানন্দ,
কঙ্কণ ক্কণে কূলে কূলে লুটি' কল কল নদী চলে।
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি' বরাভয় দান
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তব স্নিগ্ধ দিঠিতে দুগ্ধ ক্ষরিছে ধেনুর আপীনছায়।
বুলাইলে কর তনু নিরাময় ;
কান্তি, পুষ্টি, তুষ্টির জয় ;
আশীষ বরষে শালির স্তম্ব নমিছে চুম্বি পায়।
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি' বরাভয় দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

শক্তি-সাধনা।

—:০:—

আবিরাবীর্ম এধি!—ঋগ্বেদ।

'জ্যোতির্ম্ময়ি জননি, এস মা!' যুগযুগান্তর পূর্ব্বে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার হৃদয় ভেদ করিয়া এই বৈদিকী বাণী বহির্গত হইয়াছিল। হিরণ্যগর্ভ যখন রজোগুণে এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি-কামনায় বেদ স্মরণ করিয়াছিলেন, তখন এই দেববাণী ওঙ্কার-ঝঙ্কারে বর্ণস্থান-সমীরিত হইয়া যে দিকে ছুটিয়াছিল, সেই দিকেই আকাশ জন্মিয়াছিল। অনন্তের অনন্ত ধ্বনি অনন্তে মিশিয়াছিল। তখনই এই মহাবিলে অনন্ত কোটি নক্ষত্রনীহারিকা-সমন্বিত এই বিশ্ব বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিশ্ব-মাতা বিশ্ব-প্রকৃতির অট্টহাসে সেই অপ্রজ্ঞাত, তমোভূত, সুষুপ্তির ক্রোড়ে একার্ণব অবস্থায় প্রলীন বিশ্বে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাই সৃষ্টির আদি। যে মুহূর্ত্তে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার মানসমুকুরে এই বৈদিকী বাণী প্রতিবিম্বিত ইইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সংসারে মহাশক্তি মহামায়ার শাসনসূ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই হইতেই মহামায়া মায়ার খেলায় মাতিয়াছেন। সেই সময় হইতে অখণ্ড দণ্ডায়মান পরমমহৎপরিমাণ কালের অঙ্কে ছায়াবাজির মত কত বিচিত্র চিত্র উঠিতেছে, ফুটিতেছে, নাচিতেছে, খেলিতেছে, আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনন্তরূপিণী আদ্যা শক্তির এই লীলাও অনন্ত; সান্তবুদ্ধি মানবের পক্ষে তাহার ইয়ত্তা করিবার প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল। সৃষ্টির আদিকালে, লীলাময়ীর প্রাথমিক লীলাকালে কাল অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বর্ষ, ঋতু, মাসাদিতে তখন কাল পরিচ্ছিন্ন হয় নাই; সুতরাং সে লীলা-খেলায় কত কাল কাটিয়াছিল, তাহারও ইয়ত্তা নাই। তখন বিবস্বান্ জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় এই বিবস্বতী পুরীর দিগ্‌দিগন্ত জ্বালাব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর সেই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বকে লইয়া কত খেলা খেলিয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে আবার যেন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সৃষ্টির প্রবাহ অপ্রতিহত-ধারায় চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু লীলাময়ীর লীলা-খেলায় পলে পলে নানা বিচিত্রতা নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাহা কূটস্থ ছিল, তাহা প্রকৃতিস্থ—মায়া কর্ত্তৃক উপহত হইয়া বিবিধ মূর্ত্তির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত

হইয়াছে। ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সমুদ্র, বৎসর, কানন, কান্তার, প্রান্তর, পর্ব্বত প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন কালকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই বিবর্ত্তের বিরাম নাই। ইহা অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ইহার শেষ কি হইবে; শেষ আছে কি না, মানুষ তাহা জানে না।

এই বিশ্বে দুইটি সত্তা আছে ;—প্রথম জ্ঞাতা—দ্বিতীয় জ্ঞেয়। জ্ঞাতা subject, জ্ঞেয় object। জীব জ্ঞাতা, এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ জ্ঞেয়। এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ জীবের নেত্রসমক্ষে সর্ব্বদা সমুদ্ভাসিত। জীব ইহার তত্ত্ব জানিবার জন্য সর্ব্বদাই সমুৎসুক। মাতৃক্রোড়ে শিশু "এটা কি ? ওটা কি ?" বলিয়া প্রশ্নদ্বারা জীবাত্মার সেই অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসা জানাইয়া দেয়। এই জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা সহজে নষ্ট হয় না ; উহা জীবের মরণকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। শৈশবে পিতা-মাতা প্রভৃতির নিকট হইতে জীব বাহ্য জগতের বিষয় জানিয়া লইতে চেষ্টা করে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিবর্দ্ধক যন্ত্রাদির * সহায়তায় জীব এই বাহ্য বস্তুর স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আবহমানকালব্যাপিনী জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও মানুষ ইহার স্বরূপ জানিতে পারে নাই। সেই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন ;—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

"যে মনে মনে বুঝিয়াছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলতত্ত্ব জ্ঞেয় নহে, সেই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়াছে ; আর যে মনে করে যে, জগতের মূলতত্ত্ব জ্ঞেয়, সে কিছুই বুঝিতে পারে না।" ইহাই মহামায়ার মায়াচক্র। বিশ্ব-সংসারে এই মায়াচক্র অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, মানবের হৃদয় হইতে স্বতঃ উদ্ভূত এই জিজ্ঞাসার কি পরিতৃপ্তি হইবে না ? এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের স্বরূপ কি, মানব কখনও কি তাহা জানিতে পারিবে না ? যদি উহা চিরকালই মানবের নিকট অজ্ঞেয় থাকিবে, তাহা হইলে উহা জানিবার জন্য মানুষের এত কৌতূহল জন্মে কেন ? সমস্যা এই স্থানে। এই স্থানেই প্রকৃতি-পুরুষের দ্বন্দ্ব। জীবাত্মা আপনার মুক্তির জন্য বিশ্বের স্বরূপ জানিতে চাহে,—মায়া তাহার জ্ঞানে ভ্রম ঘটায়। এই বিশ্বসংসারের প্রকৃত স্বরূপ গোপন রাখিয়া উহাকে একটা ভাক্তরূপ দিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করে। আমরা সেই ভাক্তরূপ দেখিয়াই ভুলিয়া যাই। তাই

* অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।

আমাদের রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় একটা ভ্রম জন্মে। যত দিন আমাদের সেই ভ্রম থাকে, ততদিন আমরা মায়ার ডোরে বাঁধা থাকি। যতদিন মায়ার ডোরে বাঁধা থাকিব, ততদিন ভবে যাতায়াত করিতেই হইবে; জন্মমৃত্যুর অধীন থাকিয়া আমাদিগকে নানা ক্লেশ পাইতেই হইবে।

এই মায়ার কার্য্য কিরূপ, তাঁহাও জানা আবশ্যক। ইহা জানিবার জন্য অনেক প্রতিভাশালীর মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দর্শন-শাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন,—পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ (phenomenon) ও মূলতত্ত্ব (nomenon) এই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইবার নহে। কারণ- মূলতত্ত্ব মানব-বুদ্ধির অগম্য। অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া মানব কখনই ইহার চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। বিশ্বের স্বরূপ জানা যখন অসম্পূর্ণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন ঐ বিষয় লইয়া বাজে কচ্‌কচি করিয়া লাভ নাই। য়ুরোপীয়রা রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া এই পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেবল জর্ম্মণীতে এখনও এই বিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা চলিতেছে।

হিন্দুর ধারণা ও বিশ্বাস স্বতন্ত্র। হিন্দু মনে করেন, যে পথে যাইলে আমরা বিশ্বপ্রহেলিকার রহস্য উদ্ভিন্ন করিতে পারিব, তাহাই আমাদের গন্তব্য-পথ। উহাই মুক্তির পথ। মায়ার প্রভাব ক্ষয় করিতে হইলে ঐ পথেই যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাই কি করিয়া? পথে রজ্জু দেখিলেই যে সর্প-ভ্রমে পিছাইয়া আসিতে হয়। মনের এই ধন্দ যে সহজে ঘুচে না। এই ভ্রান্তি ত কাটে না। হিন্দু বলেন, এই ভ্রান্তি কাটাইবার দুইটি পথ আছে;—একটি আপ্তবাক্যে বিশ্বাস, আর একটি শক্তি-সাধনা। যে ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে, তাহাকে যদি কোনও মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা বুঝাইয়া দেন যে, সে যাহা দেখিয়াছে তাহা সর্প নহে, রজ্জু, তাহা হইলে তাহার সেই ভ্রমের অপনোদন সম্ভবে। দ্বিতীয়তঃ সাধনার দ্বারা এই ভ্রম নিরস্ত করা যায়। পথে পতিত রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মিলে পলায়ন না করিয়া যদি সাহস-ভরে উহার স্বরূপ-নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে সে ভ্রম ঘুচিবেই ঘুচিবে। এ ক্ষেত্রে কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানকে ছিন্ন করিতে হইবে। এ স্থলে একজন উপদেষ্টার আবশ্যক। মনে করুন, আমি সর্প চিনি, রজ্জু চিনি না। আমি যদি কোমর বাঁধিয়া পথিমধ্যে পতিত রজ্জুর স্বরূপনির্ণয়ে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমি উহা সর্প নহে—ইহা বুঝিব সত্য, কিন্তু উহা যে রজ্জু,—তাহা বুঝিব না। কারণ, রজ্জু কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না। কোন কোন

য়ুরোপীয় পণ্ডিতের এই দশা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ (phenomenon) আমার নিকট যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে, উহা ঠিক সেরূপ নহে। তবে উহা যে কি, তাহা আমরা জানি না,—আমাদের উহা জানিবার উপায় নাই। হিন্দুর ভাষায় বলিতে গেলে, উঁহারা ইহা যে সর্প নহে তাহা বুঝিয়াছেন,—কিন্তু উহা যে রজ্জু, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

তবে উপায়? আমরা ত প্রায় সকলেই রজ্জু চিনি না, কেবল আজন্ম সর্প দেখিয়া আসিতেছি। জন্মাবধি রজ্জুকেই সর্প ভাবিয়া আসিতেছি। রজ্জু ও সর্পের স্বরূপসন্দর্শনপক্ষে পার্থিব আলোকই পর্য্যাপ্ত; কিন্তু পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ ও মূলতত্ত্বের ধন্দ ঘুচাইবার পক্ষে এ আলোক আলোকই নহে।—উহা অন্ধকার হইতেও অধম। শ্রুতি বলিতেছেন;—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ

সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র-নিকর সেই সুপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। বিদ্যুৎসমূহও তাহার স্বরূপপ্রকাশে অসমর্থ। এই অগ্নি কোথায়? অর্থাৎ এই লোকলোচনের বিষয়ীভূত অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সেই প্রকাশ আত্মারই অনুগতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ জ্যোতিষ্মান্।

শ্রুতি আবার বলিয়াছেন,—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠ।

ইহাঁরই ভয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে, ইহাঁরই শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে,—ইহাঁরই শাসনে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

যাঁহার শাসনে সূর্য্য কিরণ দিতেছে, বায়ু অবিরত বহিয়া যাইতেছে; যাঁহার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ও তারকামালা বিশ্বের অনন্ত বিস্তারে নিরন্তর আলোক বিতরণ করিতেছে,—এই বিশ্বসংবিধানের সমস্ত বস্তুই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন

করিয়া যাইতেছে,—তাহারা কেহই আমাকে তাঁহাকে চিনাইয়া দিতে পারে না। তবে উপায় ?

উপায় কর্ম্ম। কর্ম্মেই বদ্ধ হইয়া জীব সংসারে বার বার গতাগতি করিতেছে, সুতরাং কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের নাশ করিতে হইবে। বিষের দ্বারা বিষের ক্ষয় করা আবশ্যক। নিজের ইচ্ছামত অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিষ খাইলে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। বিশ্বস্ত ভিষকের নির্দ্দেশমতে শোধিত বিষ নিয়মমত সেবন করিতে হয়। যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়, সে কর্ম্ম সিদ্ধ পুরুষগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই কর্ম্মই উপাসনা। রোগীর ধাতু-ভেদে যেমন ভিষক্ বিভিন্ন ভেষজের ও তাহার মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন,—তেমনই উপাসকের প্রকৃতিভেদে উপাসনার বিবিধ পন্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সদ্‌গুরু শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া তাহার উপাসনা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন, মহামায়ার পূজা না করিলে,—সাধনায় বিশ্বমাতাকে বশীভূত করিতে না পারিলে পরব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। জননীকে ভাল করিয়া না চিনিলে জনককে চিনা যায় না। যে ব্যক্তি মায়ার সাগরে নিমজ্জিত, মায়ার ভিতর দিয়া না আসিলে সে কূল পাইবে কিরূপে ? সেই জন্য জীবকে মহামায়ার—বিশ্বপ্রসূতির—আদ্যা শক্তির পূজা করিতে হয়। এই পূজায় বিশ্বপ্রকৃতিসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে—মহাশক্তির শক্তিসম্বন্ধে ধারণা জন্মে। চিন্ময়ীশক্তিসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে আর বিলম্ব থাকে না। সেই জন্যই মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

তোয়ং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি তথা মুক্তির্নজায়তে ॥

জল বিনা যেমন পিপাসার শান্তি হয় না, তত্ত্বজ্ঞান বিনা সেইরূপ মুক্তিলাভ হইতে পারে না। শক্তির উপাসনা সেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রথম সোপান।

পূজা ত্রিবিধ ;—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। অধিকারিভেদে উপাসনার ভেদ। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো হৃদি দেবো মনীষিণাম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ।

ক্রিয়াশীল ব্যক্তির দেবতা অগ্নিতে, মনীষাসম্পন্ন লোকের দেবতা হৃদয়ে,

অল্পবুদ্ধি লোকের প্রতিমাই দেবতা, আর জ্ঞানবানের দেবতা সর্ব্বত্র। ভাগবত বলিয়াছেন,—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতম্॥

আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছি, লোক এই তত্ত্ব যত দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে না পারিবে, তাবৎ স্বকর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে আমার পূজা করিবে। তন্ত্র বলিতেছেন,—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥

এইরূপে গুণ অনুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতার্থ মহামায়ার রূপ কল্পিত হইয়াছে। গুণ বলিলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বুঝায়। সত্ত্বগুণের স্বভাব সুখ, রজোগুণের দুঃখ ও তমোগুণের স্বভাব মোহ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল, রাজসিক ব্যক্তি দুঃখিত, অসন্তুষ্ট ও চঞ্চল; তামসিক ব্যক্তি মুগ্ধ, নিশ্চেষ্ট ও দাম্ভিক হয়। ইহা ভিন্ন সত্ত্বগুণের আরও কয়েকটি স্বভাব আছে। যথা—প্রকাশ, লাঘব, প্রসাদ, জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ইত্যাদি। প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। সেইরূপ রজোগুণের ধর্ম্ম চাঞ্চল্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, যত্ন, কার্য্যকুশলতা, চতুরতা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, কামাদির আধিক্য, সুখেচ্ছা, ঐশ্বর্য্যাদির জন্য ব্যাকুলতা প্রভৃতি। তমোগুণের ধর্ম্ম নিদ্রা, তন্দ্রা, জাড্য, ভ্রান্তি, খপুবশতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা, মূর্খতা, আড়ম্বর-প্রিয়তা প্রভৃতি। মানুষ মাত্রেরই এই তিন গুণ আছে। কিন্তু কাহারও তিন গুণ সমান নাই। কারণ গুণ-বৈষম্য হইতেই সৃষ্টি। মানুষ যখন অত্যন্ত অসভ্য, অশিক্ষিত বা মূর্খ থাকে, তখন তাঁহাদের তমোগুণ অত্যন্ত অধিক, রজোগুণ তাহা অপেক্ষা অল্প এবং সত্ত্বগুণ নিতান্তই অল্প থাকে। তাহাদের বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ হয় না। ইহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রায় স্ফূর্ত্তি পায় না। নিষ্ঠুরতা-প্রকাশে ইহারা আনন্দ বোধ করে; সকল কাযে আড়ম্বর অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ করিতে হয়। উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইহারা যখন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, তখন অতি অল্পে অল্পে ধর্ম্মের কথা তাহাদের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। সেই ধর্ম্মের কথায় মারামারি কাটাকাটির কথা, বিস্ময়জনক

ব্যাপারের কথা প্রভৃতি থাকিলে এই শ্রেণীর লোক ঐ কথা শুনিতে আকৃষ্ট হয়। ইহাদের জন্য প্রতিমাপূজা, পশুবলি প্রভৃতি নিতান্তই আবশ্যক। যতদিন উহারা ক্রমশঃ ধ্যান-ধারণা করিতে না শিখে, ততদিন বাহ্যাড়ম্বর, প্রতিমাই তাহাদের দেবতা। ক্রমশঃ ধর্ম্মের কথা শ্রবণ, ধর্ম্মের আড়ম্বর প্রভৃতির আকর্ষণ, প্রপূজিষা ও সম্ভ্রমবুদ্ধির উন্মেষ প্রভৃতির দ্বারা যখন তমোগুণ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে, তখন সাধকের সেই বাহ্য প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া তাহা হৃদয়ে ধ্যান ধারণা করিবার অধিকার জন্মে। এইরূপ রজোগুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরু সাধকের বহির্ম্মুখী পূজা অন্তর্ম্মুখী করিতে চেষ্টা করিবেন। তখন বাহ্য প্রতিমা সাধকের যন্ত্রস্বরূপ হইবে, সে বাহ্য প্রতিমা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সেই দেবীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকিবে। তখন সে ধ্যানকালে হৃদয়স্থ মূর্ত্তিকে "বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া" বলিয়া সম্বোধন করিবে। কিন্তু তখনও তাহার পূজায় প্রতিমাদির প্রয়োজন। ক্রমশঃ যতই তাহার তমোগুণ ক্ষুণ্ন, রজোগুণ প্রধান ও সত্ত্বগুণ উন্মেষিত হইবে, ততই সে মানস পূজার অধিকারী হইবে। ততই সে ভাবিবে,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গুরুর উপদেশে ক্রমশঃ তাহার প্রজ্ঞা-চক্ষুউন্মীলিত হইবে,—সে সর্ব্বভূতে মহামায়া মহাশক্তির অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। ক্রমে যখন তাহার সাত্ত্বিক ভাব প্রধান হইয়া উঠিবে; তমোগুণ প্রায় লুপ্ত হইবে; যখন সে সমগ্র বিশ্বে মহামায়ার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, যখন তাহার আত্মপর-ভেদ থাকিবে না,—ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ সংযত হইবে; মন আর সুখে আকৃষ্ট, দুঃখে অবসন্ন, শোকে কাতর হইবে না, তখন আর তাহাকে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পূজা করিতে হইবে না,—পশু বলি দিতে হইবে না। তখন সে বিশ্বময়ী মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে জ্ঞান-খড়েগ পুণ্যাপুণ্য পশু বলি দিয়া পরে চিত্তকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া মায়ায় ডোর ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। তখন জীবের মুক্তি হয়। জননী প্রসন্না হইয়া সন্তানকে মুক্তি দেন। তখনই সহস্রারের কর্ণিকারাভ্যন্তরস্থ পরমাত্মা কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সম্মিলিত হয়।

ইহাই তন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব। দুর্গাপূজা সেই তান্ত্রিক পূজার শ্রেষ্ঠ পূজা। তান্ত্রিক পূজায় আমরা যে সমস্ত মূর্ত্তির পূজা, ধ্যান-ধারণা করিয়া থাকি,

তাহা মানবের কল্পিতা মূর্ত্তি নহে,—মহামায়াই সাধকের হিতার্থ সেই মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। স্বয়ং সদাশিব বলিয়াছেন,—

ত্বমেব সূক্ষ্মস্থূলাত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তুমি সূক্ষ্মাও বট, স্থূলাও বট, তুমি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, নিরাকারা ও সাকারা তোমাকে জানিতে পারে, এমন সাধ্য কাহার আছে? তুমি উপাসকদিগের হিতার্থ, জগতের মঙ্গলার্থও দানবদলের বিনাশার্থ নানাবিধ তনু ধারণ করিয়া থাক। এই মূর্ত্তি মানবের মনঃকল্পিত নহে। মহাশক্তির শক্তি উপাসকদিগের ও জগতের হিতার্থ যে যে মূর্ত্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,—সেই সেই মূর্ত্তিই ভক্তের পূজ্য। এই শরতে আমরা মহামায়ার যে মূর্ত্তির পূজা করি, বিশ্বজননী বিশ্বপালিনী মহাশক্তি ঐ মূর্ত্তি ধরিয়াই বিশ্ববিধ্বংসী দানবকে দমন করিয়াছিলেন। তবে এস ভাই মহাশক্তির সন্তান! আমরা মায়ের রাতুল চরণে রক্তপদ্ম, গঙ্গাজল, বিল্বদল দিয়া মায়ের পূজা করি। শক্তির সন্তান আমরা, আজ শক্তিহারা, দিশাহারা, জ্ঞানহারা, কাঙ্গালপারা হইয়া জগতে ভ্রমণ করিতেছি। এক সময়ে যাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমগ্র ধরাতল সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি কলিকল্মষে কলঙ্কিত হইয়া অধ্যাত্মশক্তি হারাইয়া ধরাতলে ভ্রমণ করিতেছে। তাই ডাকি, মাতর্জ্জগন্ময়ে! ভক্তিহীন সন্তানের হৃদয়ে ভক্তিরূপে উদিত হও মা! সাধনহীন সন্তানকে সাধনায় শক্তি দাও মা! শোকে হৃদয় ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, রোগে দেহ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, মোহে মুগ্ধ মন ক্ষণিক সুখের লালসায় অনিত্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হইতেছে;—এই সময় এস মা, শান্তিরূপিণি, সন্তানের সন্তপ্ত চিত্তে শান্তি-সুধা সেচন করিতে এস মা! এস মা মহাবিদ্যে! সন্তানের অবিদ্যা বিনাশের জন্য দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধরিয়া বাঙ্গলায় এস মা! তুমি ভিন্ন আমাদের যে অন্য কোনও গতি নাই। মা গো! তোর ভক্ত সন্তান শঙ্কর তোকে যে পরা ভক্তি সহ ডাকিয়াছিল, সে ভক্তি কোথায় পাইব মা। তথাপি তাঁহারই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকি,—

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

* * * *

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো।
মহাক্ষীণ-দীন সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মানস-প্রতিমা।

সাদী।

রাত্রিকালে আসি' এক অপূর্ব্ব মূরতি,
আঁধার সে গৃহ মম ভরি' দিল রূপে ;
তা'রে দেখে ভাবিলাম—আঁধারেতে পথি
দেখায়ে সে দিবে মোরে জ্যোতির্ম্ময় রূপে।

কহিলাম তা'রে—এস, এস, প্রিয়তম,
তোমা লাগি বসে আছি আঁধার এ ঘরে ;
তোমার ও রূপরাশি নাশে মম তম,
তাই ত গো সঁপে দিছি মোরে তব করে।

শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ।

স্বাধীনতার মুল্য।

(আলফোন্স ডডে।)

হায় কবি! তুমি কি চিরকাল একই ভাবে কাটাইয়া দিবে?

প্যারিসের প্রধান সংবাদপত্রের সংবাদদাতার পদ তোমাকে দেওয়া হইল, আর দুঃসাহসী তুমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিলে! একবার আপনার দশাটা মনে কর, ভাই! ঐ ছিন্ন বেশের দিকে—ঐ শীর্ণ ক্ষুধার্ত্ত মুখের পানে চাহ দেখি! শেষে কবিতার মদিরা তোমাকে এত দূরে আনিল! এই তোমার দীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী অক্লান্ত বাণীপদ-সেবার পুরস্কার! শেষে কি তোমার একটুও ধিক্কার আসিল না?

অমন লোভনীয় পদ ত্যাগ করিও না। তোমার সকল অভাব মিটিয়া যাইবে, কোন কষ্ট রহিবে না। চিরকাল ঐ দখিনা বাতাস আর কোকিলের গানের স্বপ্নে বিভোর থাকিও না। ফুলের পরাগ ও চাঁদের জ্যোৎস্না খুব ভাল জিনিস বটে, কিন্তু উহাতে ভৌতিক ক্ষুধা মিটে না। অন্ততঃ তাহার খাতিরে চাকরিটি লও।

কিছুতেই লইবে না? তুমি চিরকাল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রহিবে? কোন বাঁধনে তুমি ধরা দিবে না?

যাহাই কর, সেগুইনের ছাগলের গল্পটা একবার শুন; বুক স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছার পরিণাম কি!—

সেগুইনের ছাগলের উপর যেন কাহার অভিসম্পাত ছিল। তাঁহার সকল ছাগলগুলি একই প্রকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একদিন প্রভাতে তাহারা বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের উপর ছুটিয়া যাইত। নেকড়ে বাঘ তথায় তাহাদের জীব-লীলার অবসান করিয়া দিত। প্রভুর আদর, বাঘের ভয় বা অন্য কিছুই তাহাদিগকে এ সংকল্প হইতে বিরত করিতে পারিত না। তাহারা যেন স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছিল; নির্ম্মল বাতাস ও স্বাধীনতা যে উপায়ে হউক, লাভ করিবেই।

সেগুইন তাঁহার পশুগুলির মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আর আশা নাই। আমার বাড়ীর উপর ছাগলদিগের বিরাগ জন্মিয়াছে। এবার ছাগল পোষা ছাড়িয়া দিলাম।"

যাহা হউক মুখে এই কথা বলিলেও মনে মনে তিনি একেবারে হতাশ

হইলেন না। একই কারণে ছয়টি ছাগল নষ্ট হইয়া যাইলেও তিনি শেষে আর একটি ছাগল কিনিয়া আনিলেন। এবার বুদ্ধি করিয়া একটি ছাগশিশু কিনিলেন; ভরসা হইল, এটি তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

সেগুইনের নূতন ক্ষুদ্র ছাগশিশুটি অতি সুন্দর। তাহার কোমল উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি, সুকৃষ্ণ ক্ষুর, চিত্রিত শৃঙ্গ সকলেরই প্রশংসা আকৃষ্ট করিত। দীর্ঘ শুভ্র লোমরাজি তাহার কোমল দেহখানি আবৃত করিয়া রাখিত। আর তেমন স্নেহশীল শিষ্ট ছাগশিশু কেহ কখন দেখে নাই। যে তাহাকে দেখিত, সে-ই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

সেগুইনের বাড়ীর পশ্চাতে হথর্ণবেষ্টিত একটি খোঁয়াড় ছিল; তিনি তাঁহার নবাগত প্রাণীটিকে তথায় রাখিলেন। তথায় প্রচুর ঘাস জন্মিত। একটি খোঁটার সহিত সে খুব লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিত। সেগুইন ছাগ-শিশুর কষ্ট হইতেছে কি না, মাঝে মাঝে দেখিতেন। সে বড় সুখে ছিল এবং এত তৃপ্তির সহিত ঘাস চিবাইত যে, তাহা দেখিয়া সেগুইনের আনন্দের আর অবধি ছিল না।

সেগুইন ভাবিলেন, এতদিনে যে ছাগলটা পাইয়াছি, আমার বাড়ীতে তাহার মন বসিয়াছে।

কিন্তু তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন; ভিতরে ভিতরে তাঁহার ছাগশিশু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন সে উপরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিল,— ঐ উচ্চে উহারা কত সুখে আছে! গলার বন্ধনরজ্জু দূর করিয়া ঐ উচ্চ বনভূমিতে ছুটিয়া বেড়াইতে কত আনন্দ! গর্দ্দভ, ষণ্ড উহারা বদ্ধ স্থানে ঘাস খাইয়া বেড়াইতে পারে; কিন্তু ছাগল? তাহাদের জন্য বিস্তীর্ণ স্থান চাই-ই।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই আবদ্ধ স্থানের ঘাস তাহার মুখে বিস্বাদ লাগিতে লাগিল। অবসাদ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে কৃশ হইয়া গেল। করুণস্বরে ডাকিতে ডাকিতে স্ফীত নাসারন্ধ্র লইয়া পর্ব্বতের পানে মাথা তুলিয়া তাহাকে অবিরত বন্ধন-রজ্জু টানিতে দেখিয়া সকলেরই কষ্ট হইত।

সেগুইন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাগশিশুর কিছু হইয়াছে; কিন্তু

কি হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। একদিন প্রভাতে ছাগশিশুটি সেগুইনের দিকে চাহিয়া তাহার আপন ভাষায় তাঁহাকে বলিল,—"আমার প্রাণ যায়, আমাকে পাহাড়ে যাইতে দাও।"

তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমিও!" বিস্ময়ের আতিশয্যে তিনি সেই ছাগশিশুর পার্শ্বে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"কি, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহ?"

সে বলিল,—"হাঁ।"

"তুমি কি যথেষ্ট ঘাস খাইতে পাইতেছ না?"

"পাইতেছি।"

"ওঃ! তোমার দড়িটা বুঝি ছোট হইয়াছে। ওটা একটু বড় করিয়া দিব?"

"তাহাতে কোনই লাভ নাই।"

"তবে তুমি কি চাহ, বল।"

"আমি ঐ পাহাড়ের উপর যাইতে চাহি।"

"আ হতভাগা, পাহাড়ে বাঘ আছে, তাহা জান? বাঘ আসিলে তোমার কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

"আমি তাহাকে শিং দিয়া গুতাইয়া দিব।"

"বাঘ তোমার শিংকে ভয় করে না। তোমার অপেক্ষা অনেক লম্বা শিংওয়ালা ছাগল সে উদরস্থ করিয়াছে। হেথায় গত বৎসর যে ছিল, সেই রেনাডের কথা তোমার মনে নাই? জান ত সে কত সুন্দর ছিল। তেমন তেজী ছাগল বড় একটা দেখা যায় না। সারারাত ঐ পাহাড়ে সে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সকালে বাঘ তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।"

সেটা তাহার দুরদৃষ্ট! কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই আইসে যায় না। আমায় তুমি পাহাড়ে যাইতে দাও।"

"হা ভগবান্! কে আমার ছাগলগুলির মাথার এমন দুর্ব্বুদ্ধি দেয়? এটিকেও বাঘ শেষ করিবে। কিন্তু তুমি যাহাই কেন কর না বাপু, আমি তোমাকে বাঁচাইব। এ দড়িটা তুমি ছিড়িয়া ফেরিতে পার। আচ্ছা, আমি তোমায় ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিব; তথায় তোমায় থাকিতে হইবে।"

তাহার পর সেগুইন ছাগশিশুটিকে একটি অন্ধকার ঘরে রাখিয়া তাহার দ্বার সাবধানে বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বড় খোলা

জানালার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি বাহিরে আসিলেই ক্ষুদ্র ছাগশিশুটি জানালা দিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল।

সেই শুভ্র ছাগশিশুর আগমনে পর্ব্বতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ বনস্পতিরা তেমন সুন্দর প্রাণী কখন দেখে নাই। তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র রাণীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কনকবর্ণ লতাসকল দুই পার্শ্বে সরিয়া তাহাদের যথাসাধ্য পুষ্পগন্ধ সুন্দরী রাণীকে উপহার দিল। বাদাম-গাছগুলি তাহাকে সোহাগ করিবার জন্য শাখাগুলি নমিত করিয়া দিল। ছাগশিশুর আবির্ভাবে পর্ব্বতময় আনন্দ উৎসব আরব্ধ হইল।

ছাগশিশুটিও কতই সুখী হইল! গলায় রজ্জু নাই, নিকটে বন্ধন-দণ্ড নাই, ইচ্ছামত চরিয়া এবং ছুটিয়া বেড়াইতে কেহ বাধা দিবার নাই! এতদিনে সে তাহার ঈপ্সিত স্থানে আসিয়াছে! এই সেই স্থান—যথায় তাহার শৃঙ্গ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ঘাস জন্মায়! আর কত প্রকারের ঘাস, কত সুন্দর, কত সুমিষ্ট! তাহার বদ্ধ স্থানের বিশীর্ণ তৃণের সহিত ইহার কত পার্থক্য! সুমিষ্ট মাদকরসে পরিপূর্ণ কত সুন্দর সুন্দর বনফুলে এ পর্ব্বত-ভূমি সুশোভিত!

সে অর্দ্ধমত্তের মত শূন্যে চারিপদ তুলিয়া খেলা করিতে লাগিল এবং বৃক্ষচ্যুত পত্র ও ফলের সহিত নিম্নভূমিতে গড়াইয়া গেল; তাহার পর হঠাৎ এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিল।

সম্মুখের দিকে মস্তক প্রসারিত করিয়া সে ঝোপ ও বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া পর্ব্বতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে কখন পর্ব্বতের শিখরদেশে, কখন মধ্যদেশে, কখন পাদদেশে দেখা যাইতে লাগিল। লোকে দেখিলে বলিত সেগুইনের ১০।২০টা ছাগল তথায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

ইহার কারণ, সে সময়ে তাহার কোন ভয় ছিল না। এক এক লম্ফে সে বিস্তৃত জলস্রোত পার হইল এবং পার হইবার সময়ে ফেনপুঞ্জ ও জলকণা তাহাকে সিক্ত করিয়া দিল। সর্ব্বশরীর আর্দ্র করিয়া সে এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডে আপনার দেহ অলসভাবে বিস্তার করিয়া দিয়া সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিয়া লইল। একবার সে মুখে একগ্রাস ঘাস লইয়া পর্ব্বতের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে সেগুইনের গৃহ ও তৎসংলগ্ন পশুশালা দেখা যাইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল; বলিল,—"কি ছোট্ট জায়গা! আমি কেমন করিয়া এতদিন ওখানে ছিলাম তাই ভাবি।"

উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া সে আপনাকে অন্ততঃ পৃথিবীর মত প্রকাণ্ড মনে করিতে লাগিল।

বাস্তবিক এই দিনটি ছাগশিশুর স্মরণীয় দিন। বেলা দ্বিপ্রহরে দক্ষিণে বাযে ছুটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদল কৃষ্ণসারের সহিত তাহার দেখা হইল। তাহারা তখন বন্য আঙ্গুর-ভক্ষণে ব্যাপৃত ছিল। আমাদের শুভ্র পলাতক ছাগশিশুটি তথায় এক অভিনব উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। এই ছাগবালিকাকে তাহারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছাড়িয়া দিল। একটি তরুণ কৃষ্ণসার ছাগ-বালিকার প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিল এবং তাহারা দুইটি কিছুক্ষণের জন্য বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহারা মৃদুস্বরে পরস্পরকে কি বলিয়াছিল, যদি জানিতে চাহ, ঐ শৈবালাচ্ছাদিতা কলম্বিনীকে জিজ্ঞাসা কর, জানিতে পারিবে।

সহসা বায়ু স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। গিরিশৃঙ্গগুলি ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করিল; সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ছাগশিশুটি বলিয়া উঠিল—"ইহারই মধ্যে!" বিস্মিত হইয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে মাঠগুলি কুয়াশায় ডুবিয়া গিয়াছিল। সেগুইনের পশুনিবাস বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছিল; তাহার কুটীরের চূড়াটি মাত্র দেখা যাইতেছিল এবং তাহার উপরে ধূমরেখা একখণ্ড সূত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। গৃহাভিমুখগামী মেষগুলির ঘণ্টাধ্বনি কাণে আসিয়া তাহার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। একটি বাজপক্ষী নীড়ে ফিরিবার পথে ছাগশিশুটিকে পক্ষের আঘাত করিয়া গেল। সে চমকিত হইয়া উঠিল! তাহার পর সে পর্ব্বতে ভীষণ গর্জ্জন উঠিল—"হালুম! হালুম!"

তখন বাঘের কথা তাহার মনে পড়িল। সমস্ত দিন সেই ভীষণ জন্তুর কথা একবারও সে ভাবে নাই। সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। সেগুইন ছাগশিশুটিকে পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন।

বাঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—"হালুম—হালুম।"

শিঙ্গা ডাকিল—"ফিরিয়া আইস, ফিরিয়া আইস।"

ছাগশিশুর চিত্ত গৃহকোণে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই সেই বন্ধনদণ্ড, সেই রজ্জু, সেই বেষ্টিত কুৎসিত স্থান তাহার মনে পড়িল! সে ভাবিল—সে জীবন কিছুতেই আর সে ফিরিয়া লইতে পারিবে না। সে যে স্থানে আছে সেই স্থানেই থাকিবে।

শিঙ্গা নীরব হইল।

ছাগশিশু পশ্চাতে পত্রের মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইল। সে ফিরিয়া অন্ধকারে দুইটি সোজা ছোট কাণ ও দুইটি জলন্ত চক্ষু দেখিল। সে তাহার কৃতান্ত ব্যাঘ্রকে চিনিল।

সে সেই অন্ধকারে পশ্চাদ্দেশের উপর ভর দিয়া তাহার বিশাল দেহ লইয়া স্থিরভাবে ক্ষুদ্র শুভ্র ছাগশিশুটির পানে চাহিয়া ছিল এবং ভবিষ্য আহারের আশায় আপনার মুখের পার্শ্বদেশ মাঝে মাঝে লেহন করিতেছিল। ছাগশিশু তাহার গ্রাসে আসিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই জানিয়া ব্যাঘ্রের বিশেষ কোন ব্যস্ততা ছিল না। ছাগশিশু তাহার দিকে ফিরিলে বাঘ দুষ্ট হাসি হাসিয়া তাহার রক্তবর্ণ বৃহৎ জিহ্বা তাহার শীর্ণ মুখপ্রান্তে ঘুরাইয়া লইল।

ছাগশিশু বুঝিল, তাহার জীবনের আর কোন আশা নাই। যখন তাহার মনে পড়িল, রেনাড সারারাত যুদ্ধ করিয়াও প্রভাতে ব্যাঘ্রনখরে নিহত হইয়াছিল, তখন সে মুহূর্ত্তের জন্য একবার ভাবিল—আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা, এখনই বাঘের গ্রাসে যাইলে সকল আপদ্ মিটিয়া যায়! তাহার পর ভাল করিয়া ভাবিয়া সে বীরের মত শৃঙ্গ উন্নত করিয়া নতমস্তকে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঘকে মারিবার কোন আশা ছিল বলিয়া সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহা নহে; সে জানিত, ছাগলে কখন বাঘ মারিতে পারে না। তাহার শুধু এই আশা ছিল, যদি সে রেনাডের মত আপনাকে কিছুক্ষণ রক্ষা করিতে পারে।

এইবার বাঘ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল। ছাগশিশুর ছোট শৃঙ্গ দুইটিও আত্মরক্ষার জন্য উঠিতে পড়িতে লাগিল।

সেই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র ছাগশিশু কি সাহসের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছিল! দশ বার বার—আমি মিথ্যা বলিতেছি না—সত্যই দশ বার বার সে বাঘকে শ্বাস লইবার জন্য ফিরাইয়াছিল। সেই অবসরে ক্ষুদ্র লোভীটি আর এক গ্রাস তাহার প্রিয় মধুর ঘাস মুখে লইত। তাহার পরে সে পূর্ণমুখে পুনরায় ব্যাঘ্রের আক্রমণ অপেক্ষা করিত। সারারাত্রি যুদ্ধ চলিল। ছাগশিশু মাঝে মাঝে নির্ম্মল আকাশে নৃত্যশীল নক্ষত্রের পানে চাহিয়া আপন মনে বলিয়াছিল—“ওঃ! যদি প্রভাত পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।”

একটি একটি করিয়া তারাগুলি অস্ত গেল। দ্বিগুণ তেজের সহিত

ছাগশিশু শৃঙ্গের দ্বারা ব্যাঘ্রের দশনের আক্রমণকে বার্থ করিতে লাগিল। দিক্-চক্রবালে পাণ্ডু আলোকরশ্মি দেখা দিল; কৃষকের গৃহ হইতে কুক্কুটের কর্কশ কণ্ঠ শুনা গেল।

অভাগা ছাগশিশু শুধু প্রভাতের অপেক্ষায় মৃত্যুকে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল। আলোক-রেখা দেখিয়া সে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"এতক্ষণে সময় আসিয়াছে।" এবং নীরবে আপনার রক্তরেখাঙ্কিত শুভ্র দেহ শ্যামল শষ্পে লুণ্ঠিত করিয়া দিল।

ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ তাহার উপর লম্ফ দিয়া পড়িয়া তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

বিদায় কবি! যে গল্পটি তোমায় বলিলাম, তাহা আমার কল্পনা-প্রসূত মনে করিও না। যদি কখন পল্লীনিবাসে যাও, তথায় কৃষকদের মুখে শুনিতে পাইবে—"সেগুইনের ছাগশিশু সারারাত্রি বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, শেষে প্রভাতে তাহার নখরে প্রাণ দিয়াছিল।"

বুঝিলে বন্ধু—"শেষে প্রভাতে তাহার নখরে প্রাণ দিয়াছিল।"

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

শীলতা।

(সংস্কৃত হইতে)

সারল্যে সুহৃদ, নীতিবলে বৈরিগণ,
ধনে লোভী, কর্ম্মে বিভু, আদরে ব্রাহ্মণ,
প্রণয়ে যুবতী, মিত্র সমতার ফলে,
অতি উগ্রভাষী স্তুতি বিনতির বলে,
প্রণতিতে গুরুজন, মূর্খ মিষ্টভাষে,
পণ্ডিত বিদ্বানগণ বিদ্যার বিলাসে,
রসালাপে বশীভূত রসিক সুজন,
শীলতা-সদ্‌গুণে কিন্তু বশ ত্রিভুবন!

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

সংক্রান্তি।

১

পঞ্চগ্রামের জমীদার দেবনাথ রায় চৌধুরী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন না বলিয়া শ্বশুরের বাসগ্রামে আসিয়াছেন বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, স্থানাভাবে দেবনাথের শ্বশুরালয়ে বাস ঘটিয়া উঠে না। গ্রামে নদীকূলে উচ্চ জমীতে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছে। তিনি সেই তাম্বুতে বাস করেন; কেবল আহারের জন্য শ্বশুরালয়ে গমন করেন।

দেবনাথের শ্বশুর যদুনাথ ভট্টাচার্য্য দরিদ্র গৃহস্থ; কিন্তু বড় কুলীন। আমরা বহুদিন পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন বাঙ্গলায় কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সমাজে কুলীনের অত্যন্ত সম্মান ছিল, দরিদ্র কুলীন ধনী মৌলিক বা বংশজ বা ভঙ্গকে কড়া কথা কহিলেও ধনী তাহা সহ্য করিতেন। সেই জন্যই দরিদ্র যদুনাথের কন্যা মহালক্ষ্মী পঞ্চগ্রামের জমীদার রাধানাথ রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। নহিলে যদুনাথের অর্থ বা মহালক্ষ্মীর রূপ ছিল না। তবে তখন কুলগৌরব থাকিলে লোক রূপও খুঁজিত না। পুত্রের সহিত মহালক্ষ্মীর বিবাহ দিয়া রাধানাথ বৈবাহিককে বলিয়াছিলেন,—"আমার ইচ্ছা, শ্বশুরবাড়ী দেবনাথের আদর-যত্ন হয়, তাই আমি বলি, আপনার পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করি।" সে কথা শুনিয়া যদুনাথ বলিয়াছিলেন,—"আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। কিন্তু তাহা হইলে জামাতা ত আসিয়া আপনার বাড়ীতেই থাকিবেন—তাঁহার শ্বশুরবাড়ী থাকা হইবে না। আর আমি কেমন করিয়া জামাইবাড়ী বাস করিব?" ইহার পর রাধানাথ আর সে কথা তুলেন নাই, পিতার মৃত্যুর পর দেবনাথ কোন দিন সে কথা তুলিতে সাহস করেন নাই। তিনি দুই একবার পত্নীর নিকট সে কথা তুলিবার উদ্যোগ করিয়া মহালক্ষ্মীর ভাব দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রধানতঃ সেই জন্যই বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন সময় দেবনাথের বড় শ্বশুরালয়ে আগমন হইত না; শ্বশুরালয়ে আসিলেও তিনি তাম্বু খাটাইতেন; কারণ, তাঁহার সঙ্গে লোক অনেক থাকিত। মহালক্ষ্মী মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আসিতেন। পিত্রালয়ে আসিবার সময় তিনি সঙ্গে দাস-দাসী আনিতেন না। তবে এবার তিনি যে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে আসিয়াছেন, এবার বিন্দিদাসী নিতান্ত জিদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। বিন্দি

তাঁহার খাস দাসী। সে তাঁহার সমবয়সী বলিয়া তাঁহার সঙ্গে তাহার একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল—তাহার আব্দার তিনি সানন্দে সহিতেন বলিয়া সে আব্দারের মাত্রাও একটু বাড়াইয়াছিল। মহালক্ষ্মীর পিত্রালয়ে আসিয়া সে পঞ্চগ্রামে যেমন তাঁহার বেশ-ভূষা হাতে হাতে যোগাইত, তেমনই যোগাইতে যাইত। মহালক্ষ্মী হাসিয়া বলিতেন,—"বিন্দি! এ বাড়ীতে আমি তোর মনিবও নহি, পঞ্চগ্রামের জমীদারের গৃহিণীও নহি। এ বাড়ীতে আমাকে এমন করিয়া উত্যক্ত করিস্ না।"

দেবনাথ সৌখীন লোক—তাহাতে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। তিনি প্রৌঢ় হইলেও তাঁহার পরিধান শান্তিপুরের কল্কাপাড় ধুতি, গাত্রে রাধানগরের মিহি আদ্ধির পাঞ্জাবী জামা ও তদুপরি ঢাকাই মস্‌লিনের উড়ানী। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়—মজলিসি লোক। তাঁহার অভাবের মধ্যে সন্তান। কিন্তু সে অভাব যে তাঁহাকে পীড়িত করিত, এমন বোধ হয় না। কারণ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, আশীর্ব্বাদক পার্শ্বচর—এমন কি, গুরু-পুরোহিতের অনুরোধেও তিনি আর বিবাহ করেন নাই। এ সব অনুরোধ তিনি এমনই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন যে, মহালক্ষ্মীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি আর বিবাহ করিবেন না। আর সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনিও সময় সময় স্বামীকে আবার বিবাহ করিতে বলিতেন। দেবনাথ হাসিয়া বলিতেন,—"বাহিরের আক্রমণ অতিক্রম করা যায়—ঘরে আবার আক্রমণ কেন?" মহালক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিতেন,—তাঁহার অদৃষ্টে সন্তান-লাভ নাই বলিয়া কি তাঁহার শ্বশুরকুলের জল-পিণ্ড লোপ হইবে? দেবনাথ বলিতেন,—"কিন্তু দুই সতীনের ঝগড়ায় যে আমার জীবন্তে পিণ্ড চট্‌কান হইবে!" মহালক্ষ্মী বলিতেন,—"না—গো—না। আমি তাহাকে কিছু বলিব না। তোমার সে ভয় নাই। তুমি যাহাই বল, আমি তোমার বিবাহ দিব।" দেবনাথ শুধু হাসিতেন। বলা বাহুল্য, স্বামীর বিবাহ দিতে মহালক্ষ্মীর অতিরিক্ত আগ্রহও দেখা যায় নাই; দেবনাথকেও দুই সতীনের ঝগড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। বহু রূপসী কন্যার পিতা দেবনাথকে জামাতা করিবার আশায় হতাশ হইয়াছেন। লোক বলিত, মহালক্ষ্মী স্বামীকে "ঔষধ করিয়াছে।" পতিগৃহে মহালক্ষ্মীর প্রভাব-প্রতিপত্তিও অত্যন্ত অধিক ছিল; তথায় তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই হইত। আত্মীয়, স্বজন, আশ্রিত, অনুগত—সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত—ভক্তি করিত, ভালও যে না বাসিত, এমন নহে।

২

দেবনাথ যে কয়দিন শ্বশুরালয়ে ছিলেন, সে কয় দিন তাঁহার তাম্বুই গ্রামের বৈঠকখানা ছিল। প্রভাত হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত তাম্বুতে লোক থাকিত। কেহ গল্প করিতে আসিত, কেহ গল্প শুনিতে আসিত; কেহ গান করিতে আসিত, কেহ গান গাহিতে আসিত; কেহ কাযের উমেদারিতে আসিত, কেহ অর্থসাহায্য চাহিতে আসিত; কেহ কাযে আসিত, কেহ কাযের অভাবহেতু আসিত।

তাহার পর দেবনাথের যাইবার দিন আসিল। প্রথম স্থির ছিল—মহালক্ষ্মী আরও কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকিবেন। কিন্তু গুরুদেব তীর্থযাত্রার পথে পঞ্চগ্রামে যাইবেন, সংবাদ পাইয়া সে বন্দোবস্ত বদলাইতে হইল—মহালক্ষ্মীও স্বামীর সঙ্গে ফিরিয়া চলিলেন। প্রার্থীদিগকে অর্থ দান করিয়া, গ্রামের কালীবাড়ী পাকা করিবার ব্যয় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, গ্রামের বারোয়ারীর শূন্য তহবিল পূর্ণ করিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের পরই সস্ত্রীক দেবনাথ যাত্রা করিলেন। দানতৃপ্ত কয়জন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আজ আমাদের বিজয়া দশমী।"

বজরা ভাসান হইল।

৩

বজরার মধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া দেবনাথ নিশ্চিন্তভাবে বৃহৎ ফুরসীর দীর্ঘ নলের প্রান্ত মুখে দিয়া ধূমপান করিতে করিতে তন্দ্রাবেশ অনুভব করিতেছিলেন। শিয়রে বসিয়া মহালক্ষ্মী ব্যজন করিতে করিতে ও পাড়ার কোন বিধবার ছেলেকে চাকরী দিবার কথা—সে পাড়ার কাহারও কন্যার বিবাহে সাহায্যদানের কথা বলিতেছিলেন। দেবনাথ নিমীলিতনয়নে "হাঁ" "হুঁ" দিতেছিলেন।

বাহিরে মাঝিরা জমাদারকে নৌকা ভিড়াইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। জমাদার "মিশির ঠাকুর" প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়া বজরার ছাতে বসিয়া ছিলেন। তিনি ভিড়াইতে বারণ করিলেন।

ভিতর হইতে মহালক্ষ্মী বলিলেন—"বিন্দি, কি রে?"

বিন্দি সরজামীন তদন্তের জন্য বাহিরে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, নদীর কূলে—আঘাটায় একজন ব্রাহ্মণ একটি যুবতীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি নৌকা ভিড়াইতে বলিতেছেন।

দেবনাথ নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত করিলেন।

মহালক্ষ্মী বলিলেন,—"বোধ হয়, কিছু প্রার্থনা জানাইবে। নৌকা ভিড়াইতে বল।"

বিন্দি বাহিরে গেল।

খড়খড়ীর পাখী তুলিয়া মহালক্ষ্মী দেখিলেন, কূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাতুল—ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে তাঁহার অনূঢ়া—রূপসী—যুবতী কন্যা সৌদামিনী!

৪

বজরা কূলে লাগিলেই দেবনাথ বাহিরে আসিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

দেবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রার্থনা?"

কন্যাকে দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি কন্যাদায়গ্রস্ত; আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

"আপনি পাত্র স্থির করিয়াছেন?"

"হাঁ।"

"ভাল। আমি আপনার কন্যার বিবাহের ব্যয় দিব।"

"আপনাকে আমার এই কন্যা সৌদামিনীকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

দেবনাথ একটু বিব্রতভাবে বলিলেন, "আমি কৃতদার।"

"কিন্তু অপুত্রক—"

ব্রাহ্মণ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি দেবনাথের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা বিন্দির উপর পতিত হইল। তিনি নতনেত্র হইয়া নির্ব্বাক্ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, মহালক্ষ্মী স্বামীর সহিত যাইবেন না। বিন্দিকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, মহালক্ষ্মী বজরায় আছেন। লজ্জায় তিনি মনে করিলেন, "এ মুখ আর কেমন করিয়া দেখাইব?"

দেবনাথ আবার বলিলেন,—"আপনি পঞ্চগ্রামে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি আপনার কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিব।"

সেই সময় নদীর তরঙ্গসঙ্গশীতল বাতাস একটু বেগে বহিল। সেই বাতাসে যুবতীর অবগুণ্ঠন একটু সরিয়া গেল। দেবনাথ দেখিলেন, যুবতীর মুখ লজ্জায় রক্তাভ—তাহার নয়নে অশ্রু। তাঁহার মনে হইল, তিনি আর

কখনও এমন রূপবতী রমণী দেখেন নাই—কি বর্ণে—কি গঠনে—কি লাবণ্যে তাহার যেন তুলনা নাই। এ সৌদামিনী যেন স্থির-সৌদামিনী।

৫

দেবনাথ ফিরিয়া আসিলে মহালক্ষ্মী বলিলেন,—"মামা কি মেয়ে দিতে আসিয়াছিলেন?"

দেবনাথ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মহালক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মামা!"

"উনিই ত বড় মামা। কেন—তাহাতে কি?"

"তবে ত ব্যবহারটা বড় রূঢ় হইয়াছে!"

মহালক্ষ্মী তীব্র বিদ্রূপের সুরে বলিলেন,—"ভালই ত, নৌকা ভিড়াইতে বল; আর মামা আসুন আর না-ই আসুন, মামার মেয়েকে বজরায় তুলিয়া লও।"

মহালক্ষ্মীর কথার ঝঙ্কারে দেবনাথ আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মামা-শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবহারটা বড় রূঢ় হইয়াছে। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া আবার ফুরসীর নল মুখে দিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার ভাবটা আর নিশ্চিন্ত নহে।

মহালক্ষ্মী বলিলেন,—"তুমি সৌদামিনীকে লইলে না কেন? জানই ত, কাচা কাপড় আর যাচা মেয়ে ছাড়িতে নাই।"

দেবনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"বটে? তবে আর গোটাকতক সিন্দুক তৈয়ার করাই—আর অন্দর-মহলে আর গোটা দুই চক করাই।"

"সিন্দুকে আর অধিক স্থান নাই বটে; কিন্তু অন্দরে এখনও অনেক মেয়ে ধরিতে পারে।"

দেবনাথ তামাক টানিতে লাগিলেন।

মহালক্ষ্মী মামার কথা ভাবিতে লাগিলেন। মামার এই ব্যবহার! ছিঃ!! এই জন্যই তিনি এবার নাতিনীর বিবাহে যায়েন নাই—অসুখের ভাণ করিয়াছিলেন! শরীর দেখিয়া ত অসুখের আভাসও পাওয়া যায় না! আসল কথা, দেবনাথ যাহাতে তাঁহাকে চিনিতে না পারেন, সেই জন্যই তিনি যায়েন নাই। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে—তাই তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতেছিলেন। কেমন করিয়া তিনি যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া এ প্রস্তাব করিলেন? সৌদামিনী রূপবতী বটে। মামা বুঝি ভাবিয়াছিলেন,

মেয়ের রূপের বলেই তিনি জয়ী হইবেন! ছিঃ!! মামার মনে অনেক দিন হইতেই এ আশা ছিল। নহিলে তিনি এত দিন মেয়ের বিবাহের বিশেষ চেষ্টা করেন নাই কেন?

মহালক্ষ্মী শয্যায় শয়ান স্বামীর দিকে চাহিলেন, আর কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিলেন। স্বামীর সঙ্গে তুলনায় তাঁহার রূপহীনতা যে এত অধিক, তাহা তিনি কখনও মনে করেন নাই—মনে করিবার কারণ ঘটে নাই। স্বামী অতিক্রান্ত-যৌবন সত্য; কিন্তু দুর্ভাবনাবিরহিত বলিষ্ঠ সুপুরুষের সৌন্দর্য্য যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয় নাই, বরং প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যে সে সৌন্দর্য্য যেন স্নিগ্ধতা ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আর যৌবনের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাঁহার রূপহীন দেহে যে লাবণ্য বিকশিত হইয়াছিল, তাহা আজ অন্তর্হিত; তাই বসন্তের পর নিদাঘে ধরণীকে যেমন অত্যন্ত নীরস ও শ্রীহীন দেখায়, তাঁহাকে তেমনই রূপহীন দেখাইতেছিল। এ অনুভূতি মহালক্ষ্মীর পক্ষে এই প্রথম। সে অনুভূতিতে তিনি একটু চঞ্চল হইলেন।

সেই সময় দেবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটির এত দিন বিবাহ হয় নাই কেন?"

মহালক্ষ্মী বলিলেন,—"তোমাকে না পাইলে উহার ফুল ফুটিবে না বলিয়া।"

"মেয়েটির বয়স হইয়াছে!"

"তোমার সঙ্গে কি আর কচি খুকীর মানাইবে?"

"অমন রূপসীর এতদিন বিবাহ হয় নাই!"

দেবনাথের কথা মহালক্ষ্মীর বক্ষে প্রবল আঘাতের মত বোধ হইল। তবে স্বামী এতক্ষণ সৌদামিনীর কথাই ভাবিতেছিলেন; আর সৌদামিনীর রূপ তাঁহার কাছে এতই ভাল বোধ হইয়াছে! মহালক্ষ্মীর বক্ষে অভিমানের বিষম বেদনা অনুভূত হইল। তিনি স্বামীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

তাহার পর প্রবল অভিমানের বেদনা জয় করিয়া মহালক্ষ্মী আত্মত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বলিলেন,—"দেখ, ভাবিয়া দেখিলাম, মামার সঙ্গে ব্যবহারটা ভাল হয় নাই।"

দেবনাথ বলিলেন,—"আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু আর উপায় কি?"

"তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

মহালক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় দেবনাথ বিস্মিত হইলেন।

মহালক্ষ্মী বলিলেন,—"তোমার পুত্র নাই। কে পিতৃপুরুষকে জল দিবে? কে তোমার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে?"

দেবনাথ কিছু বলিলেন না।

বজরায় যে দুই দিন থাকিতে হইয়াছিল, সে দুই দিন দেবনাথ ও মহালক্ষ্মী উভয়েই কি ভাবিতেন—উভয়েই যেন অন্যমনস্ক। হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে মহালক্ষ্মী জয়ী হইলেন। তিনি স্বামীর বিবাহ দিবেন।

৬

পঞ্চগ্রামে আসিয়া মহালক্ষ্মী গুরুদেবকে ধরিলেন, স্বামীর বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। গুরুদেবের পত্র পাইয়া দেবনাথের কাশীবাসিনী জননীও পঞ্চগ্রামে আসিলেন। এবার আর দেবনাথের নিকট গুরুদেবের ও জননীর অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। সৌদামিনীর সহিত দেবনাথের বিবাহ হইয়া গেল।

তাহার পর মা কাশীতে ফিরিয়া যাইলেন,—গুরুদেব তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। গৃহে রহিলেন, দেবনাথ ও মহালক্ষ্মী; আর রহিল—সৌদামিনী।

সৌদামিনী অত্যল্পকালমধ্যেই আপনার ঘর হইতে আপনার অধিকার পর্য্যন্ত সব গুছাইয়া লইল। যেমন তরু তলদেশস্থ কোমলা লতাকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যতই শাখাবিস্তার করে, লতা ততই তাহার ছায়া হইতে বাহির হইয়া রবিকর উপভোগ করিতে চাহে—তেমনই মহালক্ষ্মী সৌদামিনীকে স্নেহস্নিগ্ধ শাসনে রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেন, সে ততই সে শাসন ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইত। সে চেষ্টায় সে সফলযত্নও হইত। তাহার প্রধান কারণ, দেবনাথের উপর মহালক্ষ্মীর প্রভাব কমিতে-ছিল—আর তাহার প্রভাব বাড়িতেছিল।

মহালক্ষ্মী যখন স্বামীর বিবাহ দিয়া মনে করিয়াছিলেন—তিনি স্বার্থ-ত্যাগের আত্মপ্রসাদে যথেষ্ট সুখ পাইবেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, উপেক্ষার বেদনা তাঁহাকে ব্যথিত করিবে। এখন তিনি তাহা বুঝিলেন। স্বামীর উপেক্ষায় কত যাতনা, তাহা তিনি বুঝিতে শিখিলেন।

সময় সময় এক একটা ঘটনায় মহালক্ষ্মীর হৃদয়ক্ষতে যেন ক্ষার নিক্ষিপ্ত হইত। বসন্তকুমার ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেশীর পুত্র, গ্রাম-

সম্পর্কে ভাগিনেয়। সে কিছুদিন পূর্ব্বে পঞ্চগ্রামের নিকটে জমীদারী কাছারীতে মুহুরীগিরি পাইয়াছিল। সে মধ্যে মধ্যে সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। সে মহালক্ষ্মীকে "দিদি" বলিয়া অত্যন্ত ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিত। মহালক্ষ্মীও তাহাকে কুটুম্বোচিত আদরে আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তাহার আগমনটা ক্রমেই ঘন ঘন হইতে লাগিল; আরও গুটিপোকা যেমন অল্পদিনে প্রজাপতি হইয়া উঠে, যুবক বসন্তকুমার বেশভূষায় তেমনই অল্প দিনেই জমীদারের গোমস্তা হইতে পূরা "বাবুতে" পরিণত হইল। তিনি এ বিষয়ে সৌদামিনীকে কি বলিবেন ভাবিতেছিলেন—এমন সময় বিন্দি একদিন তাঁহাকে বলিল, বসন্তকুমারের কথা লইয়া লোক "কাণাঘুষা" করিতেছে।

মহালক্ষ্মী সৌদামিনীকে বলিলেন,—"সদু, বসন্ত এত ঘন ঘন আসে, কায করে কখন? আর ও কয় টাকা বেতন পায় যে লম্বা কোঁচা ঝুলায়? তুই একটু টুকিয়া দিস্।"

সৌদামিনী বলিল,—"চাকরীতে বেশ দুই পয়সা আছে। দেখ, আপনার লোক থাকিলেই লোক দেখা করিতে আসিয়া থাকে। তাহাতে দোষ কি?"

"আপনার লোক আর কিসে? সম্পর্ক ত এক সূর্য্যে ধানভানার। না হয় আমিই বলিয়া দিব।"

মুখ অন্ধকার করিয়া সৌদামিনী চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে রাজমিস্ত্রী আসিল। মহালক্ষ্মী শুনিলেন, অন্দর-মহলের যে দিকে সৌদামিনীর ঘর, সেই দিকে একটা ঘরে ছিদ্র করিয়া নূতন সিঁড়ি হইবে। তিনি দেবনাথকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটা সিঁড়ি ফুটান হইতেছে কেন?"

দেবনাথ একটু বিব্রত হইলেন; বলিলেন,—"এ দিকে লোক-জনের যাতায়াতে তোমার অসুবিধা হয়।"

"আমার অসুবিধা? আমার কোন অসুবিধা নাই। আমি যে বসন্তের কথা বলিয়াছিলাম, সে সদুরই জন্য। আমার তিন কাল গিয়াছে—এক কাল বাকি। না হয় আমিই ঐ দিকে যাই। কেন ঘরটা নষ্ট করা—আর কতকগুলা টাকা খরচ করা?"

"না—না! আর ওদিকে দুইটা ঘর করিব মনে করিতেছি। তাহা হইলে একটা সিঁড়ি ফুটাইলেই সুবিধা হইবে।"

মহালক্ষ্মী আর কিছু বলিলেন না।

দেবনাথ চলিয়া যাইলেন।

গৃহগাত্রে মিস্ত্রীদিগের যন্ত্রের আঘাত-শব্দে মহালক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, আঘাত যেন তাঁহারই বক্ষে বাজিতেছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কয়মাস পরে সৌদামিনীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পঞ্চগ্রামের জমীদার-বংশের বংশধরের জননী হইয়া সৌদামিনী যেন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। কিন্তু মহালক্ষ্মীর ভাগ্যেও যেন কিছু শান্তিলাভের অবকাশ ঘটিল। ছেলের সব ভার তাঁহাকে দিয়া সৌদামিনী যেমন নিশ্চিন্ত হইল, সে ভার লইয়া তিনিও তেমনই নিশ্চিন্ত হইলেন।

৭

কয় মাস পরে দেবনাথ পশ্চিমে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি পশ্চিমে গিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষয়িক কাযের ঝঞ্ঝাটে গয়ায় যাওয়া হয় নাই। তাই এবার তিনি গয়ায় পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিয়া কাশীধামে বিশ্বেশ্বরকে ও স্বীয় জননীকে দেখিয়া ফিরিবেন। তিনি যাইবেন শুনিয়া সৌদামিনীও জিদ করিল, সে সঙ্গে যাইবে। দেবনাথ বিব্রত হইলেন; কিন্তু সৌদামিনীকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। ছেলে ধাত্রীর কাছে আর মহালক্ষ্মীর কাছে থাকে—সে জন্য সৌদামিনীর যাওয়া নিবারণ হয় না। আবার কবিরাজ মহাশয়ও বলিলেন, পশ্চিমের হাওয়ায় তাহার শরীর অতি সত্বর পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিবে। শেষে দেবনাথ তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

মহালক্ষ্মীর যাইবার কথা দেবনাথও বলিলেন না, মহালক্ষ্মীও বলিলেন না। পূর্ব্ববার তিনি স্বামীর সঙ্গে তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। এবার তিনি ছেলে লইয়া—সংসার আগলাইয়া গৃহে রহিলেন। সেবার বিন্দি যাইতে পায় নাই। এবার সে যাইতে চাহিল। তাহাকে লইবার ইচ্ছা সৌদামিনীর বড় ছিল না; কিন্তু সে অনেক বলিয়া সৌদামিনীর সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইল।

যাইবার দিন সৌদামিনীকে লোহার সিন্দুক হইতে সব গহনা বাহির করিয়া হাত-বাক্সে তুলিতে দেখিয়া বিন্দি বলিল,—"বিদেশে যাইবে, এত টাকার জিনিস সঙ্গে লইবে?"

সৌদামিনী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—"আমি কি দাসী—বাঁদী—দুঃখীর মত যাইব ?"

৮

দেবনাথ গয়ায় আসিলেন। গয়ালী বলিলেন, গয়ায় পিণ্ডদানাদির স্থান ৪৫ টি। সকল স্থানে নির্দ্দিষ্ট কায করা সময়সাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য। তাই অনেকে ফল্গুর বালুবক্ষে, বিষ্ণুপাদে ও অক্ষয়-বটমূলে পিণ্ড দিয়াই "সুফল" (সফলতা) লইয়া থাকেন। দেবনাথ কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কায শেষ হইতে আর এক দিন বিলম্ব আছে—এমন সময় দেবনাথ অসুস্থ হইলেন। পরদিন প্রাতে বাহির হইবার সময় তিনি বলিয়া যাইলেন—তাঁহার শরীর অসুস্থ, পরদিনই তিনি কাশী যাত্রা করিবেন। সৌদামিনী বলিল,—"তবে আমি আজই বুদ্ধগয়া দেখিয়া আসি!" দেবনাথ বলিলেন,—"সে-ই ভাল।"

সেই দিন প্রাতেই বসন্ত গয়ায় আসিয়াছিল। সে বলিল, "তবে আমি আজই পিণ্ডদান করিয়া আসি।" সে আপনার ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নে সৌদামিনী বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। বিন্দি সঙ্গে যাইতে চাহিলে সে বলিল, "না। কর্ত্তার শরীর ভাল নাই। যদি তিনি আমি ফিরিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আইসেন—খাবার গুছাইয়া দিতে হইবে। তুমি বাড়ীতে থাক। আহা! কখন কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস নাই; এত কষ্ট সহিবে কেন ?" একজন বৃদ্ধাদাসীকে সঙ্গে লইয়া সৌদামিনী চলিয়া গেল।

এদিকে অপরাহ্নে কায শেষ করিয়া প্রবল জ্বর লইয়া দেবনাথ গৃহে ফিরিলেন—ফিরিয়াই শয্যা লইলেন।

৯

সৌদামিনীর গাড়ী বুদ্ধগয়ায় মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইল। সে গাড়ীতে কয়টা জিনিস আনিয়াছিল। দ্বারবানকে সেগুলি আগলাইয়া থাকিতে বলিয়া দাসীকে লইয়া সৌদামিনী মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিয়াই দ্রুতপদে চারি দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। বৃদ্ধা দাসী অল্পক্ষণ ঘুরিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িল; তখন সৌদামিনী তাহাকে বলিল, "তুমি গাড়ীতে যাইয়া বিশ্রাম কর। আমিও যাইতেছি।" দাসী হাঁফ ছাড়িয়া [illegible]

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া দ্বারবান ঝিকে বলিল,—"মা ঠাকরুণ এখনও ফিরিতেছেন না কেন?"

ঝি বলিল, "তাই ত! বেলা যে যায়! আমি দেখিয়া আসি।"

সে এদিক ওদিক দেখিল; কোথাও সৌদামিনীকে পাইল না। তখন সে শঙ্কিত হইয়া ফিরিয়া আসিল—দ্বারবানকে সব কথা বলিল। দ্বারবান মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; তন্ন তন্ন করিয়া সব সন্ধান করিল। সৌদামিনী নাই! যে সব বালক একটা ঢেপুয়া পয়সার লোভে যাত্রীদিগের সঙ্গে ঘুরে তাহাদের কয়জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, বহুক্ষণ পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী মহিলা একজন বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চাদ্দিকের পথে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

দ্বারবান ছুটিয়া বাহিরে আসিল; যানচালককে দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখাইয়া দ্রুত যান চালাইয়া গৃহে ফিরিতে বলিল।

সব শুনিয়া বৃদ্ধ খাজাঞ্চী দ্বারবানকে সঙ্গে লইয়া দেবনাথের নিকট গমন করিলেন এবং সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করা যায় না। সব দিকে লোক পাঠাই।"

দেবনাথ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "কোন দিকে লোক পাঠাইও না।"

বিন্দি দ্রুত সৌদামিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল; গহনার বাক্সের তালা টানিয়া দেখিল, বাক্স খোলা—বাক্সে একখানি অলঙ্কার নাই। সে খাজাঞ্চী মহাশয়কে দিয়া সব সংবাদ বিবৃত করিয়া মহালক্ষ্মীকে পত্র লিখাইল।

বিন্দির পত্র পাইয়া মহালক্ষ্মী ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। সৌদামিনী আসিলেও যাহাতে ছেলেকে না পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া তিনি গয়াযাত্রা করিলেন।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া মহালক্ষ্মী গয়ায় পৌঁছিলেন। বিন্দি কয়দিন হইতেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাল্কীর বাহকের হাঁক শুনিয়াই সে ছুটিয়া সদর দ্বারে আসিল।

পাল্কী হইতে নামিয়াই মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ত্তা কেমন আছেন?"

বিন্দি বলিল,—"ইচ্ছাবসন্ত। তবে মা'র দয়ায়—খুব বাহির হইয়াছিল। শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

১০

দেবনাথের পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মহালক্ষ্মী বিন্দির সঙ্গে স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্য দাসদাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সহসা সম্মুখে মহালক্ষ্মীকে দেখিয়া লজ্জায়—দুঃখে—আত্মগ্লানিতে দেবনাথের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল—নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

বিন্দির দিকে ফিরিয়া মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্থ কোন খবর দিয়াছে ?"

বিন্দি বলিল, "না।"

মহালক্ষ্মী বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "সে কি ? বাপের অমন অসুখ শুনিয়া গেল—একটা সংবাদ দেয় নাই ?"

"বাপের অসুখ !"

"আমার যে এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া ভার। তাই শুনিয়াই ত আমি সন্থকে লইয়া যাইবার জন্য বসন্তকে পাঠাইয়াছিলাম। কেন সে কথা কিছু বলে নাই ?"

"না।"

হাজার হউক ছেলে মানুষ! পাছে কর্ত্তা যাইতে না দেন, তাই বলে নাই। বুদ্ধি বড় কম !"

মহালক্ষ্মীর উদ্দেশ্য দেবনাথ বুঝিলেন; তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মহালক্ষ্মী স্বামীর শুশ্রূষা করিতে বসিলেন। সৌদামিনী স্বামীর বিলাস-সহচরী—আদরিণী ছিল। তিনি স্বামীর ধর্ম্মপত্নী—গৃহের গৃহিণী। তাঁহার রোগে শুশ্রূষার—পুত্রকে লালনপালনের—গৃহে গৃহিণীপনার অধিকার তাঁহার। এই অনুভূতিতে তাঁহার সকল বেদনা—সকল অভিমান দূর হইয়া গেল!

মহালক্ষ্মীকে একাকী পাইয়া অপরাহ্নে বিন্দি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ব্যাপারটা কি ?"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "দেখ্, বিন্দি, এ কথা আর কখন বলিস্ না। আমার বাড়ীতে যে কখন সন্থর নাম করিবে, আমি তাহার মুখ দর্শন করিব না।"

তাহার পর তিনি বিন্দিকে দিয়া বৃদ্ধ খাজাঞ্চীকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে দিয়া পিত্রালয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখাইলেন। পত্র লিখাইবার সময় তথায় বিন্দি ব্যতীত আর কেহ থাকিতে পাইল না।

পত্র লিখা শেষ হইলে তিনি খাজাঞ্চীকে বলিলেন, "এ পত্রের কথা যেন আর কেহ জানিতে না পারে।"

খাজাঞ্চী বলিলেন, "মা, সে কথা আর বলিতে হইবে না। পেটের কথা পেটে রাখিতে না জানিলে এক বাড়ীর চাকরিতে চল্লিশ বৎসর কাটাইতে পারিতাম না।"

১১

দেবনাথ ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

এক দিন মহালক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র আসিল। দেবনাথ পত্র দেখিয়া মহালক্ষ্মীকে দিলেন! মহালক্ষ্মী পত্র লইয়া খাজাঞ্চীকে ডাকাইলেন। তিনি পত্র পড়িয়া মহালক্ষ্মীকে শুনাইলেন—তাঁহার মাতুল বোধ হয় এ যাত্রায় রক্ষা পাইবেন। কিন্তু পিতৃ-গৃহে যাইতে পথেই সৌদামিনীর প্রবল জ্বর হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে বসন্তও হইয়াছিল। পথে কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। পিত্রালয়ে পৌঁছিবার পরই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মহালক্ষ্মী বলিলেন, " যাহা হইবার হইয়াছে। এখন শ্রাদ্ধের আয়োজন করুন।"

যথারীতি সৌদামিনীর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইয়া রোগমুক্ত স্বামীকে লইয়া মহালক্ষ্মী পঞ্চগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। সৌদমিনীর পুত্র মহালক্ষ্মীর যত্নে পালিত হইতে লাগিল।

* * * * *

সৌদামিনীর সম্বন্ধে মহালক্ষ্মী বিন্দিকে যে আদেশ দিয়াছিলেন, সে আদেশ এমনইভাবে পালিত হইয়াছিল যে, দেবনাথের পুত্রের বিবাহের সময় পুরোহিত মহাশয় তাহাকে মাতার সপিণ্ডকরণ করিতে বলিলে, সে বলিল "মা বর্ত্তমানে আমি আর সপিণ্ডকরণ করিব কেন?"

পুরোহিতঠাকুর বলিলেন, "তোমার এ মা তোমার সৎ মা।"

"মা নিজে না বলিলে আমি এ কথা বিশ্বাস করিব না।"

পুরোহিতঠাকুর মহালক্ষ্মীকে সে কথা বলিলেন। মহালক্ষ্মী অশ্রুপূর্ণনেত্রে

পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, আমি তোমার সৎ মা নহি। আমি ছাড়া তোমার মা নাই; তুমি ছাড়া আমার পুত্র নাই। কিন্তু লোকাচারের জন্য তোমাকে এ সপিণ্ডকরণ করিতে হইবে।"

পুত্র সেই দিন জানিতে পারিল, তাহার আর এক মা ছিলেন।

মনস্কামনা।

বারি-বক্ষে, স্নেহময়ী জননীর বেশে
কুলু কুলু ধায় নদী কত দেশে দেশে।
ব্যথিত উপলে বনে করিয়া ভ্রমণ,
অকাতরে স্নিগ্ধ-বারি করে বিতরণ;
আপনার পথে যেতে, অশেষ কল্যাণ
সাধিয়া সে করে তৃপ্ত মানবের প্রাণ।
অসীমে সসীমটুকু মিশাবার তরে,
চলে দিবানিশি ছুটি একাগ্র অন্তরে।
ওই তটিনীর মত পূর্ণ মনোরথে,
ইচ্ছা সদা যাই চলি জীবনের পথে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুষ্প-নায়িকা।

(টেনিসন)

(১)

সকাল সকাল উঠে কাল, মা গো, আগেই আমাকে জাগায়ে দিও ;
কালিকার দিন চরম সুখের, ভোরেই আমারে ডাকিয়া নিও ;
হরষিত সারা নব বরষে, মা, সেরা কালিকার দিবসখানি ;
এবারের এই ফল্‌গুৎসবে আমি হ'ব কাল 'ফুলের রাণী'।

আছে হেথা ঢের নলিন-নয়না, নাহি আঁখি হেন উজল কারো ;
রয়েছে চন্দ্রা রয়েছে বৃন্দা ললিতা ইন্দু কতই আরো ;
তবুও তোমার মেয়েরের মত রূপসী নাহিক গ্রামেতে মানি'
আমাকেই এরা করেছে বরণ, আমি হ'ব কাল 'ফুলের রাণী'।

সারারাত আমি এমনি ঘুমাই ঘুম মোর, মা গো ভাঙিবে নাকো,
সকাল হ'তেই উঠে তুমি মোরে 'গায়ে ঠেলা দিয়ে' যদি না ডাকো,
টাট্‌কা গোড়ে ও ফুলের তোড়ার উঠেই জোগাড় দেখিতে হবে,
'পুষ্প-নায়িকা' হ'ব আমি কাল, ফুলরাণী হ'ব এ উৎসবে।

উপত্যকার পথে মোর, বল, অজয় ব্যতীত আর কে তবে
হেলি' সেতু'পরে মধুদ্রুমতলে আশাপথ মম চাহিয়া র'বে ?
স্মরিতেছিল সে ভ্রূকুটি আমার, গতদিনে যাহা গেছিনু হানি'
কিবা তা'য়, আমি হ'ব যে এবার 'ফাগুন-সভার ফুলের রাণী'।

ভেবেছিল সে, মা, ছায়াময়ী আমি, শুভ্র-বসনা ছিলাম কি না,
আমিও আলোক-ঝলকের মত আসিলাম দ্রুত বচনহীনা।
লোকে বলে মোরে নিদয়-হৃদয়া, সে কথা কি কভু গ্রাহে আনি,
এবার যে আমি হইতে চলেছি ফল্‌গুৎসবে 'ফুলের রাণী'।

শুনি, সে মরে, মা, প্রেমেরই জন্য—হ'তেই পারে না এমন কথা ;
শুনি, ভেঙ্গে গেল হৃদয় তাহার—আমার কি তা'তে মাথার ব্যথা ?
আছে বীর যুবা হাজার হাজার, যাচিবে যা'রা এ কমল-পাণি,
এইটেই কেন দেখ না, মা, ভেবে, আমিই এবার 'ফুলের রাণী'।

'পাত্মরান্থ' সে ত সঙ্গে আমার যাবেই কল্য হরিৎ-ক্ষেতে,
দেখিতে আমায় ফুলরাণী-সাজে ; তোমাকেও সেথা হ'বে, মা, যেতে ;
শত শত শত রাখাল-বালক দূর গ্রাম হ'তে আসিছে জানি'
আমি হ'ব কাল 'ফুলরাণী', মা গো, আমি হ'ব কাল ফুলের রাণী।

সুরভি পুষ্প তুলি তরু রচেছে তোরণ কুঞ্জাকারে,
মহুয়া ফুলের মৃদু সুগন্ধ ভাসিছে মাঠের পরিখা-পারে,
গাঁদার পর্ণ ঢালিছে স্বর্ণ আর্দ্র-ভূমির শীকর টানি',
আমি হ'ব কাল 'ফুলরাণী', ও মা, আমি হব কাল 'ফুলের রাণী'।

আসে যায়, মা গো, নিশার বাতাস চুম্বন দিয়া ঘাসের শিরে,
মনে হয় যেন তারকপুঞ্জ উজলে তা'দের গতিটি ঘিরে ;
এক কোঁটা জলও করিবে না ম্লান গতি-মন্থর দিবসখানি,
আমি হ'ব কাল 'ফুলরাণী' মা গো, আমি হব কাল ফুলেররাণী।

সারা সমতলে ভাতিবে, মা, কাল শুদ্ধ নবীন শ্যামল শোভা ;
লতাগুল্মের আলিম্পনায় অঙ্কিত গিরি লোচনলোভা ;
নাচিবে তটিনী পুলক-নৃত্যে কুসুম-বিছানো উপত্যকায়,
আমি হ'ব কাল 'পুষ্প-নায়িকা' মধুবসন্ত-বাসর-সভায়।

[illegible] প্রভাতে উঠিয়া জাগা'বে আমারে সকাল সকাল
হরষিত নব-বর্ষের সেরা মধুর দিনটি আসিছে, মা, কাল ;
সারা বছরের [illegible] চরম কি সুদিন, মা গো, আসিছে নামি'
এবারের [illegible] উৎসবে পুষ্প-নায়িকা—সে এই আমি !

(২)

(বর্ষ পরে)

জাগাও জাগাও মোরে, জাগাইও, মা আমার, যদি তব ঘুম ভাঙ্গে আগে,
বারেক দেখিতে চাহি, তরুণ অরুণোদয় নব বরষের উষারাগে।
এই শেষ নববর্ষ জীবনে দেখিব আমি, নাহি আশা আর দেখিবার,
তা'র পর দিও ধীরে ভূমিতলে শোয়াইয়া, ভুলে যেও জননী আমার।

সায়াহ্নে দেখেছি আজ তপন গিয়াছে ডুবি'—ফেলে রেখে গেছে পিছে তা'র
স্মরণীয় বরণীয় পুরাণ বরষটিরে, শান্তিসুখ প্রাণের আমার;
আসিছে নবীন বর্ষ, মা আমার, মা আমার, আমি আর পা'ব না দেখিতে
ডালে ডালে ফুলশোভা, কিশলয় মনোলোভা শাখে শাখে প্রতি বিটপীতে।

বিগত ফাগুন মাসে মুকুট পড়েছি ফুলে, লভিয়াছি প্রাণভরা সুখ
তমালতরুর তলে করি' মোরে 'ফুলরাণী' ভরি' দে'ছে তাহারা এ বুক;
নাচিয়াছি মাতোয়ারা, পুলকে আপনাহারা, নাচিয়াছি বাদাম কাননে,
তা'র পর? থাক্ থাক্, সে সব পুরাণ স্মৃতি আজ আর রাখিব না মনে।

একটিও ফুল আজ ফুটেনি ও শৈলচূড়ে; তুষারে জানালা আছে ঢাকি',
সাধ হয় যে অবধি না ফোটে ঝুম্‌কো-ফুল, সে অবধি যেন বেঁচে থাকি;
তুষার গলিয়া গিয়া ঊর্দ্ধ নীলে নভবুকে তপন-দেবতা যেন জাগে,
বড় সাধ দেখে যা'ব একটি কুসুম আমি মরিবার দিনটির আগে।

পবন-প্রবাহেদোলা ছায়া-তরুশাখে বসি' বায়স ডাকিবে 'কা' 'কা' করি'
সারসের ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁশরী উঠিবে বাজি' পতিত ও তৃণভূমি ভরি',
বাবুই আসিবে ফিরে, নিদাঘ ঋতুরে ঘিরে, চে'য়ের উপর দিয়া উড়ি'—
ঘুমাব তখন একা, জননী গো, র'ব আমি ভূতল-সমাধি-তলে পড়ি'।

আচার্য্যের বেদীমূলে, আমার সমাধিকূলে, একই সাথে পড়িবে আসিয়া
নিদাঘ-রবির, মা গো, প্রথম কিরণখানি প্রফুল্লতর সমীরে ভাসিয়া;

তখনো গা'বে না পিক মুখরিত করি' দিক, পাহাড়ের কৃষিভূমি-বুকে,
আরাম শয়নে, মা গো, তখনো ঘুমাবে তুমি, জগৎ ঘুমায়ে রবে সুখে।

নিবিড়-তিমির-ভরা কানন-আঁচল হ'তে মিষ্ট স্নিগ্ধ স্যাঝের বাতাস
দোলায়ে যবের শীষ, মর্ম্মরিয়া শরবনে নাচাইবে যবে 'নেবুঘাস'।
পাণ্ডুর চাঁদিমাতলে যখন কুসুমপুঞ্জ ধীরে ধীরে উঠিবে হাসিয়া,
তুমি আর, মা আমার, ধূসর প্রান্তরে মোরে দেখিবে না বেড়াতে ভাসিয়া।

তমাল তরুর ঐ শীতল ছায়ায়, মা গো, রচে' দিও সমাধি আমার,
অবসর-মত আসি' দেখো সে সমাধি যেথা ঘুমাইবে তনয়া তোমার,
ভুলিব না, ভুলিব না, জননী, তোমারে আমি—অনুভবে বুঝিব শিহরি'
আমার শিয়রে তব কোমল চরণ-পাত ফুল্ল শষ্প-গালিচা-উপরি।

ছিলাম উদ্দাম, মা গো, দিয়াছি কতই ক্লেশ কত দিন অভিমানে, রাগে,
ক্ষমা করি' সব আজ, জননী, চুম্বন দাও একবার মরিবার আগে ;
না, না,—ওকি,কেঁদ না, মা,কেঁদ না,হৃদয় বাঁধো,বিষাদ আসে না যেন ছেয়ে
শুকায়ে যেও না শোকে, জননী করুণাময়ী, রয়েছে ত আর তব মেয়ে।

পারি যদি আসিব, মা, আবার আসিব ফিরে ত্যাগ করি' বিরাম-শয়ন,
দেখিতে পা'বে না তুমি, আমি ও মুখের পানে চেয়ে র'ব তৃষিত-নয়ন ;
না হয় কহিতে কথা না'ই পারিলাম, তবু, শুনিব যা' কিছু তুমি কহ,
হয়ত ভাবিবে তুমি, আছি কোথা কতদূরে—আমি রব কাছে অহরহঃ।

বিদায়, বিদায়, মা গো, যখন বলিব আমি—"চিরতরে তা' হ'লে বিদায়"
তখন দেখিতে পা'বে ধরাধরি করি' সবে আমারে বাহিরে লয়ে যায়।
'পানু' যেন নাহি আসে আমার সমাধিপাশে যতদিন না গজায় ঘাস,
হবে, মা, আমার চেয়ে 'পানু' তব ভাল মেয়ে, দেখো মোর মিছে না এ
আশ।

বল' তা'রে গোলাঘরে মেঝেয় রহিল পড়ি', বাগানের যন্ত্রপাতি নানা ;
সব তা'রে নিতে দিও ; তাহারেই দিয়া গেনু ; আমি আর কিছুই চাহি না ;
তবে এক কথা, যেন দেখে, মা, সে প্রতিদিন আমার গোলাপ-ঝাড়টিকে,
যতনে রোপেছি যা'রে বাহির-জানালা-ধারে, টগর গাছের চারি দিকে।

আজ তবে আর নয়; দেখো, মা, ভুল' না মোরে ডেকে দিও ভোরে
ভোরে কাল,
সারাটি রজনী আমি জাগিয়া পড়িয়া থাকি, ঢুলে পড়ি হইলে সকাল;
তবু বড় সাধ, দেখি তরুণ অরুণোদয় নব বরষের উষাভালে,
যদি তব ঘুম ভাঙ্গে, আমারে তুলিও ডেকে কাল তবে সকালে সকালে।

(৩)

(উপসংহার।)

ভেবেছিনু এ জীবন আগেই ফুরাবে তবু এখনো ত বেঁচে আছি প্রাণে;
মাঠে মাঠে চারিদিকে ভাসিয়া মেষের রব পশিতেছে আসি মোর কাণে।
মনে পড়ে, ফুটেছিল নববরষের উষা কি করুণ, পূরব আকাশে
'তুষার-ফুলের' আগে মূরছি পড়িতে পুনঃ, আজ দেখি জবা শুধু হাসে।

মধুর মধুর ঐ লোহিত জবার আভা তলদেশে নীল আকাশের,
মধুর মধুরতর তরুণ মেষের রব শ্রবণে এ শয়ন-লীনের,
বড়ই মধুর আহা চারিদিকে ধরাতল, ফুলগুলি ফুটে যাহা গাছে,
জীবনের চেয়ে আজ মরণ মধুরতর মোর কাছে—মরিলে যে বাঁচে।

আগে মনে হ'ত, মা গো, এই তপনের দেশ পারিব না ছেড়ে যেতে কভু;
আজ ভাবি, এই দেশে থাকাই যাতনাময়, ইচ্ছা তাঁ'রি পূর্ণ হ'বে তবু!
তথাপি এ আশা আছে, আচার্য্য শ্রবণে মম মুক্তিমন্ত্র দে'ছেন যখন
জীবন-বাঁধন হ'তে লভিতে মুকতি আর লাগিবে না বড় বেশী ক্ষণ।

ঝরিয়া পড়ুক তাঁর শুভ্রকেশে স্নেহভাবে শুভাশীষ পরমপিতার,
সুখে, মা, থাকুন তিনি যতদিন স্বরগে না দেখা হয় দুজনে আবার,
তাঁ'র শুভ্রশির আর কোমল হৃদয় যেন শান্তি পায়, এই নিবেদন
করিয়াছি শতবার, যবে জানু দু'টি তাঁ'র পরশিল এ রোগ-শয়ন।

আমার সকল পাপ দেখায়ে চাহিতে ক্ষমা শিখাইয়া দিয়াছেন তিনি।
দেরীতে জ্বেলেছি দীপ—হোক্, একজন আছে' কোলে মোরে টানিবেন
যিনি;
হয় ত সারিয়া পুনঃ পারিতাম উঠিবারে, তবুও, মা, উঠিব না আর
হৃদয় আকুল মম চলে যেতে তাঁ'র কাছে এ জীবন জ্যোতিঃ-কণা যাঁর।

কাঁপে নি হৃদয় মোর মরণ-ঘড়ির তালে, অশুভ সে সারমেয় রবে,
কি সুখ-সঙ্কেত যেন পাইনু উষসী আসি' যামিনীরে আলিঙ্গিল যবে ;
হোক্ তবু এস তুমি, বস, মা, আমার পাশে, করে মম রাখ কর দুটি,
এ পাশে বসুক্ 'পানু' ; যাবার সময় হ'লে, তা'র পর লয়ে যাব ছুটী।

সারাটি সকাল আমি শুনিতেছিলাম যেন ডাকে মোরে স্বরগ-দূতেরা,
মিলাইতেছিল যবে চাঁদিমা আকাশ-নীলে—আবছায়ে ধরা ছিল ঘেরা ;
তরুতে তরুতে যবে চলেছিল কাণাকাণি, বাতাসে পড়িয়াছিল সাড়া
সে সারা সকাল মম প্রাণ পাখীটিরে যেন কেবলি ডাকিতেছিল তা'রা।

স্থির জাগরণে যবে জাগিয়া ভাবিতেছিনু 'পানু' আর তোমারি সে কথা
দেখিলাম, তুমি যেন রয়েছ আবাসে বসি', আমি আর নাহি গো, মা,তথা ;
প্রাণপণে দোঁহা লাগি' প্রার্থনা করিনু, শেষে পড়িলাম অবসন্ন হিয়া,
অমনি শুনিনু যেন কি-এক সঙ্গীত আসে উপত্যকা হইতে ভাসিয়া।

ভাবিলাম, বুঝি বা এ মনের বিকার শুধু রহিলাম পাতিয়া শ্রবণ,
কি-যেন-কি-কথা কা'রা কহিল, মা, কাণে কাণে—কি সে কথা নাহি' তা' স্মরণ ;
কেবল মরমখানি কি গূঢ় পুলকে, মাগো, শিহরি' উঠিল বার বার,
সেই গীতিসুধা ঐ উপত্যকা হ'তে, শুনি ঝরিল, মা, আবার—আবার।

তোমরা ঘুমায়ে ছিলে, আমি বলিলাম—"ইহা মোর তরে ; ইহাদের নয়",
ভাবিলাম মনে মনে, যদি আসে তিন বার, বুঝিব যে হয়েছে সময়।
আসিল আরেক বার, এবার নিকটে আরো, একেবারে জানালার গায়,
তার পর যেন উঠি' গগনে গগনে লুটি' মিলাইল তারায় তারায়।

এইবার তবে বুঝি সময় এসেছে কাছে ; আসিয়াছে আসিয়াছে ঠিক ;
যে পথে যাইতে হ'বে, ঐ গান দিয়া গেল দেখাইয়া মোরে সেই দিক।
ভাবি না নিজের তরে কিছুই ভাবি না আর, আজই যদি চলে যেতে হয়,
'পানুকে' যতনে রেখো,দেখো মা তাহাকে দেখো,আমি গেলে ছাড়ি' এ আলয়।

আর, মা, অজয়ে দিও দুটি সান্ত্বনার বাণী, মানা ক'র' শোকে হ'তে সারা,
ব'লো,আছে মোর চেয়ে শত যোগ্যতর মেয়ে,সুখী তা'রে করিবে যাহারা।
বাঁচিলে হয় ত আমি, বলিতে পারি না—তবু, হয় ত বা হইতাম তা'র,
কিন্তু থেমে গেছে সব, সে সম্ভব-অসম্ভব, অবসানে আয়ু-মমতার।

*　　*　　*　　*

ঐ দেখ, মা গো, দীপ্ত আকাশ　　চাহিছে তপন নয়ন তুলি',—
যত মাঠে ঝলে কিরণ-ঝালর　　পরিচিত মোর সে সবগুলিই।
আমি আর সেথা ভ্রমি না সত্য,　　রবি-করে তবু রহিবে জাগি'
উপত্যকার বনফুলগুলি　　অপরের ব্যবহারের লাগি'।

এ বড় মধুর, বিচিত্র, যে, মা,　　যে স্বরে এখন ফুটিছে বাণী,
হ'তে পারে দূর অন্ত-পারের　　না ফুরাতে এই দিবসখানি—
সত্য পরম-আত্মা-সাগরে　　রব অনন্ত বরষ ধরি'—
কিসের জীবন? কেন বা দুঃখ?　　কেনই বা মিছে জ্বালায় জ্বরি?

অনন্তকাল, অনন্তকাল, একই বিপুল বিরাট নীড়ে—
ক্ষণ-প্রতীক্ষা-অবসানে পুনঃ তোমারে, পান্থরে, পাইব ফিরে—
পরমপিতার চরণ-বিভায় ঘুমা'ব, যেন সে তোমারি বুকে—
থেমে যাবে সব দুখ-কলরব, ক্লান্তি ঘুমাবে শান্তিসুখে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

রঘু পাগ্‌লা।

দেখ, হয় আমাকে যেমন সর্ব্বদা ডাকিয়া থাক, তেমনই 'রঘো' বা 'রঘু পাগলা' বলিয়া ডাকিও, আর না হয় 'বোকা' 'হতভাগা' যাহা বলিতে হয়, তাহা বলিয়া ডাকিও ;—কিন্তু খবরদার ! অমন করিয়া দন্তপাটী বিস্তৃতিপূর্ব্বক 'রঘু-নাথ' বলিয়া আমাকে কেহ ডাকিও না, আমি অমন পোষাকে নাম শুনিতে চাহি না। তোমরা যখনই বল 'রঘুনাথ, অমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাণের কাছে বাজিয়া উঠে 'দেবশর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্য, স্বর্গীয় রামতনু বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পুত্র।' কেন বাপু, আমার মনের মধ্যে সে সকল কথা জাগাইয়া দিয়া তোমাদের লাভ ?

আমি 'রঘো পাগলা'—বেশ ! তোমরা দশ জনে যদি আমাকে পাগলা বলিয়াই খুসী হও,—বেশ, আমি তাহাতে ত মোটেই রাগ করি না। আমাকে যে পাগল বলে, তাহাকে অমনই শুনাইয়া দিই—

এসে এক রসিক পাগল বাধালে গোল,
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যা'ব পাগল হ'ব
দেখ্‌ব রসের নব গোরা।

পাগল বলিলেই হয় না। পাগল হওয়া মুখের কথা নহে। গাঁজা, ভাঙ্গ, সিদ্ধির নেশায় অনেকে পাগল হইতে পারে ; কিন্তু আসল পাগল হওয়া বড় শক্ত রে বড় শক্ত। সেই—সেকালে একজন হইয়াছিল ; তাই সে সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিল। আর এক পাগল সেবার—সেই যে সেবার নবদ্বীপে আসিয়াছিল। জান না ? সেই পাগল। সে বলে কি—

মেরেছে মেরেছে কলসীর কাণা,
তাই ব'লে কি প্রেম দেব না॥

এই দুই পাগল। আর তোমরা যত সব ছেঁচড়া মানুষ, ইঁদুরের ঢিবি দেখিয়াই হিমালয় পর্ব্বত ভাব—তোমরা বল কি না 'রঘো পাগলা !' তোদের কথা শুনিলে হাসিও পায়, আবার সে কথাও বলি, কান্নাও পায়। তখন মনে হয়—

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়,
কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে,
হিয়ে আমার ফেটে যে যায়।
আমি, সযতনে যে রতনে
রেখেছিলাম পুরে হিয়ায়;
আমার ঘুমের ঘোরে চুরী ক'রে,
সে রতন কে নিল রে হায়!
আমি, সব হারায়ে যে ধন ল'য়ে
বাস করিতাম এ ঘরতলায়;
যদি গেল সে ধন, বল এখন,
করে কাঙ্গাল আর কি উপায়।

আচ্ছা, কান্না পায় না? এই সকল কথা বলিতে গেলেই লোকে বলে পাগল। দূর ছাই, আমি কি কাহারও সঙ্গে গায়ে পড়িয়া কথা বলিতে যাই। এই লোচনপুর গ্রামে যদি কেহ থাকে আসিয়া বলুক না যে, রঘো তাহার একটি কাণা কড়িও ধারে। ধার করিব কেন? বাবা ৺ রামতনু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কি যে সে লোক ছিলেন। এ তল্লাটে তাঁহাকে জানিত না কে, চিনিত না কে? তিনি যখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন, তখন রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ ঘর ব্রাহ্মণ যজমান (আমরা অশূদ্রযাজী) আর ত্রিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী; আর আমার মত ব্যাকরণ-সাহিত্যে পণ্ডিত দ্বাবিংশ বর্ষবয়স্ক আত্মজ শ্রীরঘুনাথ দেবশর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যতীর্থ। আমি পরের দ্বারেই বা যাইব কেন, পরের কাছে ধারই বা করিব কেন; কি দুঃখে?

বাবা মারা গেলেন, শ্রাদ্ধ শান্তি হইয়া গেল; দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সপরিবারে আসিয়া আমার দায় উদ্ধার করিয়া দিয়ে গেলেন—যজমানরা বিলক্ষণ সাহায্য করিলেন। তাহার পর গ্রামে যত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং এখনও আছেন, তাঁহারা সকলেই অনুরোধ করিলেন যে, আমার এক্ষণে বিবাহ করা কর্ত্তব্য, গৃহে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য; স্বর্গীয় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের যে পদ প্রসার ছিল, তাহা অচিরেই আমি অধিকার করিতে পারিব, কেন না, আমি ইতোমধ্যেই সাহিত্য-তীর্থ উপাধিভূষিত হইয়াছি। তাঁহাদিগের এই সকল পরামর্শসম্বন্ধে একটা বিবেচনার প্রয়োজন হইল। প্রথম কথা এই বুঝিলাম যে, গৃহে স্ত্রীলোক না থাকিলে ঘরদ্বার দেখে

কে, "জিনিসটা পত্তরটার" সুব্যবস্থা করে কে, যথাসময় অন্ন দেয় কে? কথাটা খুব ঠিক। তাহার পর বিবাহ করিয়া স্ত্রী গৃহে আনিলে ক্রমে সন্তানাদি হইবে, বৃহৎ পরিবার হইবে; সুতরাং চতুষ্পাঠী স্থাপনাদিদ্বারা চারিদিকে অধ্যাপক বলিয়া খ্যাতি প্রচারের প্রয়োজন হইবে, যজমানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ত্রিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তরে তখন আর চলিবে কেমন করিয়া? কাযেই দুই একখানি তালুকও কিনিতে হইবে। তাহার পর এই জীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর কি আর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-তীর্থের বাসের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে? তখন সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকার বিশেষ প্রয়োজন হইবে। তাহার পর বিষয়ী লোক হইলেই দশটা মামলা মোকর্দ্দমা করিতে হইবে, দশটা মিথ্যা সাক্ষ্য, দশখানা জাল দলিল প্রভৃতি সমস্তই করিতে হইবে। কেমন? ব্যস্, সব হইয়া গেল।

তখন আগা গোড়া ঠিক নামাইয়া দেখিলাম যে, এই যে সব জঞ্জাল স্কন্ধে করিতে যাইতেছি, ভবিষ্যতে এই যে সকল অবস্থা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা,—তাহা কিসের জন্য। আমি বিনা আয়াসে, বিনা শাস্ত্রালোচনায়, অতি সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রতিদিন হাত পুড়াইয়া নিজের দুইটি অন্ন প্রস্তুত করিবার ভয়েই এই গ্রহের সৃষ্টি—এই সং-সাজা রে, সং-সাজা। খ্যাপা কি সাধে গাহিয়াছেন;—

কারে তুই দেখ রে সং, বল দেখি মন
হাসিস্ এমন হা হা করে।
সংসারে সকলেই সং, ভেবে দেখ মন,
সংসারে সং ছাড়া নেই রে;
কেহ বা সংসার ছেড়ে সং সেজেছে,
সংসারে কেউ সং সাজে রে।
ভূমিষ্ঠ হলি যখন, তখনই সং সাজিলি মন,
ভেবে দেখ রে;
কাটালি ছেলে বেলা, করে খেলা
মেখে ধুলা সব শরীরে।
যৌবনে ঘোর সংসারী, চিরু বেড়ি
পায়ে পড়ি বেড়াও ঘুরে;
আবার তোর এ কি সাজা, পরের বোঝা,
বও রে সদা লয়ে শিরে।

অতএব স্থির করিলাম,—একেবারে পাকা স্থির যে, আমার উদর পোষণের হেতু যে অন্নব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন, তাহার সংযোজন ও রন্ধনক্রিয়া আমি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারিব। ঘরদ্বার প্রভৃতি দেখা শুনা, তাহা মা'র মৃত্যুর পর বাবা বাঁচিয়া থাকিতেও যে সোণার মা দেখিয়া আসিতেছে, এখনও সেই দেখিবে। মা'র মৃত্যুর পর এই চারি বৎসর যদি বাবা দ্রব্যাদি সংগ্রহ-সংরক্ষণ-কার্য্যে কোন ত্রুটি প্রদর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে আমি তাহা পারিব না কেন? বরঞ্চ বার্দ্ধক্য বিধায় তিনি যাহা সম্যক্‌রূপে করিতে পারিতেন না, আমি তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

তাহার পর চতুষ্পাঠী-স্থাপনের কথা। ভারি এক ছটাক সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছি; তাহাই লইয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসি আর কি? আর তাহাতে লাভ? গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্তান তিনপাতা মুগ্ধবোধ, রঘুর দুই চারিটা সর্গ পাঠ শেষ করিয়া এক একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া বসিবে, শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্রীয় ব্যবহার করিবে, গর্ব্ব অহঙ্কারে ধরাকে সর্ষপবৎ জ্ঞান করিবে; আর যজমানের গৃহে কোন অনুষ্ঠানের সময় প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায় অনুসন্ধান করিবে; তাহার ফলে নিজে ত নিরয়গামী হইবেই—যে অধ্যাপক তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও পাপের ভাগী করিবে। এমন কর্ম্ম আমি করিতে পারিব না। বরঞ্চ বাহিরের উঠানে দুই তিনখানি লম্বা ঘর তুলিয়া তাহাতে গো-শালা প্রতিষ্ঠা করিব, কিন্তু পাঠশালা—চতুষ্পাঠী আমি বসাইতে পারিব না।

এই সকল যখন স্থির হইল, তখন এক দিন আমার পিতার সেই ৭০ ঘর যজমানকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে, অতঃপর আমার দ্বারা তাঁহাদের যজন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, আমার সম্পূর্ণ সময়াভাব, বিশেষতঃ উক্ত কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অনাস্থা। এ অবস্থায় তাঁহারা যেন অন্য পুরোহিতের ব্যবস্থা করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র গ্রামের অনেক ভদ্রলোক আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সকলেই নানা তর্ক-বিতর্ক, প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়; অতএব আমি আমার পাগলামি ত্যাগ করি। আমি তাঁহাদিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা ঠিক, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, অনুষ্ঠানের ভাণ করিয়া, আমি পাপের ভার

যুক্তি করিতে পারিব না; আমার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে পুরোহিতের কায চলিবে না; তবে যদি কেহ "নখ দন্ত ভাঙ্গা এক্ পোষা পুরোহিত" চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশে তাহা অসংখ্য পাইবেন, তাহার অভাব নাই। তখন সকলে একবাক্যে সেই বৈঠকে স্থির করিলেন যে, আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে, আমি মনুষ্য নামের যোগ্য নহি। তথাস্তু!

যাহাদের মধ্যে আমাদিগের সেই ৩০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর বন্দোবস্ত করা ছিল, তাহারা মনে করিল, ভাল পাগলের সম্পত্তি তাহারা নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল করিতে থাকিবে। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল,"রঘো পাগলার"সে দিক্ ঠিক আছে। ঐ ত্রিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তরই যে এখন আমার সম্বল; তাহাতে অযত্ন করিলে চলিবে কেন? তখন তাহারা বলিল, আমি "সেয়ানা পাগল", আমি আপন গণ্ডা বেশ বুঝিয়া লইতে জানি। কিন্তু ক্রমে সকলেই বুঝিল যে, আমি আপন গণ্ডাও বুঝি, পরের গণ্ডাও বুঝাইয়া দিতে জানি। এই আমি— "রঘো পাগলা।"

আমি এখন কি করি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসি, তাহার পর নিজে যাহা বুঝি, নিজে যাহা ভাবি, সেই হিসাবে ইষ্টদেবের পূজা অর্চ্চনা শেষ করি; তাহার পর গ্রামের মধ্যে বাহির হই। যাহার যাহা কিছু অভিযোগ, যাহার যাহা কিছু আবদার, সব এই রঘুর কাছে। রঘু সকলের জন্য খাটিয়া, যথাসাধ্য করিয়া কোন দিন বেলা দ্বিপ্রহর, কোন দিন আড়াই প্রহর, কোন দিন একেবারে অপরাহ্নকালে ঘরে ফিরিয়া আইসে। তখন ইচ্ছা হয়, দুইটা আতপান্ন প্রস্তুত করিয়া উদর-দেবের তৃপ্তি সাধন করি, আর না হয় মুড়ি-গুড়-নারিকেলদ্বারা উৎকৃষ্ট জল-যোগ সুসম্পন্ন করিয়া দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বিশ্রাম করি। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা গায়ত্রী শেষ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া গান করি;—

তারা, কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার-গারদে রাখিস্ বল্।——

এমন সময় হয় ত শিরোমণি দাদার মেয়ে পুঁটী আসিয়া ডাকে, "ও মামা! তুমি ব'সে গান গাইছ। বাবা বাড়ী নেই,লক্ষ্মীপুরে কালীপূজো করতে গেছেন; এ দিকে ছোট খোকা যে পাঁচ বার ভেদ হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। শীগ্‌গীর এস, শীগ্‌গীর এস।" তখন আর কি করিব! তাড়াতাড়ি উঠিয়া

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শিরোমণি দাদার বাড়ীর দিকে দৌড়াই, আর মনে মনে বলি, "ওরে মায়া-বেড়ী কেটে এবার সংসার আমায় দে ছেড়ে।"

এমনই করিয়া আজ ইহার বাড়ী অসুখ, কাল উহার বাড়ী শ্রাদ্ধ, পরশু তাহার বাড়ী অন্নপ্রাশন; আজ ইহার ছেলেটি জন্মাইল, কাল উহার মেয়েটি মারা গেল—গ্রামের এই সব লইয়া আছি। আমি এখন এই গ্রামের সরকারী রঘু; মান-সম্ভ্রমের কথা নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, বড় ছোট নাই—বিপদে পড়িলেই রঘু; আবার সুখের সময়, মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না,—সুখের সময়ও রঘু। আজ মতি হালদারের নূতন পাশ-করা জামাই আসিয়াছে—যা যা, রঘুকে খেতে ব'লে আয়। আজ মুখুয্যেদের নূতন গাছের কাঁঠাল পাকিয়াছে,—যা, যা, রঘুকে ব'লে আয়, আজ দুপুরে যেন এখানেই খায়। গ্রামে আছি ভাল—বেশ আছি।

কিন্তু দেখ, যত গোল বাধে আমার এই সকল পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে। আমি এই সকলগুলি যেন দেখিতে পারি না, দেবতা লইয়া এ খেলা দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া কান্না আইসে; আমার মনে হয়, আমরা কি মানুষ—না পশু? দেবতার সঙ্গে চালাকী। এই যে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়, এই সকলে আমি কখনও যোগ দিই নাই—দিবও না। কোন বাড়ী আমি কোন পূজায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাই না—যাইতে আমার মন সরে না। এই দেখ না, সম্মুখে দুর্গোৎসব আসিতেছে। কি প্রতারণা! কি আত্মপ্রবঞ্চনা! আর সে কি যাহাকে তাহাকে লইয়া—মা আদ্যাশক্তিকে লইয়া খেলা! তখন আমার কাঙ্গালের সেই গান মনে হয়—

শক্তিপূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত, চির দিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায় শক্তিপূজা হয় না;
এক মনো-বিল্বদল, ভক্তি-গঙ্গাজলে,
শতদল দিলে হয় সাধনা (হৃদয়)।
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞানদীপ জেলে, একান্ত ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি বিচারে শক্তিপূজা হয় না;
সকল 'বর্ণ' এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।

এই সকল কথা ভাবিয়াই আমি কোন দিন কাহারও বাড়ীতে পূজায় যোগ দিই না; পূজার সময় আমি আমার গৃহে বসিয়া থাকি, আর এই সব কথা ভাবি।

এবার কিন্তু আমাকে বড়ই জ্বালাতন হইতে হইতেছে। আমাদের গ্রামের হরিশ মুখুয্যে গৃহস্থ মানুষ। এতদিন কোন রকমে তাহার দিন কাটিতেছিল; কতকগুলি ছেলে মেয়ে লইয়া ব্রাহ্মণ সংসার-ধর্ম্ম করিতেছিল। তাহার বড় ছেলেটা আজ তিন চারি বৎসর হইল নারায়ণগঞ্জে কোন এক পাটের আড়তে চাকরী করিতেছে। সে নাকি বিলক্ষণ দশটাকা রোজগার করিয়া থাকে; গত বৎসর দেখিলাম, সে বাড়ীতে কএক খানা বড় বড় টিনের ঘর তুলিল। যাউক, লোকের ভাল হয়, লোকের দুর্দ্দশা ঘুচে—বেশ কথা; কিন্তু এমনই করিয়া কি দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইবে। মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে গোপাল সামান্য লিখা-পড়াই শিখিয়াছিল। তাহাতে সে যে সৎপথে থাকিয়া এত টাকা রোজগার করে, তাহা ত আমার মনে হয় না। সেই গোপাল এবার এবার বাড়ীতে পূজা করিবে—মহা ধূমধামে দুর্গোৎসব করিবে। শুনিলাম, ইহার মধ্যে সে প্রায় দেড় হাজার টাকা বাড়ীতে পাঠাইয়াছে। পূজায় নাকি খুব আমোদ আহ্লাদ হইবে, প্রচুর আহারের আয়োজন হইবে, কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আসিবে, আর নাকি বারাঙ্গনার দল আসিবে। তাই হরিশ মুখুয্যে আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"রঘু, তুমি ত এ সবে যাও না, তা জানি; তবে কি জান, গোপাল ত তোমারই ছোট ভাই-য়ের মত। মা যদি মুখ তুলিয়া চাহিয়াই থাকেন, তবে তা'র সাধটা পূর্ণ করবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা দরকার। যা'তে পূজোটা খুব জাঁকজম-কের সঙ্গে হয়, তার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে। এ গাঁয়ের ব্যাপার-বিধানে তুমি না থাকলে কার সাধ্য সুসম্পন্ন করে।" একবার মনে হইল, বৃদ্ধকে মনের কথা বলিয়া ফেলি; কিন্তু পারিলাম না। কোন রকমে তাঁহাকে বিদায় দিয়া ভাবিতেছি, ইহারই নাম কি দুর্গোৎসব—ইহারই নাম কি পূজা? একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া, প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চোরের মত তাঁহার অর্থ আনিয়া তুমি সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিবে?

আর সেই পূজা মা গ্রহণ করিবেন? এ কি চাতুরী! এ কি প্রতারণা! ধর্ম্মের নামে এ কি ব্যভিচার! এত সহ্য হয় না।

মনটা বড়ই কেমন বোধ হইতে লাগিল; বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তখন চাদরখানি কাঁধে লইয়া বাহির হইলাম। কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে গ্রামের এক প্রান্তে রসিক হালদার মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হালদার মহাশয়ের বড়ই দুরবস্থা, সংসারে বৃদ্ধ হালদার মহাশয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, আর যুবতী পুত্রবধূ বিধবা কি সধবা, তাহা কে বলিবে? পুত্র দীনবন্ধু আজ সাত বৎসর হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তেইশ বৎসর বয়সের যুবক, বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন, সংসারের সম্বল। দীনবন্ধু বেশ লিখাপড়া জানিত; কলিকাতার এক স্কুলে মাষ্টারী করিত। মাসে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ দিত; সর্ব্বদা বাড়ীতে আসিত। স্বভাব-চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। পুত্রের প্রেরিত এই কুড়ি টাকা এবং দু-দশ ঘর শূদ্র যজমানের গৃহ হইতে যাহা পাওয়া যাইত, তাহাতে হালদার মহাশয়ের সংসার বেশ চলিয়া যাইত এবং তিনি বহুকালের বার্ষিক দুর্গোৎসব ক্রিয়াও যথারীতি সুসম্পন্ন করিতেন। পূজায় ধূমধাম ছিল না, এমন কি, ঢাক ঢোল পর্য্যন্তও আসিত না। হালদার মহাশয় নিজেই পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যাহা সামান্য ভোগের আয়োজন হইত—তাহা গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিয়া হালদার মহাশয় পরম আনন্দ অনুভব করিতেন।

অকস্মাৎ কি জানি কেন, দীনবন্ধু নিরুদ্দেশ হইল। কলিকাতা হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল। এই সুদীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে তাহার কোন সংবাদ নাই। বৃদ্ধ হালদার মহাশয়ের কষ্টের অবধি নাই; আজ কালকার দিনে কি পৌরোহিত্যে কাহারও সংসার চলে? কিন্তু বৃদ্ধ তবুও এ সাত বৎসর পূজা বন্ধ করেন নাই।

সারা বৎসরে অতি কষ্টে যে দশ পনর টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তাহারই দ্বারা কোন রকমে পূজা করিতেন। আমি মধ্যে মধ্যে হালদার বাড়ীর খোঁজ-খবর করিতাম এবং যখন যাহা সাধ্য হইত, দিয়া যাইতাম। হালদার-পত্নীর দুঃখে আমার প্রাণ গলিয়া যাইত।—আর সেই সোনার প্রতিমা—তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতাম না। সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা কি আশায় বুক বাঁধিয়া নীরবে এই সকল কষ্ট সহ্য করিতেন, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা

করিতেন আর থাকিয়া থাকিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন যাইয়া দেখি, বৃদ্ধ হালদার মহাশয় বাহিরের অর্দ্ধভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই ডাকিলেন—"রঘু, এ দিকে এস বাবা!" আমি তাঁহার নিকট উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন,—"রঘু, এবার আর মাকে আনিব না, আর পূজা করিব না। কার জন্ত, কিসের আশায় ঘরে থাকি রঘু! আজ সাত বৎসর দীনবন্ধুর পথ চাহিয়া আছি; আর পারি না। দীনবন্ধু! এই তোমার মনে ছিল!" পাষাণ ফাটিয়া যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহির্গত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়ে আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না; তাহার পর বৃদ্ধ হালদার মহাশয়ের এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শুনিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। আর কি হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি কি জানি কেন বলিয়া উঠিলাম "দীনবন্ধু আসিবে, এই পূজার পূর্ব্বেই আসিবে।" কোন দিন এমন কথা আমি ভাবি নাই, কোন দিন এমন সান্ত্বনাবাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; আজ কেন এমন কথা আমি বলিয়া ফেলিলাম, তাহা আমিই বলিতে পারি না।

আমার এই দৃঢ়তাপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া বৃদ্ধ হালদার মহাশয় বলিলেন,—"কি বলিলে রঘু! এমন কথা ত তোমার মুখে কখন শুনি নাই। দীনবন্ধু আসিবে?"

আমি অধিক দৃঢ়স্বরে বলিলাম,—"হাঁ, দীনবন্ধু আসিবে।"

বৃদ্ধ তখন আমার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর কাতর-বচনে বলিলেন,—"রঘুনাথ, তোমার কথা ত মিথ্যা হয় না, বাবা! তোমায় ত আমি অনেক দিন হইতে জানি, তুমি শাপভ্রষ্ট দেবতা। তোমার কথা ফলিবে—আমার দীনবন্ধু আসিবে।"

আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; উঠিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেলাম। সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। এ কি করিলাম? কেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের, পতি-শোকাতুরা যুবতীর মনে আশার সঞ্চার করিয়া দিলাম। সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম; শেষ রাত্রিতে আমার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল; সেই সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম, কে যেন আমার শিয়রে

দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"রঘু, তোর কথা মিথ্যা হইবে না ; দীনবন্ধু আসিবে।"

পরদিন হইতে আমি হালদার-বাড়ীর পূজার আয়োজনে যোগ দিলাম।—আমার বাড়ী হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে লাগিলাম। আয়োজন আর কি! হালদার মহাশয়ের ব্রাহ্মণী ও পুত্রবধূ অন্ন পাক করিবেন, আর গরীব দুঃখী যাহারা আসিবে, তাহারা দুইটি শাকান্ন পাইবে ; ইহারই আয়োজন।

পূজার আর দশ দিন বাকী। এক দিন সন্ধ্যার সময় হালদার মহাশয় ও আমি তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, পশ্চাতে একটি কুলী। ভদ্রলোকটি আসিয়াই একেবারে হালদার মহাশয়ের পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। হালদার মহাশয় তাড়াতাড়ি তাহাকে উঠাইয়া দেখেন, সে আর কেহই নহে—তাঁহার সাত বৎসরের হারাণ ধন দীনবন্ধু!

তাহার পর? তাহার পর কি, তাহা এইবার পূজার সময় লোচনপুরে রসিক হালদার মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিও। আমাকে এখন একটা গান করিতে দাও। মা গো—

"সারা বরষ দেখিনি, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়ন-তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল নয়ন-তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌ব তোরে অাঁখি ভ'রে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।

শ্রীজলধর সেন।

প্রেমের স্বরূপ।

(সংস্কৃত হইতে।)

কস্তুরীর সম সখি! প্রণয় সৌরভ।
গোপন করিলে তবু প্রকাশে গৌরব॥

পাল্পা-নেপাল।

—•*•—

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এক দিন বিরলে বসিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর ফটোগ্রাফার। পাল্পার শাসনকর্ত্তার গৃহে গার্হস্থ্য শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল, সেই জন্য তিনি একজন শিক্ষক সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আমার দেশভ্রমণে উৎসাহ দেখিয়া বন্ধুবর আমার সেই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আমি যাইতে সম্মত দেখিয়া পুলকিতমনে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাহার পর যাত্রার জন্য শুভ দিন স্থির করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। যথাকালে বন্ধু-সমভিব্যাহারে দীঘাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তথায় ষ্টীমার-যোগে নদী পার হইয়া বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিয়া শোণপুর, ছাপরা, গোরক্ষপুর ছাড়াইয়া পরদিন প্রাতে বৃজম্যানগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। বৃজম্যান নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ, নীলকুঠীর কুঠীয়ালের নামে এই ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। বৃজম্যানগঞ্জে গভর্ণর বাহাদুরের প্রতিনিধি ও অপরাপর কর্ম্মচারীরা কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। পাল্পায় যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। দিবাবসান হইলে আমরা বিশ্রাম করিলাম এবং পরদিন প্রত্যূষে গজারোহণে পাল্পাভিমুখে রওনা হইলাম।

ষ্টেশন হইতে পাল্পা ২৮ ক্রোশ, তাহার মধ্যে ৮ ক্রোশ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হয়। চতুর্দ্দিগ্ব্যাপ্ত মাঠের মধ্য দিয়া দোদুল্যমানগতি হস্তী অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে রাখাল বালক ও কৃষক ব্যতিরেকে আর কোন মানব নয়নগোচর হয় না। কিন্তু এই জনহীন স্থানের নৈসর্গিক শোভায় নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে একজন সৈনিক ছিল, সে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমাদের কৌতুকবর্দ্ধন করিতেছিল এবং তাহাতে অন্যমনস্ক আমরা দিবাকরের তীব্র কিরণেও ক্লান্তি অনুভব করি নাই।

দিবাকর অস্তমিত হইলে আমরা বেতকুঁইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

রাত্রি অধিক হওয়াতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। বেতকুঁইয়াতে কতকগুলি সিপাহী থাকিত, তাহারা ডাক-বাহকের কায করিত। রাত্রিতে অগত্যা আমাদিগকে তাহাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল। জানিলাম, ৮ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে চলিয়াও কেবল ১০ ক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়াছি। পরদিন প্রাতে পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার পর বুটোল নগরে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিলাম। এই স্থানে গভর্ণর কর্ত্তৃক আমাদের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত ছিল। সুবিধার মধ্যে প্রান্তরে কোথাও বৃষ্টি পাই নাই; কিন্তু আমরা প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্র মুষলধারে বৃষ্টি আরব্ধ হইল। নগর-দর্শন আর ঘটিয়া উঠিল না।

গভর্ণর সাহেব আমাদের জন্য তাঞ্জামের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য-পথে অন্য কোন যানে সহজে যাওয়া যায় না। তাঞ্জাম দেখিতে চক্রহীন পেরাম্বুলেটারের মত, চারি জন বাহক স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া যায়। রাত্রি শেষ হইলে আমরা এই নূতন যানে চড়িয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলাম। একবার এক ক্রোশ উচ্চে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া, পুনর্ব্বার ততোঽধিক দূর নিম্নে নামিয়া হেলিতে দুলিতে কত নদী-নালার উপর দিয়া চলিয়া রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় পাল্পা নগরে প্রবেশ করিলাম। আমরা সেই রাত্রিতেই গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া ভোজনান্তে বিশ্রাম করিলাম।

বুটোল রাজ-প্রাসাদটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত—কদাকার। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত লোকও বোধ হয় উহা অপেক্ষা উত্তম বাটীতে বাস করে। পাল্পার প্রাসাদটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সুন্দর; চতুর্দ্দিক্ উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাসাদের সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রান্তর, তাহার অপর পার্শ্বে অস্ত্রাগার। পশ্চাদ্ভাগে একটি অল্পায়তন উদ্যানে কতকগুলি ফল-ফুলের গাছ।

আমার বাসা প্রাসাদের নিকটে ছিল। ত্রিতলে রন্ধনশালা, দ্বিতলে শয়ন-কক্ষ ও প্রথম তলে অন্যান্য আবশ্যক কাযের ব্যবস্থা ছিল। শুনিলাম, বাড়ীতে ভূতের বিশেষ উপদ্রব। যাহাতে আমি ভয় না পাই, সেই জন্য আমার বাসায় দুই জন প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল।

পাল্পা-নেপাল নেপাল রাজ্যের চারি বিভাগের এক ভাগ, গভর্ণর কর্ত্তৃক শাসিত। কতকগুলি কুটীর লইয়া এক একটি পল্লী ও কতকগুলি পল্লী লইয়া পাল্পানগরী নির্ম্মিত। যে স্থানে ভূমি সমতল সেই স্থানেই কতক-

গুলি কুটীর দেখা যায়। প্রায় সকল পরিবারের একটু করিয়া আবাদের জমী দেখিলাম। ধানের চাষ অপর্য্যাপ্ত। আলু ও অন্যান্য ফসলের চাষ অল্প বা নাই বলিলেও হয়।

পাল্পার সৈন্যসংখ্যা অন্যূন চারি সহস্র হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষ বিখ্যাত বীর জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। শমশের বংশ জঙ্গবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়া এই হতভাগ্য বীরকে রাজধানী কাটমুণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি জেনারেল ছিলেন এখন মাত্র কর্ণেল। সৈনিকগণ সকলেই গৃহস্থ। প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময় কুচ করিবার জন্য সকলে রাজ-দরবারে উপস্থিত হয় আর সমস্ত দিন কৃষিক্ষেত্রে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে। দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রত্যেক পরিবার হইতে অন্ততঃ একজনকেও সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। নেপালী সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বেতন অল্প, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন ব্যবসা না করিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

গভর্ণরের অধীনে একটি বিচারালয় আছে। সুবিচার সকল স্থানে না হইলেও এক প্রকার বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অপরাধীদের দণ্ড দিবার কোন লিপিবদ্ধ আইন আছে বলিয়া মনে হয় না। অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য, অনেক নিষ্ঠুর পীড়নের কথাও শুনা যায়। বিচারপতি বড় বড় মোকর্দ্দমায় গভর্ণর বাহাদুরের পরামর্শ লইয়া কায করেন।

এই স্থানে একটি ছোট চিকিৎসালয় আছে। চিকিৎসক কাটমুণ্ড হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন। বেতন মাসিক এক শত টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এম, এস, উপাধিপ্রাপ্ত ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন তথায় কোন উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছিলেন না। বাঙ্গালী যে কয়জন গিয়াছিলেন, স্থায়ী হইতে পারেন নাই। একজন পঞ্জাবী কম্পাউণ্ডার তখন চিকিৎসকের কায করিতেছিলেন ; তাঁহার বেশ যশ ছিল। নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য শুনিলাম, তিনি কৌশলে কাহাকেও স্থায়ী হইতে দিতেন না। এখানে বৈদ্যদিগেরও সামান্য প্রতিপত্তি দেখিলাম।

একজন বাঙ্গালী দিন কতক ওভারসিয়ার-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বতীয় ভাষা এমন সুন্দর বলিতে পারিতেন যে, তাঁহাকে নেপালী বলিয়া ভ্রম হইত। তিনিও অল্প দিন ছিলেন।

পাল্পায় উচ্চ শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। আধুনিক গভর্ণর বাহাদুরের মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তিনি সে কাযে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, বলিতে পারি না।

পাল্পায় ব্যবসা-বাণিজ্য সামান্য। বাজারটি ক্ষুদ্র। কতকগুলি লোক গোরক্ষপুর অঞ্চল হইতে সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া এই স্থানে বিক্রয় করে। ধান্য ব্যতীত অপর সকল সামগ্রী মহার্ঘ। এক ঘর হিন্দুস্থানী ময়রা ও এক ঘর নাপিত স্থানীয় অভাব দূর করে।

পাল্পা-নেপালের গভর্ণর বাহাদুরের নাম মেজর জেনারেল শের শমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর। নেপালের প্রধান মন্ত্রী ইহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহাঁর চারি পুত্র ও অনেকগুলি কন্যা তখন ছিল। তিন পুত্রের শিক্ষার ভার আমার উপর ছিল। আমার ছাত্রত্রয় দেখিতে সুন্দর, বলবান্ ও সাহসী ছিল। শুনিয়াছিলাম, যখন তৃতীয়টির বয়স কেবল ৮ বৎসর তখন সে এক আঘাতে মহিষ-শাবক বধ করিয়াছিল। ইহাদের অশ্বারোহণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু লিখাপড়ায় ইহারা অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল। আমায় শিক্ষার কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য কাযও সময় সময় করিতে হইত। ফুটবল,ক্রিকেট প্রভৃতি ব্যায়াম-শিক্ষার ভার ক্রমে আমার উপর ন্যস্ত হইল।

নেপালে আইনানুযায়ী বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। গভর্ণর বাহাদুর নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি; সুতরাং একাধিক দার গ্রহণ করেন নাই। তিনি নেপাল দরবারের বিখ্যাত ৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন নাই বটে, কিন্তু সদা সর্ব্বদা সংবাদপত্রাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক নিজের জ্ঞান মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-প্রথা নেপালে প্রচলিত। বিবাহের পূর্ব্বে কোন সদ্বংশীয়া কন্যাকে ভাবী শ্বশুরালয়ে আনিয়া রাখা হয়। এইরূপ কন্যা আনাকে 'তোলা' কহে। দুই বা ততোঽধিক বৎসরাবধি ভাবী পতি-গৃহে বাস করিয়া পাত্রী মনোনীতা হইলে মহাসমারোহে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এখানে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ চলিত আছে। সেই জন্য পতি পত্নীর স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন না। রাজ-পরিবারের মধ্যে কতকগুলি বিস্ময়কর আচার-পদ্ধতি শুনিয়া আসিলাম। মাতা পূর্ণগর্ভবতী হইলে শিশুর স্তনপানের জন্য পূর্ব্বেই ধাত্রী অন্বেষণ করিয়া রাখা হয়। সন্তান

প্রসূত হইবার পর তাহার লালন-পালনের সমস্ত ভার ধাত্রীর উপর, "গর্ভধারিণী স্তনপান পর্য্যন্ত করান না। ধাত্রী অপনার সন্তানকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া আইসে। সে দরবারে প্রবেশ করিলে আর সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বিজয়াদশমীর দিন সৈনিক-সমভিব্যাহারে একবারমাত্র স্বামীর চরণ দর্শনের নিমিত্ত নিজ পতি-গৃহে যাইবার অনুমতি পায়। ধাত্রী কর্ত্তাদের সুনয়নে পতিত হইলে পত্নীরূপে গৃহীতা হয় এবং তদবধি 'নানি-মা' বলিয়া খ্যাত হয়। নানি-মা'দের গর্ভে যে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে তাহারা সেই বংশেরই বলিয়া পরিচিত হয়; প্রেত-কার্য্যাদিতে কেবল তাহাদের অধিকার থাকে না। পান্নার শমশেরবংশের একজন এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তিনি এক ব্রাহ্মণ-তনয়ার প্রণয়-পাশে বদ্ধ ছিলেন বলিয়া কাটমুণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। আমার ছাত্রদের মাতার অপেক্ষা ধাত্রীদের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল।

নানি-মা'দের পরেই আর এক শ্রেণীর দাসী আছে। তাহাদের কেটী কহে। শুনিলাম কেটী হইতে নানি-মা ও পরে রাণী-মা পর্য্যন্ত হওয়া যায়। কেটীরা সাধারণ দাসী-বৃত্তি করে। সন্ধ্যার সময় গান করা ইহাদের এক নির্দ্দিষ্ট কায।

নেপালে এখনও দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে। বালকবালিকাবিনিময়ে টাকার আদান-প্রদান করা নেপালীরা অন্যায় বলিয়া মনে করে না। দাস অপেক্ষা দাসীর মূল্য অধিক। অবস্থা মন্দ হইলে তাহারা নিজ সন্তান বিক্রয় করে, অনেক সময় মুক্ত করিতে পারে না। অনেকে দাসদাসী ক্রয় করিয়া বিবাহ দেন এবং তাহাদের সন্তানাদি হইলে তাহারা বংশানুক্রমে প্রতিপালিত হয়। ক্রীতদাস মূল্য ফেরৎ দিলেই মুক্ত হয়। কিন্তু ক্রীতদাসের গর্ভের সন্তানাদি কখনও মুক্তি লাভ করে না। দাসীরা প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে তাহাদের পদমর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়। নেপালীরা দাসদাসীর বিশেষ কষ্ট অনুভব করে বলিয়া মনে হয় না।

নেপালী রাজবংশীয়রা ক্ষত্রিয়। উদয়পুর রাজবংশোদ্ভব মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ যখন নেপাল জয় করেন তখন হইতে ইঁহাদের প্রভাববৃদ্ধি হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের অত্যাচারভয়ে রাজপুতরা নেপালে পলায়নপূর্ব্বক 'গোরখজঙ্গল' নামক পর্ব্বতদেশে বাস করে এবং তদবধি 'গুর্খা' নামে খ্যাত হয়। নেপালের আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে নেওয়ার জাতি সর্ব্বপ্রধান।

ইহারা পূর্ব্বে সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অধুনা সকলেই প্রায় হিন্দু। ইহাদের আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র। নেপালে নেওয়ার ব্যতীত মগর, গুরুম, লিম্বু প্রভৃতি জাতির বাস। ইহারা দেখিতে কদাকার ও অপরিষ্কার। নেওয়ারগণ অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদের মধ্যে মহিষ বলি চলিত, ইহাদের স্বভাব চরিত্র বিশেষ ভাল নহে।

পোষাক পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দেখিয়া কে কোন জাতীয় নির্ণয় করা সহজ। সাধারণ গুর্খাদের পরিধানে পাজামা, কোর্ত্তা—কোমরে কাপড় বেষ্টিত—এক পার্শ্বে ভোজালি, অপর পার্শ্বে নারিকেল ও সুপারীর থলি। কেহ কেহ কোর্ত্তার উপর ইংরাজী সার্টকোট, মাথায় নাইটক্যাপ, পদে রঙ্গীন মোজা ও পাম্প জুতা পরে। সকলেরই হাতে চারি ইঞ্চি তাবিজ আছে। অন্যান্য জাতিরা নগ্ন বলিলেই হয়। উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকরা খুব বড় বড় পাজামা পরিধানপূর্ব্বক গাত্রে পিরাণ ও ওড়না দেন। মস্তক আবরণের প্রথা নাই। স্ত্রীলোকরা মাথায় সিঁথি কাটিয়া সম্মুখে কেশগুচ্ছ সাজাইয়া রঙ্গীন সুতায় বাঁধে। বিধবারা লাল সুতা বাঁধে না। হাতে কাচের চুড়ি, গলায় পুঁথির মালা সর্ব্বত্র দেখা যায়। সচরাচর নারীগণ ২০।২২ হাত লম্বা বিচিত্র বর্ণের শাটী পরে, তাহার অধিকাংশই কোঁচা করিতে যায়। স্ত্রীলোকরা ধর্ম্মাচাররতা। অতি প্রত্যুষে রমণীগণ ফুল চয়ন করিয়া কি শীত কি বর্ষা সকল সময় ঠাকুর দর্শনে বাহির হয়।

নেপালী হিন্দুরা পরম ধার্ম্মিক। তাহাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই আছে। কতকগুলি পূজা-পার্ব্বণের কথা নিম্নে লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শারদীয় মহাপূজা আমাদের দেশের ন্যায় মহাসমারোহে হইয়া থাকে। শ্যামাপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, দশহরা, রাখিপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী সবই আছে। ইহা ছাড়া নূতন পার্ব্বণ আছে—

(১) মচ্ছীন্দ্র যাত্রা—নেপালের অভীষ্ট দেবতা মচ্ছীন্দ্রনাথের নামে এই উৎসব মহাসমারোহে ১লা বৈশাখ হইতে এক সপ্তাহ অবধি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মূর্ত্তি পবিত্র জলে স্নান করান হয়। তাহার পর রাজার তরবারি দান করা হয়। তাহার পর সুসজ্জিত রথে করিয়া পাতনে লইয়া যাওয়া হয়। পাতনে এক মাস রাখিয়া বিগ্রহ পুনরায় স্বস্থানে বোলমতি গ্রামে আনয়ন করা হয়। যে শুভদিনে উলটা যাত্রা হয় তাহার নাম "গুদরিকার"। কারণ সর্ব্ব-

সাধারণের সম্মুখে তাঁহার অর্থাৎ মচ্ছীন্দ্রনাথের কম্বল ঝাড়িয়া দেখান হয় যে, তিনি রিক্তহস্তেই ফিরিতেছেন এবং দীন হইলেও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট।

(২) বজ্রযোগিনী-যাত্রা—বজ্রযোগিনী মূলে বৌদ্ধদেবী হইলেও অধুনা হিন্দুদিগের দ্বারা পূজিতা। মণিচূড় পর্ব্বতে ইঁহার মন্দির। ইহার অনতিদূরে খর্গযোগিনীর মন্দির। খর্গযোগিনী-মন্দিরে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া রাখা হয় এবং এক পার্শ্বে নরমুণ্ড রাখা হয়। বজ্রযোগিনী যাত্রা ৩রা বৈশাখ হইতে। দেবীকে খাটে করিয়া নগর পরিক্রমণ করা হয়।

(৩) সীঁথী-যাত্রা—কাটমুণ্ডু ও সিম্বুনাথের মধ্যে বিষ্ণুমতী নদী-তীরে এই উৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে হইয়া থাকে। পূজার দিন আহারান্তে দুই দলে পরস্পর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। পূর্ব্বে কেহ প্রস্তরাঘাতে পতিত হইলে কঙ্কেশ্বরী দেবীর সম্মুখে তাহাকে বলি দেওয়া হইত। এ প্রথা আজ কাল চলিত নাই।

(৪) গায়-যাত্রা—ইহা নেওয়ারদিগের উৎসব; ভাদ্র মাসের আরম্ভেই হইয়া থাকে। গরুর মত সাজিয়া বেড়ান ও সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনা করা এই উৎসবের বিশেষত্ব।

(৫) ইন্দ্র-যাত্রা—সপ্তাহকালস্থায়ী একটি উৎসব। প্রথম দিবস প্রাসাদে একটি খুঁটি পোতা হয়। দেশদেশান্তর হইতে গায়ক, গায়িকা সংগ্রহ করা হয়। যত প্রকার সম্ভব মুখস্ পরিধানপূর্ব্বক নৃত্য করা প্রধান আমোদ। তৃতীয় দিবস কুমারী-পূজা হয়। পূজার পর কুমারীদের রথে চড়াইয়া নগর ভ্রমণ করান হয়। প্রাসাদে রথ উপনীত হইলে রাজসিংহাসন সম্মুখে আনিয়া রাজাকে বসান হয় এবং রাজ-পুরুষগণ যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন। এই দিবসের নাম অনন্ত চতুর্দ্দশী। এই দিবস প্রথমে পৃথ্বীনারায়ণ সামান্য সৈনিক সমভিব্যাহারে কাটমুণ্ড নগরে প্রবেশ করেন, রাজসিংহাসন আনীত হইলে স্বয়ং উপবেশন করেন। নেওয়ারগণ মদ্যপানে অচৈতন্য থাকায় পৃথ্বীর পথ কেহ অবরোধ করিতে পারে নাই। অবশেষে নেওয়াররাজ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়েন।

বাঘ-যাত্রা, কুকুর-যাত্র, ঘোড়া-যাত্রা প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। সবিশেষ লিখিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়।

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র।



পরিণাম।

(১)

দুর্গাপুর গ্রামে রামতনু মুখোপাধ্যায়ের বাস। তাঁহারা কত পুরুষ উক্ত প্রাচীন গ্রামখানিতে বাস করিয়া আসিতেছেন, ইতিহাস তাহার কোনও সন্ধান না রাখিলেও, আমরা জানি যে, উক্ত দুর্গাপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী দশখানা গ্রামের মধ্যে মুকুজ্জেরা প্রাচীন বনিয়াদী বংশ। রামতনুর পিতা-পিতামহ প্রভৃতি কেহই চাকরী করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করেন নাই। কুলীন ব্রাহ্মণ—গৃহে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম ও সূর্য্যদেব যথারীতি পূজা-ভোগ খাইয়া আসিতেছেন; নিষ্কর জোত জমী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি তাঁহাদের ছিল; তজ্জন্য তাঁহাদের কোনও পুরুষের কাহাকেও আত্মবিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় নাই। বিশেষ চাকরী তাঁহারা ঘৃণ্য মনে করিতেন। রামতনু ঘরে লাঙ্গল গরু রাখিয়া যথারীতি পৈতৃক জমীগুলি আবাদ করিতেন ও তাহা হইতে যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তাঁহার সংসারে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যয় অবাধে সঙ্কুলান হইয়া যাইত। বসত-বাড়ীর অনতিদূরে পুষ্করিণীর পাড়ে নানা প্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হইত এবং ক্ষেত্রে আলু, বেগুন, ঝিঙ্গে, করলা, মূলা প্রভৃতি তরিতরকারীরও অভাব ছিল না। গ্রামের তিনটি ভাল পুষ্করিণীই মুকুজ্জেদের। লোকজন, অতিথি অভ্যাগত হঠাৎ বাড়ীতে আসিলে কোনও দিনই তাঁহাকে বাজারে মৎস্যের জন্য লোক পাঠাইতে হইত না। পুকুরের পাড়ে আম, জাম, তিন্তিড়ী, নারিকেল, আমড়া, পেঁপে প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপিত ছিল। ইতর প্রাণীর দল যথেষ্ট উৎপাত করা সত্ত্বেও যাহা থাকিত, তাহাতেই তাঁহার বৎসরের খরচ ও পাঁচ জনকে দেওয়ার কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এইরূপে মুকুজ্জে-পরিবার পরমসুখে দিনযাপন করিতেন। তাঁহারা গ্রামের কত লোকের উত্থান-পতন দেখিয়াছেন, কত দরিদ্রকে অবস্থাপন্ন এবং কত অবস্থাপন্ন গৃহস্থকে দরিদ্র হইতে দেখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সেই সমানভাবেই দিন কাটাইয়া আসিতেছেন। মোটা ভাত, মোটা বস্ত্রের বেশী কিছু প্রার্থনীয় তাঁহাদের ছিল না। রামতনু মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বপুরুষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পূজাটি পর্য্যন্ত বাদ দিতেন না।

ইহার জন্য তাঁহাকে মাসে ৩।৪টা উপবাস করিতে হইত। তিনি তাহাতে কাতর ছিলেন না, বরং কোন্ তারিখে কোন্ কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার গৃহিণী সময়ে সময়ে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও কিছু ব্যয়-সঙ্কোচের কথা বলিলে রামতনু একটু উত্তেজিতভাবেই উত্তর করিতেন "দেখ, আমি যতদিন আছি, ততদিন পিতা-পিতামহের প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমাকে সেই পথ অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে। পাঁচ জনকে অযথা বঞ্চিত করিয়া সঞ্চয় করিবার অধিকার আমার নাই। সাত পুরুষ ধরিয়া গ্রামের দশ জন আমার পুকুরের মাছ, গাছের ফুল, বেল, ক্ষেত্রের বেগুন কচু খাইয়া আসিতেছে, আমি আজ কোন্ মুখে তাহাদিগকে নিষেধ করিতে যাইব? বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার কি? আবার ধান্যের মূল্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর না হয় পূর্ব্বে খরচ-পত্র বাদে যে এক আধ পেটি ধান্য গোলাজাত হইত, এখন আর তাহা হইবে না। আমার মোটা ভাত মোটা কাপড় হইলেই যথেষ্ট।" গৃহিণী আর কোন উত্তর করিতে পারিতেন না, বরং স্বামীর অভীপ্সিত কার্য করিয়া সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা-রক্ষার্থ প্রাণপণে যমের সহিত যুদ্ধ করিতেন; আর যাহাতে স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া এই সংসার ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার জন্য শিবের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন।

সংসারে রামতনু মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুশীলকুমার এবং দুর্গাবতী, হেমবতী, সরস্বতী নাম্নী তিনটি কন্যা ও বিধবা ভগিনী। তাহার উপর দুই তিনজন দূরসম্পর্কীয়া অসহায়া আত্মীয়া স্ত্রীলোক এবং চাষ আবাদের জন্য দুই জন কৃষাণ, একজন বয়স্থ রাখাল ছিল। আর রামতনুর পিতার আমলের চাকর ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ লোচন ঘোষ কৃষিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া কিছু কিছু হিসাব রাখার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিত। ইহা হইতে পাঠক-পাঠিকাগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, এই একান্নবর্ত্তী পরিবারটির দৈনিক ২০ সের চাউলের কম দুই বেলা নির্ব্বাহ হইত না। এই বঙ্গদেশে ইহা অপেক্ষাও সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা আমরা অবগত আছি। কিন্তু সে দিন আর নাই। মনে সে আনন্দ নাই। মহাজন সমস্ত লইবে ভাবিয়া কৃষক চিন্তায় অবসন্ন। এখনও বসন্তে নবপল্লবিত তরুশাখে বসিয়া কোকিল, চন্দনা, ঘুঘু, বুলবুল ডাকিয়া যায় বটে;

কিন্তু যে মধুর কুজন অভাব-পীড়িত, ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত পল্লীবাসীর প্রাণে আর আনন্দ ফুটাইতে পারে না। অধিকাংশ পল্লীর অবস্থাই শোচনীয়; যাঁহার চক্ষু আছে, যাঁহার দৃষ্টি-শক্তি নির্দ্দোষ তিনি পল্লীগ্রামে পদার্পণমাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(২)

গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সব্-রেজিষ্ট্রার তাঁহার দুইটি পুত্রকে কলিকাতায় লিখা-পড়া শিখিতে পাঠাইয়াছেন দেখিয়া আমাদের রামতনু মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীলকে কলিকাতায় পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সুশীলের বয়স তখন ১৩ কি ১৪ বৎসর হইবে। গ্রাম্য স্কুলে মাইনর পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সুশীল কলিকাতায় তাহার মাতুলের তত্ত্বাবধানে লিখা-পড়া শিক্ষার জন্য যাত্রা করিল। সুশীলের মামা সপরিবারে কলিকাতায় বাসা করিয়া কার্য্যসূত্রে অবস্থান করিতেন; সুতরাং সুশীলের আহারাদির জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাই। মুকুজ্জে মহাশয় মাসে মাসে দশটি টাকা তাঁহার শ্যালকের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। মাতুল-মাতুলপত্নীও সুশীলকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুশীল সেই কর্ম্মকোলাহলময় জনপূর্ণ নগরীতে পিতামাতার স্নেহদৃষ্টি হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও মাতুলের স্নেহে ও মাতুল-পত্নীর যত্নে কোন দুঃখ অনুভব করিত না। সুশীল বুদ্ধিমান্ বালক; লিখা-পড়ায় তাহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কোনও দিনই সে লিখা-পড়ায় আলস্য করে নাই। স্বগ্রামের সব-রেজিষ্টার বসন্ত বাবুর দ্বিতীয় পুত্র মন্মথনাথের সহিত সে একই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল এবং উভয়ে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। তাহার সুবিজ্ঞ মাতুল সুশীলকে "মানুষ" করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিতেন এবং বলিতে কি, তাঁহারই আগ্রহে সুশীল কলিকাতায় গমন করিতে পারিয়াছিল। রামতনু ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতৃদেবী ইহাতে আপত্তি করিয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—"দেখ বাছা, আমাদের কোন পুরুষে কেহ ইংরাজী লিখা-পড়া করে নাই। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিখিয়াই তোমার পিতা-পিতামহ দশের নিকট যথেষ্ট মান্য পাইয়া গিয়াছেন। একটি মাত্র পুত্র—বংশের জলপিণ্ডের ভরসাস্থল; তাহাকে আর দূর কলিকাতায় পাঠাইয়া ইংরাজি লিখা-পড়া শিখানর দরকার নাই।" মাতৃভক্ত রামতনু উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"দেখ মা, চিরদিন সমান নিয়মে মানুষ চলিতে পারে না; আজকালকার দিনে

অনুসারে ভালরূপ লিখা-পড়া না শিখিলে মানুষের মনুষ্যত্ব স্ফূরিত হয় না; বিশেষতঃ ইংরাজী আমাদের রাজভাষা—তাহা না শিখিলে কোন কার্য্যেই আজকাল অগ্রসর হওয়া যায় না এবং বিদ্যা-শিক্ষার ন্যায় মহৎ কার্য্যও আর কিছুই নাই।” বৃদ্ধা পুত্রের কথার কোন উত্তর না করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন যে, “দেখ রামতনু, পূর্ব্বপাড়ার বসন্ত চাটুজ্জের ইংরাজী শিখিয়া যেরূপ মতিগতি, চাল-চলন দেখিয়াছি, তাহাতে বড়ই আশঙ্কা হয়। বসন্তের তিনটি ছেলে; বড় ছেলেটির বিবাহ দিয়া একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে বাস্তুভিটা ছাড়া করিয়াছে।” বসন্ত বাবু সব্‌ রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তখন সব্‌রেজিষ্ট্রারগণ বেতন পাইতেন না। দলিলের কমিশন বাবদ যাহা পাইতেন, তাহাই তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। তাহার উপর তিনি তরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য, পাঁটা প্রভৃতি গুপ্ত উপহার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বসন্ত বাবু নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া এক্ষণে গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন ও টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সুদ হইতে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন। তিনি দুইটি পুত্রকে কলিকাতায় লিখা-পড়া শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাহার বিবাহ দিয়া প্রায় তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, টাকার সুদ হইতেই ছেলের লিখা-পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈবাহিক মহাশয় এক কন্যার বিবাহেই বাস্তুভিটের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া বিদেশে এক জমীদারের চাকরী লইয়া কোনওরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইহাতে রামতনুর মাতা যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিতেন এবং ইহাই বুঝি ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম ভাবিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

(৩)

দেখিতে দেখিতে জলস্রোতের ন্যায় দীর্ঘ চারিটি বৎসর বহিয়া গেল। রামতনু মুখোপাধ্যায় মাতৃহীন হইয়াছেন; মাতৃবিয়োগে তাঁহাকে তাঁহার সম্ভ্রমোচিত অনেকগুলি টাকা শ্রাদ্ধে ব্যয় করিতে হইয়াছে। তাহার উপর তিনি উপর্য্যুপরি দুইটি কন্যার বিবাহ দিতে তিন হাজার টাকা দেনার দায়ে পড়িয়াছেন। এখনও তৃতীয়া কন্যা সরস্বতী অবিবাহিতা—সেও এক বিষম সমস্যা। পুত্র সুশীলকুমার এফ, এ, দিয়াছে। তাহার পরীক্ষায় পাশ হইবার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই ছিল না। পুত্রের বিবাহ দিয়া টাকা লইতে যদি

রামতনুর আপত্তি না থাকিত, তবে সম্ভবতঃ কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহজন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইত না। রামতনু পিতামহের আদর্শকেই জীবন-যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন এবং সেই গর্ব্বে একটু যে গর্ব্বিত না হইতেন, তাহাও নহে। রামতনু মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া খুবই সহজ; তিনি বনিয়াদী বংশের সন্তান—কুলীন, বাড়ী-ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই তাঁহার যথাসম্ভব রহিয়াছে—সুতরাং অনেকে আগ্রহ করিয়াই তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিবে। কিন্তু রামতনু ঠাকুর ভুলই বুঝিয়াছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার পুরাতন প্রথা যে ধীরে ধীরে অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, এ অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। কিন্তু রামতনু ঠাকুর পুত্রের বিবাহে এক কপর্দ্দকও লইবেন না। তাই তিনি আজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; যাঁহার নিকট তিনি টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তিনি আমাদের পরিচিত ও পাড়ার সব্ রেজিষ্ট্রার বসন্ত বাবু। বসন্ত বাবুর পুত্র মন্মথ সুশীলের সহাধ্যায়ী—তাহার সহিত যদি কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহের সম্বন্ধ করিতে যায়েন, সেও এক সমস্যা। কেন না, তাঁহারই নিকট তাঁহার মোটা টাকা ঋণ। এই সকল ভাবনায় রামতনু আজ নিতান্ত অধীরহৃদয়ে মনোদুঃখে তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে বলিতেছিলেন,—"দেখ, মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি। দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় ইচ্ছা হয় না যে, এই সংসারে থাকি। সংসারটা যে এতদূর স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে, সংসার যে ভণ্ডামীর এতটা প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারি নাই। আমি জানিতাম, সংসারে মাতৃ-পিতৃদায়ই বিষম দায়। কন্যাদায় শাস্ত্রে "দায়" বলিয়া গণ্য হইলেও তাহা হইতে উদ্ধারের সহজ উপায় তখন ছিল। হরীতকী দিয়া কন্যাদান করা তখন চলিত। এখন সমস্তই বিপরীত! মাতা-পিতার শ্রাদ্ধ ভাগীরথী-সৈকতে বালুর পিণ্ডে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না! সংসারের এ কি অবস্থা হইল? আমার মত অপদার্থ, আমার মত অকর্ম্মণ্য জীব সম্ভবতঃ সংসারে আর নাই। পিতার পুণ্যনাম-স্মরণে আমি সত্য হইতে স্খলিত হইব না বলিয়া যে আস্ফালন করিতাম, আজ দেখিতেছি—" "দূর হ'ক ছাই" বলিয়া তিনি একটু মৌনা-বলম্বন করিয়া আবার অধীরভাবে বলিলেন, "না বলিলেও শান্তি পাই না—বলিয়াও কোন লাভ দেখিতে পাই না। আমি আমার বৈবাহিকদ্বয়কে

সুব বলিলেও তাঁহারা বুঝেন না। কেবল—'খাও' 'দাও'!* হাঁড়ীভরা সন্দেশ পাঠাইলেও তাঁহারা তাহা খালি বলিয়া অভিযোগ করেন। পূজার সময় সাধ্যমত মূল্যবান্ বস্ত্র দিলেও বলেন 'খেলো'। কিন্তু আমি জীবনে কখনও তিন টাকার ঊর্দ্ধের মূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করি নাই। অবনতমস্তকে দোষ স্বীকার করিয়া লইলেও রক্ষা নাই। আমার অপরাধ কি?" রামতনু কাঁদিয়া ফেলিলেন। সাধ্বী পত্নী অতিমাত্র ব্যথিতহৃদয়ে বলিলেন, "আইস; যাহা হইবার তাহা হইবে; বেলা হইয়া গিয়াছে—ঠাকুর পূজা করিতে হইবে।"

রামতনু পত্নীর হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হ য়া পড়িলেন। তিনি জানেন, সাধ্বী কোনও দিনই তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করেন নাই, তিনি কেবল মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বেহাই ও বেহাইন ঠাকুরাণীর ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন, আর কন্যার মঙ্গলকামনা করিতেন। স্বামীর প্রতি অব্যক্ত ভালবাসায়, অনাবিল শ্রদ্ধায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ ছিল।

মুখুজ্জে মশায় বড় ঘরের বারান্দায় বসিয়া তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন,—"ত্রুটি যে মানুষের হয় না, তাহা নহে; কিন্তু বিশেষ ত্রুটিও ত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কুটুম্বের প্রতি যদি কুটুম্বের স্নেহের টান না থাকে, কেবল স্বার্থই যদি মানবজীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সে জীবনে ফল কি? স্বভাব-সুলভ ভ্রান্তি হইতে আপনাকে রক্ষা করাই মানুষের কর্ত্তব্য; কিন্তু আঘাত যখন অধিক হয়, মনে যখন সন্দেহ আইসে, তখনই হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়ে—জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হইয়া যায়।" এই বলিয়া তিনি স্নানার্থ পুষ্করিণীতে গমন করিলে। কল্যাণীও ঠাকুরঘর অভিমুখে গমন করিলেন।

(৪)

এ সংসারে স্বার্থপর মানুষ অতি ভয়ঙ্কর। মনুষ্য বাহ্য-প্রকৃতির অনন্ত মহিমা-দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাহার ঐশ্বর্য্যকে করতলগত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা পারে কে? আপনার মধ্যে যে অনন্তের প্রভা রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধিজন্য মানুষ যদি চেষ্টা করিত, তবে সংসার কি সুখের স্থানই হইত! সৃষ্টির মুকুটমণি মানুষ—কিন্তু সে যখন স্বার্থের মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া উঠে, সংসারে কেবল সুখের কামনা করে, তখন সে মানুষ কি ভীষণ মানুষ! সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, তৃণাসনে ও সিংহাসনে বড়

অধিক প্রভেদ নাই—মানে অপমানে, সুখে দুঃখে, আঁধারে আলোকে, প্রাসাদে কুটীরে, মানুষ মানুষই! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেও সে একাকী তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে—এমন শক্তি তাহার রহিয়াছে। কিন্তু মোহঘোরে অচেতন মানব সে তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া যায়, স্বার্থকে পরমার্থজ্ঞানে কপট বিনয়, কপট প্রণয়, কপট কুটুম্বিতার অভিনয় করিয়া দ্রুতগতিতে উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিতে বাসনা করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বসন্তবাবু রামতনু ঠাকুরের স্বগ্রামবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু বলা হইয়াছে, তাহাতেই সম্ভবতঃ পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন বসন্ত বাবু গ্রামের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; অধমর্ণগণের নিকট হইতে অত্যধিক মাত্রায় সুদের টাকা আদায় করিয়া তিনি বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি—সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রামতনু মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিকট হইতেও দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, তাহা সুদে আসলে আজ পর্য্যন্ত তিন হাজারে দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর কনিষ্ঠা কন্যা সরস্বতীর বিবাহ তাঁহার মধ্যম পুত্র মন্মথনাথের সঙ্গেই হইয়া গিয়াছে। সে বাবদে এক হাজার টাকার হাণ্ডনোট তিনি বসন্ত বাবুকে লিখিয়া দিয়াছেন।

যে দেশের অধিকাংশ লোক মাতা বসুন্ধরার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া দুই বেলা দুই মুষ্টি কদর্য্য অন্নের সংস্থান করিয়া উদর-দেবতার তৃপ্তিসাধন করে, সে দেশে যদি ভাগ্যদেবতার অকৃপা-নিবন্ধন এক বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তবে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টি-নিবন্ধ রামতনু ঠাকুরের খামারে দশ মণ ধান্যও দেখা দেয় নাই; তাহার উপর কন্যার বিবাহে ভোজ-ভাতেও কিছু ব্যয় করিতে হইয়াছে। বৈবাহিক বসন্ত বাবুকে তিনি যে হাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ছিল—সে স্থানে দুই বৎসর শেষ হইতে চলিল। বসন্ত বাবু উপর্য্যুপরি টাকার তাগাদা করিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি কঠোর কথাও লোকমুখে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি ভাবনায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রামতনু প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া পুত্রের বিবাহে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রভূত ঋণ হইয়া গিয়াছে, বৈবাহিক বসন্ত বাবু বারংবার তাগাদা করিতেছেন—

এ অবস্থায় তিনি কি উপায়ে ঋণ পরিশোধ করিবেন? পরিণাম কি হইবে, সেই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। এইরূপ নানা চিন্তায়—দারুণ ভাবনায় তাঁহার প্রবল জ্বর দেখা দিল। তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় জ্বরের প্রবল উত্তাপে অভিভূত হইয়া প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে কেবলই পরিণামসম্বন্ধে চিন্তাপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন;—"কি নিবিড় অন্ধকার!—সেই অন্ধকাররাশির মধ্যে একা আমি! পথ খুঁজিয়া পাই না—একা আমি অন্ধকার ভেদ করিয়া কেমন করিয়া বাহির হইব? আমার পক্ষে কি আলোকলাভ অসম্ভব? চিরদিন আলোক অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু ভাগ্যে তাহা মিলে নাই। অন্ধকার—আমি তোমায় বড় ভালবাসি; এক দিন ভয় করিতাম, কিন্তু আজ বড় আনন্দ—অন্ধকারে বড় আনন্দ!" মুখোপাধ্যায় মহাশয় নীরব হইলেন। তাঁহার অবস্থা দর্শনে পত্নী কল্যাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পুত্র সুশীলকুমার কোনরূপে হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিয়া লণ্ঠনহস্তে একজন কৃষাণকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার দুর্গাবিলাস বাবুর নিকট যাত্রা করিল। গ্রাম হইতে ডাক্তারের বাড়ী দেড় ক্রোশ দূর।

জামাতা মন্মথনাথ একজন দাসীর মুখে শ্বশুরের অবস্থা শ্রবণ করিয়া দ্রুত-পদে বাটীর বাহির হইলেন। তিনি আসিবার সময় পত্নী সরস্বতীর সহস্র মুদ্রার স্বর্ণালঙ্কারপূর্ণ বাক্সটি লইয়াছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র আজ পিতার আদেশ মান্য করিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতে শ্বশুরের ও পিতার মধ্যে টাকা লইয়া যে ব্যাপার ঘটিতেছিল, তাহা সমস্তই বিদিত ছিলেন।

যাহা হউক, জামাতা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রোগীর গৃহে প্রবেশমাত্র শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী দরবিগলিতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর অবস্থা দেখিয়া মন্মথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—"যত টাকার প্রয়োজন হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব, মহকুমার বড় ডাক্তার নীলরতন বাবুকেও আনিতে হইবে।" মহকুমা গ্রাম হইতে ৮ ক্রোশ দূর। অশ্বারোহণে লালধারী সিং মন্মথনাথের চিঠি লইয়া যাত্রা করিল।

(৫)

এ দিকে যখন এই সমস্ত ব্যাপার হইতেছিল, বৃদ্ধ লোচন মণ্ডল তখন আর

স্থির থাকিতে পারিল না। সে বাবা ঠাকুরের হঠাৎ এই অবস্থা দেখিয়া শোকে দুঃখে ও বসন্ত বাবুর প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণায় কম্পিতবক্ষে দ্রুতপদে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। উন্মুক্ত স্থানের বাতাসে সে একটু সুস্থ হইল বটে; কিন্তু তাহার হৃদয়-স্পন্দন নিবৃত্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সে বসন্ত বাবুর বাটীর দিকে যাত্রা করিল। তাহার অদৃষ্টে আজ যাহাই থাকুক্ না কেন, গোটাকতক কথা সে বসন্ত বাবুকে বলিবেই বলিবে। বাবা ঠাকুর যে তাহার অগ্রে প্রস্থান করিবেন, এ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসহ্য। কলিকালে পাপের প্রভাব হইলেও রামতনু ঠাকুরের বাড়ীতে সে কোন্ পথে আসিল —বৃদ্ধ তাহাই চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বপাড়ার দিকে চলিতে লাগিল।

রাত্রি ১০॥ টা হইয়া গিয়াছে। বসন্ত বাবু আহারাদি শেষ করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আরাম-কেদারায় আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক সরকারকে বৈবাহিকের হিসাবটা আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে বলিলেন। ১০০০, টাকার হ্যাণ্ডনোটের দুই বৎসরের সুদ ধরা হইয়াছে; কিন্তু হিসাবে ভুল হইয়া গিয়াছে বলিয়া সরকারের যে হিসাবে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, তাহাই তিনি বুঝাইতেছিলেন। সে যে মাসকাবারে ১৫৲ টাকা তাঁহার নিকট ফাকি দিয়া লইয়া যায়, এ কথাও তিনি বলিতে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি পুনর্ব্বার ঠিক দিবার জন্য বলিতেছেন—এমন সময়ে বৃদ্ধ লোচন মণ্ডল তাহার কোটরগত চক্ষু দুইটিকে বড় বড় করিয়া ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে তাহার বাবা ঠাকুরের অবস্থা বর্ণনা করিল এবং ইহার জন্য যে তিনিই দায়ী—সে কথাও অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল! আজ তাহার কিছুমাত্র ভয় নাই—সে এই রকমের ভদ্র "বামুনকে" কোনও রূপেই ভক্তি করিতে পারিবে না।

বসন্ত বাবু বৃদ্ধের মুখে তাঁহার বৈবাহিকের অবস্থা শ্রবণমাত্রেই নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পদাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল।—তাঁহার সমস্ত হৃদয় ও স্থূল দেহখানি ব্যাত্যাতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। স্মৃতি কি ভয়ানক! মুহূর্ত্ত-মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৈবাহিকের কথা তাঁহার মনে পড়িল, ঠিক এমনই দিনে, এমনই সময়ে তিনিও লোকের অজ্ঞাতে বাস্তভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া-ছিলেন! বসন্ত বাবু অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কঠিন হৃদয়ও বিবেকতাড়-নায় মুহ্যমান হইয়া গেল; না হইবেই বা কেন? তিনি ত মানুষ! মানুষ-

মাত্রেরই হৃদয় আছে—সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অংশ আন্দোলিত—আকুলিত হইয়া উঠিল।

বসন্তবাবু চটী জোড়াটি পায়ে দিয়া কম্পিতহস্তে কর্ম্মচারীর নিকট হইতে রেহেনি তমশুক ও হ্যাণ্ডনোট লইয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন ও শীঘ্রই তাঁহার বৈবাহিকের সদর-দরজায় আসিয়া উপনীত হই-লেন।—পশ্চাতে বৃদ্ধ লোচন মণ্ডল।

এমন সময়ে সুশীলও ডাক্তার বাবুকে লইয়া উপস্থিত। সুশীলকুমার বসন্ত বাবুকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত বাবুর এখন আর লজ্জা নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে হৃদয়ভাব গোপন করিয়া সকলের অগ্রে রোগীর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং ডাক্তার বাবুকে উপযুক্ত ঔষধ দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন।

বসন্ত বাবু দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহার অগ্রে আসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছে। আজ তিনি তদ্দর্শনে আনন্দিত হইলেন! তিনি আজ বুঝিয়াছেন—মানুষের কতকগুলি বিশেষ বর্ত্তব্য আছে। সরস্বতী দেবতুল্য পিতাকে মৃত্যুশয্যাশায়ী দর্শন করিয়া পরিণাম-চিন্তায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বসন্ত বাবু দেখিলেন, সমস্ত অপরাধ আজ তাঁহার—তিনি সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-যাতনার ন্যায় যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন ও ডাক্তার বাবুকে বারংবার পরিণামসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেল। সুশীলকুমার ও মন্মথনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ সমস্ত লোকের ক্রন্দধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া গ্রামখানিকে অধীর করিয়া ফেলিল। মুকুজ্জে মহাশয়ের বাড়ীতে হঠাৎ কি বিপদ্ হইল ভাবিয়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই রাত্রি তিনটার সময় ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

বসন্ত বাবু তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া ডাক্তার বাবুকে শারীর তাপ রক্ষার অন্য কোন উপায় আছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুবিজ্ঞ ডাক্তার তাঁহার সাধ্যমত ঔষধ প্রদানে ক্রটি করেন নাই। তিনি তাঁহার শেষ সম্বল মূল্যবান্ ঔষধ দুই দাগ স্বয়ং রোগীর মুখে ঢালিয়া দিলেন—কিন্তু ঔষধ গলাধঃকরণ করিবে কে? রাত্রি ৩।০ টার সময় রামতনু মুখোপাধ্যায় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত লোকে যাত্রা করিলেন।

সৎকার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন বসন্ত বাবু নিজের বাটীতে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া একাকী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং গ্রামের দশজন ব্রাহ্মণের সমক্ষে তাঁহার বৈবাহিকের লিখিত হ্যাণ্ডনোট ও তমশুকখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বিবাহে এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন না এবং সাধারণকে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য—সমাজে প্রাচীন প্রথার প্রচলন জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

প্রেমসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর।

(করাসী কবিতার তরুদত্তকৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

কহ, প্রেম কা'রে কহে। ভালবাসা ?—নহে নহে
সুধু অর্থহীন শব্দ প্রলাপ-বচন।
যুগল আত্মায় প্রেমে, এক ভাবস্রোত বহে
এক সুরে দু'টি হিয়া কাঁপে আমরণ॥
কোথা হ'তে আসে প্রেম?—জানি না আমরা তাহা।
সর্ব বিঘ্ন বাধা প্রেম-ভেঙ্গে ফেলে বলে,
কোথা চলে যায় প্রেম ?—সুধাও না আর তাহা
ভালবাসা নহে সে ত যায় যদি চলে।।
কোন্ প্রেম সত্যতম, কোন্ প্রেম শুদ্ধতম ?
যে প্রেম প্রকাশে সুধু প্রিয়তম স্থান।
কোন্ প্রেম চিরস্থায়ী সবল ও অনুপম ?
গৌন প্রেম, নাহি যাহে গর্ব্ব অভিমান।
ঐশ্বর্য্য বিভব প্রেম কেমনে বাড়ায় কহ ?
প্রেম করে দান প্রতিদান নাহি লহে।
মন মুগ্ধ করে প্রেম কি বচনে কি ভাষায় ?
—শুধু ভালবাসে প্রেম কথা নাহি কহে॥

পটেশ্বরী।

পটেশ্বরী প্রসিদ্ধ দেবী বহুদিন হইতে পূজিতা। আমরা সেফালিকা-সুরভিত শরতের প্রভাতে পটেশ্বরীর বাড়ী গোবরাগ্রমের অভিমুখে গো-যানে যাত্রা করিলাম।

জিলা চব্বিশ পরগণার মধ্যে বস্থর-হাট বা বসির-হাট মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপনগর থানার অধীন্ ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বধারে গোবরা গ্রাম অবস্থিত। বনগ্রাম মহকুমা হইতে ইচ্ছামতী দিয়া বাদুড়ে, বস্থর-হাট, টাকী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গতায়াত করিতে হইলে নৌকায় বসিয়া গোবরা গ্রামের পটেশ্বরীর বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।

গোবরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া আমরা পথ জানিয়া লইলাম; রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বিবিধ বনলতাসজ্জিততট মৃদুস্রোতা ইচ্ছামতীর নির্ম্মল জল অবলোকন করিলাম। আমরা শ্মশানঘাটে পটেশ্বরীর স্থাপনকর্ত্তা রাম-রাম ঠাকুরের জপতলা, প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গাড়ি রাখিয়া মা'র বাড়ী প্রবেশ করিলাম। পটেশ্বরীর বিগ্রহ পুরাতন বাড়ী হইতে ইচ্ছামতীর শ্মশান ঘাটে কোন্ সময় নীত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামরামই নাকি শেষ বয়সে মা'কে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

আমরা ভাট-শিয়াকুলের নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া পটীর বেড় দেখিতে গিয়াছিলাম, পাটেশ্বরীর পুরাতন বাড়ীকে লোক আজও "পটীর বেড়" বলিয়া থাকে। বেড় ঘুরিতে ঘুরিতে একটি প্রকাণ্ড কেতকী ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই সড় সড় শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। এক দল বন্য বরাহ আমাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, শুনিলাম, উহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। পটেশ্বরী যে স্থানে প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ প্রায় অর্দ্ধ পোয়া বিস্তৃত গভীর খালে বেষ্টিত ছিল। এই খালবেষ্টিত ভূমি-খণ্ডকেই পটীর বেড় কহিয়া থাকে। খাল এক্ষণে ক্ষুদ্র নালা ও গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

পটেশ্বরীর বাস্তভিটার বা মন্দিরের কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। বর্ত্তমানে গোবরা গ্রামের বিশ্বাসগণ পটীর বেড়ের মধ্যে উচ্চ ভূমির জঙ্গল কাটাইয়া

বহুদিন হইতে তথায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন। পটেশ্বরী কেন যে পুরাতন স্থান হইতে শ্মশান-ঘাটে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন কারণ বা কিম্বদন্তী পাওয়া যায় না। এককালে যখন গোবরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ সমস্তই দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়, তখন পটীর ভাণ্ডার ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। পটেশ্বরীর পুরাতন বাড়ী হইতে নূতন বাড়ীতে নীত অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে দুইটি প্রস্তর বিগ্রহের হস্ত ও কর্ণ ছিন্ন দেখিয়া মনে হয়,হয় ত একদিন দেবীর সেবাইতগণ দস্যু অথবা বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কারণেই দেবীমূর্ত্তি পুরাতন খাতপরিবেষ্টিত দেবী-স্থান লোকালয় হইতে সেবাইত কর্ত্তৃক দুঃর্ভেদ্য নির্জ্জন শ্মশান-জঙ্গলে লোক-লোচনের অন্তরালে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

পুরাতন পীঠ হইতে নূতন বাড়ী প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইবে। দক্ষিণদ্বারী মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন নিম্ব-বৃক্ষ-তলে বলিদানের স্থান। এই স্থানেই আজিও কি হিন্দু, কি মুসলমান,সকলেই সিদ্ধ-মানস হইয়া ছাগ বলি দিয়া মা'র পূজা দিয়া যায়। বহু মুসলমান রমণী এই পটেশ্বরীর বাড়ী মানত করিতে আসিয়া থাকে ও ধন্না দেয়! প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব ইষ্টকপ্রাচীর-বেষ্টিত; পশ্চিমে নদী। ভগ্ন প্রাচীরের ইষ্টক স্থানে স্থানে ধসিয়া প্রায় মাটীর সমান হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকেই সেবাইতের পাকা বাড়ী। বাটীর ইট-কাঠ সবই খসিয়া পড়িতেছে। ছাতের কোন কোন অংশ ধসিয়া গিয়াছে; কোন অংশ বা বংশদণ্ডের সাহায্যে স্বস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। যষ্টির সাহায্য ব্যতীত সিঁড়ি দিয়া ঘরে উঠিতে পারা যায় না। আমরা রামরাম ঠাকুর হইতে বর্ত্তমান সেবায়ইতদিগের এক বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি, প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় এই সঙ্গে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পটেশ্বরীর স্থাপয়িতা রামরাম ঠাকুর পশ্চিমদেশীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামরাম ঠাকুর হইতে বর্ত্তমান গিরিজাভূষণ উপাধ্যায় নাবালক সেবায়ইত পর্য্যন্ত বার পুরুষ।

গিরিজাভূষণের পিতামহ রসিকলাল উপাধ্যায়ের পোষ্য ছিলেন। নিবারণচন্দ্র অর্থের অভাবে সমস্ত দেবীসেবার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া, সেসের দায়ে সবই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বারুইপুরের জমীদারদিগের

কুলগুরু ছিলেন। পটেশ্বরীর সম্পত্তি নিলামে উঠিলে বারুইপুরের বাবুরা নিজ নামে তাহা খরিদ করিয়াছিলেন। সেই হইতেই দুর্গাদাস বাবু সেবাইতগণের ভরণপোষণ ও পূজার ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া আসিতেছেন। প্রবাদ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ গোবরা গ্রামখানি পটেশ্বরীর দেবোত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রামরাম তাহা লইতে অস্বীকার করায় মহারাজ নাকি রামরামকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোবরা গ্রাম শেষে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। রামরামের বংশধরগণ গবর্ণমেণ্টের সেটেলমেণ্ট আইনের অতিরিক্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগদখল করিতেছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত জমী খাস করিয়া লইয়াছেন। সেই কারণে গোবরা গ্রামে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের কিছু খাসমহালও আছে, দেখা যায়।

রামরাম ঠাকুরে জপতলা অতীত কালের এক অক্ষয় পুণ্যস্বরূপ অদ্যাপি ইচ্ছামতী-তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান রামরাম ঠাকুরের সিদ্ধতরু সেই প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া থাকে। গ্রাম্য বালকরা উপদেবতার ভয়ে কেহ বৃক্ষতল অপবিত্র করিতে সাহস করে না; শিবচতুর্দ্দশীর দিন গাঁজার ভোগ দিয়া যায়। বৃদ্ধ ধীবরগণ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে নৌকায় গাব মাখাইবার সময় এই গাছতলায় বসিয়া পটেশ্বরী ও রামরাম ঠাকুর সম্বন্ধে কত কিম্বদন্তীর অবতারণা করিয়া থাকে!

নিবারণবাবুর অকালমৃত্যু হইল। তদীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দুই কন্যা ও একটি পুত্র রাখিয়া উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে বাস করিতেছেন।

সুরেন্দ্রবাবুর সাধ্বী স্ত্রীও নাবালক পুত্রকন্যাগুলিকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া স্বামি-শোক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। একজন দাসীই এখন বালকবালিকাদিগের অভিভাবক। সুরেন্দ্রবাবু গারদে প্রেরিত হইলে নাকি দেবী তাঁহার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেন, "আমার মূলমন্ত্র তোদের কুলগুরু ব্যতীত অন্য কাহাকেও দিস না। তাহারাই আমার পূজা করিবে।" আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন গিরিজাভূষণের পৈতা পর্য্যন্ত হয় নাই। গিরিজাভূষণের জননীর স্বপ্ন হওয়ার পর হইতেই তাঁহাদের কুলগুরু মহাশয় মা'র পূজা ও সেবা করিয়া আসিতেছেন। হরিশ বাবু একজন প্রবীণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, আমরা তাঁহার নিকট হইতেই পটেশ্বরীসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পটীর বেদীর চতুঃপার্শ্বে

অনেকগুলি প্রস্তরের নারায়ণ, মর্ম্মরের শিবলিঙ্গ ও গৌরী-পট রহিয়াছে। পিত্তল-নির্ম্মিত কালী ও দুর্গার মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম। রামরাম পটীর বেড় হইতে যাহা যাহা এই স্থানে আনিয়াছিলেন, সবই সেই স্থানে রক্ষিত আছে। দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে গোবিন্দদেব ও মদনমোহনের হস্ত ও কর্ণ ভগ্ন দেখিতে পাইলাম। প্রবাদ, রামরাম পটেশ্বরীকে মৎস্য ও মাংসের ভোগ দিতেন; সেই কারণে উক্ত ঠাকুরদ্বয় স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; তাই নাকি পটেশ্বরী তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করেন। জনশ্রুতি আছে, রামরামের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী রামরামকে গঙ্গায় দিবার বাসনা করেন; কিন্তু সে সময় বহু দূরে শব বহিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার উপযুক্ত লোকের যোগাড় হইয়া উঠিতেছিল না। রাত্রিতে রামরামের স্ত্রীর স্বপ্ন হইল, "তোর ভাবনার কোন কারণ নাই। আমিই রামের সহিত যাইব।" প্রত্যূষে আপনা আপনি গ্রামের লোক জুটিয়া রামের শব দুই ক্রোশ দূরে চাকদহে গঙ্গাতীরে লইয়া চলিল। প্রাতঃকালে রামের স্ত্রী পটীর মন্দিরের তালা-বন্ধ দরজা খোলা পড়িয়া আছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পটীর পট ও অন্যান্য বিগ্রহ যথাসময়ে জলে বিসর্জ্জন করিবার মানসে মা'র নিকট ধন্না দিলেন। পটেশ্বরী রামের স্ত্রীকে স্বপ্ন দিলেন, "আমাকে জলে ফেলিস্ না। আমি ভক্তের সৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।"

আমরা বেদীর উপর পটেশ্বরীর পট দেখিলাম। পটেশ্বরী নামে হিন্দুদিগের কোন দেবতা নাই, পটেই মা'র স্বরূপ অঙ্কিত আছে বলিয়া মা'র নাম পটেশ্বরী হইয়াছে। কিন্তু তিনি কোন্ মূর্ত্তিতে এই স্থানে বিরাজিতা, তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই; পটীর পটও সাধারণ লোক স্পর্শ করিতে পায় না। পটখানি বস্ত্রাবৃত আছে। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার বোধনের দিন পটের বস্ত্র-পরিবর্ত্তন হয়। পুরাতন বস্ত্র ফেলিয়া নূতন কাপড় দিয়া পটখানি আবার নূতন করিয়া জড়াইয়া রাখা হয়। পট কিরূপ, পটে কি মূর্ত্তি অঙ্কিত, তাহা পুরোহিত মহাশয়ও জানেন না! পটখানি তুলিলে অনুমান হয়, যেন দেড় হস্ত লম্বা ও অর্দ্ধহস্ত বিস্তৃত দেবদারু কাষ্ঠের ন্যায় পাতলা কাষ্ঠ-ফলকের উপর ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় কিছু জড়ান আছে। কারণ, পাতলা তক্তার মত পটখানি হাতে করিয়া টিপিলে ঠিক কবজ-লিখা, ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় মড় মড় করিতে থাকে। পূজারী মহাশয় বলিলেন, পটীর

পূজা করিবার মূলমন্ত্র আছে। সে মন্ত্র কাহাকেও প্রকাশ করিবার উপদেশ নাই।

পল্লীতে কেহ কোন স্মরণযোগ্য কায করিলে গ্রাম্য কবিগণ সে সম্বন্ধে ছড়া বাঁধিত। গ্রাম্য কৃষক-বালকগণ পৌষ মাসে পাড়ায় পাড়ায় এই সব ছড়ার গান গাহিয়া চাউল পয়সা সংগ্রহ করিয়া মাঠে বাস্তুতলায় বন-ভোজন করিত। এই ছড়ার গানকে ফলুই কহে। পটেশ্বরীর আবির্ভাব-সম্বন্ধে কোন প্রবাদ আছে কি না, সন্ধান করিতে গিয়া পটেশ্বরীর ফলুই আছে, জানিতে পারিলাম। ফলুইকরের চেলা বৃদ্ধ আবদুল বলিল, প্রায় ৪০।৫০ বৎসর সে গাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অনেক চেষ্টায় সে নিম্নলিখিত কএকটি পদ ব্যতীত আর কিছু গাহিয়া স্মরণ করিতে পারিল না—

"মুস্কিলে আসান আল্লা দোয়া কর দীনে—(দোয়ারকী)
আহা শুন শুন বাবু মশাই করি নিবেদন
ওস্তাদ আমার শুকচাঁদ মোল্লা বন্দিনু চরণ
আহা পটেশ্বরীর জরমো কথা কহি বিবরণ
জরমো তাহার দিয়েছেলো শোন কোন জন
আহা ওত্তর (উত্তর) দেশে এক ঘর বামন পেতো নাক খেতে
কামেল ফকির খেতে দিত এনে মেঙে পেতে
আহা বেটাবিটি ছিল না তার আঁটকুড়ো ছিল
পুরুত্তুর (পুত্র) হবার জন্যি জপ করেছিল"

* * * * *

আবদুল যাহা বলিয়াছিল, আমি অবিকল তাহাই নকল করিয়াছিলাম। পটেশ্বরীসম্বন্ধে বর্ত্তমান পূজারী হরিশবাবুর কথিত কিম্বদন্তী এইরূপ—কোন এক ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অপুত্রক ছিলেন, পুত্রার্থে তিনি নানা যাগ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হয়েন। ব্রাহ্মণের স্বপ্ন হইল, দেবী কন্যারূপে তাঁহার ঘরে যাইবেন। তিনি যেন দেবীকে প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যথাসময়ে ব্রাহ্মণের একটি অনুপমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যা হওয়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ দিকে কন্যার বয়স হইল; বিবাহ আর কিছুতেই হয় না। নানারূপ বিঘ্ন আসিয়া বিবাহের অন্তরায় হইয়া পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ এই সব কারণে

কন্যার প্রতি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি বৈষয়িক কার্য্যে বিব্রত আছেন এমন সময় যুবতী কন্যা অসুখের কথা বলিবার জন্য পিতার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বয়স্থা কন্যাকে সদরে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আধবুড়া মেয়ে; আজও আইবুড়া নাম ঘুচিল না। তোর আবার অসুখ কি রে? তোর মরণই মঙ্গল।" কন্যা পিতার ভৎর্সনা শুনিয়া বিছানায় গিয়া শুইল; আর উঠিল না। কন্যার শোকে ব্রাহ্মণ পাগলের মত হইয়া বিষয়,কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ এক দিন দেখিতে পাইলেন, এক বৃক্ষশাখায় বসিয়া তাঁহারই যুবতী কন্যা এলোচুলে পা দুলাইয়া দুলাইয়া বৃক্ষ-ত্বকে একখানি ছবি আঁকিতেছে। তিনি মৃতা কন্যাকে জীবিতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ছুটিয়া যাইয়া বৃক্ষতলে কাঁদিয়া পড়িলেন। এদিকে কন্যাও অন্তর্হিতা হইল! ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন,—দেবী বলিলেন, "আমি তোমার পবিত্র গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম; অর্থ-সমাগমে তোমার গৃহে পাপস্পর্শ হইতে আরম্ভ হওয়ায় আমি থাকিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছি। মনে দুঃখ করিও না। আর তোমার কোন সন্তান জন্মিবে না। আমার প্রচারজন্য আমার এই অসম্পূর্ণ পটখানি গৃহে স্থাপিত করিয়া পূজা করিও। তোমার মঙ্গল হইবে। কিন্তু সাবধান, এই অঙ্গহীন পট কাহাকেও দেখাইলে সে অন্ধ হইয়া যাইবে।" ব্রাহ্মণ সেই হইতে পটখানি গৃহে আনিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণীর স্বপ্ন হইল —"আর আমাকে গৃহে রাখিও না; তোমার অমঙ্গল হইবে। আমাকে নূতন হাঁড়িতে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দাও।" ব্রাহ্মণী তাহাই করিলেন। এ দিকে জপমগ্ন সিদ্ধপুরুষ রামরাম ঠাকুর জপতলায় বসিয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবী বলিতেছেন, "আমি নূতন হাঁড়িতে ভাসিতে ভাসিতে শশ্মানঘাটে লাগিব। আমাকে তুলিয়া লইয়া সেবা করিস। সাবধান আমি অসম্পূর্ণ আছি। পট যেন কখনও খুলিয়া দেখিস না।" জপশেষে রামরাম চাহিয়া দেখিলেন, নদীতীরে একটি নূতন হাঁড়ি ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি মা'র সেই গুপ্ত পট তুলিয়া লইয়া স্বগৃহে গোবরা গ্রামে স্থাপিত করিলেন। পট পূজা করিতে হয় বলিয়া মা সেই হইতে এ দেশে পটেশ্বরী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। রামরাম পটেশ্বরীকে সর্ব্বপ্রথমে যেস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন

তাহাই পটীর বেড়। এক্ষণে দেখা যাউক পটেশ্বরীর কোন ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করিতে পারা যায় কি না?

প্রবাদ,—কৃষ্ণনগরের মহারাজ গোবরা গ্রাম রামরামকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। গোবরা রামরামের ব্রহ্মোত্তর হইলেও সাধারণে উহা পটেশ্বরীর সেবার সম্পত্তি বলিয়াই জানে। বিশেষতঃ প্রবাদে আছে যে, রাজা উক্ত গ্রামখানি রাম ঠাকুরকে দেবোত্তর দান করিতে চাহেন, কিন্তু রামের তাহাতে অত্যন্ত অনিচ্ছা থাকায় অবশেষে তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয়। মধ্য বঙ্গের প্রায় অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তরই নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান। রাম রাম হইতে বর্ত্তমান গিরিজাভূষণ বার পুরুষ। তৎকালীন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হইতেন। তাহা হইলে রামরামের ব্রহ্মোত্তর কৃষ্ণচন্দ্রের বহু পূর্ব্বের বলিয়া অনুমান হয়। পটীর বেড়ের লুপ্তপ্রায় চিহ্নগুলিও তাহার সাক্ষ্যদান করে। বিশেষতঃ পটেশ্বরীর সহিত যে গোবিন্দজী ও মদনগোপাল আছেন তাঁহাদের মূর্ত্তি অনেকটা বৌদ্ধভাবাপন্ন। এ দেশে পুষ্করিণী খনন করিতে গেলে, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে গেলে অথবা কোথাও কোন কূপ কিম্বা মজা নদীর সংস্কার করিতে গেলে অনেক স্থানে প্রস্তর-ক্ষোদিত বিভগ্নাঙ্গ বৌদ্ধভাবাপন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ কান্দীর রুদ্রদেব প্রভৃতি দেশবিখ্যাত কয়েকটি বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ শিবমূর্ত্তির পূজা ও প্রভাব দেখিলে অনুমান হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেশ হইতে বিদূরিত হইয়া শৈব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধদিগের প্রথা ও সংস্কার অনুসারে হিন্দু বিগ্রহাদির গঠনকার্য্য প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত যখন কালা পাহাড়ের আত্যাচার বিস্তৃত হইয়াছিল তখন যে বাঙ্গালা দেশের মধ্যভাগ সেই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহা বিশ্বাস হয় না। কিম্বা সে সময়ে মুসলমান কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি নষ্ট করিয়া লুট পাট করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া স্থানীয় ক্ষমতাশালী দুষ্টপ্রকৃতি মুসলমানরা হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দেবদেবীর অঙ্গহানি করিত।

পটেশ্বরীর সহচর বৌদ্ধভাবাপন্ন মদনমোহন ও গোবিন্দ দেবের কালাপাহাড়ি ধরণে হাত কাণ কাটা দেখিয়া অনুমান হয় যে, পটেশ্বরীর স্থাপনকর্ত্তা রামরাম ঠাকুর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে গোবরা গ্রাম দান না পাইয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন হিন্দু স্বাধীন রাজার নিকট হইতে ব্রাহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মধ্য-বঙ্গে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য ভিন্ন ভূমি দান করিবার ক্ষমতা আর কাহার ছিল? টাকী, গোবরা, পূড়া, চান্দুড়িয়া, সাড়াপোল, অভয়াবাস, রাজনগর প্রভৃতি ইচ্ছামতীর পূর্ব্ব-তীরস্থ গ্রামসমূহের উপর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এতদূর আধিপত্য বিস্তৃত ছিল যে, মানসিংহ সোজাসুজি টাকীর ইচ্ছামতী পার হইতে সাহসী না হইয়া ভবানন্দের সাহায্যে বহু দূর ঘুরিয়া তবে প্রতাপনগর চাঁদখালি অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামরামের বংশতালিকা দৃষ্টে তাঁহাকে এই সময়ের লোক বলিয়াই অনুমান হয়। যদি রামরাম এই সময়ের লোক হয়েন তাহা হইলে তাঁহার প্রতাপের নিকট হইতেই ভূমি দান পাওয়া সম্ভব। আর সে সময় প্রতাপের সাহায্যে পরিপুষ্টি অনেক দেবমন্দিরের চিহ্ন এ দিকে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলুইকার এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছে, "উত্তর দেশে ঘর"। পটেশ্বরীর জন্মদাতা ব্রাহ্মণের বাড়ীর কথা সম্ভবতঃ সে সময় কিম্বদন্তীতে জানা যাইত। নতুবা ফলুইকারের ছড়ায় উত্তর দেশের কথা থাকিবে কেন?

ইচ্ছামতীর তীরে রাজনগর নামে এক গ্রাম আছে। রাজনগর একদিন বহুজনপূর্ণ গণ্ডগ্রাম ছিল, ইহার আর এক নাম অভয়াবাস। অভয়াবাসে প্রাচীন রাজার বাস্তভিটা, গড়, কামান, কামান-ঘর প্রভৃতির চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমার বিশ্বাস পটেশ্বরী এককালে এই রাজবাড়ীর গৃহদেবী-রূপে বিরাজিতা ছিলেন। রাজ পরিবারের ধ্বংসের সময় হয় ত কেহ এই গৃহদেবীকে ইচ্ছামতীতে ভাসাইয়া দিয়া থাকিবেন। পটেশ্বরী ভাসিতে ভাসিতে সিদ্ধপুরুষ রামরামের জপ তলায় আসিয়া লাগিয়া ছিলেন।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

অভিমান।

—:*:—

ঐ দেখ্, মা, আঁধার এল
আকাশখানি ছেয়ে,
চলে গেল সূর্য্য ঠাকুর
সোণার তরী বেয়ে।
পূজো বাড়ীর বাঁশীর গান
ঐ বুঝি, মা, বাজে;
বাঁশীর সুরে কান্না কেন
আসে বুকের মাঝে?
দিনটি ত, মা, ফুরিয়ে গেল
আপন কার্য্য সারি;
আজো কি, মা, দাদা আমার
আস্‌বে না কো বাড়ী?

সেবার দাদা যাবার বেলা
আমায় কোলে ক'রে
বলেছিলেন—"আবার আমি
আস্‌ব বছর-পরে।"
কতই যে জল পড়েছিল
দাদার দু'চোখ বেয়ে,
আমিও কত কেঁদেছিলাম
দাদার পানে চেয়ে।
আর কি দাদা আসবে না কো
আর নেবে না কোলে?
আর কি মোরে ডাকবে না কো
'লক্ষী সোণা' বলে?

তবে খুলে নে, মা, জরীর মুকুট,
ফিরিয়ে নে, মা, সাজ।
দাদা যখন আসবে না কো
আর কি এতে কায?
বাজুক বাঁশী, বলিস্‌নে, মা,
পূজো দেখার কথা;
একা যেতে প্রাণে যে, মা,
বাজে শতেক ব্যথা!
আর যাব না বিজয়াতে
চিত্রা নদীর তীরে;—
তবু কি, মা, দাদা আমার
আস্‌বে না কো ফিরে?

কেন, মা, তোর আঁখির কোণে
অশ্রু এল ভরে?
আঁচলখানি কেন, মা, গো,
দিলি মুখের পরে?
দাদার কথা বল্লে কেন
কস্‌নে কোন কথা?
প্রাণটা যে, মা, কেমন করে,
সয়না যে, মা, ব্যথা!
সবাই বলে—দাদা মোদের
আঁধার ঘরে আলো;
দাদাকে কি আগের মত
বাসিস্‌ না, মা, ভালো?

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

———

ধার-করা শাল।

(বাঙ্গালা বড় দিনের নক্সা।)

['বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটের পুরস্কার রচনার জন্য এই গল্পটি লিখিয়াছিলেন। গল্পলেখকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন প্রথম ও ঘোষ মহাশয় দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন।

'ভাদ্রের 'আর্য্যাবর্ত্ত' দ্রষ্টব্য।]

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত স্নেহশীল পিতার একমাত্র পুত্র। যেমন হইয়া থাকে—একমাত্র পুত্র বলিয়া ও অত্যধিক স্নেহ লাভ করিয়া তিনি যথেচ্ছাচারিতার কুপ্রভাব, দুর্জ্জয় অভিমান এবং ধৈর্য্যহীনতা "গুণে" বঞ্চিত হয়েন নাই। শৈশবে হরিহর তাঁহার পিতৃভবনের পাঁচ ক্রোশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত "আদুরে গোপাল" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সত্য কথা বলিতে কি, সমগ্র ধাত্রী-সমাজের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক আব্দার ছিল এবং এই সকল অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক খেয়াল প্রচুর মিষ্টান্নদ্বারাও সহজ, স্বাভাবিক এবং সম্ভব পথে পরিচালিত করা যাইত না। গভীর রাত্রিতে হয় ত তিনি দ্রাক্ষাফল আস্বাদনের জন্য চীৎকার-সম্বলিত প্রচণ্ড আব্দার ধরিলেন। অথচ তখন জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যভাগ এবং দুই মাস পূর্ব্ব হইতে বাজারে দ্রাক্ষাফল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাঁহার প্রবোধার্থ ব্যবহৃত মধুরতম সোহাগবচনসমূহ গোপালের কেবল চীৎকারের প্রচণ্ডতার বেগ বর্দ্ধিত করিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাটীর সকলের এবং কয়েকজন প্রতিবেশীর নিদ্রা ভঙ্গ হইত এবং ধাত্রী মাতা বার্দ্ধক্য-রেখাচিহ্ন আবৃতকারী অনেকগুলি সুন্দর কেশগুচ্ছ হইতে বঞ্চিত হইতেন ও আদুরে গোপালের নখাঘাতে তাঁহার বিদীর্ণ অঙ্গের বহু স্থান হইতে শোণিত-রেখা প্রবাহিত হইত, ততক্ষণ চীৎকার থামিত না। এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা পরে হরিহরের পিতার নিকট সর্ব্বপ্রকারে ঋণী কোনও শিক্ষকের প্রযত্নে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ধাতুরূপ এবং বাক্যবিন্যাসের কঠোর সূত্রগুলি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া তাঁহার বালক ছাত্রটিকে যথাসাধ্য সুখী করাই সেই শিক্ষকের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। যাহা হউক, পিতা সগর্ব্বে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট বলিতেন, বালকটি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং এরূপ প্রগাঢ় ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন যে, ইংরাজী ভাষার যে কোন দুরূহ ক্ষুদ্র শব্দের অর্থ কেবল মাত্র অভিধানের পাতা উল্টাইয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে সমর্থ। হিন্দু কলেজের জনৈক নব্য ছাত্র এই গর্ব্বের কথা শুনিয়া এই প্রকার পাণ্ডিত্যে আপত্তিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি অলক্ষিতভাবে এই অবমানজনক মন্তব্য-শ্রবণকারী এবং অলিন্দ হইতে এই ধৃষ্ট নিন্দকের নির্গমন-লক্ষ্যকারী প্রতিভাশালী বালকের হস্ত হইতে সুনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই বালকের নৈতিক উন্নতি আদৌ রতি হইতে কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। কারণ, তিনি ১০ এবং ২২ এর

পার্থক্য যেমন বুঝিতে পারিতেন না, পাপ ও পুণ্যসম্বন্ধীয় প্রচলিত নীতিবিষয়েও তেমনই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার এইটুকু সুবুদ্ধি ছিল যে, তিনি পুলিসের হাতে পড়েন নাই এবং তাঁহার পিতার দেরাজ এবং ক্যাশবাক্সের মধ্যেই তাঁহার অঙ্গুলী-চালনা সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ পিতৃধন অপহরণে যে পাপ আছে, ইহা কখন তাঁহার মনেই হয় নাই, কারণ, তিনি বলিতেন,—"বৃদ্ধ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে (এবং এই আশা তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল) সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ত আমারই! যদি আমি সে সময়ের কিছু পূর্ব্বে বৃদ্ধের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রার অবসরে আমার বর্ত্তমানকালের প্রয়োজনীয় অর্থাদি গ্রহণ করি, তাহাতে ক্ষতি কি?" তাঁহার পিতা যে তাঁহার অবস্থার উন্নতির জন্য আবশ্যক অর্থপ্রদানে আপত্তি করিতেন, তাহা নহে—কারণ, ঐ সরল-স্বভাব বৃদ্ধ তাঁহার পুত্রকে রাজপুত্রের ন্যায় আড়ম্বরে রাখিতেই চাহিতেন। কিন্তু দৃঢ়রূপে অর্গলবদ্ধ ও তালকরুদ্ধ লৌহ-সিন্দুক গোপনে লুণ্ঠন করিয়া আনন্দ উপভোগ হরিহরের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল।

* * * * * *

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস।—দিনটি সূর্য্য-করোজ্জ্বল। "বড় দিন" আগতপ্রায়। হরিহর তাঁহার বাটীর উন্মুক্ত অলিন্দে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এবং তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে ও শূন্য নয়নে চিন্তার রেখাপাত স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান। এই বহু অভিজ্ঞতালব্ধ সুখান্বেষী যুবকের আকৃতিতে ইহা একটী নূতন লক্ষণ। যেরূপ যত্নসহকারে তিনি চিন্তাকে হাসি-তামাসা করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে যথার্থ গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাহা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। কিন্তু জীবনে তিনি আর কখনও এত গম্ভীর হয়েন নাই। অষ্টাদশ মাস অতীত হইল, তাঁহার পিতা গতাসু হইয়াছেন। তাঁহার জননী রোগ-শয্যায় শায়িত। যে সঞ্চিত অর্থরাশি তাঁহার সমস্ত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়াছে! তাঁহার পিতা কোনও ইংরাজ কুঠির মুচ্ছুদ্দী ছিলেন এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণেরই মত খাতায় জমা এবং অতি বৃহৎ ভুঁড়িই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল। লোক বলিত, অতি কম তাঁহার দশ লক্ষ টাকার বিষয় আছে। পূজাতেই তাঁহার বাৎসরিক দশ সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় হইত এবং একবার তিনি ভৃত্যগণকে শাল ও জরীর পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়াছিলেম। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল। তাঁহার উত্তমর্ণগণ সকলে তাঁহার বিষয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রত্যেক দ্রব্যের উপর, এমন কি, উদ্যানস্থ টিনের জলপাত্রগুলিতে পর্য্যন্ত সেরিফ অলক্ষণবিশিষ্ট শীল বসাইলেন। তথাপি পাওনাদারগণ টাকায় দুই আনার অধিক পাইলেন না। হরিহর নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এতদিন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছেন, আর আজ তিনি পথের ভিখারী! যদি তাঁহার পিতার দূরদর্শিতা তাঁহার মাতা ভিন্ন অন্য সকলের অজ্ঞাত-

সায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু কোম্পানীর কাগজ না রাখিয়া যাইত, তবে তিনি নিশ্চয়ই উদ্বন্ধনে অথবা পথিমধ্যস্থ প্রথম জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিতেন। "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" এবং যে ব্যক্তি টাকার হিসাবসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ লক্ষের সমান। অপরিমিত ব্যয়ের মত্ততায় অতি শীঘ্রই টাকার থলি শূন্য হইয়া আসিল; অবশেষ একদিন এই চঞ্চলমতি যুবক দেখিলেন যে, তিনি একটি মাত্র আধুলীর অধিকারী। ইহাও আবার বিশ জন অভদ্র দোকানদারের নিকট প্রতিশ্রুত। তাহারা অবিশ্রান্ত তাকিদের জ্বালায় তাঁহাকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই সকল দুর্ম্মতির জন্য হরিহর বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। তাহারা বড় জোর তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইবে। নিশ্চিত অনাহারের অপেক্ষা তাহা ভয়াবহ নহে। এই শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়াই এই আমোদপ্রিয় যুবক আজ বাটীর অলিন্দে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। অতীতের মধুর স্মৃতি তাঁহাকে কোনও প্রকারে আশ্বস্ত করিতেছিল, নতুবা তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় পতিত হইয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতেন। তিনি এখনও যুবক এবং শক্তিশালী; কিন্তু তিনি কায করিতে অক্ষম; তিনি পরিশ্রমে অনভ্যস্ত আর প্রায় নিরক্ষর মূর্খ। এই অপব্যয়ী যুবক এখনও কোনও না কোনও প্রকারে কাযে আসিতে পারে, এইরূপ আশাবিশিষ্ট অনেক বন্ধু কর্ত্তৃক আমাদিগের নায়কের চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল।

"সুপ্রভাত, দাদা! দেখিতেছি বিপদে পড়িয়াছ। কিন্তু ছিঃ এত মন ভার করিয়া থাকিও না, তুমি এখনও তোমার বাড়ী বন্দক দিয়া কিছু টাকা তুলিতে পার।"

হরিহরের মানসিক অবস্থা এরূপ রঙ্গ-রহস্য উপভোগ করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল না এবং তিনি একটু রূঢ়ভাবেই বলিলেন,—"রাম, আমাকে বিরক্ত করিও না। আমার কোনও মন্ত্রীর প্রয়োজন নাই। এরূপ পরিপাটি বেশভূষায় সজ্জিত বিলাসী ভদ্র যুবকের আমার স্থায় নিঃস্ব হতভাগ্যের নিকট কি অভিপ্রায়ে শুভাগমন হইয়াছে?"

"নিঃস্ব হতভাগ্য! তাই বটে! কেন, তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি ভূত দেখিয়াছ, না দৈবজ্ঞদ্বারা তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করাইয়াছ? তুমি ত কখনও এরূপ অবসাদগ্রস্ত হও নাই? স্ফূর্ত্তি কর, বুড় ইয়ার, আর মনে রাখ যে, কাল বড় দিন।"

"ওঃ! তুমি চাও যে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমাদের ভোজের ব্যবস্থা করি—অফুরন্ত পোলাও আর কাবাব, আর জন প্রতি এক ডজন শ্যাম্পেন?"

"হাঁ। ঠিক, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। তুমি নিশ্চয়ই আমাদিগকে আমাদের বার্ষিক হইতে বঞ্চিত করিবে না?"

"কিন্তু তুমি পরিবর্ত্তিত অবস্থার বিষয় ভাবিতেছ না। আমার আর্থিক অবস্থার বিষয়ে তুমি যে কিছুই জান না, এরূপ ভাণ করিতে পার না।"

"আরে, দাদা, তুমি এখনও কুবেরের স্থায় ধনী। তুমি বিস্মৃত হইতেছ যে, তুমি কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশে অবস্থিত ১৬ কাঠা জমীর মালিক তুমি, আর সে ত আট হাজার টাকা তোমার পকেটে থাকারই সমান।"

"তোমাদের বড়দিনের আমোদ-প্রমোদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কি তুমি আমাকে বাড়ীটা বিক্রয় করিতে পরামর্শ দাও ?"

"না, তাহা নহে। আমি আশা করি, তোমার এখনও সে অবস্থা হয় নাই; কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা তুলিতে পার এবং পরে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করিতে পার। বলাই, চণ্ডী ও তারণ খরচের একটা হিসাব করিয়াছে। দুই শত টাকার বেশী খরচ হইতে পারে না। তাহাতেই আমাদের একটি সুন্দর ছোট মনোমত পার্টী হইবে। তাহাতে আমরা আর এক বৎসর স্ফূর্ত্তিতে থাকিব।"

"কি বল! দুই শত টাকা কি, দুই শত কড়ি এখন আমার ঘরে নাই।"

"ঐ তোমার ধর্ম্মভাব বা মিতব্যয়ীর ভাব যে উথলিয়া উঠিয়াছে! তুমি ত আগে এরূপ নীচপ্রকৃতি ছিলে না? আমি দেখিতেছি, তুমি একেবারে নিরাশ হইয়াছ। মনের এ অবস্থা বড় ভীষণ। কিন্তু যতক্ষণ তোমার এই বন্ধুর মাথায় বুদ্ধি খেলিবে, ততক্ষণ তোমায় নিরাশাসাগরে ডুবিতে হইবে না। আচ্ছা আমি দেখি। গত বার আমি তোমার স্ত্রীর নথটি বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলাম এবং সুন্দরীর নাসিকায় দোলাইয়া নাসিকাটিকে বিরূপ করার চেয়ে আমরা উহার অনেক সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। একটা বাঁকা সোনার তার আর তিনটা মুক্তার পরিবর্ত্তে আমরা একটি অমূল্য স্যাম্পেন ডিনার ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর মদ্য পাইয়াছিলাম। এখন হরি, আমি শুনিতেছি, তোমার মাতা মৃতপ্রায়। হতভাগিনী রমণী, পরমেশ্বর তাঁহার সদ্গতি করুন। কিন্তু তিনি মৃতপ্রায় এবং মৃতা বলিলেই হয়। মনে কর, তুমি মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার সোণার বালা জোড়াটা লইলে; তিনি যে স্থানে যাইতেছেন, সে স্থানে নিশ্চয়ই তিনি বালার অভাব অনুভব করিবেন না।"

হরিহর এই পরামর্শ শুনিয়া চমকিত হইলেন। তিনি পিতার লৌহ-সিন্দুক হইতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায়, এত স্বর্ণ ও রৌপ্য অপহরণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শয়ন-মন্দিরে সিঁধ কাটিয়া ঐ রমণীর অতিরিক্ত অলঙ্কারাদির ভার লঘু করিয়াছেন; ডে মার্টিনের লেবেলগুলি ঐ সরলাকে ব্যাঙ্ক-নোট বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহার নগদ অর্থাদি হস্তগত করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মাতার প্রতি কোনও গর্হিতাচরণের চিন্তাও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার প্রকৃতিগত উদ্দাম আবেগের সহিত তিনি মাতাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুর পরামর্শ তাঁহাকে চমকিত ও প্রায় জ্ঞানশূন্য করিয়াছিল। তিনি এত বিচলিত ও বিভ্রান্ত হইলেন যে, কিছুকাল তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

"কেমন বুড়, বোকা? আমার বুদ্ধি নাই? রামলাল শর্ম্মাকে নিজের মতে কায করিতে দাও, তোমার মন সুস্থ হইবে—তোমার হতাশভাব দূর হইবে। বন্ধু হে, যদি তোমার এই সুন্দর হৃদয়ে যদি মনের গভীর অন্ধকার প্রবেশ করিয়া থাকে তাহার মধ্যেও আমার নয়ন দেখিতে পায়। তাহা হইলে সমস্ত স্থির? জয় বড় দিনের জয়!"

আহার্য্য দ্রব্যের তালিকা আলোচিত হইল, নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল।

রামলাল বলিলেন "নবকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। সে রাতদিন তিসী আর কার্পাসসূত্রের কথায় বিরক্ত করিয়া তুলে। লোকটা মনে করে যে, পৃথিবীতে তিসী আর

শৃঙ্গ ক্রয় করা ব্যতীত আর কোনও কার্য্য নাই। তাহা ছাড়া লোকটা অতি কৃপণ, আর যদিও ব্যবসায়ে বেশ উপার্জ্জন করে এ পর্য্যন্ত একজন বন্ধুকেও ঝোলভাত পর্য্যন্ত খাওয়ায় নাই। এ রকম গাধাকে খাওয়াইয়া কি হইবে? লইবার বেলা বেশ; দিবার বেলা শূন্য! না, না ভাই হরি, যে কখনও ভোজ প্রদান করে না তাহাকেই আমি মন্দ লোক বলি।"

এতক্ষণে হরিহরের চমক ভাঙ্গিল। মনোবৃত্তি অদ্ভুত রূপে সংযত করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তিনি বন্ধুর প্রস্তাবের ও যুক্তির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, যতই ব্যয় হউক না কেন বড় দিনের আমোদ যথোচিত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে এবং এই প্রীতি-সম্মিলনে তাঁহার কোনও বন্ধুকে বাদ দিলে চলিবে না। এমন কি তিসীপ্রিয় নবকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। নতুবা হরি বাবু মোটেই ভোজ দিবেন না। এই কথায় রামলাল শীঘ্রই নিন্দিত নবের গুণের দিক দেখিতে পাইলেন। নব সঙ্গীতে খুব পারদর্শী; আর বড় দিনে ভাল সঙ্গীত না হইলে কি হইল? নিমন্ত্রণের ফর্দ্দে পঞ্চাশ জনের অধিক ব্যক্তির নাম লিখিত হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যে আহার্য্য-দ্রব্যের সমস্ত আয়োজনাদি করিতে হইবে। হরিহর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন সুতরাং বন্ধুবর্গ যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন; আর গাড়ীর বন্দোবস্ত নিজেরাই করিয়া লয়েন। কারণ, যদিও নিমন্ত্রিতগণ যে অবস্থার লোক তাহাতে তাঁহারা প্রতিদিন গড়ে দশ মাইল পদব্রজে গমনাগমন করিতে বাধ্য হয়েন তথাপি মেসার্স খিদেমবর এণ্ড কোংর সরকার হওয়া এক আর হরিবাবুর নিমন্ত্রিত হওয়া এক কথা। বাগানে গাড়ী না হইলে তাঁহারা যাইতে পারেন না। সুতরাং, রামলালের বজেটে এই অত্যাবশ্যক খরচের জন্য ৩০৲ ধার্য্য হইল। অধিকন্তু হরি মিনতি করিয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, এ বিষয়ে যেন কার্পণ্য করা না হয়; কারণ, তিনি গাড়ী ভাড়াটা অকাতরে প্রদান করিবেন। তিনি এই ভোজে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহার বন্ধুগণ যে কেবল আনন্দ উপভোগ করিবেন তাহাই নহে, পরন্তু তাঁহারা যেন বেশ জাঁক জমকে আইসেন।

স্থির হইল, ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রামলাল গাড়ীর বন্দোবস্ত করিবেন এবং নিমন্ত্রিতগণকে বেলঘরের বাগানে লইয়া যাইবেন। বেলঘরেয় হরিহরের একখানি বাগান ছিল; কিন্তু সে বাগান এখন আর তাহার নহে। কিন্তু নূতন ক্রেতা পুরাতন মালীকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং আশা ছিল যে, বড় দিনের নিমন্ত্রিতগণ অপমানিত হইয়া বহিষ্কৃত হইবেন না। অন্ততঃ হরি তাঁহার বন্ধুকে এইরূপই জানাইয়াছিলেন। প্রীতি সম্মিলনের সমস্তই স্থির, নিমন্ত্রিতগণ কিছু পূর্ব্বেই আগমন করিবেন। প্রিয় সহচরগণের হৃদয়ানন্দকারী সুখ-আশা লইয়া এবং একখানি কাশ্মীরী শাল জোগাড় করিবার জন্য রামলাল প্রস্থান করিলেন। পৌষের মধ্যভাগে কাশ্মীরী শাল ব্যতীত কি কেহ ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন?

হরিহর স্বগত বলিলেন, "এইবার আমি এই বিলাসী বাবুটিকে এবং আমার দুই কুড়ি কপট বন্ধুগণকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। যাহারা যেরূপ আঘাতের উপযুক্ত সেইরূপ আঘাত প্রদান করিতে ভগবান আমাকে শক্তি দিউন!"

তৎক্ষণাৎ তাঁহার মতলব স্থির হইল। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তিনি পুরাতন মালীর সহিত প্রাথমিক বন্দোবস্ত করিবার জন্য বেলঘরে রওনা হইলেন।

বড়দিন প্রভাত হইল। রামলাল শর্ম্মা ঘোড়লের ন্যায় ব্যস্ত; একবার গাড়ীবানকে ডাকিতেছেন. একবার কোনও মন্দগামী বন্ধুকে ডাকিতেছেন, কখনও বা যে বন্ধু তাঁহাকে কাশ্মীরী শাল ধার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মনে হয় যে, কেবল তাঁহারই জন্য এবং তদপেক্ষা লোভী যাঁহারা বেশী নিদ্রিত হইয়া পড়িলে গাড়ী পাইবেন না এই ভয়ে সমস্ত রাত্রি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন নাই তাঁহাদেরই জন্য বড় দিনের প্রভাত উদিত হইয়াছে।

যথাসময়ে চিৎপুর রোডে একটি সুদৃশ্য গাড়ীর আড্ডার সম্মুখে নানা বেশভূষায় সজ্জিত (সজ্জার মধ্যে নানাবর্ণের পশমী গলাবন্ধ বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইলেন। গাড়ীগুলি একে একে চলিতে লাগিল। ঐ দেখ, সুখী বন্ধুবর্গ বাগানের দিকে চলিয়াছেন!

হরি বাবুর নামে পরোক্ষভাবে তদীয় অবস্থাপরিবর্ত্তনের প্রতি উদ্দিষ্ট বহুবিধ বিদ্রূপ-দ্বারা তাঁহারা পথিমধ্যে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। দশটা বাজিল, সুখান্বেষী সুহৃদ্বর্গ তাঁহাদিগের প্রীতিসমাগম স্থানে উপনীত হইলেন। হরি এখনও উপস্থিত হয়েন নাই। কিন্তু তিনি অবিলম্বে আগমন করিবেন এইরূপ আশা করা যাইতেছিল। দূরে শকটচক্রের শব্দ শ্রবণ করিয়া সমবেত নিমন্ত্রিতগণ সিংহদ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলেন—আশা, যে হরি আহার্য্য দ্রব্যাদি সমেত আসিতেছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁহাদিগকে হতাশ হইতে হইতেছিল। কোনও বার কোন দীর্ঘ গুম্ফবিশিষ্ট সৈনিকপুরুষ ব্যারাকপুরে যাইতেছেন, কোনও বার বা কোন মুসলমান খানসামা ধর্ম্মতলা বাজারের সুস্বাদু দ্রব্যাদি লইয়া সেই সুখময়ী নগরীতে প্রত্যাগমন করিতেছে। একটা বাজিল! নিমন্ত্রণকর্ত্তা কোথায়? ঘটনাটি বড়ই বিষম দেখাইতে লাগিল এবং প্রত্যেকেরই মুখ লম্বাকৃতি ধারণ করিল। মালী কোথায়? সেও অদৃশ্য! প্রত্যেকেরই মুখে চিন্তা ও দুঃখের ভাব; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে, সব ফাঁকী! আর এক ঘণ্টা গভীর আগ্রহপূর্ণ আলোচনা ও পরামর্শে কাটিয়া গেল।

ভোজের আশা অনেকক্ষণই ত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু সুখান্বেষী সুহৃদমণ্ডলীর সম্মুখে এক নূতন বিপদ দেখা দিল। গাড়ীবানগণ সন্দিগ্ধ হইল। তাহাদিগের এতদিনের অভিজ্ঞতায় তাহারা কখনও এরূপ বিষন্ন বড়দিনের পার্টি বহন করে নাই। তাহাদিগের ভাড়া-প্রাপ্তিবিষয়ে আশঙ্কা স্বাভাবিক এবং এক্ষণে তাহারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। ঐ পঞ্চাশজনের কাছে সর্ব্বশুদ্ধ অর্দ্ধ তঙ্কাও ছিল না অথচ ভাড়া প্রায় চল্লিশ টাকা। ঐ মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান ছিলেন তাঁহারা মুক্ত পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া গোপনে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু রামলাল শর্ম্মা পশ্চাৎপদ হইলেন না। সকলেই জানে গাড়ী-বানগণ মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপর এবং চাবুকের ন্যায় কঠিন-হৃদয়। মিষ্ট বাক্য হইতে শীঘ্রই তাহারা বাহুযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। রামলাল তাহার দেহের জন্য কিছুমাত্র

চিন্তিত হয়েন নাই কারণ এরূপ সামান্য বাহুযুদ্ধে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাহার ধার করা শালটি পুঁটুলী পাকাইয়া বক্ষঃস্থলে দৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। হায়! তাঁহার প্রযত্ন বিফল হইল। জিহুর এই দুর্দ্দান্ত সন্তানগণ তাঁহার অমূল্য রত্নটি কাড়িয়া লইল এবং তাঁহার অতি কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগের বিজয়লব্ধ দ্রব্যটি লইয়া প্রস্থান করিল।

* * * * *

ঠিক দুই ঘণ্টা পরে পানিহাটীর একজন কৃষক রক্তাক্ত নাসিকাবিশিষ্ট এবং উপরের গাত্রাবরণবিহীন একজন যুবককে উন্মাদের ন্যায় ভাগীরথীর দিকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তিনি পুণ্যসলিলে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন কি উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে আপনার অদৃষ্টনির্ভরকারী ব্যক্তিগণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে রামলালের জননী এখনও তাঁহার হারানিধির জন্য এবং তাঁহার বন্ধু তাঁহার কাশ্মীরী শালের জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

সুবর্ণরেখা নদী।

হে নদি! সুবর্ণরেখা, সুবর্ণ-হিল্লোলে,
বহিছ বঙ্গের বুকে অনন্ত শোভায়;
এ কর্ণকুহর তৃপ্ত করুণ কল্লোলে,
মুগ্ধ এ নয়ন তব তট-চারুতায়!
সৈকতে শ্যামল শৈল শতবাহু তুলি',
আলিঙ্গিতে চায় ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ,
বনকুঞ্জে বিহঙ্গম বুলে কত বুলি,
হরিণী শিখিনী নৃত্যে মরি কি উল্লাস!
কত নরনারী নামি তব স্বর্ণজলে,
কৌতুকে আপনাহারা সুবর্ণ চয়নে;
স্বর্ণের কাঙাল জীব চির ভবতলে,
ঢাল স্বর্ণরেণুভার তরঙ্গ প্লাবনে!
পার্থিব সুবর্ণ তুচ্ছ কবির নয়নে,
হেরি ওই পাপ-স্বর্গ বিহ্বল জীবনে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

(১)

রবিবারে কলেজে 'ডিউটি' ছিল না। সুতরাং পরম নিশ্চিন্ত মনে চা পান করিতে করিতে বন্ধুবরের নিমন্ত্রণ পত্র পড়িতেছিলাম। শ্রীরামপুর হইতে তিনি লিখিয়াছেন যে, আগামী শুক্রবার বৌভাত। সে দিন আমার কোনও ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। বিবাহের দিন যাইতে পারি নাই। বৌ-ভাতের দিন না যাইলে তিনি আমার অপরাধ কোন মতেই মার্জ্জনা করিবেন না। আজ রবিবার; শুক্রবারের রাত্রিতে বৌভাতের নিমন্ত্রণ। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। সকালের ডিউটি সারিয়া যাত্রা করিলেই চলিবে আমার যাইবারও বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। বান্ধবী দেখিতে কেমন, বন্ধুর মনের মত হইয়াছেন কি না, প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতে হইবে। পত্রের ভাষা যেরূপ আবেগপূর্ণ, উচ্ছাসে ভরা, তাহাতে অনুমান হয় যে, বন্ধুবর খোস মেজাজে আছেন।

অনেকের ধারণা, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা শুধু ঔষধের তালিকা মুখস্ত করে এবং মড়া কাটিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর আর কোনও ব্যাপারে তাহাদের তেমন আসক্তি নাই; কোন খবরই রাখে না। হয় ত কোন কোন ক্ষেত্রে কথাটা আংশিক সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমাদের মেসের ছাত্রদের সম্বন্ধে এ কথাটা আদৌ সত্য নহে। সকলেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বটে; ঔষধের তালিকা তাহাদের কণ্ঠাগ্রে বিরাজিত, মড়া কাটিতেও তাহারা সিদ্ধহস্ত বটে; কিন্তু তাই বলিয়া মেসে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতিরও ভক্তের অভাব ছিল না। নানাবিধ সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক পত্রের যথেষ্ট পাঠকও আমাদের মেসে ছিলেন।

ঝি 'ষ্টেটস্ ম্যান' খানা ঘরে দিয়া গেল। চা'র পেয়ালা সরাইয়া রাখিয়া কাগজ খুলিয়া ফেলিলাম। যুদ্ধের খবর আর ভাল লাগে না। তবু এক-বার তারের সংবাদগুলিতে চোখ্ বুলাইয়া গেলাম। সহসা বড় বড় অক্ষরে লিখিত ভীষণ বন্যা শীর্ষক সংবাদে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থান জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। শত সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন; অনাহারে শত শত ব্যক্তি বৃক্ষশাখায়—জলমগ্ন গৃহচূড়ে আশ্রয় লইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। অসংখ্য গরু মহিষ

প্রভৃতি গৃহপালিত পশু জলস্রোতে ডুবিয়া—ভাসিয়া গিয়াছে। হাহাকারে চারিদিক পরিপূর্ণ। রেলপথ জলমগ্ন। শোচনীয় দুর্দ্দশার উজ্জ্বল বিবরণ পড়িয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলাম। সহসা একটা খেয়াল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলার অভ্যাস কোন দিনই ছিল না। এতকাল বিশৃঙ্খল ভাবেই জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি। একটা খেয়াল মাথায় চাপিলে তাহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। আজও তেমনই একটা দুর্দ্দমণীয় খেয়াল মাথায় চাপিল। কাগজ ফেলিয়া বাহিরে আসিলাম।

আমি কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, "মহাশয়, আমি বর্দ্ধমান যাইতেছি; যদি দুই একদিন কলেজে না আসিতে পারি তাই ছুটী চাহি।"

তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন?"

সংক্ষেপে তাঁহাকে বর্দ্ধমানের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম।

"তুমি যাইবে কেমন করিয়া; বর্দ্ধমানের গাড়ী এখন যাইতেছে না।"

"সে আমি ঠিক করিয়া লইব; এখন আপনার অনুমতি পাইলেই হয়!"

তিনি আপত্তি করিলেন না।

মেসে ফিরিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। আহারাদির পর কোটের পকেটে একশিশি "কুইনাইন", একশিশি "টিংচার ওপিআই" এবং এক শিশি "ভাইনম্ গ্যালিসাই" সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। চিরকাল চাদর নিবারণী সভার গোঁড়া সভ্য; সুতরাং ও বালাই আর রাখিলাম না।

(২)

অ্যাডভেঞ্চারে ত বাহির হইলাম; কিন্তু আমার রঙ্গভূমি কোথায় তখনও তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখিলাম, বিষম জনতা। রেল কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবক অথবা রিলিফ কার্য্যে যাঁহারা যাইতেছেন তদ্ব্যতীত অন্য কোন যাত্রীকে গাড়ীতে উঠিতে দিতেছেন না। বন্যাপীড়িত স্থানসমূহে যাঁহাদের আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহারা ম্লান মুখে কেবল ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া সংবাদ সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। বহু মাড়বারী ও বাঙ্গালী যুবক আর্ত্ত-পীড়িত-অভাবগ্রস্ত জনবর্গের সাহায্যার্থ চলিয়াছেন। রাশি রাশি আহার্য্য ও পরিধেয়বস্ত্র গাড়ীতে তুলিবার আয়োজন চলিতেছে। বিপন্ন নিরা-

শ্রয় দেশবাসীর জন্য আজ ভারতীয় সর্ব্বজাতির হৃদয়ে সহানুভূতির প্রেরণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। দশ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের লোকের অন্তরে এমন স্বজাতিপ্রীতির অপূর্ব্ব বিকাশ কেহ দেখিয়াছিল কি? মনের মধ্যে একটা বিরাট সুরের বিচিত্র-ঝঙ্কার বাজিতে লাগিল।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, রিলিফ কার্য্যে যাইতেছি, বলিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। সহসা কে ডাকিল, "সুরেশ বাবু, আপনি কোথায়?"

চাহিয়া দেখিলাম, ব্রজগোপাল। সে স্কটীশ চার্চ্চেস কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার সহিত তাহার বহুদিনের পরিচয়। আমি বলিলাম, "তুমি কোথায় যাও, মুখুজ্জে?"

সে বলিল, "তারকেশ্বর!"

ভাবিলাম, মন্দ কি? তারকেশ্বরেই যাওয়া যাউক্। বিশেষতঃ সঙ্গী যখন পাওয়া গিয়াছে! ধূর্জ্জটীর জটাজালে জননী জাহ্নবীরই একাধিপত্য। এখন দামোদর জাহ্নবীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেবাদিদেবকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছেন, শুনিয়াছি। দৃশ্যটা দেখিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

রথ চলিল, কিন্তু অতি মন্দগতি। ক্রমশঃ বন্যার দৃশ্য দৃষ্টিপথে পড়িল। সত্য এ ক্ষেত্রে কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছে। হরিপাল ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ থামিল। আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। চারিদিক জলমগ্ন। সম্মুখে সীমাহীন বারিবিস্তার! রেলপথ ভগ্ন, বিপর্য্যস্ত। ষ্টেশনের প্লাটফরম, বাঙ্গালী ও মাড়বারী ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। সকলেই বিপন্নের সাহায্যার্থ সমবেত। কেহ অর্থ, আহার্য্য ও বস্ত্র লইয়া মুক্তহস্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ—কেহ বা শরীর দিয়া দেশবাসীর সাহায্য করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। প্লাটফরমের উপর বস্তা বস্তা চিড়া, মুড়কী, চাউল স্তূপীকৃত। বড় বড় উনান জ্বালিয়া লোহার কড়ায় হালুয়া তৈয়ার হইতেছে এবং টিনের কেনেস্তারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হইতেছে।

রিলিফের উদ্যোগপর্ব্ব চলিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকের দল চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইবে। দুই বন্ধু কোনও দলে মিশিলাম না। একেবারে খোদ তারকেশ্বরে পঁহুছিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিব। কিন্তু যাইব কি প্রকারে? পরামর্শের পর স্থির হইল, পদব্রজে রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক। আমাদের সংকল্পের কথা শুনিয়া কেহ কেহ বাধা দিল। রেলপথ জলমগ্ন, কোন কোন অংশ বন্যার স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পদব্রজে যাইলে জীবনের আশঙ্কা

আছে। দুই চারিজন সেই পথে অতিকষ্টে তারকেশ্বর হইতে অদ্য সকালে হরিপালে আসিয়াছেন। তাঁহারা পথের দুর্গমতার সাক্ষ্য দিলেন।

ব্রজগোপাল বলিল, "যদি কোন ক্রমে উহারা আসিতে পারিয়া থাকে, আমরা যাইতে পারিব না কেন ?"

নিশ্চিতই ! সুতরাং আমরা কাহারও বাধা মানিলাম না ; অগ্রসর হইলাম। বন্যার স্রোতোবেগে রেলপথের কোন কোন স্থলের বিশ পঁচিশ হাত মাটী কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। শুধু লৌহ-রেল-লাইন বক্র অবস্থায় উভয় পারের সংযোগের সাক্ষ্য দিতেছে। নিম্নে প্রবল জলস্রোত। চারিদিক জলমগ্ন। কোথাও প্রাণীমাত্রের চিহ্ন নাই। উভয়ে জুতা খুলিয়া সন্তর্পণে সেই রেল-লাইনের উপর দিয়া পরপারে পঁহুছিলাম। একবার পদস্খলন হইলে জলস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইব, কে জানে ? কিন্তু হৃদয় কোনও বাধা মানিল না। এইরূপে কতগুলি বিপদসঙ্কুল খাত পার হইলাম তাহার সংখ্যা নাই।

তারকেশ্বর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। শত শত নিরাশ্রয় ব্যক্তি ষ্টেশনের প্লাটফরমে ও রেলগাড়ীর মধ্যে আশ্রয় লইয়া কয়দিন কোনরূপে জীবনরক্ষা করিয়া আসিতেছে। দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ কয়েকখানি নৌকা একটু পূর্ব্বে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এখন দূরবর্ত্তী গ্রামে 'রিলিফ' পাঠাইতে হইবে। গ্রামসমূহের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় কেহ তাহা এখনও বলিতে পারেন নাই। বহু স্বেচ্ছাসেবক তখনও তারকেশ্বরে আইসেন নাই। দুইবন্ধু এক খানি আহার্য্যপূর্ণ জেলে ডিঙ্গি অধিকার করিয়া বসিলাম।

(৩)

একটা বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করিলাম। সভ্যতার মনুমেণ্ট মহানগরী কলিকাতার এত নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীরা একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণভক্ত ! ব্রাহ্মণের নদী পার হইবার সময় 'পারাণী' পয়সাটি পর্য্যন্ত দিতে হয় না। সহস্র কর্ম্ম থাকুক, ব্রাহ্মণ যদি কাহাকেও কোন কায করিতে অনুরোধ করেন, সে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আদেশ পালন করিবে। নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও বর্ণশ্রেষ্ঠ উপবীত-ধারী দ্বিজকে সে সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া তৃপ্ত করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মানিবে। অতিরঞ্জন নহে ; ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

ব্রজগোপাল ব্রাহ্মণ সন্তান। আমি চিত্রগুপ্তের বংশধর। বন্ধু পরামর্শ দিলেন, এ স্থানে দ্বিজ সাজিতে না পারিলে অনেক বিষয়ে অসুবিধা হইবে।

বন্ধুর পরামর্শদান গ্রহণ করিলাম। ব্রজগোপাল স্বয়ং তাহার উপবীতের কয়েক গাছি সূত্র খুলিয়া মাঝির অজ্ঞাতসারে আমার গলায় পরাইয়া দিল। আমি বিরুক্তি করিলাম না। বিশেষতঃ নব আন্দোলনের দোহাই দিলে কোন অপরাধই হয় না। আমরা যে ক্ষত্রিয় এবং উপবীত ধারণের অধিকারী এ কথা ত মহামহোপাধ্যায়, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব প্রভৃতি সকলেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন! সুতরাং কার্য্যোদ্ধারের জন্য চাণক্যনীতি অবলম্বনই প্রশস্ত। মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু (ক্ষত্রিয়মতে বর্ম্মা) শর্ম্মায় উন্নীত হইলেন! 'বর্ম্মা' ও 'শর্ম্মা'য় কেবল একটা বর্ণের প্রভেদ বইত নহে। উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে একটু আড়ষ্ট করিয়া বলিলেই নেহাৎ মিথ্যাবাদীও হইব না। নজির আছে। প্রয়োজনে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র 'ইতি গজ' ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আমাদের নৌকা চলিয়াছে। জলরাশির অন্ত নাই! এ যেন প্রলয়-পয়োধি! গ্রামের পর গ্রাম জলসমাধি লাভ করিয়াছে। শুধু উচ্চ বৃক্ষশীর্ষ এবং কুটীরচূড়াগুলি জাগিয়া রহিয়াছে। অনশনক্লিষ্ট নরনারী কোনরূপে তদুপরি বসিয়া আছে; আমাদের নৌকা দেখিয়া চারিদিক হইতে যে কাতর কণ্ঠের ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল—তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। সে দৃশ্য কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী! কেহ দুই দিন, কেহ তিন দিন উপবাসী। অনাবৃত দেহের উপর দিয়া প্রকৃতির বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। তবু এখনও তাহারা বাঁচিয়া আছে! আহার্য্য বিতরণ করিতে লাগিলাম। আজ হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব করিতেছি! সেবায়, আর্ত্তের শুশ্রূষায় এত সুখ—এত তৃপ্তি?

বিধিলিপি কি বিচিত্র! চারিদিকে ধ্বংসের দৃশ্য! মৃত্যু সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সে স্থানেও জীবের সৃষ্টি হইতেছে! সেই ঘোর বিপ্লবের দিনে, পর্ণকুটীর-শীর্ষে প্রসূতী নবজাত শিশুক্রোড়ে উপবিষ্ট। জীবের স্রষ্টা—পালক যেন অভয় হস্তে উভয়কে রক্ষা করিতেছেন! পকেটে ভাইনম্ গ্যালিসাই ছিল; প্রসূতিকে কিছু পান করাইলাম।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। আজিকার মত বিতরণকার্য্য বন্ধ করিতে হইল। আহার্য্যও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আস্তানায় ফিরিতে হইবে। অন্ধকারে অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে জলবিস্তার অতিক্রম নিরাপদ নহে,তাহাতে লাভও নাই। নৌকা ফিরিল।

আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। জলের উপর মৌণ প্রকৃতির গম্ভীর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাঝি জোরে নৌকা বাহিতে লাগিল। আমরাও লগি ধরিলাম।

অন্ধকার গাঢ়তর হইল। চারিদিকে বিরাট নিস্তব্ধতা। ব্রজগোপাল বলিল, "সুরেশ বাবু, কোথায় চলিয়াছি? কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না।"

মাঝি বলিল, "ভয় নাই, বাবু, ঠিক যাচ্ছি।"

রাত্রি ঘনাইয়া আসিল; গন্তব্যস্থান কত দূরে, কে জানে? কিন্তু ক্রমশঃ অনুভব করিলাম, স্রোতের বেগ বাড়িতেছে, নৌকা দ্রুত চলিয়াছে। আশঙ্কা হইল, বাঁধের ভগ্নমুখে জলের স্রোত চলিয়াছে, বোধ হয় সেই স্রোতে আমরা পড়িয়াছি। বড় সুবিধার কথা নহে। ক্রমশঃ দামোদরের মধ্যে নৌকা পড়িলে এই অন্ধকার রাত্রিতে জীবনের আশঙ্কা নাই কে বলিল?

তখন নৌকাকে অন্য দিকে চালাইবার চেষ্টা করিলাম। আজ তারকেশ্বরে ফিরিবার আশা নাই। অর্দ্ধ দণ্ড পরে মনে হইল, জলের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অদূরে অস্পষ্ট গ্রামের ছায়া যেন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দিগন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তখন একটা বুদ্ধি যোগাইল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "কে কোথায় আছ গো? খাবার এনেছি।"

নিদ্রিত পল্লী মায়ামন্ত্রপ্রভাবে যেন সহসা জাগিয়া উঠিল! চারি দিক হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল, "কোথায় গো, মশায়রা! এদিকে, এ দিকে!"

ব্রজগোপাল বলিল, "ভারি ফন্দী বাহির করিয়াছেন, সুরেশ দা?"

আমি বলিলাম, "চুপ কর, মজা দেখ।" চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আগে আলো জ্বাল; পথ দেখিতে পাইতেছি না।"

কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে তিন চারিটি আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

দেখিলাম, সত্যই একটি গ্রামের ধারে আসিয়াছি। জল সামান্য। অতি কষ্টে নৌকা বাহিয়া আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এ গ্রামখানিও জলে ডুবিয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু ক্রমশঃ জল সরিয়া গিয়াছে।

কিছু কিছু আহার্য্য বিতরণ করিয়া লোক-মুখে আগত হইলাম, নিকটেই গ্রামের মণ্ডলের বাটী; নৌকাযোগে তাহার বাড়ীর কাছে যাওয়া যায়। আমরা ব্রাহ্মণ জানিয়া এক ব্যক্তি আলোক লইয়া আমাদিগকে মণ্ডলের বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিল।

আমাদের অনুমান সত্য। প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে দামোদরের ভগ্ন বাঁধ।

তারকেশ্বরে ফিরিবার চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধির কায করিয়াছি। কে জানে রজনীতে কোথায় গিয়া পড়িতাম!

মণ্ডলের পো বিশেষ যত্নসহকারে আমাদের সেবা আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহার ভক্তির মাত্রা বাড়িয়াছিল। সে পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থকে সেই রাত্রিতে ডাকিয়া আসিল। তিনি স্বয়ং আমাদের আহার্য্য পাক করিতে বসিলেন। আমাদের কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। চাউল ডাউল আমাদের সঙ্গেই ছিল। ব্রাহ্মণের বাড়ী অধিকাংশ পাঠাইয়া দিলাম। বন্যায় মণ্ডলের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। তাহার কোঠাবাড়ী। কিন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীরা অন্নহীন হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকের দল অদ্য সকালে এ স্থানে আহার্য্য বিতরণ করিয়া গিয়াছে।

সেবা করিতে আসিয়া সেবা গ্রহণ করিতেছি; কাযটা সঙ্গত কি না এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে সেবা লাগিতেছে বেশ।

মণ্ডলের পো বাহিরের ঘরে উত্তম শয্যা রচনা করিয়া দিল। তাহার পর ব্রাহ্মণের প্রসাদ সপরিবারে সাগ্রহে ব্যবহার করিল।

(৪)

চারি দিন হাড়ভাঙ্গা রিলিফের কায করিবার পর ব্রজগোপালের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। দিনের বেলা, কখনও নৌকাযোগে, কখনও কর্দ্দম-মগ্ন পথ অতিক্রম করিয়া আহার্য্য বিতরণ এবং রাত্রিতে আড্ডায় আসিয়া রোগীর শুশ্রূষা, তাহার শরীরে সহিল না। তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইব, স্থির করিলাম; কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। তখন স্বেচ্ছাসেবকের দল পুষ্ট হইয়াছিল। লোকের অভাব ছিল না। বহুসংখ্যক ছাত্র সমবেত। জোর করিয়া ব্রজগোপালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। তখন রেলপথ সংস্কৃত হইয়াছে, গাড়ীও চলিতেছে।

সিভিলসার্জ্জন তখন তারকেশ্বরে ছিলেন। আমাকে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র জানিয়া হাসপাতালের কার্য্য-ভার আমার স্কন্ধেই অর্পিত করিয়াছিলেন। কায বাড়িয়াছিল। সন্ধ্যার পর রোগীর তত্ত্বাবধান করিতাম।

বন্যার জল কমিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে দশ মাইল পর্য্যন্ত নৌকাযোগে যাওয়া আসা চলিত; এখন অধিকাংশ স্থলেই পদব্রজে কাদা ভাঙ্গিয়া গ্রামে যাইতে হয়। কোন কোন গ্রামের এমন অবস্থা যে, তথায় মৃত্তিকা স্পর্শ

করিতে হয় নাই। ঘরের চালের উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়াছি। সে গ্রামে একখানি পর্ণকুটীরও মাথা খাড়া করিয়া ছিল না।

ব্রজগোপাল কাল চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আসিয়াছেন। তাঁহাদের একজনের উপর হাস-পাতালের কার্য্য-ভার দিয়া আজ একাই এক দিকে নৌকাযোগে বিতরণ-কার্য্যে চলিলাম। ব্রজগোপালের অভাব আজ বড় মনে হইতেছিল। অন্য সঙ্গীর প্রয়োজন নাই।

সম্পূর্ণ নূতন দিকে আজ আসিয়াছি। এ দিকে রিলিফের নৌকা পূর্ব্বে আইসে নাই। বিতরণ করিতে করিতে বহুদূর অগ্রসর হইলাম। সহসা মনে পড়িল, আজ শুক্রবার না?

বন্ধুবরকে কথা দিয়াছি; আজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হইবে। বিতরণের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। বেলাও প্রায় অবসান। মাঝিকে জোরে নৌকা বাহিতে বলিলাম। আমিও লগি ধরিলাম। সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতেই হইবে।

গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিলের উপর দিয়া নৌকা চলিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরশ্মিরেখা জলমগ্ন কুটীর ও ধ্বংস স্তূপের উপর পড়িয়া যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল।

চারি দিক নিস্তব্ধ, বিহগের কলগীতিও আজ শুনা যাইতেছে না। পল্লীর সে শ্যামসুষমা কোথায়? চারি দিকে শুধু শ্মশানের বিকট চিত্র! কয় দিন শুধু ধ্বংসের ভীষণ দৃশ্যই দেখিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বে যে স্থান নরনারীর, বালকবালিকার আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইত, আজ সে স্থানে শুধু শোকার্ত্তের হৃদয়ভেদী হাহাকার, অভাবগ্রস্তের আকুল দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দন! এমন সুন্দর সংসারে রুদ্রের এ ভীম মূর্ত্তি কেন?

অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। মাঝিও সম্ভবতঃ আমারই মত আনমনে নৌকা বাহিতেছিল। সহসা গ্রামের পথে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাঁকের মোড়ে অদূরে লতাগুল্মের অন্তরালে একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিলাম। সে ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বলিল।

নৌকা নিকটে থামাইয়া দেখিলাম—মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের—যুবতীর। সায়াহ্নের অস্তগামী সূর্য্যালোক তাহার বিবর্ণ আননের উপর পড়িয়াছিল।

লতাগুল্মের অন্তরালে সে যেন দেহের অধিকাংশ প্রচ্ছন্ন রাখিতে ব্যগ্র। নম্র-কণ্ঠে বলিলাম, "কি চাহ, বাছা, এ দিকে আইস।"

কিন্তু সে নড়িল না। তাহার পাণ্ডুর আননে লজ্জার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নত দৃষ্টিতে সে বলিল, "ওখানে যাইবার আমার জো নাই, বাবু—"

বুঝিলাম, দামোদর তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার লজ্জা নিবারণের উপায় কি? আহার্য্য সঙ্গে আছে দিতে পারি। কিন্তু বস্ত্র ত আজ সঙ্গে নাই। নিজের পরিহিত বস্ত্র ছাড়া উত্তরীয় পর্য্যন্ত সঙ্গে নাই। চাদর নিবারণী সভার সভ্য হইয়া আজ বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি।

আমি বলিলাম "মাঝি তোমার গামছাখানি দাও ত, বাপু! আমি দাম দিব।"

মলিন, দুর্গন্ধযুক্ত গামছা পরিয়া, কাপড়খানি যুবতীর দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, "আর আমার সঙ্গে বস্ত্র নাই। যদি আশ্রয় না থাকে, সঙ্গে আইস; হাসপাতালে স্থান দিব।"

রমণী বলিল যে, বন্যার জলে তাহাদের সর্ব্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু একখানি ঘর এখনও খাড়া আছে। না খাইয়া দুই এক দিন চলে; কিন্তু বিবস্ত্র হইয়া থাকা যায় না। তাই নৌকা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিল। অদূরেই তাহার ঘর।

অবশিষ্ট চিড়া, মুড়কী, চাউল প্রভৃতি মাঝি তাহার ঘরে পঁহুছিয়া দিল।

যুবতীর নয়নে সে দিন কৃতজ্ঞতার যে অপূর্ব্ব আলোক দেখিয়াছিলাম, তাহাতে জীবন কৃতার্থ হইল।

(৫)

কিন্তু অর্দ্ধ-নগ্নাবস্থায় লোক-সমাজে বাহির হইব কিরূপে? এখনই ট্রেণ ছাড়িবে। কাহারও নিকট হইতে বস্ত্র ভিক্ষা করিবার অবসর নাই। গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ীর মধ্যে এ বেশে যাইতে লজ্জা নাই। বন্যার প্রকোপে অনেকেরই এরূপ অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং কেহ প্রশ্নমাত্রও করিবে না। আর অপরিচিত-সমাজে বিশেষ লজ্জিত হইবার প্রয়োজনও তেমন দেখি না। কিন্তু বন্ধু-গৃহে এ বেশে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিব কিরূপে?

অ্যাড্‌ভেঞ্চার দস্তুর মত জীবনে ঘটিয়া গেল দেখিতেছি। বন্ধুবরের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিব না। সত্য বলিতে কি, উদরপরায়ণ বলিয়া

বন্ধু-সমাজে আমার একটা খোসনাম ছিল! দুর্ভিক্ষের রাজ্যে কয় দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোভটাও আজ বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। রসনা-তৃপ্তিকর বিবিধ আহার্য্যের কল্পনা করিতে করিতে চলিলাম। গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীরামপুরে গাড়ী থামিবামাত্র নামিয়া পড়িলাম। জুতা ও কোট খুলিয়া ফেলিলাম; গামছা যাহার কটিদেশে, জুতা ও কোট তাহার অঙ্গে নিশ্চয়ই শোভা পায় না। রাত্রি তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। অপূর্ব্ব বেশে বন্ধু-গৃহে বৌভাতের নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিয়াছি!

প্রকাণ্ড অট্টালিকা আলোকচিত্রিত, কলরবমুখর। বহির্দ্বারে দরোয়ান পাগড়ী বাঁধিয়া বসিয়া আছে। এ বেশে ভিতরে প্রবেশ-চেষ্টা কখনই সঙ্গত নহে; অর্দ্ধচন্দ্র লাভের সম্ভাবনাই অধিক। বরং বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকা যাউক্। বন্ধুবরের সহিত একটু রঙ্গ করা যাইবে।

কি দুর্ভোগ! আবার টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

একটু পরে জনৈক যুবক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বাহিরে আসিল। আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল, "কি চাও হে?"

"চারটি ভিক্ষা; নহে ত খানকয়েক লুচি।"

"এখন হ'বে না। আগে বাবুদের হয়ে যাক্।"

যুবক চলিয়া গেল।

দুনিয়াই এই রকম! শুধু বাহিরের বেশভূষায় মানুষের দর! 'এডভেঞ্চার' রীতিমত চলিয়াছে। ধনী পিতার একমাত্র বংশধর শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু একখানি কাপড়ের অভাবে আজ ভিক্ষুকের দলে গিয়া পড়িয়াছে।

আমার পার্শ্ব দিয়া নিমন্ত্রিতগণ একে একে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ বন্ধুর চিরপরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি সকলের দিকে চাহিতে চাহিতে বাহিরে আসিলেন। আমি পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

বন্ধু চারিদিকে আগ্রহভরে চাহিতেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিপাতে আমাকে সম্ভবতঃ চিনিতে পারিলেন না। বাহিরের উজ্জ্বল আলোকে অধিকক্ষণ আত্মগোপন সম্ভব নহে। বন্ধু আরও নিকটে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে?"

পরমুহূর্ত্তে দৃঢ় বাহু পাশে আমি বদ্ধ হইলাম।

"সুরেশ! এ কি বেশ? ব্যাপার কি?"

আমি বলিলাম, "নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

"কিন্তু এ বেশে কেন? কি হইয়াছে?"

"আগে একখানা কাপড় দাও। আমি সোজা তারকেশ্বর হইতে আসিতেছি।"

সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিলাম' বন্ধু আমাকে দাঁড়াইবার অবকাশ দিলেন না। টানিয়া ভিতরে লইয়া চলিলেন।

আমি বলিলাম, "আগে কাড়প আন। ছিঃ এ বেশ অত লোকের মাঝখানে——"

কে সে কথায় কাণ দেয়। নিষ্ঠুর বন্ধু একেবারে সভামধ্যে আমায় হাজির করিলেন।

বন্ধুর কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত হইতেছিল। সকলের সম্মুখে বন্যার শোচনীয় কাহিনীর বর্ণনা সংক্ষেপে শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "আজ আমার বন্ধুর ব্যবহারে আমি স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছি, এমন কখনও করি নাই।"

বন্ধুর পিতৃদেব আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত অতিথি নগ্নবেশ সুরেশচন্দ্রের সহিত করমর্দ্দনে কুণ্ঠিত হইলেন না। সকলের তীক্ষ্ণ প্রশংসমান উজ্জল দৃষ্টি আমি সহ্য করিতে পারিলাম না।

সেই সভামণ্ডপে তখনই আড়াই হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল। সেই টাকা লইয়া আমাকে 'রিলিফ কেন্দ্রে' পুনরায় দুই তিন দিন পরে যাইবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করিলেন।

এমন সময় একটি চারুবেশ পরিহিতা নয় বৎসরের বালিকা আসিয়া বলিল, "দাদা আপনার বন্ধুকে নিয়ে এদিকে আসুন; বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাকে দেখিতে চাহেন।"

বন্ধুর নয়ন যুগলে আনন্দের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে নত নেত্রে আমি দাঁড়াইলাম। বন্ধুর মাতা আসিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সার্থক তোমার মা তোমায় গর্ভে ধরিয়াছিলেন।"

কর্ত্তব্য পালন করিয়া এত কি প্রশংসার কার্য্য করিয়াছি? চারিদিক হইতে নারীকণ্ঠের অজস্র প্রশংসা-কূজন কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। ওয়াটারলু যুদ্ধজয়ী বীরপুরুষ এত আনন্দ পাইয়াছিলেন কি?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

———

নীলা।

বিজয়া-দশমী। অপরাহ্ণ কাশীর জনসঙ্ঘ যেন কাশী শূন্য করিয়া নদীতীরে আর নদীনীরে আসিয়াছে। কাশীর গঙ্গাতীরে কেবল ঘাটের পর ঘাট। রাজ-ঘাট হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট, আর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে অসিঘাট কাশীর ৬৪ ঘাটেই জনতা—সোপানে দাঁড়াইবার স্থানও নাই। হরিশচন্দ্রের শ্মশানের ঘাটও জনপূর্ণ। আবার ঘাটে যেমন—নদীতীরস্থ গৃহগুলির অলিন্দে, ছাতে, গবাক্ষে তেমনই জনতা। পুরুষের পাগড়ী, রমণীর শাড়ী উভয়েই হরিৎ, হরিদ্রা, ফিরোজা, গোলাপী বর্ণের বিকাশ। বর্ণের বৈচিত্র্য উৎসবানন্দের পরিচায়ক। নদীতীরে এই জনতা—আর নদীনীরে বজরায়, ডিঙ্গিতে যাত্রীর বাহুল্য। ডিঙ্গির উপর, বজরার ছাতে গালিচা পাতিয়া দর্শকদল উপবিষ্ট। কোন নৌকায় য়ুরোপীয় পুরুষ ও মহিলা—ক্যামেরা লইয়া এই দৃশ্যের চিত্র তুলিতেছেন। কোন নৌকায় গান-বাজনা চলিতেছে। কোন নৌকায় গল্পগুজব চলিতেছে। একখানি নৌকার যাত্রী কয়জন বাঙ্গালী যুবক। তাহারা কেহ শিগারেট টানিতেছিল, কেহ পান চিবাইতেছিল, কেহ একটা ছোট খাতায় ছবি আঁকিতেছিল; আর সকলেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলির পূজার সংখ্যার আলোচনা করিতেছিল!

নৌকা অসি-সঙ্গম ছাড়াইয়া গেল। অদূরে রামনগরের দুর্গে অপরাহ্ণের রবিকরদীপ্তি। উত্তরবাহিনী গঙ্গার বক্ষে অগণিত নৌকা। নৌকা হইতে বাদ্যধ্বনি উঠিতেছে। কাশীর বাজনা বাঙ্গালার বিসর্জ্জনের বাজনার মত নহে। বাঙ্গালায় বিসর্জ্জনের দিন শানাই কাঁদিয়া গাহে, "এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী।" কাশীতে বাদ্যকর মুসলমান। চড়বড়ের বাদ্যে আর সব বাদ্য ঢাকিয়া যায়। অসি-সঙ্গমের পর এক স্থানে গঙ্গাতীরে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ একাকী বসিয়া ছিলেন। যেন এই উৎসবের আনন্দ তাঁহাকে কাশী হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া ভাবিতে-ছিলেন; চিন্তায় এমনই নিমগ্ন ছিলেন যে, কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি যেন কিছুই শুনিতে ছিলেন না।

যুবকদিগের মধ্যে একজন বলিল, "দুনিয়ায় কত রকমের লোকই আছে।

আজ কাশী ছাড়িয়া এই লোকটি একা আসিয়া ব্যাসকাশীর পরপারে বসিয়া আছে। লোকটি বোধ হয় পেচক-স্বভাব।"

আর একজন বলিল, "কাহার জীবনে কি ঘটনায় কি হয়, তাহা বলা যায় না। লোকটির আজ এই বিরলে বসিয়া থাকিবার কারণ অবশ্যই আছে।"

"কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না এ সত্য তোমার অনেক পূর্ব্বে অনেকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কারণটা কি?'

"তাহা কে বলিবে?"

নৌকা চলিয়া গেল।

(২)

বাস্তবিকই সারদাচরণের জীবনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা যেমন বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত, তেমনই করুণ ও বেদনাদায়ক। সারদাচরণ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। লোক এমনও বলিত, এবার হাইকোর্টে উকীল-জজের পদ খালি হইলে সে পদ তিনিই পাইবেন। তাহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতির কথা তুলিয়া আলোচনা করিবার সময় উকীল-লাইব্রেরীর নিষ্কর্ম্মা উকীলরা বলিতেন, "টাকা লইয়া সারদাচরণ কি করিবেন? তিনি বিপত্নীক, সংসারে তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক কন্যা, সে কন্যাও বিবাহিতা; আর, তিনি যে টাকা করিয়াছেন, তাহা বড় অল্প নহে। বিশেষ তাঁহার দাঁওয়ে পাওয়া কয়লার খনি যেরূপ লাভের দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর ওকালতী বা জজীয়তী না করিলেও চলে।" এ অবস্থায় যে তাঁহার পক্ষে টাকার মায়ায় উকীল থাকিয়া জজীয়তীর সম্মান ত্যাগ করা সঙ্গত নহে, এ বিষয়ে তাঁহার সহকর্ম্মীরা একবাক্যে এক-তরফা ডিক্রী দিতেন।

এই কয়লার খনিতেই কিন্তু সারদাচরণের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। জামাতা নরেশচন্দ্র সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সারদাচরণ তাঁহাকে খনির কায শিখিবার জন্য য়ুরোপে পাঠান। সে-ই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পাইবে। কয়লার খনিতে আশাতিরিক্ত লাভ পাইয়া সারদাচরণ নিকটবর্ত্তী আরও দুইটি খনি কিনিয়াছিলেন। জামাতা কায শিখিয়া আসিয়া খনির তত্ত্বাবধান করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। জামাতা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তিনি মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে একজন য়ুরোপীয়ান ইঞ্জিনিয়ারকে ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন।

নরেশ কায শিখিয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীকে পাইয়া সুরমার মিলন-পিপাসী হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। জামাতা কায শিখিয়া ফিরিল বলিয়া সারদাচরণও পরম পুলকিত হইলেন।

নরেশের প্রত্যাবর্ত্তনের পর পক্ষকাল কাটিতে না কাটিতে শ্বশুর ও জামাতা কর্ত্তব্যবিচার করিয়া সব স্থির করিলেন। স্থির হইল, ম্যানেজার মর্গ্যানকে তিন মাস পরে কর্ম্মচ্যুত করিবার নোটিশ দেওয়া হইবে। এই তিন মাসে নরেশ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া কায ভাল করিয়া শিখিয়া লইবে। তাহার পর নরেশ কার্য্যভার গ্রহণ করিবে।

মর্গ্যানকে নোটিশ দেওয়া হইল। নরেশ খনিতে গেল। খনিতে মর্গ্যানের সহিত নরেশের বনিবনাও হইল না। না হইবার অনেক কারণ ছিল। মর্গ্যান জানিত, নরেশ তাহার অন্ন কাড়িতে আসিয়াছে। যে অন্নের জন্য সে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশে আসিয়াছে, সে অন্ন যে কাড়িয়া লইবে, তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার পর মর্গ্যানের বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসী যতই কেন লিখাপড়া শিখুক না, যে কার্য্য শ্রমসাধ্য ও যাহাতে দশ জনকে খাটাইতে হয়, সে কায ভারতবাসী সুসম্পন্ন করিতে পারে না। সে কায করিবার ক্ষমতা ভারত-বাসীর—বিশেষ বাঙ্গালীর—ধাতুতে নাই। তাই সে নরেশকে শিক্ষানবীশের মত ব্যবহার করিত, সমান ভাবিতে পারিত না। আর, ঠিক সেই কারণেই নরেশ তাহার সঙ্গে ব্যবহারে কেবলই বুঝাইতে চাহিত, সে মনিব, আর মর্গ্যান চাকর।

দুই জনই যুবক। এ অবস্থায় উভয়েরই ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া বিস্ময়কর নহে। হইলেও তাহাই। এক দিন কথায় কথায় দুই জনে কথা কাটাকাটির পর নরেশ সব কর্ম্মচারীর সম্মুখেই মর্গ্যানকে বলিল, "তোমাকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। তোমাকে আমার আর দরকার নাই। তুমি তিন মাসের বেতন লইয়া আজই চলিয়া যাও। হিসাবপত্র আমাকে বুঝাইয়া দাও।" নরেশ খাতা টানিতেই মর্গ্যান গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুমি খাতা দেখিবার কে?" নরেশ বলিল, "তুমি কি মদ্যপান করিয়াছ? তুমি জান না, আমি কে?" মর্গ্যান বলিল, "তুমি এই খনির স্বত্বাধিকারীর উত্তরাধিকারী হইতে পার; কিন্তু তুমি খনির স্বত্বাধিকারী নহ। স্বধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত আমি কাহাকেও খাতা দেখাইতে বাধ্য নহি, দেখাইবও না। তুমি জানিও, আমি

ইচ্ছা করিলে আজ তোমাকে এ স্থান হইতে দূর করিয়া দিতে পারি।” নরেশ গর্জ্জিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঠকিল। “ভাল, দেখা যাউক” বলিয়া সে শ্বশুরকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিল।

পরদিন প্রাতে সারদাচরণ যখন খনিতে পৌঁছিলেন, তখন খনিতে বিস্ময়-কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। নরেশ ও মর্গ্যান একই বাঙ্গলোর দুইটি কক্ষে থাকিত। নিশীথে বাঙ্গলোয় পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া দেখে, নরেশ মর্গ্যানের কক্ষ হইতে বাহির হইতেছে। সে কক্ষ অন্ধকার—ধূমপূর্ণ। তাহার পর, সকলে আলোক আনয়ন করিয়া দেখে, মর্গ্যানের মৃতদেহ শয্যায় পড়িয়া আছে—পিস্তলের গুলী তাহার বক্ষ ভেদ করিয়াছে। নরেশের পিস্তল হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া আছে। পুলিশ আসিয়া তদন্ত করিল। সে দিন নরেশের সহিত মর্গ্যানের কলহের কথা—নরেশের অপমানের কথা পুলিশ শুনিল। তাহার পর পুলিশ দেখিল, নরেশ ও মর্গ্যান এই বাঙ্গলোয় থাকিত; শুনিল ভৃত্যগণ আসিয়া নরেশকে মর্গ্যানের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়াছিল। একটার পর একটা ঘটনা যুক্ত করিয়া পুলিশ যে শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিল, শেষে মর্গ্যানের কক্ষে হর্ম্ম্যতলে নরেশের পিস্তল পাওয়ায় সে শৃঙ্খল নরেশকেই বদ্ধ করিল। পুলিস নরেশকে গ্রেপ্তার করিবে স্থির করিল। কিন্তু সহসা নরেশকে আর পাওয়া গেল না। সে যেন সকলের চক্ষুতে ধূলি দিয়া সহসা বাতাসে মিশাইয়া গিয়াছে! পুলিস অনেক অনু-সন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইল না।

সারদাচরণ সব কথা শুনিলেন, পুলিশকে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বলিলেন—যে হত্যাকারী, তাহার শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহার পর, সহকারী কার্য্যা-ধ্যক্ষকে কার্য্যভার দিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। খনির জমাদার স্বয়ং তাঁহার ব্যাগ বহিয়া ষ্টেশনে চলিল ও পথে তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি নরেশের লিখা। সে নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া পেন্সিলে পত্র লিখিয়াছে,—“আমি নির্দ্দোষ। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য দেখিতেছি। যদি কখন আমার কথা প্রমাণ করিতে পারি, তবে ফিরিয়া আসিব; নহিলে নহে। জমাদার রামদীন আমাকে রক্ষা করিয়াছে। তাহাকে পুরস্কৃত করা আমার অভিপ্রেত।”

রামদীন প্রভুকে জানাইল, সে পুলিশের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নরে-

শকে বাঙ্গলোর পশ্চাতে ডাকিয়া খনির জমীসীমা পার করিয়া দিয়াছিল। নরেশ নিশ্চয়ই ডাক-গাড়ী ধরিয়া পলাইতে পারিয়াছে।

সারদাচরণ কলিকাতায় ফিরিলেন। এই অপ্রকাশিত দুর্ঘটনার দারুণ আঘাতে তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র সন্তান সুরমার অদৃষ্টে এই ছিল? হায় হতভাগিনী! সেই দুঃখ তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার ততোঽধিক দুঃখ এই যে, এই ঘটনায় মানুষের উপর তাঁহার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল। সুশিক্ষিত—সুশীল—সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তান নরেশ এমন কায কেমন করিয়া করিল? সে যদি ক্রোধবশে মর্গ্যানকে খুন করিত, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সমস্ত দিন ভাবিয়া উপায় স্থির করিয়া নিশীথে নিরস্ত্র নিদ্রিত মর্গ্যানকে হত্যা করিল? মানুষকে বিশ্বাস কি? শিক্ষায় সংসর্গে তাহার পশুপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

* * * * * * *

কাযে মন লাগে না। সুতরাং মক্কেলের কায লওয়া উচিত নহে মনে করিয়া সারদাচরণ ওকালতী ছাড়িয়া দিলেন। তিনি গ্রামের জমীদারী স্বত্ব কিনিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জলনিকাশাদির ও বিদ্যাবিস্তারের জন্য বিদ্যালয়-স্থাপনের সব উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সে সব ছাড়িয়া তিনি ম্লানমুখী কন্যাকে লইয়া কলিকাতার জনতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়াছেন।

কাশীতে পিতা আর পুত্রী। পুত্রীকে লইয়া, তাহাকে নানা তীর্থ দেখাইয়া, পড়াইয়া সারদাচরণ অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কখনও নরেশের কোন কথা হইত না। কারণ, সুরমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নরেশ সত্য কথাই বলিয়াছে; সে নির্দ্দোষ। আর, সে জানিত, তাহার পিতার দৃঢ় বিশ্বাস, জামাতা অতি ঘৃণ্য কায করিয়াছেন। এ অবস্থায় সে পিতার সহিতও স্বামীর কথার আলোচনা করিতে চাহিত না। বাস্তবিক সে ক্রমে ক্রমে স্বামীকে দেবতার আসন দান করিতেছিল। নরেশ যেন দূর হইয়া কেবলই তাহার নিকটে আসিতেছিল; সে যেন রহস্যময় শক্তিরূপে অহরহঃ তাহার অন্তরে বিরাজ করিয়া তাহার জীবন পূর্ণ করিয়া ছিল। তাই সে পিতার সঙ্গেও স্বামীর কোন কথা কহিত না।

সারদাচরণের মনে সুখও ছিল না শান্তিও ছিল না। আজ কাশীর উৎসবা-

নন্দ সত্য সত্যই যেন তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া কাশী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি অতীত কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের সব কায তাঁহার আরব্ধ পল্লীভবনেরই মত অসম্পূর্ণ। তিনি চিন্তায় তন্ময় ছিলেন।

(৩)

সন্ধ্যার পর সারদাচণ গৃহাভিমুখগামী হইলেন। গৃহে না ফিরিলেও নহে, ফিরিতেও ইচ্ছা নাই। গৃহে ফিরিয়া আজ এই দিনেও ত কন্যার মুখ মলিন দেখিতে হইবে!

গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া সারদাচরণ দেখিলেন, কে একজন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি ভাল করিয়া দেখিলেন। আগন্তুক নমস্কার করিয়া বলিল, সে রামদীনের পুত্র; বিপন্ন হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে। তিনি তাহাকে চিনিলেন।

কাশীর উপকণ্ঠেই রামদীনের বাড়ী। জামাতার পত্র পাইয়া সারদাচরণ তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও সে আর চাকরী করে নাই; গৃহে ফিরিয়া প্রাপ্ত অর্থে জমী লইয়া চাষ করিতেছে। তিনি তাহাকে মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিলে সে একবার আসিয়াছিল। কিন্তু সুরমা যখন তাহাকে দেখিয়া স্বামীর কথা মনে করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই, তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়াছিল। সেই হইতে সে আর কখনও সারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। সারদাচরণ ও সুরমা মনে করিয়াছিলেন, সুরমাকে দেখিয়া নরেশের কথা স্মরণ করিয়া তাহার কোমল হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল।

আজ রামদীনের পুত্রের কথা শুনিয়া সারদাচরণ তাহাদের বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, তাহাদের পাড়ায় একটি চুরীর তদন্তে আসিয়া পুলিশ তাহাদের বাড়ী খানাতল্লাস করে। তল্লাসের সময় তাহার পিতার বাক্সে একটি অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে। অঙ্গুরীতে একখানি উৎকৃষ্ট উজ্জল নীলা বসান। অঙ্গুরীর ভিতরের দিকে তিনটি ইংরাজী অক্ষর ক্ষোদিত। পুলিশ তাহার পিতাকে যতই জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে কিছুতেই কোথায় অঙ্গুরী পাইয়াছে বলিতেছে না। শেষে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, চালান দিবে। পুত্র সারদাচরণকে সংবাদ দিবার কথা

বলিলে রামদীন উন্মাদের মত চীৎকার করিয়াছে, "আমি জেলে যাইব, ফাঁসী যাইব, সেও ভাল ; তবু তাঁহাকে সংবাদ দিও না—দিও না—দিও না।"

কথা শুনিয়া সারদাচরণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রামদীনের পুত্রের দিকে চাহিলেন। এ কি ব্যাপার! তিনি সব জানিবার জন্য তখনই রামদীনের পুত্রের সহিত থানায় চলিলেন।

(৪)

সারদাচরণ থানার দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দারোগা সাহেব তখন বিজয়ার আমোদ জমাইবার জন্য সিদ্ধি পানের আয়োজন করিতেছিলেন; সারদাচরণকে আসিতে দেখিয়া বড় বিব্রত হইলেন। কিন্তু উপায় কি? সারদাচরণ একে বাঙ্গালী, তাহাতে উকীল। কি জানি, পাছে কোন ফেসাদ বাধাইয়া ফেলেন। দারোগা লোহার সিন্দুক হইতে একটি অঙ্গুরী বাহির করিয়া সারদাচরণকে দেখাইলেন; বলিলেন, "এ অঙ্গুরী আসামী পাইল কোথায়? এ নীলা; সকলের সহে না; সকলে ব্যবহারও করে না। আবার অঙ্গুরীতে তিনটা ইংরাজী অক্ষর ক্ষোদিত!" সারদাচরণ অঙ্গুরী লইয়া দেখিলেন, তাহাতে এফ, টি, এম, ক্ষোদিত। এ কি? তাঁহার নিহত ম্যানেজারের নাম ফ্রেডরিক টমাস মর্গ্যান ছিল! এ আবার কি রহস্য! তিনি সে রহস্য ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দারোগাকে বলিলেন, "আমি আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সারদাচরণকে সঙ্গে লইয়া দারোগা গারদঘরের দ্বারে আসিলেন; তালা খুলিয়া লৌহদণ্ডাবৃত দ্বার মুক্ত করিলেন। গারদে রামদীন ব্যতীত আরও দুই জন আসামী ছিল। রামদীন সম্মুখে সারদাচরণকে দেখিয়া উন্মাদের মত লাফাইয়া উঠিল, দীপালোকে তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল। সে উত্তেজিতস্বরে বলিল, "মৃত্যুমণি তাহার কায করিয়াছে। আপনি কেন আসিলেন।"

সারদাচরণ তাহার কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি রামদীনকে বলিলেন, "মৃত্যুমণি কি? সুস্থির হও। আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।"

রামদীন বলিল, "আমার উদ্ধার নাই। আমি মৃত্যুমণি লইয়া মরণ ডাকিয়া আনিয়াছি। আমার পাপের শাস্তি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। দৈবজ্ঞের কথাই সত্য।"

(৫)

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রামদীন বলিতে লাগিল।

আপনার জামাতা ম্যানেজারকে খুন করেন নাই। আমিই খুন করিয়াছিলাম। আর সে ঐ মৃত্যুমণির জন্য। আপনার জামাতা খনিতে আসিবার কয় দিন পূর্ব্বে এক দিন অপরাহ্নে ম্যানেজার বাঙ্গলোর বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। আমিও একটা কাযে তথায় আসিয়াছিলাম। এমন সময় একজন পাঞ্জাবী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "আমি দৈবজ্ঞ।"

ম্যানেজার অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার ভাগ্যে কি আছে, বলিতে পার?" তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার হাত হাতে লইয়াই দৈবজ্ঞ অঙ্গুরীটি ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "এ মৃত্যুমণি আপনি কেন রাখিয়াছেন?"

ম্যানেজার বলিলেন, "কেন?"

"আমি ইহার নীলবর্ণের মধ্যে লোহিত আভা দেখিতে পাইতেছি। ইহা মৃত্যুমণি। ইহা ত্যাগ করুন; ফেলিয়া দিউন।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আর তুমি কুড়াইয়া লইয়া যাও।"

দৈবজ্ঞ বলিল, "আমি উহা স্পর্শও করিব না।" সে ম্যানেজারের হাত ছাড়িয়া দিল।

ম্যানেজার বলিলেন, "কি কুসংস্কার। আমি দরিদ্র—নিরন্ন ছিলাম। আর, এই অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইবার পর হইতে আমার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তোমার বিদ্যা বুঝিয়াছি। তুমি যাও।"

দৈবজ্ঞ চলিয়া গেল।

আমি ম্যানেজারের কথা শুনিয়াছিলাম। আমি অন্নের আশায় বিদেশে চাকরী করি; পেট ভরে না। যদি আমি মণি পাই! আমি অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

তাহার পর জামাই বাবু খনিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত ম্যানেজারের বিবাদ বাধিল। যে দিন উভয়ে বচসা হইয়া গেল, সেই দিন ডাকঘরে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ফিরিবার সময় আমি সঙ্কল্প স্থির করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি জামাই বাবুর পিস্তল সরাইয়া রাখিয়াছিলাম। নিশীথে ম্যানেজারের ঘরে প্রবেশ করিয়া আমি তাহার বক্ষে গুলী করিলাম;

তাহার পর, তাহার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরী লইয়া গোসলখানার ভিতর দিয়া পলাইলাম। গোসলখানার দ্বার আমি পূর্ব্বেই খুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

যখন অন্য চাকরদিগের সঙ্গে আমি বাঙ্গলোয় ফিরিয়া আসিলাম, তখন জামাই বাবু ম্যানেজারের ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। বোধ হয়, ঘর অন্ধকার দেখিয়া তিনি বাতি আনিতে যাইতেছিলেন।

আমিই যাইয়া পুলিশে খবর দিলাম। পুলিশ জামাই বাবুকে সন্দেহ করিল। তিনি পলাইলে পুলিশ আর কাহাকেও সন্দেহ করিবে না বলিয়া আমিই তাঁহার পলাইবার যোগাড় করিয়া দিলাম। তিনি পলাইলেন। আমার উপর সন্দেহের ছায়াপাতও হইল না।

আপনি আমাকে পুরস্কৃত করিলেন। আমি ভাবিলাম, ম্যানেজারের কথাই ঠিক। মণি পাইতে না পাইতে আমার অর্থলাভ হইল।

ছয়মাস কাটিতে না কাটিতে আপনি কাশীতে আসিলেন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া যে দিন আপনার কন্যায় মলিন মুখ—অশ্রুপূর্ণ নয়ন দেখিলাম সেই দিন বুঝিলাম পাপে সুখ হয় না। সেই দিন হইতে আমি শান্তি পাই নাই। তাহার পর, আজ মৃত্যুমণি অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটাইয়া তাহার কায সম্পন্ন করিল।

(৬)

সারদাচরণ যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহে পিতার আগমনবিলম্বে সুরমা উৎকণ্ঠিতা হইয়া কেবল পথের দিকে চাহিতেছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সারদাচরণ ডাকিলেন, "সুরমা! মা!"

সুরমা আসিয়া পিতাকে বিজয়ার প্রণাম করিল।

সারদাচরণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি বড় অন্যায় করিয়াছি; বড় অন্যায় করিয়াছি। আমাকে মাপ কর।"

সুরমা বিস্মিতনেত্রে পিতার দিকে চাহিল। পিতার কি মস্তিষ্ক-বিকৃত হইয়াছে?

সারদাচরণ সমস্ত কথা কন্যাকে বলিলেন। আজ তাঁহার মনের ভার দূর হইয়াছে, তিনি যে শান্তি পাইয়াছেন, তাহা তিনি জীবনে আর পাইবার আশা করেন নাই।

সুরমা সব শুনিল। সে বিস্মিত হইল না। সে ত জানিত, তাহার স্বামী নিরপরাধ।

(৭)

মোকর্দ্দমার সময় রামদীন দারোগার নিকট বিবৃত বিবরণের এক বর্ণও অস্বীকার করিল না। সারদাচরণ নিজব্যয়ে সব সংবাদপত্রে মোকর্দ্দমার বিবরণ প্রকাশিত করিলেন। আশা, নরেশ জানিতে পারিবে।

মোকর্দ্দমার পর সারদাচরণ কন্যাকে কহিলেন, "মা, যে কারণে সব ছাড়িয়া কাশীতে আসিয়াছিলাম, সে কারণ আর নাই। চল, আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাই। কি জানি যদি নরেশ আসিয়া ফিরিয়া যায়। তাহার পর, সে আসিলে আমার সব অসমাপ্ত কাযে আবার হাত দিব।"

কাশীর বাস উঠাইয়া সারদাচরণ আবার কলিকাতায় চলিলেন।

মোগলসরাই ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহারা যখন কলিকাতাগামী ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন কলিকাতার গাড়ী আসিল। এক জন যুবক দ্রুতপদে ট্রেণ হইতে নামিয়া কাশীযাত্রী গাড়ীর দিকে চলিল। সুষমা তাহাকে দেখিল, দেখিয়াই চিনিল। সে পিতাকে সে কথা বলিল।

নরেশের আর কাশী যাইতে হইল না। মিলনানন্দবিহ্বল কন্যা-জামাতাকে লইয়া সারদাচরণ আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

মৃত্যু-মিলন।

জীবনে যাহা পারি নি কভু বলিতে
আজিকে তাহা জানাব তব চরণে।
পাষাণ প্রাণে দিয়েছি যা'রে ফিরায়ে
লভিয়া তা'রে বরিব আজি মরণে॥
আর্ত্তজনে দিয়েছ তুমি সান্ত্বনা
বিশ্বমাঝে দিয়েছ প্রেম বিলায়ে।
ক্ষুদ্র আমি পেয়েছি কি যে যাতনা
কাঁকর ভ্রমে পরশমণি হারায়ে॥
মৃত্যু-সুপ্তি-মগ্ন দু'টি নয়নে
চাহিয়া দেখ হৃদয়হীনা এ নারী
এসেছে আজি, ক্ষমিও তারে হে প্রিয়
চরণে তব করুণা-কণা-ভিখারী॥
বাজা রে তোরা মিলনোৎসব-বাজনা
প্রিয় বাঞ্ছিতে পেয়েছি আজি ফিরিয়া;
জীবনে যা'রে পারি নি আমি বাঁধিতে
মৃত্যু আসি' নিমেষে দিল বাঁধিয়া॥

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

অনিন্দ্যা।

—:*:—

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বনমধ্যে।

ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষে দুরতিক্রমণীয় ও নিবিড় লতাগুল্মাদিতে সমাচ্ছন্ন সেই বনপথে একত্র সংবদ্ধ অশ্বদ্বয়কে পরিচালিত করিতে অনিন্দ্যার যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা অনেকটা লাঘব করিতেছিল। গিরণের মন এখন পৈশাচিক ভাবে পূর্ণ। যে প্রিয়তমা পত্নী এক মুহূর্ত্ত চক্ষুর অন্তরাল হইলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন তাঁহার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণে তিনি দুঃখিত হওয়া ত দূরের কথা, বরং মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিলেন। যে সঙ্কল্প লইয়া তিনি বাহির হইয়াছেন, তাহারই সাধনের জন্য তিনি মনকে এইরূপ প্রস্তুত করিতেছিলেন।

বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা সেই বনপ্রদেশের বহির্ভাগে এক প্রান্তরসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুই জনই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনিন্দ্যার ম্লান, শুষ্ক মুখ, ও অশ্রুভারাক্রান্ত ছল ছল নয়নযুগল দেখিয়া বোধ হয় গিরণের একটু করুণার উদ্রেক হইল। আর তাঁহার আপনারও পথপর্য্যটনের ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া আসিল। তাই পত্নীকে আহ্বান করিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। গিরণ তৃণশয্যায় শুইয়া পড়িলেন; আর বাষ্পাকুললোচনা অনিন্দ্যা অনতিদূরে বসিয়া মাঝে মাঝে এক একটি তৃণ উন্মূলিত করিয়া প্রস্তরে ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে দণ্ডাধিক কাল অতিবাহিত হইলে সম্মুখস্থ প্রান্তর পথে একটি ব্রাহ্মণ বালক দৃষ্ট হইল। সে একটি বৃহৎ পাত্রে কি লইয়া যাইতেছিল। গিরণ তাহাকে ডাকিলেন, নিকটে শীঘ্র কোন আহার্য্য পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক বলিল,—"এ স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি পান্থাবাস আছে; আর এই প্রদেশের রাজার প্রাসাদও এ স্থান হইতে অধিক দূর নহে। কিন্তু আপনারা যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি, তাহাতে আপাততঃ অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি রাজার এক পাচকের পুত্র। দূরে ঐ যে শস্যক্ষেত্র দেখিতেছেন, ঐ স্থানে রাজার চারি জন ভৃত্য আজ কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে গিয়াছে; আমি তাহাদের জন্য আহার্য্য লইয়া যাইতেছিলাম। এই অপকৃষ্ট খাদ্যে যদি আপনাদের রুচি হয়, তাহা হইলে ইহা আপনারা এখন স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পারেন; আমি এখনই আবার উহাদের জন্য খাবার লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া বালক সেই আহার্য্য দ্রব্যের পাত্রটি গিরণের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

গিরণের আর তখন বিচার করিবার ক্ষমতা বা অবসর ছিল না। তিনি বালকের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন,—"বেশ কথা; খাবার দুই ভাগ করিয়া ফেল,—এক ভাগ ঐ রমণীকে দাও, অপর ভাগ আমি লইতেছি। আর তোমার পুরস্কার স্বরূপ এই দুইটি অশ্বের যেটি তোমার ইচ্ছা বাছিয়া লও।"

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি, মহাশয়? এ খাবারের মূল্য ত কিছুই নহে। ইহার জন্য আমাকে এই বহুমূল্য অশ্ব দিতেছেন কেন? আর আমি ইহা লইয়াই বা কি করিব? লোক সন্দেহ করিবে, আমি ইহা চুরি করিয়াছি।"

গিরণ বলিলেন,—"তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ অশ্ব তুমি কোথায় পাইলে? বলিও, রাজকুমার গিরণ তোমাকে দিয়াছেন। নিজে যদি ব্যবহার করিতে না পার, বিক্রয় করিয়া ফেলিও; অনেক টাকা পাইবে।"

বালক যে তখন কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে রাজকুমারকে সেই অবস্থায় দেখিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি বলিলেন—"যাও, আর বিলম্ব করিও না। বেচারাদের খাবার আমরা খাইয়া ফেলিলাম; উহাদের জন্য পুনরায় শীঘ্র খাবার লইয়া আইস।"

বালক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্ব লইয়া চলিয়া গেল।

গিরণ ক্ষুধার তাড়নায় শীঘ্রই স্বীয় আহার্য্য নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দুঃখভারপীড়িতা অনিন্দ্যার কি আহারে রুচি আছে? তথাপি পাছে স্বামী অধিকতর অসন্তুষ্ট হয়েন, এই ভয়ে, তিনি যৎসামান্য গলাধঃকরণ করিলেন।

গিরণ গাত্রোত্থান করিলেন এবং পত্নীকে অনুগমন করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং অগ্রগামী হইলেন। অবশিষ্ট অর্দ্ধটি সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। তাঁহারা যখন একটি পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহারা পান্থশালায় প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শিবালিক।

এ দিকে সেই বালক যাইয়া সেই দেশের রাজাকে গিরণ-বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া একটু চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ করিলেন। এই স্থানে এই রাজার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

রাজা অনিলের রাজ্যাপহারী অদীরণের কথা পাঠকপাঠিকার স্মরণ আছে। সে তাহারই ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত এক বন্ধু পাইয়াছিল। তাহার নাম শিবালিক এবং সে তখন সুবর্ণপুরের যুবরাজ। এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক অনিন্দ্যাকে লাভ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিত। কিন্তু সে যখন জানিল যে, অদীরণ তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন সে নিজের আশা ত্যাগ করিল। অতঃপর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে সে রাজদণ্ড গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার চরিত্রের কোন উন্নতি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অবনতি হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, রাজকার্য্য মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়া সে পার্শ্বচরবৃন্দ পরিবৃত থাকিয়া দিবারাত্র পাপপঙ্কিল আমোদে রত থাকিত। এই শিবালিকের রাজ্যে গিরণ সেই অপরাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শিবালিক জানিত যে, গিরণের সহিত অনিন্দ্যার বিবাহ হইয়াছে; এবং বন্ধু অদীরণের শোচনীয় পরাজয়-কাহিনী শুনিয়া সে মনে মনে গিরণকে তাহার প্রধান শত্রুমধ্যে গণ্য করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ যখন সে পাচক বালকের মুখে শুনিল যে, গিরণ একটি রমণীর সহিত তাহার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কৌতূহলের সহিত একটা দুষ্ট ভাব তাহার হৃদয় অধিকৃত করিল। কিয়ৎকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত শিবালিক বাহির হইয়া পড়িল।

পান্থশালার একটি কক্ষে গিরণ সবে মাত্র আসিয়া বসিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি কক্ষ অনিন্দ্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুই জনেই পথশ্রমে অবসন্ন, মনোবেদনায় ম্রিয়মান। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া গিরণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। আর অনিন্দ্যা স্বামীর এবম্বিধ অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া ছিলেন। দুই জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা একেবারে বন্ধ।

এমন সময়ে শিবালিক অনুচরগণসহ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর নিকটে গিরণের বার্ত্তা জানিয়া লইয়া সে তাঁহার কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল।

গিরণ তাহার পরিচয় পাইয়া সসম্ভ্রমে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে বলিল,—"পাচক বালকের মুখে আপনার কথা শুনিয়া আমি আপনার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছি। নিকটেই আমার আলয়; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রিতে আমার আতিথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

গিরণ বলিলেন,—"আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ; কিন্তু ক্ষমা করিবেন, আজ আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমি কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য বহির্গত হইয়াছি; যত ক্ষণ না তাহা সম্পন্ন হয় ততক্ষণ কোথাও আতিথ্য স্বীকার নিষিদ্ধ। আপনার এই সহৃদয়তা চিরকাল আমার মনে থাকিবে।"

শিবালিক এই কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"তাহা হইলে আর আপনাকে অধিক অনুরোধ করিতে পারি না। আর কথা, ছেলেটির মুখে শুনিয়াছিলাম, আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আছেন। কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না।"

"তিনি ঐ পার্শ্বের ঘরে আছেন" বলিয়া গিরণ সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন।

স্বামিস্ত্রী পৃথক পৃথক ঘরে থাকার কোন সন্তোষজনক কারণ বুঝিতে না পারিয়া ধূর্ত্ত শিবালিক মনে মনে স্থির করিয়া লইল যে, দুই জনের মধ্যে নিশ্চয়ই মনোমালিন্য হইয়াছে। দুষ্ট অভিসন্ধি-সাধনের ঠিক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া সে গিরণকে বলিল,—"বাল্যকালে আমি রাজা অনিলের বড় স্নেহভাজন ছিলাম; অনিন্দ্যাও আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। আপনাদের বিবাহের সময় আমি দুর্ভাগ্যক্রমে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। আজ আপনাদের দুই জনকে এই স্থানে পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। একবার অনিন্দ্যাকে দেখিবার অনুমতি পাইতে পারিব কি ?"

"আপনি স্বচ্ছন্দে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।" বলিয়া গিরণ একটু ভ্রুকুটী করিলেন। তাহা শিবালিকের চক্ষু এড়াইল না। সে হৃষ্টচিত্তে অনিন্দ্যার দর্শনে গমন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শিবালিক কি চাহে ?

মেঘম্লান জ্যোৎস্নার ন্যায় বিষাদভারাক্রান্তা অনিন্দ্যা ক্ষীণালোকিত কক্ষে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। স্বামী যে তাঁহার প্রতি এরূপ রূঢ় ব্যবহার করিতেছিলেন সে জন্য যত না হউক, তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার আশঙ্কা করিয়া তিনি ততোঽধিক দুঃখাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর সমস্ত দিন পথপর্য্যটনে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিয়া তিনি অনাস্তৃত কক্ষতলে শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক সেই সময়ে শিবালিক ধীরপদে অনিন্দ্যার ঘরের দ্বার-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জন অপরিচিত পুরুষকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া সাধ্বী রমণী তৎক্ষণাৎ অতি চকিতভাবে উঠিয়া বসিলেন, এবং ভীত অথচ দৃঢ় স্বরে তাহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিবালিক তাহার নির্নিমেষ দৃষ্টি অনিন্দ্যার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অনভ্যস্ত কোমল ও মৃদু স্বরে বলিল—"অনিন্দ্যা, তোমার দাস

শিবালিককে কি ভুলিয়া গিয়াছ? ভুলিয়া যাইবারই কথা; পাঁচ বৎসর হইয়া গেল। কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই। অনিন্দ্যা, সত্য সত্যই কি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ?"

দুষ্ট শিবালিককে সেই সময়ে তথায় দেখিয়া অনিন্দ্যা যুগপৎ এরূপ ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দুর্ব্বৃত্তের শেষ কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন এ স্থানে কেন? তুমি কি চাহ?"

দুরাত্মা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি কি চাহি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি চাহি তোমাকে আমার রাণী করিতে। আমি জানি, তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসেন না। যদি তাঁহার প্রণয়লাভের প্রত্যাশা করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি হতাশ হইবে। ভালবাসা না পাইলে রমণীর জীবনে সুখ কি? আর যদি সমুদ্রের ন্যায় গভীর ভালবাসা পাইতে চাহ,তবে আমাকে প্রত্যাখ্যাত করিও না। তোমার কৈশোর হইতে তোমাকে অমি ভালবাসিয়াছি। আজ পাঁচ বৎসর কাল তোমার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কত কষ্টে কাল কাটাইয়াছি! আজ কি তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না? বল, অনিন্দ্যা, বল, তুমি কি আমার হইবে না?"

মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণা অনিন্দ্যা যখন দুরাত্মার এই ঘৃণিত প্রস্তাব শুনিলেন, তখন তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল। ক্রোধে ও ঘৃণায় যুগপৎ তাঁহার কোমল হৃদয় অভিভূত হইল। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন।

পাপিষ্ঠ শিবালিক অনিন্দ্যার মৌনভাব তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপক স্থির করিয়া মনে মনে ভাবিল, এখন আর অধিক পীড়াপীড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কল্য অতি প্রত্যূষে আসিয়া গিরণকে হত্যা করিয়া অনিন্দ্যাকে অনায়াসে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিব। এখন ইহারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; রাত্রির মত বিশ্রাম করুক। সে প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আমি তবে চলি-লাম। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। সুখই যদি তোমার জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমার প্রস্তাব উপেক্ষা করিও না। আমি কল্য প্রত্যূষে আবার আসিব।"

এই বলিয়া শিবালিক ত্বরিতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

পলায়ন।

পাপিষ্ঠ যে কখন চলিয়া গেল, অনিন্দ্যা তাহা জানিতেও পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, সে আর তথায় নাই, তখন তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং দুরাত্মার অভিপ্রায় ও নিজের অবস্থা বুঝিয়া ভীত হইলেন বটে; কিন্তু কিরূপে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। স্বামী বোধ হয় এতক্ষণ নিদ্রাগত হইয়াছেন; যদিও বা জাগিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এখন নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন। এ সময় তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আর শিবালিক যখন এই মাত্র চলিয়া গেল, তখন রাত্রিশেষ হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় সে আর আসিতেছে না। দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেই হইবে। এই রূপ ভাবিয়া অনিন্দ্যা তখন আর স্বামীকে কিছু না জানাইয়া কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন, এবং পুনরায় অঞ্চল ভূমিতে বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল, ঘুমাইয়া পড়িলে হয় ত রাত্রি থাকিতে জাগরিত নাও হইতে পারেন। সুতরাং বসিয়া জাগিয়া থাকাই এই অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত।

অনিন্দ্যা উঠিয়া বসিলেন, এবং বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা নিদ্রাজড়িত চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জিত করিলেন। এইরূপে বাধা পাইয়া নিদ্রা যেন আরও সবলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তিনি পণ করিয়া বসিয়াছেন যে, ঘুমাইবেন না। সে অদম্য মানসিক বলের কাছে কি শারীর-ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু এইরূপে পরাভূত হইয়াও নিদ্রা একেবারে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। সে প্রায়ই তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। তখন আবার তাহাকে তাড়াইতে নূতন উদ্যমের প্রয়োজন হইতেছিল। এই রূপে প্রহরের পর প্রহর কাটিতে লাগিল। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাত্রি অবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিঃশব্দে দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আকাশে তখনও দুই একটি তারকা ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। শুক্লা সপ্তমীর খণ্ড শশী তখনও নীল আকাশগাত্রে রজতময়ী তরণীর ন্যায় ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। তখনও অন্ধকার আছে। চারি দিকে সব নীরব, নিস্তব্ধ; শুধু ঝিল্লিরব সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল!

অনিন্দ্যা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুপ্তা প্রকৃতির সেই নীরব গাম্ভীর্য্য ও অবসানপ্রায় রজনীর সেই ম্লান সৌন্দর্য্য তাঁহার বিষণ্ণ হৃদয়কে অধিকতর বিষাদিত করিল। চিন্তাভারে তাঁহার মন প্রপীড়িত হইতে লাগিল। বিবাহের পর এক বৎসর তাঁহার কত সুখেই কাটিয়াছে! পতিপ্রেমের আধিক্যই যেন তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছিল! এত সুখ যেন তাঁহার আত্মসাৎ করা উচিত হইতেছিল না। পরে পত্নীগতপ্রাণ স্বামী যখন তাঁহাকে লইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বসিলেন, তখন যেন সেই অপরিসীম সুখও তাঁহার পাতিব্রত্যের অন্তরায় বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহার পর আজ অকস্মাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয়! অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! কি দোষে তিনি স্বামীর এরূপ বিরাগভাজন হইলেন? তাঁহার সুখের রবি কি চিরতরে অস্তমিত হইল?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি গিরণের কক্ষের দ্বারসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল; কক্ষমধ্যে গিরণ তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারদেশে আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন! গিরণের নিষ্ঠুর আদেশ তাঁহার মনে পড়িল। কিন্তু যখনই শিবালিকের শেষ কথা "কাল প্রত্যুষে আবার আসিব" তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তখনই তাঁহার আর সকল ভাবনা দূরীভূত হইল। কালবিলম্বে বিপদ-সম্ভাবনা জানিয়া তিনি তখনই স্বামীকে জাগাইতে অগ্রসর হইলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে এই সময় গিরণের নিদ্রার গাঢ়তা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং অনিন্দ্যার দুই একবার মৃদু সম্বোধনেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার আদেশ অবহেলা করার জন্য তিনি পত্নীকে ভর্ৎসনা করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু অনিন্দ্যা কাতরভাবে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"জানি না ও চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য আমার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পত্নীর বিপদে পতিই একমাত্র সহায়। তাই আমি মহাবিপদে পড়িয়া এই

অন্যায়ে প্রভুকে জাগাইয়াছি।” এই বলিয়া তিনি স্বামীর নিকট শিয়ালিক-ঘটিত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

গিরণ বুঝিতে পারিলেন যে, এখনই দুরাত্মা দলবলসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার মন স্ত্রীকে নির্দ্দোষ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তিনি একটু ক্রূর বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—“কেন, শিয়ালিককে তোমার পছন্দ হইল না?” এই নিষ্ঠুর বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনিন্দ্যা বাত্যাহতা ব্রততীর ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। স্বামীর সমস্ত দুর্ব্যবহার তিনি এতক্ষণ সহিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর যখন স্বামীকর্ত্তৃক এইরূপে অপমানিতা হইলেন, তখন তাঁহার যাতনা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল।

অনিন্দ্যাকে মূর্চ্ছিতা হইতে দেখিয়া একবার গিরণের মনে হইল “তবে কি আমি অন্যায় সন্দেহ করিয়া পত্নীর প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছি?” কিন্তু তিনি পূর্ব্বদিনের প্রত্যূষে স্বকর্ণে স্ত্রীর মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে পত্নীর অপরাধসম্বন্ধে ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সে ধারণা সহজে যাইবার নহে। সে যাহাই হউক এখন তিনি অনিন্দ্যার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে অনিন্দ্যা যখন উঠিয়া বসিলেন, তখন পূর্ব্ব দিক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব বিপদজনক জানিয়া গিরণ অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আইস, আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।” এই বলিয়া তিনি অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনিন্দ্যা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীর অনুসরণ করিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দস্যু-হস্তে।

প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া তপনদেব ধীরে ধীরে দেখা দিতেছেন। সুপ্তা প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্ব দিকের পথ ধরিয়া গিরণ ও অনিন্দ্যা মৃদুমন্দ বেগে অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়াছেন। শক্রর অনুসরণের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা অশ্বের গতি আরও মন্দীভূত করিয়া দিলেন। এখন আর অনিন্দ্যার প্রতি বাক্যালাপ বন্ধ করিবার সে কঠোর আদেশ নাই। কিন্তু শঙ্কাবিমূঢ়া অনিন্দ্যা এখনও বিনা প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া কোন কথা কহিতে সাহস করিতেছিলেন না। দুই জনে এখন প্রায় পাশাপাশি যাইতেছিলেন। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই পশ্চাদ্ভাগে দ্রুতধাবমান অশ্বের ক্ষুরশব্দ দম্পতীর কর্ণে প্রবেশ করিল। দুই জনেই অশ্বের মুখ ফিরাইলেন; দেখিলেন যে, অন্যূন দশ জন অশ্বারোহী তীরবেগে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। সকলেরই করে দীর্ঘ বর্শা; সেই সুশাণিত অস্ত্রসমূহ সূর্য্যকিরণে ঝকমক করিতেছিল। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহীকে শিবালিক বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

অনিন্দ্যাকে কিয়দ্দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া গিরণ দৃঢ় হস্তে বর্শাটি লইয়া আক্রমণকারিগণের অভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি শক্রগণের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। শিবালিক তাঁহার আক্রমণ এড়াইয়া পার্শ্বদিকে সরিয়া পড়িয়াছিল। ক্ষিপ্তপ্রায় গিরণের ভীম বর্শাঘাতে একজন অশ্বারোহী ভূতলশায়ী হইল। তখন একযোগে সকলে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু কি চমৎকার তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা! একাকী তিনি দশ জন যোদ্ধার অস্ত্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। আর গিরণের সৌভাগ্যক্রমে সম্মুখের তীব্র রবিকর তাহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছিল। সকলেই যখন বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত তখন গিরণ সহসা অতর্কিত ভাবে শিবালিককে এমন এক প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে; তাহাতেই সে হতজ্ঞান হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল। দলপতির সাহসেই অনুচরগণের সাহস। তাহারা যখন শিবালিককে ভূতলশায়ী দেখিল, তখন যে কয়জন বাঁচিয়াছিল, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

দূর হইতে অনিন্দ্যা স্বামীর অদ্ভুত রণকৌশল দেখিতেছিলেন। অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। তিনি কাতরভাবে ভগবানের নিকট বিপন্মুক্তির জন্য প্রর্থনা করিতেছিলেন। পরে যখন শক্রগণকে নিহত ও পলায়িত দেখিলেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভগবানকে ধন্য-

বায় দিতে লাগিলেন। তিনি ছুটিয়া স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং তিনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরণ কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বামীর অঙ্গের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি স্বামীর দেহের নানাস্থানে গভীর আঘাতচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং সেই সকল ক্ষতস্থান হইতে এরূপভাবে অজস্র রক্তস্রাব হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সত্যই গিরণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন; এবং অতি কষ্টে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন।*

এই নূতন বিপদে অনিন্দ্যা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া তিনি স্বামীর ক্ষতস্থানসমূহ বাঁধিয়া দিলেন এবং নিকটে পতিত একখানি বৃক্ষপত্র লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না। নিকটে কোথাও জল পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মূর্চ্ছিত পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া পতিব্রতা সাধ্বী সেই পথিপার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় এক দণ্ড কাল অতিবাহিত হইলে একদল দস্যু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গ্রামান্তরে দস্যুতা করিতে যাইতেছিল। পথের পার্শ্বে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া দস্যুদলপতি তথায় দাঁড়াইল এবং অনিন্দ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"সুন্দরী, মৃত ব্যক্তির জন্য কেন বৃথা কাঁদিতেছ? উহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠ; নিকটেই আমার আলয়, তথায় যাইলে তোমার আর কোন কষ্ট থাকিবে না।"

অনিন্দ্যা কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দলপতি তখন একটা ইঙ্গিত করিতেই কয়জন দস্যু অগ্রসর হইয়া গিরণকে অনিন্দ্যার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টিত হইল। অভাগিনীর তৎকালীন মানসিক অবস্থা কল্পনারও অতীত। পাছে তাহাদের বলপ্রকাশে আহত ও মূর্চ্ছিত স্বামীর অনিষ্ট হয়, তাই তিনি তাহাদের নির্ম্মম চেষ্টায় বাধা দিতেও পারিতেছেন না; আবার কোন্ প্রাণেই বা তিনি সেই কালান্তক সদৃশ দস্যুদিগের হস্তে স্বামীকে ছাড়িয়া দিবেন? কিন্তু এই ভীষণ বিপদেও তিনি ধৈর্য্য হারাইলেন না। তিনি আর কোন উপায় না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দলপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার স্বামী জীবিত আছেন।

আমার সঙ্গে। তাঁহাকে লইয়া চল।” তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, পথের ধারে এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিলে স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত। দস্যুর আলয়ে যাইলে হয় ত তাঁহার বাঁচিবার উপায় হইতে পারে। তাহার পর পরমেশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। সতীত্বের তেজে তাঁহার হৃদয়ে এখন সাহস আসিয়াছে।

দস্যুদলপতি কি ভাবিল জানি না। সে এক জন অনুচরকে গিরণকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল। দুই জন দস্যু তাঁহাদের দুই জনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অপর সকলে তাহাদের অভীষ্ট কার্য্যে গমন করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

অনতিবিলম্বে দস্যুদ্বয় তাঁহাদের দুই জনকে অরণ্যমধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহমধ্যে এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে একটি দালানে লইয়া গেল। তাহারই এক পার্শ্বে অনিন্দ্যাকে তাহাদের প্রত্যাগমন কালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া এবং মৃতবৎ মূর্চ্ছিত গিরণকে তাঁহার নিকট নামাইয়া দিয়া তাহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার পূর্ব্বে তাহারা একজন ভৃত্যকে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ করিয়া গেল।

পুরীটি জনশূন্য বলিয়া বোধ হইল। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনিন্দ্যা জানিলেন যে, বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ তখনও নিদ্রিত। সেই দস্যুপুরীতে কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

কিন্তু তিনি এখন বিপদে একেবারে অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে শিখিয়াছেন। স্বামী তখন মূর্চ্ছিত; সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চৈতন্যসঞ্চার এখন তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

তাঁহার আদেশক্রমে ভৃত্য তাঁহাকে শীতল জল ও ব্যজনী দিয়া গেল। তিনি সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকারে পতির মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইয়া একাগ্রমনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সতীর কাতর আহ্বানে কি ভগবানের আসন না টলিয়া থাকিতে পারে? কিয়ৎক্ষণ পরেই গিরণ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। একবার তিনি বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং পরক্ষণেই ক্ষীণকণ্ঠে "জল" এই কথাটি মাত্র উচ্চারিত করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তখন তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত।

অনিন্দ্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শীতল বারি পান করাইলেন। তাহার পর ভৃত্যের সাহায্যে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তিনি অত্যল্প মাত্রায় তাহা স্বামীর গলাধঃকরণ করাইলেন।

গিরণ পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অনিন্দ্যা মনে করিলেন, অত্যধিক দুর্ব্বলতাই বোধ হয় তাহার কারণ।

সেই জনশূন্যবৎ প্রকাণ্ড পুরীতে অনিন্দ্যা পতির পার্শ্বে একাকিনী বসিয়া রহিলেন। প্রহরের পর প্রহর যাইতে লাগিল; প্রভাত-রবির মৃদু কিরণ ক্রমে মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে পরিণত হইল। আবার তাহা মন্দীভূত হইয়া দিনদেবের বিদায়-কালের সূচনা করিল।

পতিপ্রাণা অনিন্দ্যা তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর ন্যায়ই নিশ্চল—নিশ্চেষ্ট। পূর্ব্বদিনের পথপর্য্যটন, অনাহার ও অনিদ্রা তাঁহার শরীরে যে অবসাদ আনিয়া দিতেছিল, তাহা তাঁহার মানসিক বলের কাছে তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। তাহার পর আরও সমস্ত দিন তিনি উপবাসী। তিনি কেবল বিপদভঞ্জন ভগবানের নিকট এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন; আর মাঝে মাঝে কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নানা দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। এখনই হয় ত দস্যুরা আসিয়া পড়িবে। গিরণ এখনও উঠিতেছেন না কেন? এখনও হয় ত এই নরক সদৃশ স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারা যাইত। তবে কি এই নারকীদিগের সহিত এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে? না জানি এখনও কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা কপালে আছে!

অনিন্দ্যা জানিতেন না যে, গিরণ যে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন তাহাতে একপ্রকার মাদক দ্রব্য মিশ্রিত ছিল। দস্যুরা সমস্ত পানীয়ের সহিত তাহা

শিশাইয়া পান করিত। তাহা কিয়ৎ পরিমাণে মন্ত্রের কায করিত। কিন্তু যাহারা তাহা পানে অনভ্যস্ত তাহারা তাহাতে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িত। গিরণের শারীরিক দুর্ব্বলতা এই মাদকদ্রব্যজনিত নিদ্রাকে বহুক্ষণ স্থায়ী করিয়াছিল।

অনিন্দ্যা যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই হইল। একটা বিকট চীৎকার দস্যুগণের আগমন ঘোষণা করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ তথায় স্তূপাকৃত করিয়া তাহারা মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই দালানে আসিয়া কেহ উপবেশন করিল, কেহ দিবসের কার্য্যজনিত উত্তেজনায় পরিক্রমণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই তথায় প্রচুর পরিমাণে মদ্য মাংস প্রভৃতি আনীত হইল। তখন তাহারা সকলেই আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কলরবে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল।

অনিন্দ্যা অত্যন্ত ভীত হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। দস্যুদের চীৎকারে গিরণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু সেই মাদকদ্রব্য-পানফলে তিনি চক্ষু খুলিতে পারিতেছিলেন না। সন্ধ্যার স্বচ্ছ অন্ধকারে দস্যুরা প্রথমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। বোধ হয়, তাঁহাদের বিষয় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু আহারের সময় দালানটিতে যখন উজ্জ্বল আলোক প্রজ্বালিত হইল তখন দস্যুপতির দৃষ্টি অনিন্দ্যার প্রতি পতিত হইল। তখনই সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "সুন্দরি, তুমি সমস্ত দিন কিছু খাও নাই? এখনও এই মরা লোকটিকে লইয়া বসিয়া আছ? আইস, আমাদের সঙ্গে আহার করিবে।"

অনিন্দ্যা সাহসে ভর করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন, ততক্ষণ আমি কিছুই খাইব না।"

দস্যুপতি ইহা শুনিয়া বিদ্রূপ-বিকৃতস্বরে বলিল, "কি! এই দশ বার ঘণ্টা ধরিয়া লোকটা ঘুমাইতেছে! তুমি পাগল হইয়াছ? ইহার গায়ে যেরূপ আঘাত দেখিতেছি, তাহাতে মানুষ কি কখনও বাঁচিতে পারে? আর বৃথা কেন ভাবিয়া মর? আইস; শীঘ্র আইস। তুমি না আসিলে আমার আজ

খাইয়া সুখ হইবে না।" এই বলিয়া সে অনিন্দ্যার অভিমুখে দুই এক পদ অগ্রসর হইল।

অনিন্দ্যা আপনার বিপদ বুঝিতে পারিলেন; বিপদে রমণীর একমাত্র সহায় স্বামীর দিকে একবার চাহিলেন। এত গোলমাল কোলাহলেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না কেন? তবে কি সত্য সত্যই তিনি মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন? না তাহা হইবে কেন? তাঁহার গাত্র ত তাপহীন হইয়া যায় নাই?

দস্যুপতিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি কাতর কণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, "আমার স্বামী যতক্ষণ না আমাকে আমার করিতে বলিবেন, ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ করিব না।"

"আমার কাছে ওসব ওজর খাটিবে না" বলিয়া দস্যু বলপূর্ব্বক অনিন্দ্যাকে লইয়া যাইতে অগ্রসর হইল। ভয়বিহ্বলা অনিন্দ্যা উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গিরণ শুইয়া শুইয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। শেষে যখন তিনি পত্নীর ক্রন্দন শুনিলেন, তখন এক প্রবল চেষ্টায় দৌর্ব্বল্য ও জড়তাকে দুর করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন; এবং নিমেষের মধ্যে কোশ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দস্যুপতির মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিলেন; এবং দস্যুগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

যাহাকে তাহারা মৃত বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেই মৃত ব্যক্তি দলপতিকে হত্যা করিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে দেখিয়া তাহারা মৃত শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে স্থির করিল; এবং ভয়ে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় যে যে স্থানে পারিল পলাইল। অনেকে তাঁহার অস্ত্রাঘাতে ভূমিশয্যায় শয়ন করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সতীর আনন্দ।

পুরী শত্রুশূন্য হইয়াছে দেখিয়া গিরণ ধীরে ধীরে পত্নীর কাছে আসিলেন, এবং সস্নেহে তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার এই নরাধম স্বামীকে কি তুমি ক্ষমা করিবে? হায়! আমার

কি দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, তোমার ন্যায় দেবীস্বরূপিণী পত্নীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম! জানি না কি জন্য তোমায় দিন দিন মলিন ও বিষণ্ণ দেখি-দেখিতাম; জানি না কেন সেই কাল প্রত্যুষে তোমার মুখে সন্দেহপূর্ণ কথা শুনিয়াছিলাম। সে সকলের কারণ এখন আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না। কারণ তুমি যে কতদূর পতিগতপ্রাণা তাহা আজ বুঝিতে পারিয়াছি। অনিন্দ্যা, তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে?"

অনিন্দ্যা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "নাথ, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কেন ভগবানের নিকট আমাকে অপরাধী করিতেছেন? আমার ন্যায় তুচ্ছ রমণী যে আপনার প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে? আমার সুখের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু শত্রুগণ যে আপনাকে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই জন্যই আমি মনে মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিতে-ছিলাম। আমি মুখ ফুটিয়া এ কথা আপনাকে বলিতে পারিতাম না। কল্য প্রত্যুষে আমি মনে মনে সেই কথা তোলাপাড়া করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, আমি তবে বুঝি আপনার প্রকৃত পত্নী হইতে পারিলাম না। তাহার পরেই আমাকে লইয়া আপনি বাহির হইয়া পড়িলেন। আপনার এই দুই দিনের কার্য্যাবলী আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এখন আমার কি আনন্দ!"

গিরণ আবেগভরে পত্নীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ওঃ, আমি কি ভ্রমেই পতিত হইয়াছিলাম! হায়, অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস! ভগবানের কি নিদারুণ পরীক্ষা, যে যত দুঃখকষ্ট তোমাদের ন্যায় আদর্শ রমণীদিগের কপালেই থাকে! সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী প্রভৃতি পূতচরিতা আর্য্যনারীগণের করুণ দুঃখ কাহিনী কাহার না হৃদয় পীড়িত করে? আজ তুমি তাঁহাদেরই ন্যায় মহিমময়ী; অগ্নিপূত স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় পবিত্রতায় উজ্জ্বল। আর আজ তুমি আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহার জন্য আমি চিরকাল তোমাকে গুরুর আসনে বসাইয়া রাখিব। তুমি আর কখনও আমায় কর্ত্তব্যে অব-হেলা করিতে দেখিবে না। আজ তোমার কাছে শিখিলাম যে, যে প্রেম জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলাইয়া দেয়, তাহা প্রেম নহে, পরন্তু মোহ মাত্র। এতদিন আমি সেই মোহে মত্ত ছিলাম, মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছিলাম। তুমি প্রকৃত পত্নীর কায করিয়াছ; আমার নষ্টপ্রায় কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া

দিয়াছ। কিন্তু হায়, তৈল যেমন আপনি পুড়িয়া অন্ধকার কক্ষ আলোকিত করে, তুমিও তেমনই নিজে দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আমার মনের অন্ধকার দূর করিয়াছ। আজ আমি তোমার প্রতি পৈশাচিক দুর্ব্ব্যবহারের জন্য যেমন ভীষণ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, তেমনই আবার এত দিনে তোমার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনাকে অশেষ সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি।"

মানসিক উত্তেজনা গিরণের শারীরিক দৌর্ব্বল্যকে কিয়ৎক্ষণের জন্য দূর করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইল; তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না; লজ্জানতমুখী অনিন্দ্যার গাত্রে ঢলিয়া পড়িয়া তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন; এবং হর্ষাবেগভরে বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার স্কন্ধদেশে স্বীয় মস্তক ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন।

তাহার পর ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া তিনি অনিন্দ্যাকে বলিলেন, "প্রিয়ে, এই রাত্রিটা এই স্থানেই কোনরূপে কাটাইয়া দেওয়া যাউক। এখন বোধ হয় এ স্থানে আর বিপদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যূষেই আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থানেই শুইয়া পড়িলেন, আর পত্নীকেও নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অনিন্দ্যা শয়ন না করিয়া নিদ্রিত পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

আজ অনিন্দ্যার কি আনন্দ! সেই আনন্দের প্রবল বন্যায় গত দুই দিনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভাসিয়া গেল। সুখময় বর্ত্তমানের কাছে, সে সকল দুঃখময় ব্যাপার এখন তাঁহার নিকট অলীক স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। আনন্দের প্রাবল্যে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। পূর্ব্ব রাত্রির অনিদ্রা সত্বেও তিনি এখনও জাগিয়া থাকিতে কষ্ট অনুভব করিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

কে এ? অদীরণ!

নিদ্রাভঙ্গে গিরণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া পত্নী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন, তখন তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, —"অনিন্দ্যা, তুমি দেবী না মানবী? মানবে কি এত গুণ, এত কষ্টসহন-

শীলতা সম্ভবে ? হায়, কি মোহেই আমি আচ্ছন্ন ছিলাম ! আর তোমার উপর আমি যত অত্যাচার করিয়াছি, তত অত্যাচার বুঝি অদীরণও করে নাই। আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই।"

অনিন্দ্যা যেন লজ্জাজড়িতস্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাহিরে শব্দ হইল। পরক্ষণেই বর্শাহস্তে কয়েকজন অশ্বারোহী অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরণের দিকে ধাবিত হইল।

কিন্তু এ কি ! তাঁহার নিকটে আসিয়াই অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি অস্ত্র নামাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল কেন ? সে বিস্ময়কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"অনিন্দ্যা !—গিরণ ! আপনারা এখানে ! ব্যাপার কি ?"

এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অদীরণ। তাহাকে সদলে তখন সেই স্থানে দেখিয়া তাঁহারা দুই জনই স্থির করিলেন যে, তাহার পূর্ব্বচরিত্র সংশোধিত হয় নাই ; সে নিশ্চয়ই দস্যুবৃত্তি করিতেছে। অনিন্দ্যার নয়নে ও মুখে আশঙ্কার ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল, গিরণও সাধ্যমত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র লইতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া অদীরণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"কুমার, আপনি অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। আমি আর আপনাদের শত্রু নহি। অনিন্দ্যা, তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ ? শুন ; আমি আর সে অদীরণ নাই ; এখন আমি একজন মানুষ, এখন আমি রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের অনুচর, দস্যু-তস্কর প্রভৃতি অত্যাচারীর দমনকারী অদীরণ। তোমারই কৃপায় আমার এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন। তুমিই আমার প্রাণ দিয়াছিলেন। আর কুমার, আপনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি ; অত্যাচারীর দমনে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছি। দস্যুদমন করিবার জন্য আমার এ সময়ে এ স্থলে আগমন। এই প্রদেশে দস্যুর অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানে দুর্ব্বৃত্তরা দিবাভাগেই ডাকাইতি করে। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল, আর কাতরভাবে আপনাদের দুরবস্থার কথা মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছিল। প্রজাবৎসল মহারাজ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দস্যুদল সমূলে ধ্বংস করিতে সৈন্য সামন্ত লইয়া নিজেই বাহির হইয়াছেন। আমি তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছি। নানাস্থানে দস্যুদিগকে বিনষ্ট করিয়া অবশেষে গুপ্ত রাত্রিতে আমরা এ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমরা শুনিলাম, এই প্রদেশে নাকি দিবাভাগেই

দস্যুরা লুণ্ঠন করিতে বহির্গত হয়! তাই আমি নিশাশেষেই মহারাজের আদেশে এই পুরী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলাম। চারিদিকেই সৈন্য সন্নিবেশিত আছে; কাহারও পলাইবার উপায় নাই। কিন্তু, কই একজনও দস্যু দেখিতেছি না ত? তাহারা কি বাহির হইয়া গিয়াছে? আর আপনারাই বা এ স্থানে কেন?"

দুই জন এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া অদীরণের এই কথা শুনিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে গিরণ কহিলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ, যে তোমার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে এ স্থানে আর তোমার কিছু করিবার নাই। ঐ দেখ, দস্যুদিগের ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। কেহ কেহ পলায়ন করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা কেহ আর এ দিকে দস্যুতা করিতে সাহস করিবে না। ঐ তাহাদের দলপতির মস্তকহীন শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। আমি যে কিরূপে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিব। এখন বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। একে, আমি স্বয়ং অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহাতে আবার গত দুই দিন আমাদের অন্ন আহার জুটে নাই; এ সময় এরূপ আশ্রয় না পাইলে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িত। এখন চল আমরা মহারাজের নিকট গমন করি।" এই বলিয়া তিনি অনিন্দ্যাকে পার্শ্বে লইয়া অগ্রসর হইলেন। অদীরণও অনুচরগণ সহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রমণী-রত্ন।

স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য হৃদয়ে যে অনুতাপ-শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা উৎপাটিত করিবার মানসে গিরণ মহারাজ ধর্ম্মপালের নিকট সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। মহারাজ তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এই সংসারে এমন মানুষ বোধ

হয় কেহই নাই যাহাকে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয় না, যাহার নিকট কোন-না-কোন সময়ে পৃথিবীটা মরু-ভূমি-তুল্য বোধ হয় না। কিন্তু এই মরু-ভূমিকে সুখের নন্দনে পরিণত করিতে, এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে, একটি জিনিস আছে; তাহা পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়। যে দম্পতী পরস্পরকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাদের নিকট সংসারের কোন কষ্ট কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। এই পৃথিবীতেই তাহারা স্বর্গ-সুখ ভোগ করে, প্রেমামৃত পানে তাহারা বিভোর হইয়া থাকে। তাহাদের জীবন চিরসুখময়। কিন্তু যখনই দম্পতীর মধ্যে একজন অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের সমস্ত সুখ চির বিদায় গ্রহণ করে, অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পান করিয়া তাহারা তখন অনন্ত যাতনায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এই সন্দেহ যে অধিকাংশ স্থলেই অন্যায় ও ভিত্তি-হীন, তাহা কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন হয় ত অনিষ্ট যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। তখন সেই হতভাগ্য সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির অবস্থাটা কিরূপ হয় তাহা ভাবিলেও মনে কষ্ট হয়! এইরূপ সন্দেহের কারণ কি? কারণ এই যে, মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থপর, ভালবাসাতেও তাহার স্বার্থপরতা অনেক সময়ে পূর্ণ মাত্রায় থাকে। সে ষোল আনা পাইতে চাহে, একটু ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। এই ভাবটা অপরের পক্ষে বড় কষ্টকর হয়। ফলে এক জন নানা অন্যায় সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিতে আরম্ভ করে; আর অন্য জন হয় সরল ভাবে পূর্ব্ববৎ আচরণ করিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হইতে থাকে, নহে ত অভিমানভরে হঠকারিতায় প্রবৃত্ত হয়। তোমাদের মধ্যেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি অনিন্দ্যার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা পাইয়াছ। তিনি এত অনাদর সত্ত্বেও তোমার প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। তাহা না হইলে হয়ত এখন তোমার কেবল অশ্রু ও হাহাকারই জীবনের সম্বল হইত। তুমি এরূপ পতিপ্রাণা পত্নী লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। আর তোমায় অধিক কি বলিব? এখন বোধ হয় তোমার ন্যায় সুখী জগতে অতি অল্পই আছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এ সুখে আর কোন বিঘ্ন, কোন ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইবে না।" তাহার পর নতমুখী অনিন্দ্যার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ করি, স্বামি-সোহাগিনী হইয়া চিরসুখে কালযাপন কর; আর পাতিব্রত্যের যে দৃষ্টান্ত আজ তুমি জগৎ সমক্ষে প্রচার করিলে, প্রার্থনা করি, তাহা যেন লক্ষ লক্ষ রমণীকে

স্বাধীনতাউদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করে।" কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "যাও, তোমরা বিশ্রাম ও আহারাদি কর।"

সেই বন্যমধ্যে পটমণ্ডপে তাঁহারা দুই দিন অবস্থান করিলেন। গিরণ শরীরে বেশ বল পাইলেন; আর তাঁহার ক্ষতসমূহও অনেকটা শুষ্ক হইয়া আসিল। তখন কুমার মহারাজের নিকট বিদায় চাহিলে, তিনি বলিলেন, "তাহা কি হয়? তোমার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। আবার এই বনের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা কি কখনও হইতে পারে? আমাদের এ স্থানের কায প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার জন্য একদল মাত্র সৈন্য অদীরণের অধীনে রাখিয়া আমরা কল্যই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিব। তোমরাও আমার সঙ্গে তথায় যাইবে। তাহার পর তথা হইতে ধীরে সুস্থে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। তোমার পিতা ও আত্মীয়স্বজন যাহাতে চিন্তিত না হয়েন সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছি।"

গিরণ আর কোন আপত্তি করিলেন না; মহারাজের সঙ্গে তাঁহারা রাজধানী পাটলিপুত্রনগরে গমন করিলেন। তথায় কয়েক দিন থাকিয়া উপযুক্ত যানাদি আরোহণ তাঁহারা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ তাঁহাদের সঙ্গে অনেক অনুচর দিলেন।

গিরণ কোন কথাই গোপন না করিয়া আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের নিকট এই কাহিনী বিবৃত করিলেন। এইরূপে তিনি আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন।

শত মুখে তখন অনিন্দ্যার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। গিরণ আবার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। এখন তাঁহার ন্যায় সুখী জগতে আর কে?

সম্পূর্ণ।

সমালোচনা।

—০:০—

অনুপ্রাস।*

—০:০—

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিধান—ব্যঞ্জনসাম্যে অনুপ্রাস হয়। ইংরাজীতে স্বরসাম্য ও ব্যঞ্জনসাম্য উভয়ই দেখা যায়। অনুপ্রাসের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট ছিল, আজ কালও দেখা যায়। অনুপ্রাসে রচনায় মাধুরী সঞ্চারিত হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "এক সময়ে, শুধু আমাদের সাহিত্যে কেন, সকল দেশের সাহিত্যেই, অনুপ্রাসের খুব চলন ছিল। এখন ইহা অনেকের মতে সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। * * * সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সমালোচনা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এক কথায় বলিতে গেলে, রন্ধনে লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, অথচ মাত্রা অধিক হইলে অখাদ্য হয়, অনুপ্রাসও সেইরূপ পরিমিত প্রয়োগে রচনার সৌন্দর্য্য-সাধন করে, ভূরি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে।" প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, আমাদের পদ্যে দাশরথি ও গদ্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় অনুপ্রাস প্রয়োগে বাড়াবাড়ি করিয়া রচনার সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন; আর ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন তাহার পরিমিত প্রয়োগে রচনার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, মধুসূদনের রচনায় সুপ্রযুক্ত অনুপ্রাসের গুণে তাঁহার রচনা সহজেই স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও অনুপ্রাসের অলঙ্কারে রচনা সুসজ্জিত করিতে বিরত হয়েন নাই।

বাস্তবিক অনুপ্রাস ভাষাতত্ত্বের একটি কৌতুকাবহ রহস্য। অনেকের বিশ্বাস, অনুপ্রাস জিনিষটা নিতান্ত কৃত্রিম, সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক ভাষার সহিত অনুপ্রাসের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। কিন্তু ললিত বাবু দেখাইয়াছেন,—"শুধু সাধু ভাষায় নহে, সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায়ও অনুপ্রাসের অনুপাত কম নহে। এক কথায়, অনুপ্রাস ভাষা-শরীরের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাষাগঠনে

* অনুপ্রাস—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত—৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

অনুপ্রাসের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।" আর এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, "ভাষাতত্ত্ব হিসাবে, সাধুভাষার অপেক্ষা সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষার ব্যবহৃত অনুপ্রাসের দৃষ্টান্তগুলিই অধিকতর মূল্যবান। কেন না সেগুলি আসল ও অকৃত্রিম।"

অনুপ্রাসে শব্দের ধ্বনি-সামঞ্জস্যে কথাটা সহজে স্মৃতিবদ্ধ হইয়া যায় বলিয়াই প্রবাদবাক্যে অনুপ্রাসের অবাধ অধিকার।

আমরা অনুপ্রাসের অনুরাগী। ভাব রচনার প্রাণ; কিন্তু ভাষা তাহার দেহ। দেহের সৌন্দর্য্য সহজেই লোককে আকৃষ্ট করে; তাহা অবহেলার সামগ্রী নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।"

অনুপ্রাসের নানা রূপ, নানা ভাব। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার অসাধারণ নিপুণতাসহকারে ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া অনুপ্রাসের সেই সব রূপ ও ভাব দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি একাধারে অনুপ্রাসের অভিধান ও নিদান। যাঁহারা সরস বাঙ্গালা রচনা করিতে চাহেন, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপ নির্ণয়-প্রয়াসী, আর যাঁহারা বাঙ্গালা রচনার রস সম্যক উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন—সকলকেই আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রচনার গুণে এই পুস্তকখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে! গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন—"কটুকষায়স্বাদ ভাষাতত্ত্বের কথা একটু মিষ্টরসে পাক করিয়া বাজারে বাহির করিয়াছি।" রচনায় ললিতের ললিতলাবণ্যলীলা সর্ব্বত্র প্রকাশ; আর উদাহরণ সংগ্রহে যে অসাধারণ অধ্যবসায় অবলোকিত হয় তাহা সত্য সত্যই বিস্ময় কর।

গ্রন্থের দৈহিক সৌন্দর্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাপা পরিষ্কার—নির্ভুল না হউক ভুল অতি অল্প। আবরণ সুন্দর। আর পুস্তকে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের অঙ্কিত হরগৌরীর চিত্রের যে চারিবর্ণে মুদ্রিত প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রাবণ মাসে আমরা তাহা পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছি।

পুস্তকের মূল্যও যথাসম্ভব অল্প নির্দ্ধারিত হইয়াছে।
